জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বর্ণানুক্রমিক ষাণ্মাসিক বিষয়সূচী

জানুয়ারী হইতে জুন—1972

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ষাণ্মাসিক বর্ণানুক্রমিক লেখকসূচী

জানুয়ারী হইতে জুন — 1972

চিত্রসূচী

প্রধান সম্পাদক—**শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য**

শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ 37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

রজত জয়ন্তী বর্ষ   জানুয়ারী, 1972   প্রথম সংখ্যা

নববর্ষের নিবেদন

নববর্ষের প্রাক্কালে পাকিস্তানের নাগপাশ হইতে বাংলাদেশের সর্বাত্মক মুক্তির মধ্য দিয়া বাঙালীজাতির যে নব-অভ্যুত্থানের সূচনা হইয়াছে, আমরা তাহাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি। যাঁহাদের আত্ম-বলিতে মুক্তি-যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইয়াছে, বাংলা দেশ ও ভারতের সেই বীর শহীদদের পবিত্র স্মৃতির প্রতি আমরা শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিতেছি।

বর্তমান বর্ষ 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা তথা বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের রজত জয়ন্তী বর্ষ।

সুদীর্ঘ 24 বৎসর অতিক্রম করিয়া 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা আজ যে পঞ্চবিংশতিতম বর্ষে পদার্পণ করিল, বাংলাভাষায় বিজ্ঞান পত্রিকার ইতিহাসে ইহা একটি স্মরণীয় ঘটনা।

প্রায় 25 বৎসর পূর্বে কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর কক্ষে কয়েকজন বিজ্ঞানী সমবেত হইয়া আচার্য বসুর প্রেরণায় বাংলাভাষায় বিজ্ঞানবিষয়ক একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন।

1948 সালের জানুয়ারী মাসে এই পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হয়। ঐ সময় বাংলাভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উহার পরিচালনায় 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা প্রকাশ লাভ করে।

তখন বিজ্ঞান পরিষদের বিশেষ কোন আশ্রয়স্থল ছিল না—বিজ্ঞান কলেজে আচার্য বসুর কক্ষেই মাঝে মাঝে সমবেত হইয়া পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যকরী ব্যবস্থা করা হইত। অনেকেই তখন পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত পত্রিকাটির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। বসু বিজ্ঞান মন্দিরের তদানীন্তন অধ্যক্ষ ডক্টর দেবেন্দ্রমোহন বসু মহাশয় বসু বিজ্ঞান মন্দিরের একটি প্রশস্ত কক্ষ বিজ্ঞান পরিষদের কার্যাদি চালাইবার জন্ত ব্যবহারের ব্যবস্থা করিয়া দেন। কয়েক বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পর 1955 সালে বিজ্ঞান পরিষদ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডস্থ ফেডারেশন হলে ভাড়াটিয়া কক্ষে উঠিয়া আসে। 1969 সালে বিজ্ঞান পরিষদ তাহার নিজস্ব গৃহ নির্মাণ করিয়া সেখানেই বর্তমানে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আজ রজত জয়ন্তী বর্ষের প্রারম্ভে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র পাঠকবৃন্দ, লেখকমণ্ডলী ও পৃষ্ঠপোষকগণকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

বিগত 24 বৎসরে অনেক রকমের বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া পত্রিকাটিকে অগ্রসর হইতে হইয়াছে; আরও অনেক বাধাবিঘ্ন আসিতে পারে—তাহাও অতিক্রম করিতে হইবে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, সংশ্লিষ্ট সকলের সাহায্যে ও ঔদার্যে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র অগ্রগতি অব্যাহত গতিতেই চলিতে থাকিবে।

সাহায্য ও সহযোগিতা আমরা অনেকেই পাইয়াছি, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তাহা যথেষ্ট নয়। বর্তমানে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র প্রচার সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে সত্য, কিন্তু এই প্রচার সংখ্যা আরও বহুগুণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। বর্তমান প্রচার সংখ্যার বৃদ্ধির মূলে আছে পাঠক সাধারণের ক্রমবর্ধমান আগ্রহ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাবিভাগের আনুকূল্য। তাঁহাদিগকে জানাই আমরা আন্তরিক ধন্তবাদ।

বিদেশী বিজ্ঞান পত্রিকার পিছনে যে আর্থিক সাহায্য বিদ্যমান, আমাদের ক্ষেত্রে তাহার নিতান্ত অভাব। এই আর্থিক সমস্যা যতই দূরীভূত হইবে, 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' ততই নূতন নূতন পথের সন্ধান অবশ্যই করিতে পারিবে—এই বিশ্বাস আমাদের আছে। বিজ্ঞানানুরাগী জনসাধারণের সহানুভূতি ও সক্রিয় সহযোগিতাই আমাদের পাথেয়।

তাপতড়িতীয় ঘটনা ও হিমায়ন

শ্রীপ্রদীপকুমার দত্ত*

সূচনা

মানব সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানেরও অগ্রগতি হয়েছে। যুগে যুগে নানা-বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্যের আবিষ্কার হয়েছে। এই সমস্ত আবিষ্কার মানবজাতিকে করেছে সমৃদ্ধ। অনেক সময় এমনও হয়েছে যে, কোনও আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক সত্যের ব্যবহারিক উপযোগিতা আবিষ্কারের অব্যবহিত পরেই অনুভূত হয় নি। কিন্তু পরবর্তী কালে তা বিরাট সম্ভাবনাপূর্ণ বলে প্রতিভাত হয়েছে। এমনই একটি আবিষ্কার হলো তাপতড়িতীয় ঘটনা (Thermo-electric effect)। এপর্যন্ত তিন প্রকার তাপতড়িতীয় ঘটনার কথা জানা গেছে। প্রথমটি আবিষ্কৃত হয় 1821 খৃষ্টাব্দে। আবিষ্কার করেন টমাস জন সিবেক। তিনি দেখেন দুটি পৃথক ধাতব তার দুই প্রান্তে পরস্পর সংযুক্ত করে (যার নাম থার্মোকাপল) সংযোগ বিন্দু (Junction) দুটির একটিকে উত্তপ্ত করলে অর্থাৎ দুই সংযোগ বিন্দুর মধ্যে তাপমাত্রার পার্থক্য সৃষ্টি করলে সংযোগ বিন্দুদ্বয়ের মধ্যে একটি বিভব প্রভেদের সৃষ্টি হয়। আবিষ্কারকের নাম অনুসারে এটি সিবেক ঘটনা (Seebeck effect) নামে পরিচিত। সৃষ্ট সিবেক বিভব প্রভেদের পরিমাণ খুবই কম, কয়েক মাইক্রোভোল্ট মাত্র। তাই এই ঘটনার ব্যবহারিক প্রয়োগের দ্বারা বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন করা যায় না। তবে এর সাহায্যে সাফল্যের সঙ্গে তাপমাত্রার পরিমাপ করা সম্ভব হয়েছে।

1834 খৃষ্টাব্দে পেলটিয়ার সিবেক ঘটনার বিপরীত একটি ঘটনা আবিষ্কার করেন। দুটি পৃথক পরিবাহী তারকে দুই প্রান্তে সংযুক্ত করে তার মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত করা হলে সংযোগ বিন্দুদ্বয়ে তাপমাত্রার পার্থক্যের সৃষ্টি হয়—একটি সংযোগ বিন্দু উত্তপ্ত ও অপরটি শীতল হয়ে পড়ে। এই ঘটনা পেলটিয়ার ঘটনা (Peltier effect) নামে পরিচিত এবং এটি জুল তাপায়ন (Joule heating) থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। একটি পরিবাহীর মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হলে পরিবাহিতা রোধের জন্যে তা উত্তপ্ত হয় এবং উৎপন্ন তাপের পরিমাণ তড়িৎ-প্রবাহের বর্গের সমানুপাতিক। এটিই হলো জুল তাপায়ন। পেলটিয়ার ঘটনায় উৎপন্ন তাপ প্রবাহিত তড়িতের সমানুপাতিক।

পেলটিয়ার ঘটনার প্রথম ব্যবহারিক প্রয়োগ হয় 1838 খৃষ্টাব্দে। এই ঘটনার প্রয়োগে জলকে বরফে পরিণত করা হয়। বিসমাথ ও অ্যান্টিমনি ধাতুর তারের দ্বারা এক্ষেত্রে থার্মোকাপল তৈরি করা হয়। থার্মোকাপলের মধ্য দিয়ে বিপরীত দিকে তড়িৎ প্রবাহিত করে সেই বরফকে তিনি আবার জলে পরিণত করেন। এভাবে তাপতড়িতীয় ঘটনা হিমায়নের কাজে ব্যবহারের দ্বার উন্মুক্ত করলো। অবশ্য কেবলমাত্র গত দশক থেকে পেলটিয়ার ঘটনার প্রয়োগে হিমায়ন বা Refrigeration-এর স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে। এর আগে দীর্ঘ এক শতাব্দী বৈজ্ঞানিক তথ্য হিসাবেই পেলটিয়ার ঘটনার সাহায্যে হিমায়নের গুরুত্ব ছিল।

---

* পদার্থবিদ্যা বিভাগ, আচার্য বি. এন. শীল কলেজ, কোচবিহার।

সিবেক ও পেলটিয়ার গুণাঙ্ক

সিবেক ও পেলটিয়ার ঘটনার ব্যবহারিক প্রয়োগের জন্যে পদার্থের সিবেক ও পেলটিয়ার গুণাঙ্ক সম্বন্ধে ধারণা থাকা প্রয়োজন। সিবেক গুণাঙ্ককে আমরা গাণিতিক উপায়ে নিম্নলিখিত ভাবে প্রকাশ করতে পারি।

$\alpha = \frac{dE}{dT}$......(1), যেখানে α হলো সিবেক গুণাঙ্ক এবং dE হলো দুটি বিভিন্ন ধাতুর দুই সংযোগ বিন্দুর মধ্যে dT তাপমাত্রার পার্থক্যের জন্যে সৃষ্ট বিভব প্রভেদ। সুতরাং কোনও নির্দিষ্ট পরিমাণ তাপমাত্রার প্রভেদের জন্যে উৎপন্ন বিভব প্রভেদ বেশী হতে হলে সিবেক গুণাঙ্ককে বেশী হতে হবে। কিন্তু ধাতু ও সঙ্কর ধাতুর ক্ষেত্রে সিবেক গুণাঙ্কের মান 49 মাইক্রোভোল্ট/0 সে-এর বেশী হয় না। কোনও কোনও অর্ধপরিবাহীর ক্ষেত্রে এই মান 1 মিলিভোল্ট/0 সে. হতে দেখা গেছে। সাধারণতঃ অর্ধপরিবাহীর সিবেক গুণাঙ্কের মান 200 মাইক্রোভোল্ট/0 সে-এর মত হয়।

যদি 1 পরিমাণ তড়িৎ-প্রবাহের ফলে থার্মোকাপলের দুই সংযোগ বিন্দুতে Q পরিমাণ তাপ সৃষ্ট বা শোষিত হয়, তবে পেলটিয়ার গুণাঙ্ককে এরূপে প্রকাশ করা যায়—$\pi = Q/1$···(2)

যদিও সিবেক ও পেলটিয়ার ঘটনার মধ্যে কোনও পারস্পরিক সম্পর্কের কথা জানা ছিল না, তথাপি 1857 খৃষ্টাব্দে লর্ড কেলভিন thermodynamical consideration থেকে দুই গুণাঙ্কের মধ্যে একটি সম্পর্ক স্থাপন করেন। সেটি হলো $\pi = \alpha T$, যেখানে T চরম স্কেলে তাপমাত্রার মান। এই সম্পর্কটি নতুন একটি তাপতড়িতীয় ঘটনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবহিত করলো। এটি টমসন ঘটনা রূপে পরিচিত। ঘটনাটি হলো এই যে, কোনও সমসত্ত্ব পরিবাহীর বিভিন্ন বিন্দুতে যদি তাপমাত্রার পার্থক্য থাকে, তবে পরিবাহীর মধ্যে তড়িৎ প্রবাহিত করলে তা ঠাণ্ডা বা গরম হয়ে উঠবে।

সিবেক ঘটনা ও অর্ধপরিবাহী

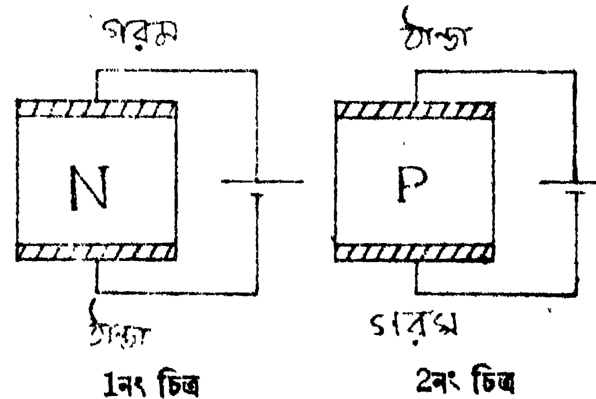
আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, অর্ধপরিবাহীর ক্ষেত্রে সিবেক গুণাঙ্কের মান ধাতুর ক্ষেত্রে মানের অপেক্ষা অনেক বেশী। এর কারণ সিবেক ঘটনার কারণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। কোনও পদার্থে মুক্ত তড়িদ্বাহীর (Charge carrier) ধর্ম গ্যাসের ধর্মের অনুরূপ। তাই পদার্থের মধ্যে তড়িদ্বাহীর ঘনত্ব পদার্থের তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল। বিভিন্ন পদার্থে তড়িদ্বাহীর সংখ্যাও বিভিন্ন। তাই দুটি বিভিন্ন ধাতুর তারের দুই সংযোগ বিন্দুর একটিকে উত্তপ্ত করলে তারের উত্তপ্ত অংশ থেকে ইলেকট্রন (ধাতুর ক্ষেত্রে ইলেকট্রনই তড়িদ্বাহী) ঠাণ্ডা অংশের দিকে চলে যাবে এবং সে অংশে ইলেকট্রন ঘনত্ব বৃদ্ধি পাবে। ঠাণ্ডা সংযোগ বিন্দুর কাছে ইলেকট্রন ঘনত্ব বৃদ্ধি পেতে পেতে এমন অবস্থার সৃষ্টি হবে, যখন এই সমস্ত ইলেকট্রনের বিকর্ষণের ফলে নতুন আর কোনও ইলেকট্রনের পক্ষে এই অংশে আসা সম্ভব হবে না; অর্থাৎ একটি স্থিতিশীল অবস্থার (Equilibrium condition) সৃষ্টি হবে। দুই সংযোগ বিন্দুতে ইলেকট্রনের ঘনত্বের পার্থক্যের জন্যে বিন্দুদ্বয়ের মধ্যে একটি বিভব প্রভেদের সৃষ্টি হবে। এটিই সিবেক বিভব প্রভেদ। স্পষ্টতঃই এই সিবেক বিভব তড়িদ্বাহীর সংখ্যার উপর নির্ভরশীল। যদি পদার্থের তড়িদ্বাহীর সংখ্যা কম হয়, তবে সৃষ্ট সিবেক বিভবের মান বেশী হবে। ধাতুতে তড়িদ্বাহীর সংখ্যার ($\sim 10^{22}$ / ঘন সেমি) তুলনায় অর্ধপরিবাহীতে তড়িদ্বাহীর সংখ্যা অনেক কম ($\sim 10^{14}-10^{18}$ / ঘনসেমি)। তাই একই তাপমাত্রা পার্থক্যের জন্যে অর্ধপরিবাহিতে সৃষ্ট সিবেক বিভবের পরিমাণ ধাতুতে

সৃষ্ট সিবেক বিভবের পরিমাণ অপেক্ষা অনেক বেশী।

পেলটিয়ার ঘটনা ও অর্ধপরিবাহী

থার্মোকাপলে পেলটিয়ার ঘটনার অস্তিত্ব থেকে স্বতঃই প্রতীয়মান হয় যে, থার্মোকাপলের দুই সংযোগ-বিন্দুতেই একটি তড়িৎ-চালক বলের অস্তিত্ব আছে এবং এই তড়িৎ-চালক বল এক ধাতু থেকে অন্য ধাতুর দিকে ক্রিয়া করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, তামা ও লোহার দ্বারা গঠিত থার্মোকাপলে তড়িৎ-চালক বল তামা থেকে লোহার দিকে ক্রিয়া করে। দুই ধাতুতে মুক্ত তড়িদ্বাহীর (ইলেকট্রন) সংখ্যার পার্থক্য থাকায় সংযোগ-বিন্দুতে তড়িদ্বাহীর চলাচলের ফলেই এই তড়িৎ-চালক বলের সৃষ্টি হয়। এর ফলে যখন থার্মোকাপলের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত করা হয়, তখন তড়িৎ একটি সংযোগ-বিন্দুতে তড়িৎ-চালক বলের দিকে প্রবাহিত হয় এবং অপর সংযোগ বিন্দুতে তড়িৎ-চালক বলের বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয়। যে সংযোগ-বিন্দুতে তড়িৎ তড়িৎ-চালক বলের দিকে প্রবাহিত হয়, সেখানে তড়িৎ-চালক বল কাজ করে। এই কাজ সংযোগ-বিন্দুর তাপশক্তির ব্যয়েই সাধিত হয়। তাই সেখানকার তাপমাত্রা হ্রাস পায়। অপর সংযোগ-বিন্দুতে যেখানে তড়িৎ তড়িৎ-চালক বলের বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয়, সেখানে তড়িৎ কাজ করে এবং এই কাজ তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হওয়ায় সংযোগ-বিন্দু উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সুতরাং একটি থার্মোকাপলকে আমরা একটি তাপইঞ্জিনের সঙ্গে তুলনা করতে পারি, যা এক সংযোগ-বিন্দু থেকে তাপ গ্রহণ করে এর কিছু পরিমাণকে তড়িৎ-শক্তিতে রূপান্তরিত করে এবং অবশিষ্ট তাপ অপর সংযোগ-বিন্দুতে ত্যাগ করে।

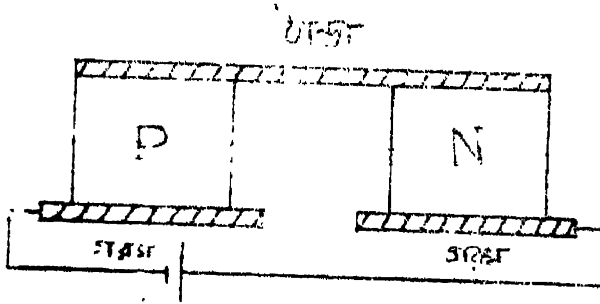
দুটি বিভিন্ন ধাতুর সংযোগের ক্ষেত্রে যে তাপতড়িতীয় ঘটনা লক্ষ্য করা যায়, একটি ধাতু ও একটি অর্ধপরিবাহীর সংযোগের ক্ষেত্রেও তা দেখা যায় এবং উভয়ের মূল তত্ত্ব একই। হ্যাঁ-ধর্মী (p-type) বা না-ধর্মী (n-type)—উভয় প্রকার অর্ধপরিবাহী এই কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। হ্যাঁ-ধর্মী অর্ধপরিবাহীতে ধনাত্মক হোল (Hole) এবং না-ধর্মী অর্ধপরিবাহীতে ঋণাত্মক ইলেকট্রন প্রধান তড়িদ্বাহী। যদি একটি না-ধর্মী অর্ধপরিবাহী পদার্থের উভয় পার্শ্বে দুটি ধাতব পাত সংযুক্ত করে ধাতব-পাত দুটিকে একটি তড়িৎকোষের দুই মেরুর (অর্থাৎ একটি D. C. বিভব উৎসের) সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়, তবে যে সংযোগস্থলে বিভব উৎসের ধনাত্মক মেরু সংযুক্ত আছে (অর্থাৎ সংযোগস্থলে বর্তনীতে তড়িৎ প্রবিষ্ট হচ্ছে), সেটি উত্তপ্ত হবে এবং অপর সংযোগস্থল শীতল হবে—ঠিক থার্মোকাপলের মতই (1নং চিত্র)। যদি না-ধর্মীর পরিবর্তে হ্যাঁ-ধর্মী অর্ধপরিবাহী নওয়া হয়, তবে বিপরীত ঘটনা লক্ষ্য করা যাবে (2নং চিত্র), অর্থাৎ প্রথম



1নং চিত্র　　2নং চিত্র

ক্ষেত্রে যে সংযোগস্থল উত্তপ্ত হয়েছিল, তা দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শীতল হবে এবং পূর্বে যে সংযোগস্থল শীতল হয়েছিল, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তা উত্তপ্ত হবে। এর কারণ উভয় ক্ষেত্রের তড়িদ্বাহীর আধানের বৈপরীত্য। যদি হ্যাঁ ও না-ধর্মী দুটি অর্ধপরিবাহী পদার্থ নিয়ে উভয়েরই এক পার্শ্ব একটিমাত্র ধাতব পাতের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয় এবং উভয়ের অপর

প্রান্ত দুটিকে পৃথক পৃথকভাবে দুটি ধাতব পাতের সঙ্গে সংযুক্ত করে শেষোক্ত ধাতব পাত দুটিকে D. C. বিভব উৎসের দুই মেরুর সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়, তবে শীতলতার পরিমাণ অনেকটাই বৃদ্ধি করা যাবে (3নং চিত্র)। যদি উত্তপ্ত প্রান্ত থেকে



3নং চিত্র

কোন উপায়ে অবিরত তাপ নিষ্কাশন করা হয়, তবে শীতল প্রান্তে শীতলতার সৃষ্টি হতে হতে সেখানকার তাপমাত্রা ঘরের তাপমাত্রা অপেক্ষা কম হয়ে পড়বে। এটাই হলো অর্ধপরিবাহীর ক্ষেত্রে পেলটিয়ার ঘটনার সাহায্যে তাপতড়িতীয় হিমায়নের পদ্ধতি।

উপযুক্ত পদার্থের সন্ধানে

তাপতড়িতীয় হিমায়নের মূল তত্ত্বটি জটিল না হলেও এর ব্যবহারিক উপযোগিতার জন্যে একটি জিনিষের উপর গুরুত্ব দেওয়া একান্তই প্রয়োজন; তা হলো এই যে, তাপতড়িতীয় হিমায়ন সফলভাবে করতে গেলে উপযুক্ত অর্ধপরিবাহীর খোঁজ করতে হবে। এই কাজে কোন্ অর্ধপরিবাহী কতটা সাফল্য অর্জন করবে, তা তার তাপপরিবাহিতার উপর নির্ভর করে। কারণ পদার্থের তাপপরিবাহিতার ফলে উত্তপ্ত সংযোগস্থল থেকে তাপ শীতল সংযোগস্থলের দিকে প্রবাহিত হয়ে সেটিকেও কিছু পরিমাণে উত্তপ্ত করে তুলবে। ফলে সেখানকার শীতলতা হ্রাস পাবে এবং যন্ত্রের কার্যকারিতা (Efficiency) কম হবে। সুতরাং যন্ত্রের কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্যে কম তাপ পরিবাহিতাঙ্কবিশিষ্ট পদার্থের প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ অর্ধপরিবাহীর মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহের জন্যে জুল তাপায়নের ফলে শীতল সংযোগস্থল কিছু পরিমাণে উত্তপ্ত হয়ে যন্ত্রের কার্যকারিতা হ্রাস করবে। জুল তাপায়নের জন্যে উৎপন্ন তাপের পরিমাণ হ্রাস করতে হলে—হয় পদার্থের বৈদ্যুতিক রোধ আর না হয় প্রবাহমাত্রা হ্রাস করতে হবে। তড়িৎ প্রবাহের মাত্রা হ্রাস করলে পেলটিয়ার হিমায়নও কম হবে। সমীকরণ (2) থেকে তা স্পষ্টই বোঝা যায়। সুতরাং তড়িৎ-প্রবাহমাত্রা কমানো যাবে না। তাই জুল তাপায়ন কমানোর জন্যে পদার্থের বৈদ্যুতিক রোধের মান কম করাই একমাত্র উপায়; অর্থাৎ পদার্থের বৈদ্যুতিক পরিবাহিতাঙ্ক (σ) বেশী হতে হবে। কিন্তু কোন পদার্থের বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা বেশী হলে তার তাপ পরিবাহিতাও (K) বেশী হয়। ফলে একটু আগের আলোচনা অনুযায়ী কম রোধবিশিষ্ট পদার্থ নিলে জুল তাপায়ন কখনো সম্ভব হলেও প্রথম কারণে যন্ত্রের কার্যকারিতা হ্রাস পাবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, যন্ত্রের কার্যকারিতা হ্রাসের মূল কারণ দুটি দূর করতে হলে দুটি পরস্পর বিরোধী ব্যবস্থার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। সুতরাং এই দুই বিপরীত অবস্থার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করেই উপযুক্ত পদার্থ নির্বাচন করতে হবে। এই সামঞ্জস্য বিধানের জন্যে অর্ধপরিবাহীর জন্যে একটি নতুন পরিবর্তনীয় ধ্রুবকের (Parameter) -Z- সাহায্য নেওয়া হয়। ধ্রুবকটিকে নিম্নরূপে প্রকাশ করা হয়।

$$-Z- = \alpha^2 \sigma / K$$

-Z- এর মান যত বেশী হবে, পেলটিয়ার ঘটনার জন্যে সৃষ্ট হিমায়নের পরিমাণও তত বেশী হবে। বিভিন্ন পদার্থে মুক্ত তড়িদ্বাহীর ঘনত্বের উপর α, σ, K তিনটিই নির্ভর করে। সুতরাং -Z- ও মুক্ত তড়িদ্বাহী ঘনত্বের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। তাই

পদার্থে মুক্ত তড়িদ্বাহী ঘনত্বের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ∝, σ, K, ও -Z- এই চারটিরই পরিবর্তন একটি ছক কাগজে আঁকা হয়। দেখা যায় যে, সিবেক গুণাঙ্ক ∝ তড়িদ্বাহী ঘনত্বের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কমতে থাকে। অপরিবাহী পদার্থের ∝-এর মান সর্বোচ্চ অর্ধপরিবাহীর ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত কম এবং ধাতুর ক্ষেত্রে আরও কম। K ও σ উভয়েই তড়িদ্বাহী ঘনত্বের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায়। লেখচিত্র থেকে দেখা যায় যে, অর্ধপরিবাহীর ক্ষেত্রে -Z- -এর মান পারবাহী ও অপরিবাহী উভয়ের তুলনায় বেশী এবং পদার্থে তড়িদ্বাহী ঘনত্ব যখন 10^{18-19}/ঘন সেমি, তখন -Z- এর মান সর্বোচ্চ। সুতরাং তাপতড়িতীয় হিমায়ন ভালভাবে করবার জন্যে এই তড়িদ্বাহী ঘনত্বের কাছাকাছি তড়িদ্বাহী ঘনত্ববিশিষ্ট অর্ধপরিবাহী ব্যবহার করা প্রয়োজন।

সাধারণতঃ যে সব অর্ধপরিবাহী বর্তমানে এই কাজে ব্যবহার করা হয়, তা হলো বিসমাথ টেলুরাইড (Bi_2Te_3) এবং Bi_2Te_3-এর সঙ্গে অ্যান্টিমনি টেলুরাইডের (Sb_2Te_3) কঠিন দ্রবণ (Solid solution)। না-ধর্মী করবার জন্যে Bi_2Te_3-তে কপার আয়োডাইড, সিলভার আয়োডাইড প্রভৃতি অবিশুদ্ধি যোগ করা হয়। হ্যাঁ-ধর্মী অর্ধপরিবাহী হিসাবে ব্যবহৃত হয় বিশুদ্ধ বিসমাথ। এছাড়া কয়েকটি ত্রয়ী সঙ্কর (Ternary alloys), যথা $Bi_2Te_3-Sb_2Te_3-Sb_2Se_3$ ব্যবহৃত হয়। এই সমস্ত যৌগগুলির অধিকাংশের -Z- এর মান 3×10^{-3}/°সে অপেক্ষা কম। উষ্ণ ও শীতল সংযোগস্থলের মধ্যে সর্বোচ্চ কত তাপমাত্রার পার্থক্য হতে পারে, তা নিম্নের সমীকরণ থেকে পাওয়া যায়—

$$\Delta T_{max} = -Z\text{-}Te^2/2,$$

যেখানে Te শীতল সংযোগস্থলের তাপমাত্রা। -Z- এর মান প্রায় 2.6×10^{-3}/°সে হলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রার পার্থক্য 70° সেন্টিগ্রেডের মত হতে পারে। কঠিন পদার্থে পরিবহন সম্বন্ধে আমাদের বর্তমান জ্ঞান থেকে আমরা বলতে পারি -Z- এর মান 10×10^{-3}/°সে অপেক্ষা বেশী হবার সম্ভাবনা কম। Cd_3As_2 প্রভৃতি কয়েকটি যৌগে $\propto^2\sigma$-এর মান Bi_2Te_3-এর $\propto^2\sigma$-এর মান অপেক্ষা বেশী। আবার $AgSbTe_2$-এর তাপপরিবাহিতা Bi_2Te_3 প্রভৃতি যৌগের তুলনায় অনেক কম। সুতরাং একথা আশা করা অযৌক্তিক হবে না যে, এই সব যৌগের বিভিন্ন ধর্মের সমবায়ে এমন কোন যৌগ পাওয়া ভবিষ্যতে সম্ভব হবে, যাতে তাপতড়িতীয় হিমায়নের কাজ আরও ভালভাবে হতে পারে।

ব্যবহার ও উপযোগিতা

পেলটিয়ার ঘটনার প্রধান ব্যবহার তাপতড়িতীয় হিমায়নে। এর কয়েকটি সুবিধা আছে, যেগুলি সাধারণ রেফ্রিজারেটারে পাওয়া যায় না; যথা—এই যন্ত্র আকারে অপেক্ষাকৃত অনেক ছোট হতে পারে এবং এতে কোনও ক্ষতিকর গ্যাস ব্যবহার করতে হয় না। কোন সচল যন্ত্রাংশ না থাকায় এটিতে কোন শব্দ হয় না এবং এটি দীর্ঘকাল কাজ করতে সক্ষম। এর আর একটি প্রধান সুবিধা হলো এই যে, পেলটিয়ার হিমায়ন তাপতড়িতীয় রেফ্রিজারেটারের আকারের উপর কোনভাবেই নির্ভরশীল নয়।

সাধারণতঃ গৃহস্থালীতে ব্যবহারের জন্যে রেফ্রিজারেটারের 50 ওয়াটের মত হিমায়ন ক্ষমতা থাকা দরকার। তত্ত্বগতভাবে একটি মাত্র থার্মোকাপলেই এটা পাওয়া সম্ভব। অবশ্য এর জন্যে তড়িৎ-প্রবাহের মাত্রা খুবই বেশী হওয়া (হাজার অ্যাম্পিয়ারের মত) প্রয়োজন, যদি D.C. বিভবের পরিমাণ খুব কম (~0.1 ভোল্ট) হয়। তাই ব্যবহারিক সুবিধার জন্যে বিভবের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয় এবং তাতে তড়িৎ-প্রবাহের মাত্রাও অতিরিক্ত হয় না

পেলটিয়ার হিমায়ন ঘর বাতানুকূল (Air-conditioned) করবার কাজেও ব্যবহার করা যেতে পারে। শুধুমাত্র তড়িৎ-প্রবাহের দিক পরিবর্তন করে একই যন্ত্রের সাহায্যে শীতকালে ঘর গরম করাও সম্ভব। সচরাচর ব্যবহৃত বাতানুকূল যন্ত্রের এই সুবিধা নেই।

তাছাড়া নানা বৈজ্ঞানিক ও ডাক্তারী কাজেও তাপতড়িতীয় হিমায়ন সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করা যেতে পারে। শুধু তাই নয়, এর আরও কত বিভিন্নমুখী প্রয়োগ হতে পারে, তা হয়তো এখনই অনুমান করা সম্ভব নয়। কিন্তু তাপতড়িতীয় হিমায়ন যে, এক বিরাট সম্ভাবনার বার্তা বহন করে এনেছে—একথা অনস্বীকার্য।

গ্রহ-সৃষ্টির রহস্য

গিরিজাচরণ ঘোষ*

কোন রহস্যোপন্যাসের বিশেষত্ব হলো সেখানে এমন কতকগুলি সূত্র পড়ে থাকে, যা ধরে অগ্রসর হলে প্রকৃত রহস্য উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব হয়। গ্রহ-সৃষ্টির রহস্যের মধ্যেও সেই ধরণের কিছু সূত্র পড়ে রয়েছে, যা ধরে এগিয়ে গেলে আমরা সেই রহস্যের আবরণ উন্মোচন করতে পারি।

সূর্য আপন অক্ষের চারপাশে ছাব্বিশ দিনে একবার আবর্তিত হচ্ছে এবং সেই অক্ষ সব গ্রহগুলির কক্ষপথের সঙ্গে লম্বভাবে অবস্থিত। এটাকেই আমরা গ্রহ-সৃষ্টির রহস্যের প্রথম সোপান হিসেবে ধরে নিতে পারি। কারণ রহস্যোদ্‌ঘাটনের প্রথম সোপানস্বরূপ এখানে প্রশ্ন করা যেতে পারে সূর্য ছাব্বিশ দিনে একবার আবর্তিত হচ্ছে কেন? সূর্য তো আরো দ্রুত ঘুরতে পারতো! মাত্র কয়েক ঘণ্টায় এই ঘুরপাক খাওয়ার কাজটা সে তো অনায়াসেই শেষ করতে পারতো!

এখানে স্বভাবতঃই মনের মধ্যে যে প্রশ্ন জেগে ওঠে, তা হলো—সূর্যের এই দ্রুত আবর্তনের স্বপক্ষে যুক্তিটা কোথায়? এর জবাব দিতে হলে একটা দূরবীন বা বাইনোকুলার নিয়ে আমাদের তাকাতে হবে কালপুরুষ (Orion) নক্ষত্রমণ্ডলীর দিকে। সেখানে দেখা যাবে কালপুরুষ নীহারিকা (Orion Nebula)। ঐ নীহারিকা থেকে গ্যাসের মেঘপুঞ্জ ঘনীভূত হয়ে নক্ষত্র সৃষ্টি হতে চলেছে। ঐ গ্যাসপিণ্ডের ঘনত্ব অত্যন্ত কম হওয়ায় আয়তন এক বিরাট আকার ধারণ করে রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ আমাদের সূর্যের মধ্যে যে ভরের উপাদান রয়েছে, তা যদি ঐ কালপুরুষ নীহারিকার অন্তর্বর্তী গ্যাসীয় পিণ্ডগোলকের থাকে, তবে তার ব্যাস হবে দশ-লক্ষ কোটি মাইল, যেখানে সূর্যের ব্যাস হলো দশ লক্ষ মাইলের মত। সুতরাং ঐ মেঘপুঞ্জ থেকে সূর্যের মত নক্ষত্র সৃষ্টি হতে তার সঙ্কোচন ঘটবে দশ লক্ষ কোটি মাইল থেকে মাত্র দশ লক্ষ মাইল অর্থাৎ তার সঙ্কোচনের পরিমাণটা দাঁড়াবে দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ।

এখন গতিবিদ্যার নিয়ম অনুসারে জানা আছে যে, বাইরে থেকে কোন বল প্রযুক্ত না হলে ওর সঙ্কোচনের সঙ্গে আবর্তনগতি বাড়তে থাকবে,

* পদার্থবিদ্যা বিভাগ, বিদ্যাসাগর কলেজ, কলিকাতা-6

কারণ সংকোচনের সঙ্গে ঐ আবর্তন গতি ব্যস্তানুপাতে (Inverse proportion) পরিবর্তিত হয়ে চলবে; অর্থাৎ সংকোচন দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ হলে তার গতিবেগ দশ লক্ষগুণ বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং যদি প্রাথমিক গতিবেগ প্রতি সেকেণ্ডে এক সেণ্টিমিটার হয়, তবে তার চরম গতিবেগ দাঁড়াবে প্রতি সেকেণ্ডে দশ লক্ষ সেণ্টিমিটার বা এক-শ' কিলোমিটার। কিন্তু সূর্যের বিষুবরেখা অঞ্চলে গতিবেগ হলো প্রতি সেকেণ্ডে মাত্র দুই কিলোমিটার। সূর্য যদি প্রতি সেকেণ্ডে এক-শ' কিলোমিটার বেগে আবর্তিত হতো, তবে তার একবার আবর্তন শেষ করতে ছাব্বিশ দিনের পরিবর্তে মাত্র অর্ধ দিন লাগতো।

মনের মধ্যে প্রশ্ন জেগে ওঠে—তবে কি ঐ বিশাল গ্যাসপিণ্ডের প্রাথমিক বেগ সেকেণ্ডে এক সেণ্টিমিটারেরও কম ছিল? না, তা নয়। কারণ কালপুরুষ নক্ষত্রমণ্ডলীর অন্তর্গত নীহারিকা থেকে যা ফল পাওয়া গেছে, তাতে প্রতি সেকেণ্ডে এক সেণ্টিমিটার প্রাথমিক বেগটা নিতান্তই কম। কারণ উক্ত নীহারিকার অন্তর্ভুক্ত গ্যাসপিণ্ডের প্রাথমিক বেগ প্রতি সেকেণ্ডে দশ সেণ্টিমিটার, এমন কি প্রতি সেকেণ্ডে এক-শ' সেণ্টিমিটারও হতে পারে। যদি গ্যাসপিণ্ডের প্রাথমিক বেগ হয় প্রতি সেকেণ্ডে দশ সেণ্টিমিটার, তার চূড়ান্ত বেগ দাঁড়াবে প্রতি সেকেণ্ডে এক হাজার কিলোমিটার। যদি গ্যাসপিণ্ডের প্রাথমিক বেগ হয় প্রতি সেকেণ্ডে এক-শ' সেণ্টিমিটার, তবে তার চূড়ান্ত বেগ দাঁড়াবে প্রতি সেকেণ্ডে দশ হাজার কিলোমিটার। সূর্যের মত কোন নক্ষত্র যদি এই প্রচণ্ড বেগে আবর্তিত হতে থাকে, তবে তা ভেঙ্গে খণ্ড খণ্ড হয়ে যাবে। বাস্তব ক্ষেত্রে প্রচণ্ড গতিবেগসম্পন্ন কোন নক্ষত্রের স্থায়িত্ব কল্পনা করা যায় না। অধিকাংশ নক্ষত্রের আবর্তন গতি পরিমাপ করে দেখা গেছে, তাদের বেগ সূর্যের আবর্তন বেগের মতই মন্থর।

তা হলে প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে সূর্য বা নক্ষত্রের আবর্তন গতি মন্থর হয়ে যাওয়ার কারণটা কি? বিপুল আয়তনবিশিষ্ট গ্যাসপিণ্ড যতই সঙ্কুচিত হতে থাকে, তার আবর্তন গতিও ততই বাড়তে থাকে। আর গ্যাসপিণ্ডের আবর্তন গতি যতই বাড়তে থাকে, তার মেরুর দিক ততই চ্যাপ্টা হতে থাকে। আবর্তন গতি যতই তার চূড়ান্ত বেগের দিকে এগিয়ে যাবে, গ্যাসপিণ্ডের বিষুবরেখা অঞ্চল ততই চ্যাপ্টা থালার মত হতে থাকবে। গ্রহ-সৃষ্টির প্রাক্কালে আমাদের সূর্যেরও বিষুবরেখা অঞ্চলে এইরূপ চ্যাপ্টা থালার সৃষ্টি হয়েছিল।

ঐ চ্যাপ্টা থালা থেকে গ্রহের সৃষ্টি কি ভাবে হলো, তা বলবার আগে মনে করা যাক সৌর-জগতের সব গ্রহগুলি তুলে এনে সূর্যের মধ্যে ফেলে দেওয়া হলো। এতে সূর্যের ভর নিঃসন্দেহে বেড়ে যাবে এবং সেই কারণে তার আবর্তন গতিও বাড়বে। হিসাব অনুযায়ী তখন বিষুবরেখা অঞ্চলে গতিবেগ প্রতি সেকেণ্ডে দুই কিলোমিটারের পরিবর্তে এক-শ' কিলোমিটার হয়ে যাবে। এই গতিবেগের জন্যে সূর্যের মেরুপ্রান্ত কিছুটা চ্যাপ্টা হবে সত্য কথা, কিন্তু এই গতিবেগের জন্যে সূর্যের বিষুবরেখা অঞ্চল কখনই চ্যাপ্টা থালায় পরিণত হবে না। গ্যাসপিণ্ডের ঘনীভবনের সময় ঐ চ্যাপ্টা থালা থেকেই যদি গ্রহগুলির সৃষ্টি হয়ে থাকে, তবে ঐ গ্রহগুলি আত্মসাৎ করে সূর্যের নিশ্চয়ই সেই গতিবেগ অর্জন করা উচিৎ ছিল, যাতে তার বিষুবরেখা অঞ্চল চ্যাপ্টা থালায় পরিণত হয়। কিন্তু হিসাব করে দেখা গেছে, সৌর জগতের গ্রহগুলি ছাড়া পৃথিবীর ভরের তিন হাজার গুণ অতিরিক্ত বস্তু যদি সূর্যে নিক্ষেপ করা হয়, তবে তার আবর্তন বেগ দাঁড়াবে প্রতি সেকেণ্ডে এক হাজার কিলোমিটার এবং তখনই সূর্যের বিষুবরেখা অঞ্চল চ্যাপ্টা থালায় পরিণত হবে। তাই যদি হয়,

তবে গ্রহের সৃষ্টির সময় পৃথিবীর ভরের তিন হাজার গুণ অতিরিক্ত বস্তুপরিমাণ নিশ্চয় সূর্যে ছিল। কিন্তু তা গেল কোথায়? এর উত্তর হলো ইউরেনাস এবং নেপচুনের যে পরিমাণ হাইড্রোজেন গ্যাস থাকবার কথা, তা আদৌ ঐ দুটি গ্রহে নেই। গ্রহের সৃষ্টির সময় ঐ দুটি গ্রহ থেকে বিপুল পরিমাণ হাইড্রোজেন গ্যাস নিশ্চয়ই সৌর জগতের সীমানা ছেড়ে চলে গেছে। তা ছাড়া প্লুটোর পরে অনাবিষ্কৃত গ্রহ থাকবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। কয়েকটি ধূমকেতুর চলবার রহস্য থেকে বা বোড-টিটিয়াসের প্রগতি অনুসারে সূর্য থেকে সাত-শ' কোটি মাইল দূরে একটি অনাবিষ্কৃত গ্রহ হয়তো রয়েছে। ইউরেনাস এবং নেপচুন গ্রহের চলবার পথে যে সামান্য বিচলন পরিলক্ষিত হচ্ছে, তা যদি ঐ অনাবিষ্কৃত গ্রহের প্রভাবে হয়ে থাকে, তবে তার ভর বৃহস্পতির ভরকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে, বৃহস্পতির ভর পৃথিবীর ভরের তিন-শ' সতেরো গুণ। তাহলে কথাটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, সৌর জগৎ থেকে পলাতক হাইড্রোজেন গ্যাস এবং অনাবিষ্কৃত গ্রহের সম্মিলিত ভরের বস্তু যদি সূর্যের সঙ্গে যুক্ত হয়, তবে তার আবর্তন বেগ প্রচণ্ড বৃদ্ধি হওয়ার ফলে সে চ্যাপ্টা হয়ে পড়বে এবং গ্রহ সৃষ্টির দশা প্রাপ্ত হবে।

ঘনীভবনের সময় গ্যাসপিণ্ড চ্যাপ্টা হয়ে আসে এবং তার বিষুবরেখা অঞ্চল প্রতি সেকেণ্ডে এক হাজার কিলোমিটার বেগে আবর্তিত হতে থাকে, তখন তার বহিঃস্থ গ্যাসের তুলনায় মধ্যবর্তী গ্যাসপিণ্ডের আরও অধিক সঙ্কোচনের ফলে তার মধ্যবর্তী অংশ তার বহিঃস্থ থালার অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এই সময় তার চেহারা হয়ে পড়ে শনিগ্রহের মত। শনির বলয়ের মত গ্যাসপিণ্ডের চ্যাপ্টা থালাটা-তার কেন্দ্রস্থিত ঘনীভূত গ্যাসপিণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘুরে চলে। এই সময় তাদের উভয় অংশের আবর্তন গতি কিছুটা মন্দীভূত হয়ে আসে।

তবে সূর্যের গতি আরও মন্দীভূত হয়ে গেল কি ভাবে, এবার সে কথায় আসা যাক। গ্রহ-সৃষ্টির প্রাক্কালে সূর্যরূপী প্রকাণ্ড গ্যাসপিণ্ডের চারপাশে গ্যাসীয় বলয়টি যখন প্রচণ্ড বেগে আবর্তিত হচ্ছিল, তখন আদিম সূর্যের চৌম্বক শক্তির প্রভাব পড়লো ঐ গ্যাসীয় বলয়ের উপর। একটা চাকার ধুরার সঙ্গে চাকার বেষ্টনীটা যেমন কতকগুলি অরা বা স্পোকের সাহায্যে যুক্ত থাকে, তেমনি কেন্দ্রস্থিত গ্যাস-পিণ্ডের সঙ্গে গ্যাসীয় বলয়টি কতকগুলি চৌম্বক বলরেখার দ্বারা যুক্ত থাকে। এখন চাকার অরা বা স্পোকগুলি যদি খুব শক্ত হয়, তবে ধুরার সঙ্গে চাকার বেষ্টনী এক সঙ্গে ঘুরতে থাকবে। কিন্তু অরাগুলি যদি স্থিতিস্থাপক বস্তুতে গঠিত হয়, তবে চাকার বেষ্টনীটা ধুরার ঘূর্ণনের সঙ্গে কিছুটা পিছিয়ে পড়তে থাকবে এবং বেষ্টনীর পিছনটানে ধুরার গতি মন্দীভূত হতে থাকবে। গ্যাসীয় বলয়ের পিছনটানে সূর্যরূপী গ্যাসপিণ্ডের আবর্তন গতিও ঐ চৌম্বক বলরেখারূপী স্থিতি-স্থাপক অরাগুলির সাহায্যে মন্দীভূত হয়ে এল।

এবার আর একটি প্রশ্নে আসা যাক। সূর্যের নিকটবর্তী গ্রহগুলি; অর্থাৎ বুধ, শুক্র, পৃথিবী এবং মঙ্গল এই চারিটি হলো প্রস্তর ও লৌহ প্রধান এবং দূরবর্তী গ্রহগুলি অর্থাৎ বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুন এই চারিটি হলো গ্যাসীয়প্রধান। যদি একই গ্যাসীয় বলয় থেকে সব গ্রহগুলির সৃষ্টি হয়ে থাকে, তবে ওদের উপাদানের এরকম তারতম্য ঘটলো কেন? এর উত্তর হলো গ্রহের সৃষ্টির পূর্বে গ্যাসীয় বলয়টি যখন ক্রমশঃ প্রসারিত হয়ে চলেছিল, তখন উচ্চ স্ফুটনাঙ্কবিশিষ্ট পদার্থ, যেমন সিলিকন, লৌহ, ম্যাগ্নেসিয়াম প্রভৃতি পদার্থগুলি তরল ও কঠিন কণায় পরিণত হয়ে দানা বাঁধতে সুরু করলো।

ফলে নিম্ন স্ফুটনাঙ্কবিশিষ্ট পদার্থগুলি তখনও গ্যাসীয় অবস্থায় থেকে বাইরের দিকে প্রসারিত হয়ে চললো, কিন্তু দানাবাঁধা পদার্থগুলি সূর্যের আকর্ষণে বেশী দূর অগ্রসর হতে পারলো না। এই কারণেই সূর্যের নিকটবর্তী গ্রহগুলিতে সিলিকন, লৌহ, ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতি পদার্থের আধিক্য দেখা দিল, আর দূরবর্তী গ্রহগুলিতে দেখা দিল অ্যামোনিয়া, জল, মিথেন প্রভৃতি পদার্থের আধিক্য।

গ্রহগুলির আর একটি ব্যাপার বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। প্রতিটি গ্রহ তাদের কক্ষতলের সঙ্গে বিভিন্ন কোণে আনত রয়েছে। যেমন বুধ গ্রহের আনত কোণ হলো সাতাশি ডিগ্রী, শুক্রের আশী ডিগ্রী, পৃথিবীর সাড়ে ছেষট্টি ডিগ্রী, মঙ্গলের পঁয়ষট্টি ডিগ্রী, বৃহস্পতির উননব্বই ডিগ্রী, শনির বাষট্টি ডিগ্রী, ইউরেনাসের সাত ডিগ্রী (ঋণাত্মক) এবং নেপচুনের সত্তর ডিগ্রী। এখানে দেখা যাচ্ছে, বৃহস্পতি, বুধ এবং শুক্র তিনটি গ্রহের আবর্তন-অক্ষ তাদের কক্ষতলের উপর প্রায় লম্বভাবে অবস্থান করছে। কিন্তু তার তুলনায় অন্য গ্রহের অক্ষগুলি কিছুটা হেলানো অবস্থায় রয়েছে। সবচেয়ে বেশী হেলানো অবস্থায় রয়েছে ইউরেনাস। এর কারণ ঘূর্ণায়মান গ্যাসীয় বলয়টি যখন ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হয়ে জেলীর মত হয়ে এল, তখন তা খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল এবং প্রত্যেক খণ্ডতেই মহাকর্ষ শক্তি ক্রিয়া সুরু করে দিল। তখন তাদের পরস্পরের আকর্ষণে কোন কোন ক্ষেত্রে দুটি বা ততোধিক খণ্ড একত্রিত হয়ে একটি খণ্ডে পরিণত হলো। এই ভাবে দুই বা ততোধিক খণ্ড একত্রিত হওয়ায় ওদের আবর্তনের অক্ষরেখা পরিবর্তিত হলো। ইউরেনাসের ক্ষেত্রে খুব সম্ভবতঃ একই ভরের দুটি খণ্ডের মিলন সংঘটিত হওয়ায় ওদের আবর্তনের অক্ষ-রেখা অত অধিক পরিবর্তিত হয়েছে।

গ্রহ-সৃষ্টির এই যে পরিণতি, এর মধ্যে কোন আকস্মিক ঘটনা নেই। হঠাৎ কোন দুর্ঘটনায় আমাদের পৃথিবীর জন্ম হয় নি। ব্রহ্মাণ্ডের স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারেই সৃষ্ট হয়েছে গ্রহগুলি। এই কারণে বহু নক্ষত্রেরই গ্রহ থাকা অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা। তবে অসুবিধা হলো—ঐ সব নক্ষত্র এত দূরে রয়েছে যে, তাদের গ্রহ-অবস্থানের অস্তিত্ব উপলব্ধি করবার কোন উপায় নেই। ভবিষ্যতে যেদিন ঐ সুদূরের নক্ষত্রগুলির আয়ত্তাধীন গ্রহগুলির অস্তিত্ব উপলব্ধির কোন উপায় উদ্ভাবিত হবে, সেদিন নিঃসন্দেহে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে গ্রহ-সৃষ্টির এই নতুন তত্ত্ব।

ট্র্যান্সডিউসার

অমরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য*

ট্র্যান্সডিউসার বহুল ব্যবহৃত ইলেকট্রনিক যন্ত্রাবলীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ব্যবহারিক জগতে বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে চালিত বহু প্রকার যন্ত্র আমরা দেখতে পাই। বিদ্যুৎসম্পর্কিত বিভিন্ন প্রকার পরিমাপ আজকাল খুব সহজসাধ্য। অ-বৈদ্যুতিক কোন পরিমাপকে যদি কোন প্রকারে বৈদ্যুতিক সংকেতে পরিণত করা যায়, তবে যে যন্ত্রের দরকার, তাকে ট্র্যান্সডিউসার বলা হয়। যেমন—মনে করা যাক, শব্দ-তরঙ্গ। শব্দ-তরঙ্গকে মাইক্রোফোনের সাহায্যে বৈদ্যুতিক তরঙ্গে পরিণত করা যায়। এক্ষেত্রে মাইক্রোফোন হলো একটা ট্র্যান্সডিউসার। আবার মাইক্রোফোন থেকে নির্গত তড়িৎ-তরঙ্গ পরিবর্ধিত করবার পর লাউডস্পীকারের সাহায্যে শব্দে পরিণত করা যায়। এখানে লাউডস্পীকারও একটি ট্র্যান্সডিউসার। বিভিন্ন ধরণের ট্র্যান্সডিউসারকে মোটামুটিভাবে নিম্নোক্ত ভাগে ভাগ করা যায়:—

(ক) থারম্যাল বা তাপীয় ট্র্যান্সডিউসার

(খ) যান্ত্রিক ট্র্যান্সডিউসার

(গ) রেডিয়েশন বা বিকিরণ ট্র্যান্সডিউসার

(ঘ) অ্যাকাউস্টিক বা শব্দসম্বন্ধীয় ট্র্যান্সডিউসার

(ঙ) চুম্বকীয় ট্র্যান্সডিউসার

(ক) তাপীয় ট্র্যান্সডিউসার—তাপমাত্রা মাপবার জন্যে ব্যবহৃত থার্মোকাপল একটি সরল তাপীয় ট্র্যান্সডিউসার। দুটি ভিন্নজাতীয় ধাতু, যেমন তামা ও লোহার সংযোগকারী একটি প্রান্ত ঠাণ্ডা রেখে অপর সংযোগপ্রান্তে তাপ প্রয়োগ করলে যে তাপ-বৈষম্য হয়, তার ফলে বিদ্যুৎ-প্রবাহ ঘটে। সৃষ্ট বিদ্যুৎ-বিভবের সঙ্গে উষ্ণ ও শীতল প্রান্ত দুটির তাপমাত্রার একটা গাণিতিক সম্বন্ধ আছে। সুতরাং মিটারের সাহায্যে বিদ্যুৎ-বিভব মেপে তাপমাত্রা নির্ণয় করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে অ-বৈদ্যুতিক পরিমাপক তাপমাত্রাকে থার্মোকাপলের দ্বারা অতি ক্ষুদ্র বিভবের ডি. সি. বিদ্যুৎ-সংকেতে পরিণত করা হয়েছে। কাজেই এটা তাপীয় ট্র্যান্সডিউসার। এই ট্র্যান্সডিউসারের সাহায্যে অতি নিম্ন তাপমাত্রা, যেমন—200° সেন্টিগ্রেড থেকে উচ্চ তাপমাত্রা 1450° সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত মাপা যায়। তবে এটা নির্ভর করে থার্মোকাপলের সংশ্লিষ্ট দুটি ধাতুর উপর।

রেজিস্ট্যান্স তাপমান যন্ত্র ও থার্মিষ্টর বিভিন্ন কার্যে ব্যবহৃত আরো দুটি তাপীয় ট্র্যান্সডিউসার। তাপমাত্রার পরিবর্তনে পদার্থের বৈদ্যুতিক প্রতিবন্ধক বা রেজিস্ট্যান্স পরিবর্তিত হয়। এই ধর্মের উপর ভিত্তি করে উপরিউক্ত ট্র্যান্সডিউসার দুটি প্রস্তুত করা হয়। রেজিষ্ট্যান্স তাপমানযন্ত্রে ধাতু (সাধারণতঃ প্ল্যাটিনাম) থাকে। এক্ষেত্রে তাপমাত্রা বর্ধিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বৈদ্যুতিক প্রতিবন্ধক বর্ধিত হয়। থার্মিষ্টর সাধারণতঃ সেমিকণ্ডাক্টরের দ্বারা নির্মিত। সেমিকণ্ডাক্টরের ক্ষেত্রে তাপমাত্রা বর্ধিত হলে বৈদ্যুতিক প্রতিবন্ধকতা হ্রাস পায়। তাছাড়া অল্প তাপমাত্রার বৈষম্যে বেশী প্রতিবন্ধকের পরিবর্তন হয়। এর ফলে অত্যল্প তাপমাত্রা নির্ণয়ে থার্মিষ্টর বিশেষ উপযোগী। তাছাড়া থার্মিষ্টর আকারে ছোট ও বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের উপযোগী বিভিন্ন প্রকার ও আকারের পাওয়া যায়। তাপমাত্রার নিয়ন্ত্রণ কার্যে এর ব্যবহার সুবিধাজনক।

---

* পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগ, ঢেঙ্কানল কলেজ, ঢেঙ্কানল, উড়িষ্যা।

(খ) যান্ত্রিক ট্র্যান্সডিউসার—যান্ত্রিক উপায়ে নির্ণীত কোন পরিমাপক, যেমন—দৈর্ঘ্য, বল, চাপ ও ওজন ইত্যাদিকে বৈদ্যুতিক সঙ্কেতে রূপান্তরিত করে মাপা যায় যান্ত্রিক ট্র্যান্সডিউসারের দ্বারা।

ষ্ট্রেন গেজ এই ধরণের একটি ট্র্যান্সডিউসার। এক্ষেত্রে একটা সরু তার আগে পিছনে বাঁকিয়ে অপরিবাহী কাগজের উপর স্থাপন করা হয়। তারপর কোন তলের টান বা চাপ মাপবার জন্যে উপরিউক্ত জিনিষটি সিমেন্ট দিয়ে তলের সঙ্গে সাবধানে লাগানো হয়। চাপের পরিবর্তনে বৈদ্যুতিক প্রতিবন্ধকের পরিবর্তন ঘটে এবং তার ফলে যে বৈদ্যুতিক অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি হয়, তার পরিমাপ করে বল, চাপ ইত্যাদি বের করা যায়। এই ষ্ট্রেন গেজ বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। কোন যন্ত্র, রেলওয়ে লাইন, উড়োজাহাজ ইত্যাদির ষ্ট্রেন পরিমাপ করবার জন্যে বৈদ্যুতিক ষ্ট্রেন গেজ ব্যবহার করা হয়।

Linear Variable Differential Transformer (সংক্ষেপে L. V. D. T.) ষ্ট্রেন গেজের মত দৈর্ঘ্য, চাপ, বল, ওজন ইত্যাদি মাপবার জন্যে ব্যবহৃত হয়। দেখা গেছে যে, ট্র্যান্সফরমারের মুখ্য বা প্রাইমারী ও গৌণ বা সেকণ্ডারী কুণ্ডলীর মধ্যবর্তী স্থানের নরম লোহার (Iron-core) অতি ক্ষুদ্র স্থান পরিবর্তনে গৌণ অংশে প্রাপ্ত বৈদ্যুতিক বিভবের পরিবর্তন হয়। স্থানচ্যুতির সঙ্গে এই বিভব পরিবর্তন সমানুপাতী। এই মূল তত্ত্বকে ভিত্তি করে এই যান্ত্রিক ট্র্যান্সডিউসার L. V. D. T. ব্যবহার করা হয়।

(গ) রেডিয়েশন বা বিকিরণ ট্র্যান্সডিউসার—এই জাতীয় ট্র্যান্সডিউসার আলোকবিকিরণ বা আয়ন বিকিরণের দ্বারা কার্যকরী হতে পারে। আলোকরশ্মি কতকগুলি অ্যালকালী ধাতু, যেমন—সিজিয়াম, পটাশিয়াম, সোডিয়াম ইত্যাদির উপর পড়লে ইলেকট্রন নির্গত হয়। একে বলা হয় ফটোইলেকট্রিক এফেক্ট। বায়ুনিষ্কাশিত কাচের আধারে উপরিউক্ত ধাতুনির্মিত একটি ইলেকট্রোড থাকে এবং তার সামনে আর একটি সাধারণ ধাতুর ইলেকট্রোড রাখা হয়। বর্তমানে প্রথমটিকে বাইরে রাখা ব্যাটারীর নেগেটিভ প্রান্তে এবং দ্বিতীয়টিকে পজিটিভ প্রান্তে সংযোগ করে তীব্র আলোকরশ্মি যথাস্থানে নিক্ষেপ করলে প্রচুর সংখ্যক ইলেকট্রন নির্গত হয়। ইলেকট্রনগুলি পজিটিভ ইলেকট্রোডের দ্বারা আকর্ষিত হয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহের সৃষ্টি করে। এই ধরণের ট্র্যান্সডিউসারকে বলা হয় ফটোসেল, বা আলোকসক্রিয় সুইচের মত কাজ করে। আরো দুটি স্বতন্ত্র ধরণের আলোকবিকিরক ট্র্যান্সডিউসার বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়। একটি হচ্ছে ফটোকণ্ডাক্টর আর একটি হচ্ছে ফটোভোলটেইক সেল। এর মধ্যে ফটোকণ্ডাক্টরের ক্ষেত্রে আলোকশক্তির দ্বারা বৈদ্যুতিক প্রতিবন্ধকের পরিবর্তন ঘটে এবং দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে আলোকশক্তির দ্বারা বৈদ্যুতিক বিভবের উদ্ভব ঘটে। ফটোসেল, ফটোকণ্ডাক্টিং সেল এবং ফটোভোলটেইক সেলের যে কোনটিকে সাধারণভাবে ফটোটিউব বলা হয়। টেলিভিশন, মোশন পিকচার, ফটোমিটার, স্পেক্ট্রোফটোমিটার ছাড়াও ফটোটিউব আলোর স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ, মাছের ঝাঁক বা কোন গতিশীল বস্তুর গণনা ইত্যাদি অসংখ্য কার্যে ব্যবহার করা হয়। আধুনিক স্বয়ংক্রিয় অনেক ব্যবস্থাপনার পিছনে ফটোটিউবের অবদান অনেকখানি।

আয়নবিকিরণ ট্র্যান্সডিউসারের মধ্যে গাইগার-মুলার কাউন্টার তেজস্ক্রিয়তার পরিমাপক হিসাবে সুপরিচিত। এক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে যে বৈদ্যুতিক কণা নির্গত হয়, তা কাউন্টারের অভ্যন্তর আয়নিত করে বিচ্ছিন্ন বৈদ্যুতিক প্রবাহের সৃষ্টি করে। কাউন্টারসংশ্লিষ্ট জটিল ইলেকট্রনিক যন্ত্রাদির সাহায্যে তেজস্ক্রিয়তার বিষয়ে জানা যায়।

(ঘ) অ্যাকাউস্টিক বা শব্দসম্বন্ধীয় ট্র্যান্স-

ডিউসার—সর্বজনপরিচিত মাইক্রোফোন ও লাউড-স্পীকার এই ধরণের দুটি ট্র্যান্সডিউসার। তাছাড়া আছে শ্রবণোত্তর ট্র্যান্সডিউসার। কম্পনসংখ্যা বিশ হাজার বা তার উপরে (প্রতি সেকেণ্ডে) হলে আমাদের শ্রবণচেতনায় সাড়া জাগায় না। কোয়ার্টজ, টুর্মেলিন ইত্যাদি কেলাসিত পদার্থের দুই প্রান্তে একটা নির্দিষ্ট উচ্চ কম্পন-সংখ্যার এ. সি (বিদ্যুৎ) প্রয়োগ করলে কেলাসিত বস্তুটির তীব্র কম্পনের দ্বারা শ্রবণোত্তর শব্দের সৃষ্টি হয়। কেলাসিত বস্তুটির স্বাভাবিক কম্পন-সংখ্যা এবং এ. সি. বিদ্যুতের কম্পন-সংখ্যা সমান হলে এই তীব্র কম্পনের সৃষ্টি হয়। এই ব্যাপারকে বলা হয় পিজোইলেকট্রিক এফেক্ট। শ্রবণোত্তর ট্র্যান্স-ডিউসারের দ্বারা সমুদ্রের গভীরতা বা অন্যান্য সামুদ্রিক পরীক্ষা করা হয়। তাছাড়া শিল্পক্ষেত্রে শ্রবণোত্তর ট্র্যান্সডিউসারের সাহায্যে বিভিন্ন প্রকার কলকব্জা ও যন্ত্রপাতির খুঁৎ বের করা যায়। চিকিৎসা-বিজ্ঞানেও এর বিভিন্ন প্রকার ব্যবহার আছে।

(ঙ) চুম্বকীয় ট্র্যান্সডিউসার—চুম্বকীয় ট্র্যান্স-ডিউসার বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। তবে চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তি পরিমাপ করাই এর কাজ। চৌম্বক ক্ষেত্র ও তারের কুণ্ডলীর আপেক্ষিক গতি বা চৌম্বক ক্ষেত্রের দ্বারা কোন কোন পদার্থ, যেমন—বিস্‌মাথ-এর বৈদ্যুতিক প্রতিবন্ধকের পরিবর্তন বা 'হল এফেক্ট' প্রয়োগ করে—চুম্বকীয় ট্র্যান্সডিউসার নির্মাণ করা হয়। অবশ্য এছাড়া আরো কয়েকটি মূল তত্ত্বের উপর ভিত্তি করেও এই জাতীয় ট্র্যান্সডিউসার প্রস্তুত করা হয়।

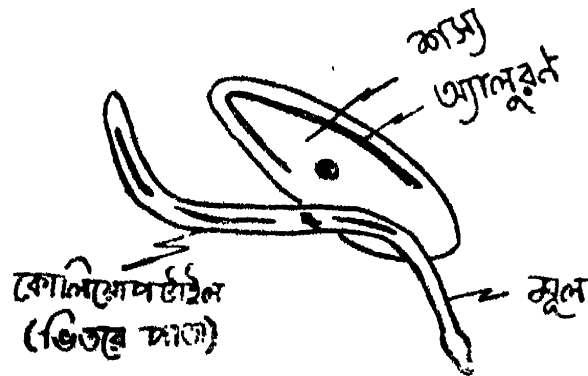
আজকাল বৈদ্যুতিক টেক্‌নিকের ব্যাপক ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায় শিল্প নিয়ন্ত্রণকার্যে এবং বিজ্ঞানাগারে গবেষণাকার্যে। পরীক্ষাধীন কোন পরিমাপককে প্রথমে বৈদ্যুতিক সঙ্কেতে রূপান্তরিত করা হয়। তারপর ইলেকট্রনিক সার্কিটের সাহায্যে ঐ সঙ্কেতকে পরিবর্ধিত প্রসেসিং (Processing), রেকর্ডিং করে সর্বশেষে প্রকাশন (Detect) করা হয়। এ সব কাজ ইলেকট্রনিক ব্যবস্থাপনায় সহজে করা যায় বলে ট্র্যান্সডিউসারের ব্যবহার অতি ব্যাপক।

অঙ্কুরোদ্গমের রহস্য

মনোজকুমার সাধু*

কি ভাবে একটি বীজ অঙ্কুরিত ও পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদে পরিণত হয়—এই বিষয়ে অতি সাম্প্রতিক-কাল পর্যন্ত আমাদের কোন সঠিক ধারণা ছিল না। কিন্তু বিগত কয়েক দশকের ব্যাপক গবেষণায় কয়েকটি উদ্ভিদ-হর্মোনের আবিষ্কারের ফলে এই রহস্যের মোটামুটি কিনারা করা সম্ভব হয়েছে।

দানাজাতীয় শস্য, যেমন—ধান, গম, যব ইত্যাদি উদ্ভিদের বীজে প্রধানতঃ দুটি অংশ দেখা যায়; যথা—(1) ভ্রূণ (Embryo)—যা কালক্রমে পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদে পরিণত হয়; (2) শস্য (Endosperm)—যা অঙ্কুরোদ্গমের সময় বৃদ্ধি-প্রাপ্ত ভ্রূণকে প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহ করে, যতদিন ছোট চারাটি স্বয়ং খাদ্য তৈরি করতে সক্ষম না হয় (1নং চিত্র)। শস্যের মধ্যে কঠিন



1নং চিত্র

অগ্রহণীয় অবস্থায় উদ্ভিদের খাদ্য সঞ্চিত থাকে এবং ভ্রূণ ব্যতিরেকে ঐ খাদ্য সহজ গ্রহণযোগ্য অবস্থায় আসে না। ভ্রূণটিকে শস্য থেকে বিচ্ছিন্ন করলে সঞ্চিত খাদ্য তরলীকৃত হয় না এবং অগ্রহণীয় কঠিন অবস্থায় অপরিবর্তিত থাকে। স্বভাবতঃই প্রশ্ন ওঠে—ভ্রূণের মধ্যে কি এমন চাবিকাঠি আছে, যা শস্যের মধ্যস্থিত জটিল খাদ্যকে উদ্ভিদের সহজ গ্রহণযোগ্য অবস্থায় আনে? এই বিষয়ে কতকগুলি উদ্ভিদ-হর্মোনের ভূমিকা সর্বাগ্রগণ্য এবং তাদের বিষয় যথাস্থানে আলোচনা করবো।

সম্প্রতি বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে—বীজের অঙ্কুরোদ্গম ও ভ্রূণের পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদে পরিণত হবার সময় একাধিক উদ্ভিদ-হর্মোন বিভিন্ন ভৌতিক ও রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে। ঐ সকল উদ্ভিদ-হর্মোনের মধ্যে ডরমিন, জিবারেলিন, সাইটোকাইনিন ও অক্সিন প্রধান। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, বীজটি জলের সংস্পর্শে এলে যথারীতি অঙ্কুরিত হয়। কিন্তু কিছু কিছু বীজ, যেমন—বন্য যব, বীট ইত্যাদি অনুরূপ অবস্থায় অঙ্কুরিত হয় না। ঐ সকল বীজের মধ্যে এক ধরণের বৃদ্ধি-নিবারক পদার্থের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। পর্যাপ্ত

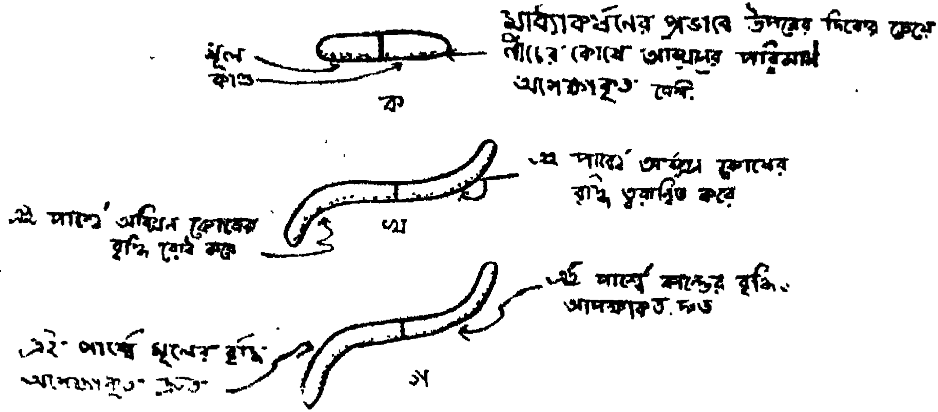
বৃষ্টি বা সেচের জলে ঐ বৃদ্ধি-নিবারক পদার্থটি অপসারিত না হওয়া পর্যন্ত বীজের অঙ্কুরোদ্গম সম্ভব হয় না। সম্প্রতি অঙ্কুরোদ্গম রোধকারী পদার্থটির রাসায়নিক প্রকৃতি আবিষ্কৃত হয়েছে। ইংল্যাণ্ডের মিল্টেড রিসার্চ লেবরেটরীর কর্নফোর্থ ও ক্যালিফোর্নিয়ার সেল ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ লেবরেটরীর আডিকট স্বতন্ত্রভাবে প্রায় একই সময়ে পদার্থটির রাসায়নিক প্রকৃতি নির্ণয় করেন এবং গবেষণাগারে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করতেও সক্ষম হন। পদার্থটির নাম দেওয়া হয় ডরমিন বা অ্যাবসেসিক অ্যাসিড। ডরমিনের কর্মপদ্ধতি নিয়ে এপর্যন্ত যা কিছু জানা গেছে, তাতে দেখা যায় যে, এর উপস্থিতিতে কোষের রাসায়নিক ক্রিয়াকলাপ, বিশেষ করে নিউক্লিক অ্যাসিডের সংশ্লেষণ বন্ধ থাকে এবং ডরমিন অপসারিত হলেই কোষের স্বাভাবিক জৈব-রাসায়নিক বিক্রিয়া সুরু হয়। এক কথায়—ডরমিন যেন একটা সুইচের মত কাজ করে। সুপ্ত বীজের অঙ্কুরোদ্গম রোধ করতে ডরমিনের ভূমিকা অন্ত-তম হলেও অন্যান্য ধরণের রাসায়নিক পদার্থ, যেমন—বিভিন্ন ফেনোলিক অ্যাসিডের ভূমিকাও নগণ্য নয়। প্রকৃত পক্ষে বৃদ্ধিসহায়ক ও বৃদ্ধি-নিবারক—এই দুই পদার্থের ভারসাম্যের উপরই কোষের যাবতীয় রাসায়নিক ক্রিয়াকলাপ ও উদ্ভিদের বৃদ্ধি নির্ভর করে।

ডরমিন অপসারিত হবার সময় বীজটি যথেষ্ট জল শোষণ করে এবং ভ্রূণের মধ্যে জিবারেলিন নামে একটি উদ্ভিদ-হর্মোনের উৎপাদন সুরু হয় এবং ক্রমে অ্যালুরিয়ন কোষস্তরে এসে জমা হয়। অ্যালুরিয়ন কোষস্তরের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো—এই কোষগুলির স্বাভাবিক শ্বাসক্রিয়া চললেও এগুলির বিভাজন ক্ষমতা নেই এবং এই কোষস্তর জীবিত ভ্রূণকে মৃত শস্য থেকে পৃথক করে রাখে।

জিবারেলিনের প্রভাবে আলফা অ্যামাইলেজ নামে একটি এনজাইমের উৎপাদন সুরু হয়। এই এনজাইম শস্যের মধ্যে সঞ্চিত অদ্রবণীয় শ্বেতসারকে দ্রবণীয় শর্করায় পরিণত করে। আলফা অ্যামাইলেজ ছাড়া আরও নানান ধরণের এনজাইম, যেমন—প্রোটিন বিশ্লেষক এনজাইম, নিউক্লিক অ্যাসিড বিশ্লেষক এনজাইম ইত্যাদির উৎপাদনও সুরু হয়। এই সব এনজাইমের প্রভাবে কোষের সঞ্চিত খাদ্য ক্রমাগত ভেঙে গিয়ে সরল খাদ্যে রূপান্তরিত হয়; ফলে ভ্রূণের বৃদ্ধির জন্যে প্রয়োজনীয় শক্তির সরবরাহ অব্যাহত থাকে। আবার কোষের ক্রমাগত বিভাজন ও আয়তনে বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ভ্রূণের বৃদ্ধি সম্ভব নয়। এই কাজে যথাক্রমে সাইটোকাইনিন ও অক্সিন নামে দুটি হর্মোন বিশেষভাবে অংশ গ্রহণ করে। নিউক্লিয়েজ নামে একটি এন-জাইমের সহায়তায় নিউক্লিক অ্যাসিড ভেঙে সাইটোকাইনিন তৈরি হয়। সাইটোকাইনিন কি ভাবে কোষ-বিভাজনে সহায়তা করে, তা সঠিকভাবে এখনও জানা যায় নি। তবে বিভিন্ন গবেষণার ফল থেকে এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এটি DNA উৎপাদনে অংশ গ্রহণ করে। ভ্রূণের কোষ তখন যথারীতি বিভাজিত হচ্ছে, কিন্তু কেবলমাত্র কোষ-বিভাজনই ভ্রূণের বৃদ্ধির জন্যে যথেষ্ট নয়, নতুন কোষগুলির আয়তনে বৃদ্ধি পাওয়াও দরকার। অক্সিনের প্রভাবে কোষ-প্রাচীর কোমল বা দুর্বল হয় এবং জিবারেলিনের প্রভাবে কোষে দ্রবণীয় শর্করার পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় অসমোসিস প্রক্রিয়ায় কোষটি প্রচুর জল শোষণ করে আয়তনে সহজেই বৃদ্ধি পায়। ঠিক কি প্রক্রিয়ায় এটি সম্পন্ন হয়, সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন যে, অক্সিনের প্রভাবে extensin নামে hydroxy proline-সমৃদ্ধ একটি প্রোটিনের সংশ্লেষণ বৃদ্ধি পায় এবং কোষ-প্রাচীরে extensin-এর উপস্থিতিই এর নমনীয়তার প্রধান কারণ।

অক্সিনের (Indole acetic acid) উৎস সম্বন্ধে স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠতে পারে। শস্যের মধ্যে প্রোটিয়েজ নামে একটি এনজাইম প্রোটিনকে বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিডে বিশ্লিষ্ট করে, যার মধ্যে tryptophan অন্যতম। এই tryptophan আবার কতকগুলি এনজাইমের প্রভাবে ইণ্ডোল-অ্যাসেটিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত হয়।

অক্সিনের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশী লক্ষ্য করা যায়। ফলে কোলিয়োপটাইলের নীচের কোষগুলি অপেক্ষাকৃত বেশী বৃদ্ধি পেলেও শিকড়ের নীচের কোষগুলি অপেক্ষা উপরের কোষ বেশী বাড়ে। কারণ একই পরিমাণ অক্সিনে এই দুই ধরণের কোষের বৃদ্ধি সমান নয়। এই প্রক্রিয়ায় অক্সিনের ভূমিকা ও বিভিন্ন কোষে এর



2নং চিত্র

ভ্রূণের ক্রমবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় যে, এর একটি অংশ (কোলিয়োপটাইল) মাটির উপরে উঠে আসে, অন্য অংশটি (মূল বা শিকড়) মাটির মধ্যে প্রবেশ করে (2নং চিত্র)। এখানেও অক্সিনের মুখ্য ভূমিকা রয়েছে। ভ্রূণটি যখন মাটির সঙ্গে সমান্তরালভাবে অবস্থান করে, তখন মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে উপরের কোষ থেকে নীচের কোষে

পুনর্বিন্যাস সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

চারার পরবর্তী বৃদ্ধি, ফুল ও ফল ধারণ, ফল ও বীজের পরিপক্কতা ইত্যাদি প্রক্রিয়াও বিভিন্ন উদ্ভিদ-হর্মোন নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এই বিষয়ে দেশে ও বিদেশে বহু গবেষণা হলেও উক্ত প্রক্রিয়াগুলির সম্যক তাৎপর্য উপলব্ধি করা এখনও সম্ভব হয় নি।

পরমাণু-বিভাজন ও পারমাণবিক শক্তি

হিরণ্ময় চক্রবর্তী

টমসন, রাদারফোর্ড এবং বোরের পারমাণবিক তত্ত্বের পর পরমাণু সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের মধ্যে আলোড়ন পড়ে গেল এবং পরমাণুর বিষয়ে গবেষণা দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলল। পরমাণুতে ইলেকট্রন এবং প্রোটনের সজ্জা, নিউট্রনের আবিষ্কার ইত্যাদির ফলে পরমাণুর মৌলিক কণিকাগুলির বৈশিষ্ট্য নিয়েও গবেষণা চলতে থাকল। রাদারফোর্ডের পারমাণবিক তত্ত্ব এবং নিউট্রন-প্রোটন তত্ত্বের পর আমরা জানতে পারলাম পরমাণুর কেন্দ্রীনে (Nucleus) প্রোটন এবং নিউট্রন থাকে। পরমাণুর অভ্যন্তরে প্রোটনের সংখ্যা -Z- ধরলে নিউট্রনের সংখ্যা হয় (A− -Z-), যেখানে A ঐ পরমাণুর পারমাণবিক গুরুত্ব (Atomic weight)। ইলেকট্রনের সংখ্যা প্রোটনের সংখ্যার সমান থাকে, আর তাই জন্তে ঋণাত্মক আধান (Negative charge) ও ধনাত্মক আধান (Positive charge) পরস্পরকে প্রশমিত (Electrically nutral) করে পরমাণুকে নিস্তড়িৎ অবস্থায় রাখে। ইলেকট্রনগুলি প্রোটন ও নিউট্রনের আবাসের চারিদিকে নির্দিষ্ট কক্ষে (Orbit) ঘুরতে থাকে। ইলেকট্রন ও প্রোটনের পারস্পরিক আকর্ষণ বল এবং ইলেকট্রনের গতিবেগের জন্তে উদ্ভূত অপকেন্দ্র বল (Centrifugal force) ইলেকট্রনকে নির্দিষ্ট কক্ষে ঘুরতে সহায়তা করে। ধনাত্মক আধান-বিশিষ্ট প্রোটনসমূহ কেন্দ্রীনে থাকায় সমধর্মী আধানের বিকর্ষণ বলের জন্তে পরমাণুর সুস্থিরতা (Stability) কিরূপে বজায় থাকে, সে বিষয় প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক।

আমরা কুলম্বের (Coulomb) সূত্র থেকে জানি যে, দুই আধানের মধ্যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল* আধানদ্বয়ের গুণফলের সঙ্গে সমানুপাতে বেড়ে যায় আর তাদের পারস্পরিক দূরত্বের বর্গের সঙ্গে সমানুপাতে কমে যায়। কিন্তু আধানদ্বয়ের দূরত্ব যদি খুব কম হয়, তখন কুলম্বের এই সূত্র খাটছে না, বিজ্ঞানী জর্জ গ্যামো (George Gammow) এই অভিমত প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন, সে সময় সমআধান পরস্পরকে আকর্ষণ করে থাকে। আর সত্য সত্যই প্রোটনগুলির মধ্যে পারস্পরিক দূরত্ব খুবই কম—বলা যেতে পারে তা এক সেন্টিমিটারের এক লক্ষ কোটি ভাগেরও (10^{-12}cm) কম পরিমাণ। উপরন্তু নিউট্রন ও প্রোটনের মধ্যে এমন একটা প্রক্রিয়া চলতে থাকে যে, আর একটি ক্ষণস্থায়ী মৌল কণা সর্বদাই প্রোটন ও নিউট্রনকে বেঁধে রাখতে সহায়তা করে। এই কথা বললেন জাপানী বিজ্ঞানী য়ুকাওয়া (Yukawa)। ইলেকট্রন আর প্রোটনের মাঝামাঝি ভর বলে এই কণিকাটির নাম দিলেন মেসন (Meson)†। এইভাবে জটিল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নিস্তড়িৎ পরমাণুর কেন্দ্রীন সুস্থির থাকে।

জানা গেছে, প্রোটন ও নিউট্রনের আবাস ঐ খোলসটির ব্যাস এক সেন্টিমিটারের এক লক্ষ কোটি ভাগের এক ভাগ (10^{-12}cm) আর নিকটতম ইলেকট্রন কক্ষের ব্যাস এক সেন্টিমিটারের দশ লক্ষ ভাগের একভাগ (10^{-6}cm)। সুতরাং

---

* সম আধানের মধ্যে বিকর্ষণ এবং বিপরীত আধানের মধ্যে আকর্ষণ হয়।

† জাপানী ভাষায় মেসন কথার অর্থ মাঝামাঝি।

প্রতিটি পরমাণুর বিরাট অংশ থাকে ফাঁকা। এই স্থান দিয়ে ইলেকট্রন, প্রোটন বা নিউট্রন ইত্যাদি অতি সহজেই যাতায়াত করতে পারে। তবে ইলেকট্রন বা প্রোটন ইত্যাদি কোন আহিত কণাকে (Charged particle) যেতে হলে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল অতিক্রম করে যেতে হয়, কিন্তু অনাহিত কণার (Uncharged particle) সেই বাধার সম্মুখীন হতে হয় না। তাই নিউট্রন দিয়ে কোন পরমাণুকে আঘাত করা অধিকতর সহজ হয়।

আলফা কণিকার* সাহায্যে পরমাণুকে আঘাত করে পরমাণু-বিভাজনে রাদারফোর্ডের পরীক্ষা বিজ্ঞানে নতুন যুগ এনে দিল। 1919 সাল সেই কারণে নিউক্লিয়ার যুগের সূচনাকাল। বায়ুতে আলফা কণিকার বিস্তার (Range) 7cm-এর অধিক নয়, বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে তা আগে থেকেই জানা ছিল। কিন্তু রাদারফোর্ডের পরীক্ষায় মনে হলো বুঝি এই তথ্য ভুল। তবুও সুপ্রতিষ্ঠিত ঐ তথ্যকে রাদারফোর্ড ভুল ভাবতে পারলেন না, তাই তিনি অন্য ভাবে চিন্তা করতে থাকলেন। এখন রাদারফোর্ডের পরীক্ষাটা সংক্ষেপে একটু বলে নেওয়া যাক।

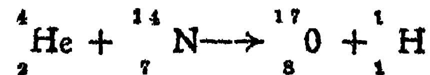
তাঁর পরীক্ষায় একটি প্রবেশ ও একটি নির্গমন পথবিশিষ্ট কক্ষের ভিতর একটি কাচদণ্ডে কিছু তেজস্ক্রিয় পদার্থ† (Radioactive substance) রাখা ছিল। নির্গমন পথ দিয়ে বায়ু বের করে নিয়ে প্রবেশ পথ দিয়ে নাইট্রোজেন, হিলিয়াম ইত্যাদি গ্যাস ভর্তি করে নেওয়া হতো। যে দিক দিয়ে তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে আলফা কণিকা বেরিয়ে আসত, তার বিপরীত পার্শ্বে ছিল একটি প্রতিপ্রভ পর্দা (Fluorescent screen), আর প্রতিপ্রভ পর্দা লক্ষ্য করবার জন্যে ছিল একটি মাইক্রোস্কোপ। প্রতিপ্রভ পর্দা আর আলফা কণিকার উৎসের মধ্যে দূরত্ব ইচ্ছামত পরিবর্তন করা যেত। অনুরূপ অবস্থায় এই দূরত্ব 7cm থেকে বাড়িয়ে নিয়েও দেখা গেল যে, উৎস থেকে আগত আলফা কণিকা প্রতিপ্রভ পর্দা ঝিকমিক করে তুলছে। তাই তখন তিনি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, অবশ্যই আগত আলফা কণিকা নাইট্রোজেনকে ভেঙে ফেলেছে এবং তা থেকেই কোন কণিকা এসে প্রতিপ্রভ পর্দায় ঝিকমিক সৃষ্টি করছে। প্রকৃতপক্ষে নাইট্রোজেনের কেন্দ্রীন ভেঙে দূর পাল্লার প্রোটন বেরিয়ে এসেছে। ব্যাপারটা সহজ করে বুঝবার জন্যে আমরা কিছুটা গাণিতিক আলোচনা করতে পারি। আপেক্ষিকতা তত্ত্বে (Theory of relativity) আইনষ্টাইন ভর ও শক্তির পারস্পরিক সম্পর্কসূত্র প্রতিষ্ঠা করে বললেন, এক গ্রাম পদার্থকে ধ্বংস (Annihilation) করে মোট 9×10^{20} আর্গ বা 9320 লক্ষ ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তি পেতে পারি। ভর ও শক্তির পারস্পরিক সম্পর্কসূত্র থেকে প্রতি এক গ্রাম ভরে প্রাপ্ত শক্তি

$E = m$ (ভর) $\times c^2$ (শূন্য মাধ্যমে আলোর গতিবেগের বর্গ)

$= 1\times(3\times10^{10})^2$ আর্গ

$= 9\times10^{20}$ আর্গ।*

রাদারফোর্ডের পরীক্ষার সমীকরণটি—



$${}^{4}_{2}He + {}^{14}_{7}N \longrightarrow {}^{17}_{8}O + {}^{1}_{1}H$$

4 একক ভরযুক্ত এবং 2 পরমাণু ক্রমাঙ্কের (অর্থাৎ

* দুই একক আধানযুক্ত কণা; দ্বি-আয়নিত হিলিয়াম মৌলিক পদার্থও ধরা যেতে পারে।

† এই পরীক্ষায় ব্যবহার করা হয়েছিল রেডিয়াম C′

* তাপ শক্তিতে প্রকাশ করলে পাওয়া যাবে 227 কি. গ্রা. বিশুদ্ধ জলকে এক ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড উষ্ণতা বৃদ্ধি করতে যে তাপ প্রয়োজন, তার এক লক্ষ কোটি গুণ (227×10^{15} Calories) পরিমাণ শক্তি।

ধনাত্মক আধান প্রোটনের সংখ্যা 2 এবং ঋণাত্মক আধান ইলেকট্রনের সংখ্যা 2) হিলিয়াম দ্বি-আয়নিত কণার (অর্থাৎ আলফা কণিকা) দ্বারা 14 একক ভরযুক্ত 7 পরমাণু ক্রমাঙ্কের নাইট্রোজেনকে আঘাত করায় 17 একক ভরযুক্ত 8 পরমাণু ক্রমাঙ্কের অক্সিজেন এবং প্রোটন উৎপন্ন হয়েছে। আগত আলফা কণিকার শক্তি ছিল 77 লক্ষ ইলেকট্রন ভোল্ট, এক্ষণে 77 লক্ষ ইলেকট্রন ভোল্ট $= \frac{77}{9320}$ পরমাণু-ভর একক (atomic mass unit বা সংক্ষেপে a.m.u)।

$= \cdot 0083$ a.m.u.

সুতরাং সমীকরণের বাম দিকে মোট যে তুল্যাঙ্ক ভর পাওয়া যাচ্ছে, তার পরিমাণ

$= (4 \cdot 0040 + 14 \cdot 0075 + \cdot 0083)$ a.m.u.

$= 18 \cdot 0198$ a.m.u.

এবং উৎপন্ন অক্সিজেন ও প্রোটনের যুগ্ম ভর

$= (17 \cdot 0045 + 1 \cdot 0081)$ a.m.u.

$= 18 \cdot 0126$ a.m.u.

এই দুই ভরের পার্থক্য

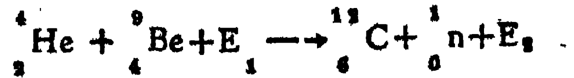
$= (18 \cdot 0198 - 18 \cdot 0126)$ a.m.u.

$= \cdot 0072$ a.m.u.

$= 67$ লক্ষ ইলেকট্রন ভোল্ট।

ভরের সঙ্গে শক্তি ব্যস্তানুপাতে ভাগাভাগি করে নেয় অর্থাৎ অক্সিজেন পায় 3·7 লক্ষ ইলেকট্রন ভোল্ট আর প্রোটন পায় প্রায় 17 গুণ, অর্থাৎ 63·3 লক্ষ ইলেকট্রন ভোল্ট। অধুনা রাদারফোর্ডের পরীক্ষার উন্নততর ব্যবস্থায় প্রোটনের বিস্তার 48cm এবং মোট শক্তি 60 লক্ষ ইলেকট্রন ভোল্ট পাওয়া গেছে। তাই গণনা ও পরীক্ষালব্ধ ফলের যথেষ্ট সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা গেল।

স্যাডুইকের (Chadwick) নিউট্রন আবিষ্কারের বিখ্যাত সমীকরণটিও এখানে স্মরণ করা যেতে পারে। পলোনিয়াম উৎস থেকে আগত আলফা কণিকার দ্বারা বেরিলিয়াম (Be) পরমাণুকে আঘাত করা হয়। এর ফলে কার্বন (C) এবং নিউট্রনের (n) উৎপত্তি হয়—



$${}^{4}_{2}He + {}^{9}_{4}Be + E_1 \longrightarrow {}^{12}_{6}C + {}^{1}_{0}n + E_2$$

এখানে আলফা কণিকার বায়ুতে বিস্তার ছিল 3·8cm এবং শক্তি 53 লক্ষ ইলেকট্রন ভোল্ট (E_1)। এই শক্তির তুল্যাঙ্ক ভর ·0057 a.m.u. সুতরাং বামদিকের ভর

$= (4 \cdot 0040 + 9 \cdot 0150 + \cdot 0057)$ a.m.u.

$= 13 \cdot 0247$ a.m.u.

কার্বন ও নিউট্রনের ভর

$= (12 \cdot 0040 + 1 \cdot 0090)$ a.m.u.

$= 13 \cdot 0130$ a.m.u.

$\therefore E_2 = (13 \cdot 0247 - 13 \cdot 0130)$ a.m.u.

$= \cdot 0117$ a.m.u.

$= \cdot 0117 \times 9320$ লক্ষ ইলেকট্রন ভোল্ট।

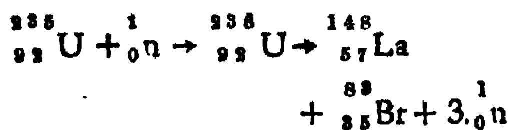
$= 109$ লক্ষ ইলেকট্রন ভোল্ট।

এই শক্তি ভাগাভাগি করলে দাঁড়ায় পুনর্বার কুণ্ডলীপ্রাপ্ত (Recoiled) কার্বনের শক্তি 8 লক্ষ ইলেকট্রন ভোল্ট এবং নিউট্রনের এক কোটি ইলেকট্রন ভোল্ট।

এইভাবে পরমাণু-বিভাজনের পরীক্ষা থেকে আইনষ্টাইনের বিখ্যাত ভর শক্তির পারস্পরিক সম্পর্কসূত্রের সত্যতা প্রকটভাবে প্রতীয়মান হলো। তবে কেন্দ্রীনকে ভেঙ্গে ফেলবার জন্যে বিশেষ বিশেষ পরমাণুর ক্ষেত্রে ন্যূনপক্ষে একটা শক্তির আবশ্যক। এই শক্তির কম শক্তিতে পরমাণুর বিভাজন সম্ভব নয়। সবচেয়ে দ্রুতগামী আলফা কণিকার সাহায্যেও অনেক পরমাণুকে ভাঙ্গা সম্ভব হয় না। অধুনা পরমাণু সম্বন্ধে বিভিন্ন গবেষণার বিষয় জেনে পরমাণুর কেন্দ্রীনের গঠন-জটিলতা সম্বন্ধে কিছু জানবার ফলে অবশ্য অনুমান করা যেতে পারে—কেন তা সম্ভব নয়। কিন্তু একবার পরমাণু ভাঙ্গতে পারলে যে প্রচণ্ড শক্তি পাওয়া যায়, সেই শক্তি আবার পরবর্তী পরমাণুকে ভাঙ্গতে সক্ষম ; এই ভাবে নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়ার ফলে প্রচণ্ড পরিমাণ শক্তি পাওয়া যেতে পারে।

নিরবচ্ছিন্ন এই প্রক্রিয়ার নামই হচ্ছে শৃঙ্খল বিক্রিয়া (Chain reaction)। এই প্রক্রিয়াটিকে ক্রমবর্ধমান শৃঙ্খল বিক্রিয়াও (Divergent chain reaction) বলা যেতে পারে। কিন্তু বিশেষ প্রক্রিয়ায় যদি আমরা বিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারি—যাতে করে একটি নিউট্রন আবার পরমাণু ভেঙে একটি মাত্র নিউট্রনই বের করতে পারে, তবে একটি সুস্থির প্রক্রিয়ায় শক্তি পাওয়া সম্ভব। এক্ষণে প্রথম প্রক্রিয়াটি পরমাণু-বোমায় সংঘটিত হয় আর দ্বিতীয়টি সংঘটিত হয় পরমাণু-রিয়্যাক্টরে। প্রথম ক্ষেত্রে যা মানবজাতির চূড়ান্ত অকল্যাণে ব্যবহৃত হয়, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তাই কাজ করে মানবজাতির পরম কল্যাণে।

1939 সালে প্রথম দু-জন জার্মান বিজ্ঞানী অটো হান (Otto Hahn) এবং ফ্রিৎস স্ট্রাস্মান (Fritz Strassmann) [অবশ্য মূল পরীক্ষা 1938 সালের ডিসেম্বরে করে থাকেন] আবিষ্কার করলেন যে, ইউরেনিয়াম-235 ($^{235}_{92}U$) বা প্লুটোনিয়াম-239 ($^{239}_{94}Pu$)-এর মত ভারী পরমাণুকে তেজী নিউট্রন দিয়ে আঘাত করা যায়, তবে পরমাণুটি ভেঙে প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন নিউট্রন বেরিয়ে আসে—



$$^{235}_{92}U + {}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{236}_{92}U \rightarrow {}^{148}_{57}La + {}^{88}_{35}Br + 3.{}^{1}_{0}n$$

প্রতি ইউরেনিয়াম -235 পরমাণু থেকে বেরিয়ে আসে তিনটি করে নিউট্রন। প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন এই নিউট্রনগুলি আরও ইউরেনিয়াম-235কে ভেঙে ফেলে এবং এই প্রক্রিয়াটি গুণোত্তর হারে বেড়ে চলে। ক্রমবর্ধমান শৃঙ্খল বিক্রিয়ায় মুহূর্তের মধ্যে 20 কোটি ইলেকট্রন ভোল্টের গুণনীয়কে শক্তি বেরিয়ে আসে। অবশ্য পরমাণু-বোমায় সাধারণতঃ প্লুটোনিয়াম-239 ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এইরকম প্লুটোনিয়াম ইউরেনিয়াম-238-এর সঙ্গে নিউট্রন যুক্ত করে পাওয়া যায়। ভারতের ট্রম্বেতে আমাদের বিজ্ঞানীরা এরকম প্লুটোনিয়াম তৈরি করতে পারেন এবং বছরে প্রায় দুটি পরমাণু-বোমার পরিমাণ প্লুটোনিয়াম-239 তৈরি করা যায়; কিন্তু আরোপিত সর্তে সে সব মানব কল্যাণকর কাজে ব্যবহৃত হবার জন্যে; সে সব দিয়ে পরমাণু বোমা তৈরি করা হয় না।

নিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খল বিক্রিয়ায় (Controlled chain reaction) ইউরেনিয়াম, প্লুটোনিয়াম ইত্যাদির বিভাজনের মাধ্যমে স্থির শক্তি পাওয়া সম্ভব। বেরিয়েআসা প্রতি তিনটি নিউট্রনের দুটিকে ক্যাডমিয়াম শোষক দিয়ে শোষণ করে যদি একটিকে বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করতে দেওয়া হয়, তবেই প্রতি ক্ষেত্রে একটি করে ইউরেনিয়াম বা প্লুটোনিয়াম ইত্যাদি ভাঙতে থাকবে এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি স্থিরভাবে বেরিয়ে আসতে পারবে। এই শক্তিকে তেল, কয়লা ইত্যাদির পরিবর্তে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা যায়। চীন গণ-প্রজাতন্ত্র, সোভিয়েট রাশিয়া, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেনের মত দেশে ইতিমধ্যেই এই পারমাণবিক শক্তি মানবকল্যাণেও নিয়োজিত হচ্ছে। উচ্চ শক্তিসম্পন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদনে এর প্রচলন বেশ বেড়েছে। বোম্বাই থেকে কুড়ি মাইল দূরে তারাপুরে 380 মেগাওয়াট শক্তিসম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। দ্বিতীয় কেন্দ্র 400 মেগাওয়াট শক্তিসম্পন্ন এবং এটি স্থাপিত হয়েছে রাজস্থানের রাণাপ্রতাপ সাগরে। তৃতীয় একটি কেন্দ্রও শীঘ্রই মাদ্রাজের কালপাক্কামে তৈরি হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। বিজ্ঞানীদের সাধনায় প্রাপ্ত এই অপরিমিত শক্তি মানবকল্যাণে নিয়োজিত হলে মানবজাতির অগ্রগতি কে রোধ করতে পারে?

সমুদ্র-গর্ভে খনিজ পদার্থের সন্ধান

শ্রীকমল নন্দী

মানুষের অনুসন্ধানের আর শেষ নেই। পৃথিবীপৃষ্ঠ তন্ন তন্ন করে খুঁজে এবার তারা নেমেছে সাগরের গভীরে।

যুক্তরাজ্যে পরমাণু শক্তি কমিশনের আইসোটোপ উন্নয়ন বিভাগের গবেষণার ফলে সম্প্রতি নতুন নিউক্লিয়ার সন্ধানী-শলাকা (Nuclear probe) আবিষ্কৃত হয়েছে, যার সাহায্যে সমুদ্র-গর্ভে খনিজ পদার্থের অনুসন্ধান করা সম্ভব হয়েছে। শলাকাটি এতই অনুভূতিসম্পন্ন যে, কয়েক টন খনিজ পদার্থের মধ্যে কোনও বিশেষ মৌল, যেমন—সোনা, রূপা, তামা বা ম্যাঙ্গানিজ যদি কয়েক আউন্সও থাকে, তাহলেও তার উপস্থিতি ধরা পড়বে। বিজ্ঞানীরা এই শলাকাটিকে ব্যাপকভাবে সমুদ্রের গভীরে খনিজ পদার্থের সন্ধানে কাজে লাগবার কথা চিন্তা করছেন। এমন কি, চলমান জাহাজ বা ডুবোজাহাজ থেকে এই শলাকাটির সাহায্যে অনুসন্ধান চালিয়ে সমুদ্র-গর্ভের ভূ-পদার্থতাত্ত্বিক (Geophysical) মানচিত্র তৈরি করবার ব্যাপারেও বিশেষ দক্ষতার সঙ্গেই করা সম্ভব।

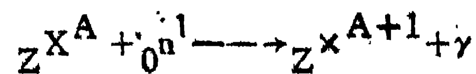
আগেও এই ধরণের অনুসন্ধান চলতো। সমুদ্রের তলদেশ থেকে শিলা সংগ্রহ করে এনে গবেষণাগারে বিশ্লেষণ করা হতো। কিন্তু এখন এই শলাকাটির সাহায্যে খনিজ পদার্থগুলিকে স্থানচ্যুত না করে স্বস্থানেই (In situ) বিশ্লেষণ করে কোন্ কোন্ মৌলিক পদার্থ কি পরিমাণে আছে, তা নির্ণয় করা যায়। এদিক থেকে এই ধরণের প্রচেষ্টা এই প্রথম। শুধু সামান্য কয়েকটা মৌলই নয়, খনিজের মধ্যে কম পক্ষেও 20 থেকে 30টি মৌলিক পদার্থের পরিমাণগত বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

শলাকাটির কার্যক্ষমতা পরীক্ষা করবার জন্যে প্রায় 100 কিলোগ্রাম ওজনের একটা কৃত্রিম খনিজস্তূপ সমুদ্রের তলদেশে ফেলে দেওয়া হয়। তাতে ছিল সোনা, রূপা, তামা, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ। পরে শলাকাটির সাহায্যে প্রত্যেকটি মৌলিক পদার্থের পরিমাণগত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, প্রকৃত পরিমাণের সঙ্গে নির্ধারিত পরিমাণের কার্যতঃ বিশেষ কোনও তফাৎ নেই।

শলাকাটির কাজের কথা তো কিছু বলা হলো। এবার এর কার্যপ্রণালীর তত্ত্বগত দিকটা আলোচনা করবো।

এই শলাকাটিতে থাকে 0·2 মিলিগ্র্যাম (প্রায় 0·00001 আউন্স) ক্যালিফোর্নিয়াম-252 এবং উচ্চ অনুভূতিসম্পন্ন গামারশ্মি নির্দেশক যন্ত্র (Gamma-ray detector)।

এটা আসলে খুব নিম্নশক্তিসম্পন্ন neutron activation analysis। ক্যালিফোর্নিয়াম-252 উৎস থেকে খুবই অল্প সংখ্যক নিউট্রন নির্গত হয়। এই ধীরগতি নিউট্রনগুলিকে (Slow neutrons)—তারপর যে খনিজ পদার্থগুলিকে পরীক্ষা করতে হবে—তাদের উপর নিক্ষেপ করা হয়। খনিজ পদার্থগুলি এই সব ধীরগতি নিউট্রনকে শোষণ করে এবং একটি নতুন তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ উৎপন্ন হয়।



$${}_ZX^A + {}_0n^1 \longrightarrow {}_ZX^{A+1} + \gamma$$

অর্থাৎ X নামে একটি মৌল, যার ভরসংখ্যা A ও পারমাণবিক সংখ্যা Z, যখন নিউট্রন (${}_0n^1$) কণার দ্বারা বিকিরিত হওয়ার ফলে মৌলটি একটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপে পরিণত হয়, যার

ভরসংখ্যা (A+1) ও পারমাণবিক সংখ্যা Z এবং গামারশ্মি (γ) নির্গত হয়। এই নির্গত গামারশ্মি জার্মেনিয়াম-লিথিয়াম গামারশ্মি নির্দেশক যন্ত্র দিয়ে বিশ্লেষণ করে খনিজটির মৌলিক উপাদান নির্ণয় করা সম্ভব।

সমুদ্র-গর্ভে কয়েক ইঞ্চি ব্যাসার্ধবিশিষ্ট ক্ষেত্রফলের উপর 2/1 মিনিট ধরে ক্যালিফোর্নিয়াম-252-এর উৎস থেকে নির্গত ধীরগতি নিউট্রন রশ্মির বিকিরণ হয়; তারপর নির্গত গামারশ্মি—গামারশ্মি নির্দেশক যন্ত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ করে কি কি মৌলিক পদার্থ কত পরিমাণ আছে, তা 4/5 মিনিটের মধ্যে নিরূপণ করা মোটেই শক্ত কাজ না। এই বিকিরণের ফলে যে তেজস্ক্রিয়তার সৃষ্টি হয়, তার জন্যে তেজস্ক্রিয়তাজনিত কোনও ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা মোটেই নেই, কারণ সেই তেজস্ক্রিয়তা মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই খুব ক্ষীণ হয়ে যায়—ঐ স্থানের স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয়তার প্রায় $\frac{1}{100}$ ভাগ কমে যায়।

দু-মুখ বন্ধ $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট 3 ইঞ্চি দীর্ঘ ষ্টেনলেশ ষ্টীলের কৌটার মধ্যে থাকে ক্যালিফোর্নিয়াম-252। সন্ধানী-শলাকার এক প্রান্তে থাকে এই কৌটাটি আর অপর প্রান্তে 5 ফুট দূরে থাকে 2 ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট জার্মেনিয়াম-লিথিয়াম ডিটেক্টর।

এই যন্ত্রের বহুল প্রচারের জন্যে এখন জোর চেষ্টা চলছে, যাতে সমুদ্র-গর্ভের খনিজ পদার্থের মানচিত্র অঙ্কন করা সম্ভব হয়। এখন বিশ্বের কয়েকটি প্রখ্যাত গবেষণাগারে এটিকে ব্যবহার করা হচ্ছে।

সঞ্চয়ন

ভারতীয় বিজ্ঞানীদের চান্দ্র উপাদান পর্যালোচনা

বোম্বাইয়ের টাটা ইনস্টিটিউট অব ফাণ্ডামেন্ট্যাল রিসার্চে চান্দ্র শিলা নিয়ে গবেষণার ফলে নূতন অনেক কিছু জানা গেছে, চাঁদ সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানের সীমা অনেকখানি প্রসারিত হয়েছে। ভবিষ্যতে এই সকল তথ্য চাঁদ ও অন্যান্য গ্রহের সৃষ্টি-রহস্যের উপর বিশেষ আলোকপাত করবে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা।

অ্যাপোলো-11 এবং অ্যাপোলো-12-এর মহাকাশচারীরা চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে যে সকল মৃত্তিকা ও প্রস্তর পৃথিবীতে নিয়ে এসেছিলেন, তাদের কতকাংশ বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধানের উদ্দেশ্যে ইনস্টিটিউটকে দেওয়া হয় এবং ডক্টর দেবেন্দ্রলাল সাতজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীকে নিয়ে এই সকল উপাদানের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। 1971 সালের প্রথম দিকে আমেরিকার জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থার উদ্যোগে চান্দ্র বিজ্ঞান বিষয়ে যে দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে তাঁদের গবেষণার কিছুটা ফলাফল উপস্থাপিত করা হয়।

ইনস্টিটিউটের ভূ-পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ডক্টর লাল এই গবেষণার ফলাফল খুবই চমকপ্রদ বলে মন্তব্য করেন। তিনি বলেন—উল্কাপাত সম্পর্কে ইতিপূর্বে যে সকল তথ্য সংগৃহীত হয়েছে, তা বর্তমান পর্যালোচনায় সমর্থিত হয়েছে। বিভিন্ন ধরণের মহাজাগতিক ঘটনার ইতিহাস চান্দ্র শিলায় যে যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ থাকে, তা আমরা এই অনুসন্ধানের ফলে জানতে পেরেছি।

এই গবেষণার ফলে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত তথ্য-সমূহ সংগৃহীত হয়েছে। ভবিষ্যৎ গবেষণা ও কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের পক্ষে এই সকল তথ্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা চান্দ্র উপাদানের মধ্যে খুব ভারী রাসায়নিক মৌলিক উপাদানের সন্ধান পেয়েছেন। গবেষণাগারে অথবা প্রকৃতিতে এই ধরণের উপাদানের সন্ধান এর আগে পাওয়া যায় নি। ভবিষ্যতে নক্ষত্রের বিবর্তন, মৌলিক উপাদানের সংশ্লেষণ এবং সৌরমণ্ডলীর বিভিন্ন গ্রহের সৃষ্টি-রহস্য উন্মোচনে এই সকল তথ্য খুবই সহায়ক হতে পারে।

নতুন নতুন তথ্য উদ্ঘাটিত হওয়ায় মৌলিক পদার্থের ভরের তালিকা প্রসারিত হবে, 300 ভরের পদার্থও সেই তালিকায় স্থান পাবে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। বর্তমানে আমেরিকা ও সোভিয়েট রাশিয়ার গবেষণাগারে সবচেয়ে ভারী যে সকল মৌলিক উপাদান কৃত্রিম উপায়ে তৈরি বা সংশ্লিষিত হয়েছে, এই সকল চান্দ্র উপাদান তার চেয়েও ভারী। আদি সূর্যের উষাকালে কি রকম তাপমাত্রা ও ঘনত্বের কোন্ পরিবেশে যে এই সকল অতিরিক্ত ভারী মৌলিক উপাদানের জন্ম হয়েছিল, সে বিষয়েও এই সকল তথ্যের ভিত্তিতে অনেক কিছু জানা যেতে পারে।

চান্দ্র ধূলির মধ্যে ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা ইউরেনিয়ামের চেয়েও ভারী, যেমন প্লুটোনিয়াম-244 নামক মৌলিক পদার্থের সন্ধান পেয়েছেন। এই মৌলিক উপাদান প্রচুর পরিমাণে চান্দ্র ধূলিতে রয়েছে। ডক্টর লাল এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এই উপাদানের সন্ধান তিনি চান্দ্র মৃত্তিকায় পেয়েছেন, চান্দ্র শিলায় নয়। এতে চাঁদের অংশবিশেষ যে খুবই প্রাচীন, এই কথাই প্রমাণিত হয়। সৌর-মণ্ডলীর সৃষ্টির পূর্বেই চাঁদ যখন কঠিন আকার ধারণ করছিল, সেই সময়ের উপাদান রয়েছে চাঁদের কোন কোন অংশে।

ডক্টর লাল এই প্রসঙ্গে আরও বলেন—এর মধ্যে কেবলমাত্র চান্দ্র ধূলির প্রাচীনত্বের প্রমাণই নয়, পারমাণবিক পদার্থ-বিজ্ঞান ও ভূ-পদার্থ-বিজ্ঞানের দিক থেকেও এই তথ্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সৌর-মণ্ডলীর সৃষ্টির আদি পর্বে অতিরিক্ত ভারী মৌলিক পদার্থের অস্তিত্বের সন্ধান করতে গিয়ে আরও একটি বিষয় প্রমাণিত হয়েছে যে, এই সকল পদার্থের অস্তিত্ব কোটি কোটি বছর ধরে অক্ষুন্ন রয়েছে, আর যথেষ্ট পরিমাণে এই ধরণের ভারী পদার্থের সংশ্লেষণের অনুকূল পরিবেশও রয়েছে।

চান্দ্র ধূলিতে প্লুটোনিয়ামের অস্তিত্ব চাঁদের সৃষ্টির রহস্যের উপরও আলোকপাত করে। ডক্টর নরেন্দ্র ভাণ্ডারী এই প্রসঙ্গে বলেছেন,—কেন্দ্রীন-সংশ্লেষণের বা নিউক্লিয়ার সিন্থেসিসের সমাপ্তি এবং চাঁদের স্বতন্ত্র গ্রহ হিসাবে রূপ গ্রহণের মধ্যে কয়েক কোটি বছর অতিবাহিত হয়েছে। ক্যালি-ফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেক্নোলোজীর বিজ্ঞানী-দের পর্যালোচনায়ও এই মত সমর্থিত হয়েছে।

চন্দ্রপৃষ্ঠে মহাজাগতিক রশ্মি নিয়েও ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা গবেষণা চালিয়েছিলেন। অ্যাপোলো-12 যে চান্দ্র শিলা পৃথিবীতে নিয়ে এসেছিল, সেই শিলার মাধ্যমেই তাঁরা এই বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। মহাজাগতিক রশ্মির প্রধান উৎস যে সূর্য, তা সর্বজনবিদিত। তাঁরা বলেছেন যে, গত এক কোটি বছরের মধ্যে এই সকল রশ্মির শক্তির তেমন কোন পরিবর্তন ঘটে নি।

চান্দ্র মৃত্তিকার বিভিন্ন স্তর নিয়েও ঐ সকল বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন। তাঁরা এই সম্পর্কে বলেছেন যে, চন্দ্রপৃষ্ঠে বর্তমানে যে সকল প্রস্তরখণ্ড দেখা যায়, সে সকল বিশ লক্ষ বছর পূর্বে চন্দ্রগর্ভের 20 সেন্টিমিটার নীচু থেকে উপরে উঠে এসেছে। চান্দ্র ধূলি সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে, চন্দ্রে নানা গহ্বর রয়েছে। যে স্থান থেকে ঐ ধূলি সংগৃহীত হয়েছে, সেখানে 1 থেকে 10 কোটি বছরের মধ্যে বিভিন্ন গহ্বর থেকে ঐ

উপাদান এসে জমা হয়েছিল। চাঁদ সৃষ্টি হয়েছে 450 কোটি বছর পূর্বে, সুতরাং সেই তুলনায় এই সময়টা এমন কিছু বেশী সময় নয়।

ফসিল ট্র্যাক টেক্‌নিক বা যে প্রক্রিয়ায় কোন বস্তু প্রস্তরীভূত হয়, সেই প্রক্রিয়ার সাহায্যে উল্কাকণা নিয়ে এখানে গবেষণা হচ্ছে। এই গবেষণার স্বীকৃতি হিসাবেই এই গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে আমেরিকার জাতীয় বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা তথ্যানুসন্ধান ও গবেষণার জন্যে চান্দ্র উপাদান উপহার দিয়েছেন। অ্যাপোলো-14 র মহাকাশচারীরা যে সকল চান্দ্র শিলা ও ধূলি পৃথিবীতে নিয়ে এসেছেন, সে সকলও তাদের দেওয়া হয়েছে।

ফসিল ট্র্যাক টেক্‌নিক সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে, ভারী বিদ্যুতাহিত কণাসমূহ যখন প্রস্তরের সিলিকেট মিনারেল বা ধূলির মধ্যে যে ধাতব পদার্থ রয়েছে, তাদের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়, সেই সকল কণা সেই প্রস্তরের কাঠিন্যের দরুণ পরিণতি লাভ করতে পারে না। জীবাশ্মের মধ্যেই সেই কণাপ্রবাহের অবস্থান্তর ঘটে। এদের রাসায়নিক বিশ্লেষণ সম্ভব, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও এই সকল কণার সন্ধান পাওয়া যায়।

এই পদ্ধতিতেই ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা চান্দ্র শিলা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। ডক্টর লাল এই প্রসঙ্গে বলেছেন—বিদ্যুতাহিত এক মিলিগ্র্যামের এবং তার চেয়েও কম চান্দ্র উপকরণের উপর আমরা এই পদ্ধতিতে পরীক্ষা করে দেখেছি। মহাজাগতিক রশ্মির সৃষ্টির সুরু থেকেই ঐ চান্দ্র শিলা ও ধূলি ঐ রশ্মির তেজস্ক্রিয়ার মধ্যে ছিল। এই তথ্যানুসন্ধানের ফলে এই তেজস্ক্রিয়ার ইতিহাস নূতন করে রচনা করতে হচ্ছে। যে সকল তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের অস্তিত্বের সন্ধান আজ আর পাওয়া যায় না, কিন্তু প্রস্তরসমূহ ঘনীভূত হবার সময়ে পাওয়া যেত, এই পদ্ধতিতে সেই সকল আইসোটোপ সম্পর্কেও তথ্যানুসন্ধান করা যেতে পারে।

চাঁদ সম্পর্কে যতদূর সম্ভব তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে ডক্টর লাল আরও বলেন—আমাদের উত্তর পুরুষেরা চাঁদকে নানাভাবে কাজে লাগাতে পারে, সেখানে তারা বসবাস করতে পারে, চাঁদকে ভিত্তি করে তারা অন্য গ্রহে যেতে পারে, রসায়ন-বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং অন্যান্য বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা চালাতে পারে। মহাজাগতিক রশ্মির তেজস্ক্রিয়া, উল্কাকণা, সৌরঝঞ্ঝা এবং পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র আজ আর মাত্র পুঁথিগত বিষয় নয়—এই সকল বিষয়ের সঙ্গে এই পৃথিবীর মানুষের অস্তিত্ব বজায় রাখবার প্রশ্নও জড়িত।

কীট-পতঙ্গের সমাজ

শ্রীহরিমোহন কুণ্ডু*

প্রজাপতি, মথ, পিপীলিকা, মৌমাছি প্রভৃতি হলো সন্ধিপদ পর্বের পতঙ্গ শ্রেণীভুক্ত জীব। অধিকাংশ কীট-পতঙ্গ এককভাবে বাস করলেও কয়েক রকম কীট-পতঙ্গের মধ্যে বিচিত্র ধরণের সামাজিক জীবন দেখা যায়। সামাজিক পতঙ্গেরা বিভিন্ন স্থানে উপনিবেশ তৈরি করে বাস করে। একটি উপনিবেশে সামাজিক রীতি অনুযায়ী একই প্রজাতির পতঙ্গদের মধ্যে কার্য অনুসারে শ্রেণীভেদ থাকে। বিভিন্ন শ্রেণীর কীট-পতঙ্গেরা তাদের নিজ নিজ কার্যের দ্বারা সামগ্রিকভাবে গোষ্ঠী বা উপনিবেশকে বাঁচিয়ে রাখে।

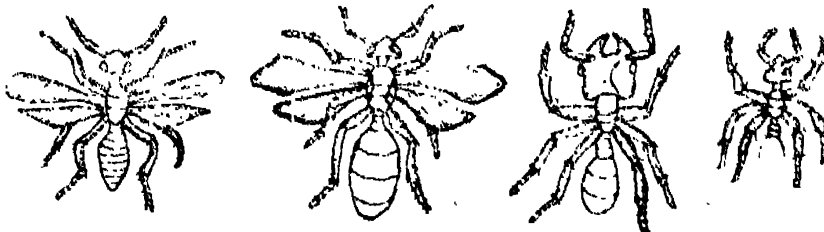
পিপীলিকা

পিপীলিকা পৃথিবীর সর্বত্র অত্যন্ত পরিচিত সামাজিক পতঙ্গ। বিখ্যাত কীট-পতঙ্গবিদ্ Imms একটি পিপীলিকা গোষ্ঠীতে 29 রকমের শ্রেণীভেদের কথা উল্লেখ করেছেন। সচরাচর একটি পিপীলিকার উপনিবেশে 4 রকমের শ্রেণীভেদ দেখা যায়।

রাণী—একটি উপনিবেশে বসবাসকারী বিভিন্ন শ্রেণীর পিপীলিকার মধ্যে রাণীই একমাত্র রাজকীয় সম্মান পেয়ে থাকে। দৈহিক আকৃতিতে রাণীই হলো সবচেয়ে বড়। পূর্ণাঙ্গ আকৃতি প্রাপ্তির সময় রাণীর দেহে একজোড়া ডানা গজায়। আবার পরিণত বয়সে ঐ ডানা ঝরে যায়। এদের একমাত্র কাজ হলো ডিম পাড়া। পিপীলিকার একটি উপনিবেশে কতকগুলি রাণী বাস করে। এদের পরিচর্যার ভার থাকে শ্রমিকদের হাতে। একমাত্র বংশবৃদ্ধি ছাড়া এরা সমাজের জন্যে অন্য কোন কাজ করে না। এদের আয়ুষ্কালও দীর্ঘ।

2. পুরুষ—রাণীদের অপেক্ষা দৈহিক আকৃতিতে এরা বেশ ছোট হয়। পূর্ণাঙ্গ আকৃতি প্রাপ্তির সময় এদের দেহেও একজোড়া ডানা গজায়। সামনের শুঁড় দুটি অত্যন্ত গন্ধ-সচেতন। এদের একমাত্র কাজ মিলনের সময় শুক্রাণুর দ্বারা ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করা; কিন্তু জন্মসূত্রে এরা রাণীর অনিষিক্ত ডিম থেকে সৃষ্ট হয়।

3. শ্রমিক—প্রকৃতপক্ষে এরা প্রজনন ক্ষমতাহীন স্ত্রীপতঙ্গ। নিষিক্ত ডিম্বাণু থেকে এদের জন্ম হয়। কিন্তু খাদ্য-বৈষম্যের জন্যে বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে এরা প্রজনন-ক্ষমতারহিত শ্রমিক শ্রেণীতে পরিণত হয়। এদের ডানা গজায় না। প্রকৃতপক্ষে এরাই শ্রম দিয়ে উপনিবেশকে বাঁচিয়ে



পিপীলিকা

পুরুষ রাণী সৈনিক শ্রমিক

* প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, বাঁকুড়া সম্মিলনী কলেজ, বাঁকুড়া।

রাখে। খাদ্য সংগ্রহ, বাসা তৈরি, রাণী ও পুরুষের পরিচর্যা প্রভৃতি এদের কাজ।

4. সৈনিক—রূপান্তরিত শ্রমিক থেকেই এদের জন্ম হয়। এদেরও ডানা থাকে না। এরা অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও কঠোর সংগ্রামী। উপনিবেশকে শত্রুমুক্ত করা এবং কঠিন খাদ্যকে গুঁড়া করা এদের কাজ।

বিভিন্ন প্রজাতির পিপীলিকা নিজ নিজ উপনিবেশের জন্যে বিভিন্ন ধরণের বাসা বাঁধে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরা মাটির নীচে বিভিন্ন প্রকোষ্ঠযুক্ত বাসা তৈরি করে। বৈশিষ্ট্যপূর্ণ একটি বিশেষ কক্ষে রাণী ডিম পাড়ে। শ্রমিক ডিমগুলি তুলে এনে নার্সারীতে রাখে এবং বড় না হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করে। কোন কোন প্রকোষ্ঠ ভাঁড়ার ঘর হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং সেখানে খাদ্য জমা করা থাকে। ভারতীয় লালপিঁপড়ে বা নালসো পাতার সাহায্যে বাসা তৈরি করে। একটি উপনিবেশে 500,000 পর্যন্ত পিপীলিকা বাস করে। কোন কোন প্রজাতির পিপীলিকা অন্য প্রজাতির উপনিবেশকে আক্রমণ করে এবং আক্রান্ত উপনিবেশের শ্রমিক, পুরুষ—এমন কি, রাণীকেও বন্দী করে এনে ক্রীতদাসরূপে নিয়োগ করে। তাদের দিয়ে খাদ্য সংগ্রহ, বাচ্চা লালন-পালন প্রভৃতি কাজ করিয়ে নেয়।

পূর্ণাঙ্গ স্ত্রী ও পুরুষ পিপীলিকাদেরই ডানা গজায়। প্রজননের পূর্বে একঝাঁক স্ত্রী ও পুরুষ পিপীলিকা আকাশে উড়তে থাকে। একই সময়ে হয়তো অন্যান্য উপনিবেশ থেকেও এক এক ঝাঁক পিপীলিকা আকাশে উড়ে আসে। এর ফলে গোষ্ঠীবহির্ভূত পিপীলিকার পারস্পরিক মিলনের সম্ভাবনা থাকে। তারপর এক সময়ে অনেক উঁচু আকাশে উড়ন্ত অবস্থায় স্ত্রী ও পুরুষের যৌন-মিলন ঘটে। যৌন-মিলনের পর অধিকাংশ পুরুষই মৃত্যুবরণ করে। রাণী আবার মাটিতে ফিরে আসে। গাছের অজস্র পাতা মুড়ে তার মধ্যে সে ডিম পেড়ে নূতন উপনিবেশ তৈরি করে, অথবা পুরনো উপনিবেশে গিয়ে পিপীলিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করে।

মৌমাছি

মৌমাছিও সামাজিক পতঙ্গ। এরা মৌচাক গঠনের মাধ্যমে উপনিবেশ তৈরি করে। সাধারণতঃ একটি বড় মৌচাকে 50,000 থেকে 80,000 মৌমাছি বাস করে এবং ছোট মৌচাকে 4000 থেকে 5000 মৌমাছি থাকে। এদের মধ্যেও কার্য অনুযায়ী শ্রেণীভেদ আছে।

1. রাণী—একটি মৌচাকে মৌমাছির সংখ্যা যতই হোক না কেন, এদের ক্ষেত্রে রাণীর সংখ্যা একটি। সময়ে সময়ে একাধিক রাণীও দেখা যায়। রাণীর দেহ লম্বা এবং তার একমাত্র কাজ বংশবৃদ্ধি করা। পরিণত বয়সে রাণী প্রত্যহ প্রায় 200টি ডিম পাড়ে এবং সারা জীবন 1,500,000 ডিম পাড়তে পারে। রাণী কখনও মৌচাক তৈরি অথবা মধু সংগ্রহ প্রভৃতি শ্রমের কাজ করে না।

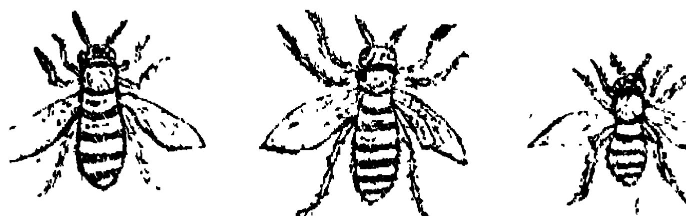
2. পুরুষ—একটি মৌচাকে পুরুষের সংখ্যা কয়েকটি থেকে 200 পর্যন্ত দেখা যায়। এদের দেহের গঠন মাঝামাঝি, দুটি ডানা আছে এবং চোখ দুটি অত্যন্ত বড়। এরা অত্যন্ত অলস প্রকৃতির। এদের একমাত্র কাজ ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করা।

3. শ্রমিক—সমগ্র উপনিবেশে এদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী। আকৃতিতে রাণী ও পুরুষের চেয়ে এরা ছোট। শক্তিশালী ডানার ভর করে এরা দীর্ঘপথ উড়ে যেতে সক্ষম। দেহ থেকে মোম নির্গত করে তার সাহায্যে মৌচাক তৈরি করে, তাছাড়া এরা ফুল থেকে মধু সংগ্রহ, রাণী ও পুরুষের সেবা এবং বাচ্চা লালন-পালন করে। এদের দেহে এক ধরণের বিষ গ্রন্থি থাকে এবং হুলের সাহায্যে দংশন করে ঐ বিষ শত্রুর দেহে ঢেলে দেয়।

কেবলমাত্র ডিম পাড়বার জন্তেই মৌমাছিরা আকাশে ওড়ে না। গ্রীষ্মকালে এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং একই স্থানে সংখ্যাবৃদ্ধির চাপ কমাবার জন্তে অনেক মৌমাছি নূতন উপনিবেশ সৃষ্টির আশায় অন্ত স্থানে উড়ে যায়। স্থান পরিবর্তনের আগে শ্রমিকেরা মৌচাকের মধ্যে বিশেষ ধরণের কিছু প্রকোষ্ঠ তৈরি করে, যার মধ্যে নূতন রাণী ও পুরুষ জন্মগ্রহণ করতে পারে। কিন্তু নতুন রাণী পূর্ণাঙ্গ আকৃতি প্রাপ্তির আগেই পুরাতন রাণী কিছু সংখ্যক শ্রমিক ও পুরুষকে নিয়ে অন্ত স্থানে চলে যায়। ফেলে যাওয়া মৌচাকটি থেকে প্রথম যে স্ত্রীবাচ্চা বেড়িয়ে আসে, সেই হয় কুমারী রাণী এবং পরে যে সমস্ত বাচ্চা বেরিয়ে আসে, তাদেরকে হত্যা করে কুমারী রাণী সর্বময় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। কারণ ভাবী রাণী কখনও অন্ত স্ত্রী মৌমাছির প্রতিদ্বন্দ্বিতা সহ্য করে না। কোন কোন সময় খাদ্যের অভাবের জন্তে পুরনো মৌচাক ফেলে সকলে উড়ে যায়।

মৌমাছিরা ডিম পাড়বার জন্তে যে আকাশে ওড়ে, তা পূর্বোক্ত আকাশে ওড়া থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এক্ষেত্রে একমাত্র কুমারী রাণীই আকাশে ওড়ায় অংশগ্রহণ করে। ডিম ফুটে বাচ্চা বেড়িয়ে আসবার এক সপ্তাহের মধ্যে ভাবী রাণী এক ঝাঁক পুরুষকে সঙ্গে নিয়ে আকাশে ওড়ে। উন্মুক্ত আকাশে স্ত্রী ও পুরুষদের যৌন-মিলন হয়। স্ত্রী মৌমাছি দেহমধ্যস্থিত থলিতে অজস্র শুক্রাণু জমা করে নেয়। ফলে রাণী জীবদ্দশায় যত ডিম পাড়ে, সেই সব ডিমকে নিষিক্ত করতে পারে। সাধারণতঃ একবার যৌন-মিলনের পর দ্বিতীয়বার মিলনের দরকার হয় না। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মিলনের শেষে আহত পুরুষের মৃত্যু ঘটে। রাণী মৌচাকে ফিরে আসে এবং বৃদ্ধ বয়সে স্থান পরিবর্তনের কাজে আর কখনও মৌচাকের বাইরে যায় না।

রাণী মৌমাছি যে ডিমগুলি পাড়ে, তার মধ্যে নিষিক্ত ডিম থেকে স্ত্রীমৌমাছি এবং অনিষিক্ত ডিম থেকে পুরুষ মৌমাছি জন্মায়। বাচ্চা স্ত্রী মৌমাছিকে শুশ্রূষারত শ্রমিক যদি মুখের লালামিশ্রিত এক ধরণের বিশেষ মধু পান করায়, তবেই বাচ্চার প্রজনন যন্ত্রগুলি পরিণত রূপ ধারণ করে। এরা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কুমারী রাণীতে রূপান্তরিত হয়। আর যদি শ্রমিকেরা কেবল বাঁচিয়ে রাখবার জন্তে সাধারণ মধু পান করায়, তবে বাচ্চার প্রজনন যন্ত্রগুলি বর্ধিত হয় না এবং জন্মসূত্রে স্ত্রী মৌমাছি বন্ধ্যা স্ত্রীতে পরিণত হয়।



মৌমাছি
শ্রমিক রাণী পুরুষ

গ্রেলিং প্রজাপতি

এরা সামাজিক পতঙ্গ নয়। বর্ষাকালে সাধারণতঃ এরা একা একা ফুলে ফুলে উড়ে বেড়ায়। পুরুষ গ্রেলিং প্রজাপতি অত্যন্ত গন্ধসচেতন। ঘুরতে ঘুরতে কোন এক সময় পুরুষ প্রজাপতি মাটির উপরে অথবা গাছের ডালে অত্যন্ত সজাগ হয়ে চুপ করে বসে থাকে। যখনই অন্ত কোন প্রজা-

পক্ষি এদের পাশ দিয়ে উড়ে যায়, তখনই ঐ সজাগ পুরুষ প্রজাপতি তার পিছু ধাওয়া করে। উড়ন্ত প্রজাপতি যদি স্ত্রীজাতের হয়, তাহলে সেও এক সময় মাটিতে বসে পড়ে। পুরুষ প্রজাপতিটি তখন অগ্রসর হয়ে তার মুখোমুখি বসে। যদি স্ত্রীপ্রজাপতিটি সঙ্গে সঙ্গে ডানা তুলে সম্মতি



পুরুষ গ্রেলিং প্রজাপতির নৃত্য

জানায়, তাহলে উভয়ের যৌন-মিলন সংঘটিত হয়। আর যদি চুপ করে বসে থাকে, তাহলে পুরুষ প্রজাপতিটি তার মানভঞ্জনের জন্যে নানারূপ অঙ্গ-ভঙ্গী সুরু করে। প্রথমে ডানায় একটু ঝাঁকা দেয়। পরে এমনভাবে ডানা দুটি মেলে ধরে, যাতে সাদার উপরে চমৎকার কালো দাগ-গুলি স্ত্রীপ্রজাপতিকে আকৃষ্ট করে। এর পর সম্মুখভাগের পাখা দুটি তুলে স্ত্রীপ্রজাপতির সামনে এমনভাবে মাথা নেড়ে বশ্যতা স্বীকার করে, যাতে সহজেই স্ত্রীপ্রজাপতি সাড়া দেয়। কিন্তু তাতেও যদি কাজ না হয়, তাহলে সামনের শুঁড় দুটি ধরে আস্তে আস্তে নাড়া দিতে থাকে এবং সর্বশেষে পেটের তলায় আস্তে আস্তে নাড়া দেয়। এই ভাবে মনোরঞ্জনের পালা শেষ হলে স্ত্রী-পুরুষের মিলন হয়। এরপর অবশিষ্ট জীবনে গ্রেলিং প্রজাপতি একা একা বিচরণ করে এবং আর কখনও উভয়ে মিলিত হয় না।

সাইকিড মথ

স্ত্রীসাইকিড মথেরা উড়তে পারে না। কারণ তারা সাধারণতঃ ডানাবিহীন। স্ত্রীমথেরা গুটি থেকে বেরিয়ে কাছেপিঠেই আশ্রয় নেয় এবং আশ্রয়স্থল থেকে তারা মোটেই অগ্রসর হতে পারে না। পুরুষ মথেরা উড়তে পারে। তাদের শক্ত ডানা আছে। পুরুষ মথের শুঁড়



সাইকিড মথের গন্ধসচেতনশীল শুঁড়

দুটি পালকের মত এবং অত্যন্ত গন্ধ-সচেতন। গুটি থেকে বেরিয়েই তারা খুঁজে বেড়ায় স্ত্রীমথকে। স্ত্রীমথের দেহ থেকে এক অদ্ভুত মিষ্টি গন্ধ বের হয়, যা পুরুষ মথকে আকর্ষণ করে। পুরুষ মথ শুঁড়ের সাহায্যে বহু দূর থেকে—এমন কি, দু-তিন মাইল দূর থেকেও স্ত্রীমথকে খুঁজে বের করে পরস্পরে মিলিত হয় এবং তারপর স্ত্রীমথ ডিম পাড়ে।

কাঁকড়াবিছা

কাঁকড়াবিছা প্রকৃতপক্ষে পতঙ্গ শ্রেণীভুক্ত নয়, কিন্তু সন্ধিপদ পর্বের অন্তর্ভুক্ত। এদের স্ত্রী-পুরুষের মিলন সম্বন্ধে জীব-বিজ্ঞানী Fabre



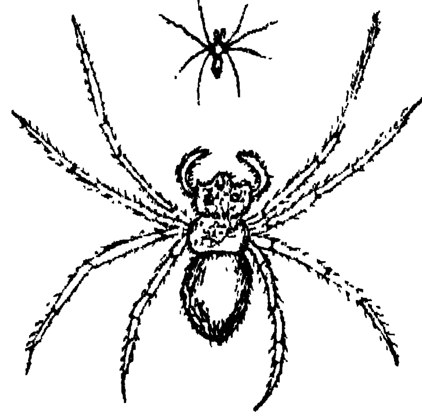
নৃত্যরত কাঁকড়াবিছা

অদ্ভুত বর্ণনা দিয়েছেন। যৌন-মিলনের পূর্বে তারা মুখোমুখি হয় এবং লেজের দিকটি উপরের দিকে তুলে অবস্থান করে। তারপর পুরুষটি তার

সামনের বড় দাঁড়াটি দিয়ে স্ত্রীবিছার বড় দাঁড়াটি ধরে এবং তাকে ঘিরে 30 মিনিট থেকে 120 মিনিট পর্যন্ত সে নাচতে থাকে। এই সময় সোঁ সোঁ করে এমন শব্দ করে, যা বেশ দূর থেকেও শোনা যায়। এই নাচের পর স্ত্রীবিছা পুরুষ বিছার সঙ্গে মিলিত হতে রাজী হয়। পুরুষ বিছাটি তখন মিলন স্থলের জন্যে গর্ত খুঁজতে বেরিয়ে যায় এবং স্ত্রীবিছা তাকে পিছু পিছু অনুসরণ করে। অবশেষে নির্দিষ্ট গর্তে তারা মিলিত হয় এবং মিলনের শেষে স্ত্রীবিছা পুরুষ বিছাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে খেয়ে ফেলে।

মাকড়সা

এরা কাঁকড়াবিছার সমগোত্রীয় প্রাণী। পুরুষ মাকড়সা স্ত্রীমাকড়সার চেয়ে অনেক ছোট। যৌন-মিলনের আগে পুরুষ মাকড়সা একটি ছোট সুন্দর জাল বোনে। এরপর পুরুষ মাকড়সাটি তার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে স্ত্রীমাকড়সার খোঁজে তার জালে এসে উপস্থিত হয়। এখানে এসে নানারকম ভঙ্গীমার সাহায্যে সে স্ত্রীমাকড়সার



উপরে পুরুষ মাকড়সা, নীচে স্ত্রী মাকড়সা

চিত্তাকর্ষণের চেষ্টা করে। অবশেষে সম্মতি পেলে উভয়ে মিলিত হয়। মিলনের পর অধিকাংশ স্ত্রীমাকড়সাই পুরুষকে হত্যা করে খেয়ে ফেলে।

ইউরেনিয়ামোত্তর মৌল

অরবিন্দ দাশ*

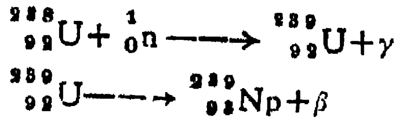
ইউরেনিয়ামোত্তর মৌল (Trans-uranic elements) বলতে ইউরেনিয়াম থেকে ভারী মৌলগুলিকেই বুঝায়। এদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, এরা প্রত্যেকেই তেজস্ক্রিয় এবং এদের প্রত্যেককেই লেবরেটরীতে কৃত্রিম উপায়ে সংশ্লেষণ করা সম্ভব। কৃত্রিম উপায়ে সংশ্লেষিত মৌল-গুলির কথা উঠলে প্রথমেই বলা যায়, নিরুদ্দিষ্ট মৌল (Missing element) টেকনিসিয়ামের (মৌল-43) কথা—একে 1937 সালে প্রস্তুত করা হয়েছিল। এটাই প্রথম কৃত্রিম মৌল, এরপর থেকে লেবরেটরীতে বাকী নিরুদ্দিষ্ট মৌল ও অন্যান্য মৌল প্রস্তুতের জন্যে চেষ্টা চলে।

ইউরেনিয়ামোত্তর মৌলগুলি সুরু হয়েছে মৌল 93-কে দিয়ে। 1940 সালে ই. ম্যাক-মিলান ও পি. এবেলসন দেখিয়েছেন যে, ইউ-রেনিয়ামের সমস্থানিক (Isotope), $({}^{238}_{92}U)$[1]কে মন্থর নিউট্রন (Slow neutron) দিয়ে আঘাত

* রসায়ন বিভাগ, রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক মহাবিদ্যালয়, পোঃ নরেন্দ্রপুর, 24 পরগণা।

1. এখানে উর্ধ্বলিপি (Superscript) মৌলের ভর সংখ্যা (Mass number) এবং অধঃলিপি (Subscript) পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক নির্দেশ করছে। আধুনিক নিয়ম অনুযায়ী তেজস্ক্রিয় মৌলের একই পার্শ্বে ভর সংখ্যা ও পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক লেখা হলো।

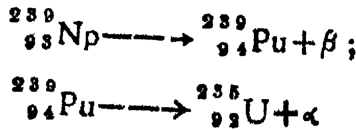
করলে প্রথম পর্যায়ে পাওয়া যায় গামা (γ)-রশ্মি ও অস্থায়ী U-239। এটি স্বতঃই বিটা (β)-রশ্মি বিচ্ছুরিত করে এবং অপেক্ষা এক অধিক পারমাণবিক ক্রমাঙ্কবিশিষ্ট (Atomic number) মৌল গঠিত হয়। ইউরেনাসের পরবর্তী গ্রহ নেপচুনের নামানুসারে এর নাম হলো নেপচুনিয়াম (Np)[2]



$$^{238}_{92}U + ^{1}_{0}n \longrightarrow ^{239}_{92}U + \gamma$$

$$^{239}_{92}U \longrightarrow ^{239}_{93}Np + \beta$$

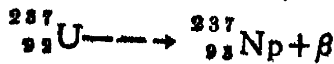
ঐ বছরই ম্যাকমিলান, সীবোর্গ প্রমুখ দেখালেন, নেপচুনিয়ামের ঐ সমস্থানিকটি আবার একটি বিটা কণা হারিয়ে মৌল-94-এ পরিবর্তিত হয়। নবম গ্রহ প্লুটোর নামানুসারে এই মৌলকে বলা হলো প্লুটোনিয়াম (Pu); কিন্তু এই সমস্থানিক আলফা (α)-রশ্মি বিচ্ছুরক, তাই তা আবার ইউরেনিয়ামের সমস্থানিকে পরিবর্তিত হয়।



$$^{239}_{93}Np \longrightarrow ^{239}_{94}Pu + \beta;$$

$$^{239}_{94}Pu \longrightarrow ^{235}_{92}U + \alpha$$

নেপচুনিয়াম, প্লুটোনিয়ামের অন্যান্য সমস্থানিকগুলিও জানা গেছে। যেমন, নেপচুনিয়ামের দীর্ঘতমস্থায়ী সমস্থানিক $^{237}_{93}Np$ (অর্ধজীবনকাল—$2{\cdot}25\times10^{6}$ বছর) পাওয়া যায় ইউরেনিয়াম 237-এর বিটাবিচ্ছুরণ প্রক্রিয়ায়।



$$^{237}_{92}U \longrightarrow ^{237}_{93}Np + \beta$$

আর প্লুটোনিয়ামের দীর্ঘতমস্থায়ী সমস্থানিক $^{242}_{94}Pu$ (অর্ধজীবনকাল—$5{\cdot}00\times10^{5}$ বছর) পাওয়া যায় প্লুটোনিয়াম-241-এর উপর নিউট্রন কণা দিয়ে আঘাত করে।

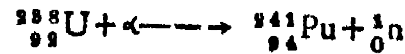


$$^{241}_{94}Pu + ^{1}_{0}n \longrightarrow ^{242}_{94}Pu + \gamma$$

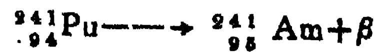
2 ইউরেনিয়ামোত্তর মৌলগুলির নামের পার্শ্বে প্রথম বন্ধনীতে তাদের সঙ্কেতগুলি লেখা হলো।

প্লুটোনিয়াম-242-এর গুরুত্ব কিন্তু কম নয়। এর অর্ধজীবনকাল বলা হয়েছে 5×10^{5} বছর। আবার তেজস্ক্রিয় পদ্ধতিতে পৃথিবীর বয়স হিসাব করে দেখা গেছে, তা হলো—এ সময়ের হাজার গুণেরও বেশী। তাই বলা যেতে পারে, পৃথিবী সৃষ্টির সময়ে কিছু প্লুটোনিয়াম থাকলেও আজ আর তা থাকা উচিত নয়। ইউরেনিয়ামের খনিতে প্লুটোনিয়ামের সমস্থানিক পাওয়া যায়, অর্থাৎ বলা যায় নিশ্চয়ই প্রকৃতিতে এই প্লুটোনিয়াম আবিষ্ট তেজস্ক্রিয়তা (Induced radioactivity) প্রক্রিয়ায় গঠিত হয়েছে।

সীবোর্গ ও তাঁর সহকর্মীরা 1944 সালে দেখালেন ইউরেনিয়াম-238-এর উপর আলফা রশ্মির বিক্রিয়ায় প্লুটোনিয়াম-241 গঠিত হয়। এই সমস্থানিকটি আলফা বা বিটা উভয়ই বিচ্ছুরণে সক্ষম; যখন বিটা কণা বেরোয়, তখন এক পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক অধিকবিশিষ্ট মৌল পাওয়া যায়—এরই নাম অ্যামেরিসিয়াম (Am)

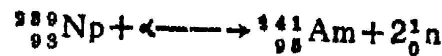


$$^{238}_{92}U + \alpha \longrightarrow ^{241}_{94}Pu + ^{1}_{0}n$$



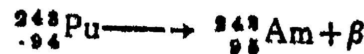
$$^{241}_{94}Pu \longrightarrow ^{241}_{95}Am + \beta$$

Am-241-কে সোজাসুজিই Np-239 ও আলফা কণার বিক্রিয়ায় পাওয়া যায়।



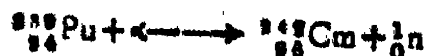
$$^{239}_{93}Np + \alpha \longrightarrow ^{241}_{95}Am + 2^{1}_{0}n$$

অ্যামেরিসিয়ামের দীর্ঘতমস্থায়ী সমস্থানিকটি (অর্ধজীবনকাল 1×10^{4} বছর) প্লুটোনিয়াম-243 থেকেই পাওয়া যায়।



$$^{243}_{94}Pu \longrightarrow ^{243}_{95}Am + \beta$$

সীবোর্গ, ঘিয়ারসো এবং তাঁদের সহকর্মীরা 1944 সালেই প্লুটোনিয়াম-239 ও আলফা কণার বিক্রিয়ায় যে মৌল পেলেন, তার পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক 96 এবং কুরী দম্পতীর সম্মানার্থে নাম দিলেন কুরিয়াম (Cm)



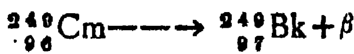
$$^{239}_{94}Pu + \alpha \longrightarrow ^{242}_{96}Cm + ^{1}_{0}n$$

সীবোর্গ, ঘিয়ারসো, টমসনের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়

1949 সালে অ্যামেরিসিয়াম-241-এর উপর আলফা কণার আঘাতে যে মৌল সংশ্লেষিত হলো, বার্কলে শহরের নামানুসারে তার নাম হলো বার্কেলিয়াম (Bk)

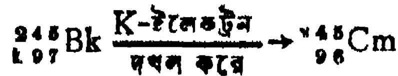


একমাত্র বার্কেলিয়াম-249 (অর্ধজীবনকাল প্রায় 1 বছর) ছাড়া এর কোনও সমস্থানিক বেশী স্থায়ী নয়। তা কুরিয়াম-249 থেকে সোজাসুজি পাওয়া যায়।



বার্কেলিয়াম-245, যা কুরিয়াম-244 ও ভারী হাইড্রোজেনের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন—তার বিশেষত্ব এই যে, তা K-কক্ষের ইলেকট্রন অধিকার করে (K-electron capture) এবং কুরিয়াম-245 দেয়। সেটাই কুরিয়ামের দীর্ঘতমস্থায়ী সমস্থানিক এবং অর্ধজীবনকাল মোটামুটি 2×10^4 বছর।

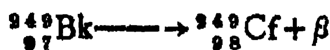




উপরিউক্ত বৈজ্ঞানিকমহল 1950 সালে যে মৌলটি কুরিয়াম-242 থেকে তৈরি করলেন, ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্য ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নামানুসারে তার নাম হলো ক্যালিফোর্নিয়াম (Cf)



ক্যালিফোর্নিয়ামের দীর্ঘস্থায়ী সমস্থানিক (যার অর্ধজীবন প্রায় 400 বছর) পাওয়া গেছে বার্কেলিয়াম-249 থেকে।

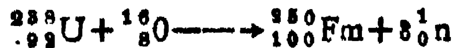


ক্যালিফোর্নিয়াম থেকে ভারী মৌলগুলি প্রস্তুত করবার জন্যে খ্যাতনামা বিজ্ঞানীরা তাঁদের নিজেদের লেবরেটরীতে অনেক চেষ্টা চালিয়েছেন। এই ভাবে সীবোর্গ ও তাঁর সহকর্মীরা মৌল-93 ও মৌল-100 সংশ্লেষণ করে বিশেষ কৃতিত্ব দেখালেন। মৌল-101-এর জন্যে যাঁদের অবদান খুব বেশী, তাঁরা হলেন—অ্যালবার্ট ঘিয়ারসো, জি. হারভে, জি. কোপিন, এস. টমসন, জি. টি. সীবোর্গ প্রভৃতি। এই মৌলগুলি প্রস্তুতের বিশেষত্ব এই যে—এদের জন্যে হাল্কা প্রাথমিক কণা (নিউট্রন, প্রোটন ইত্যাদি) লক্ষ্যবস্তুর উপর সোজাসুজি আঘাত না করে, সাইক্লোট্রোন দিয়ে ত্বরিত (Accelerated by cyclotron) অপেক্ষাকৃত ভারী কণা, যেমন কোন হাল্কা মৌলের (বোরন, কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন প্রভৃতি) সমস্থানিক দিয়ে আঘাত করা হয়। নীচের মৌলগুলির প্রস্তুতের কেন্দ্রীন-বিক্রিয়াগুলি (Nuclear reactions) দেখলেই বোঝা যাবে।

মৌল-99 ও মৌল-100 তৈরি করা হয়েছে প্রায় একই সময়ে 1952 সালে। ইউরেনিয়াম-238-কে নাইট্রোজেন-14 দিয়ে আঘাত করে মৌল-99-কে পাওয়া গেছে। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী আইনষ্টাইনের নাম অনুসারে এর নাম হয়েছে আইনষ্টাইনিয়াম (Es)।

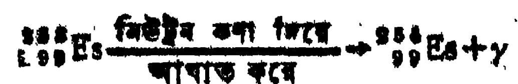


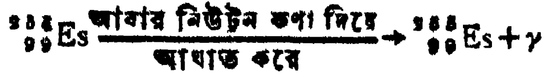
নাইট্রোজেন-14-এর পরিবর্তে অক্সিজেন-16 ব্যবহার করলেই শততম মৌল পাওয়া যায়। পদার্থবিদ্ এনরিকো ফের্মির নামানুসারে এর নাম হয়েছে ফের্মিয়াম (Fm)।



উল্লিখিত মৌল দুটির সবগুলি সমস্থানিকই কণস্থায়ী। আইনষ্টাইনিয়ামের অধিকতর স্থায়ী কণা, Es-255 (অর্ধজীবন কাল প্রায় 30 দিন) বিটা কণা দিয়ে ফের্মিয়ামের অধিকতর স্থায়ী কণায় (Fm-255, অর্ধজীবনকাল প্রায় 15 দিন) পরিবর্তিত হয়। Es-255, Fm-255—উভয়কেই ক্যালিফোর্নিয়াম-253 থেকে কয়েকটা ধাপ পাওয়া যায়।







$$^{254}_{99}Es \xrightarrow[\text{আঘাত করে}]{\text{আবার নিউট্রন কণা দিয়ে}} {}^{255}_{99}Es + \gamma$$



$$^{255}_{99}Es \longrightarrow {}^{255}_{100}Fm + \beta$$

1955 সালে আইনষ্টানিয়াম-255-এর উপর আলফা কণা দিয়ে আঘাত করে মাত্র আধ ঘণ্টা অর্ধজীবনবিশিষ্ট যে মৌল পাওয়া গেছে, তার পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক 101 ; দামিত্রি মেণ্ডেলিভের স্মরণে এই মৌলকে বলা হলো মেণ্ডেলিভিয়াম (Md)



$$^{253}_{99}Es + \alpha \longrightarrow {}^{256}_{101}Md + {}^{1}_{0}n$$

255-তম সংখ্যাবিশিষ্ট সমস্থানিকটির অর্ধজীবন একটু বেশী (দেড় ঘণ্টার কাছাকাছি) ; তাকেও একইভাবে প্রস্তুত করা সম্ভব।



$$^{253}_{99}Es + \alpha \longrightarrow {}^{255}_{101}Md + 2{}^{1}_{0}n$$

1957 সালে ষ্টকহোমের নোবেল ইনস্টিটিউট অব ফিজিক্স কুরিয়াম-244-এর উপর কার্বন-13-এর বিক্রিয়ায় নোবেলিয়াম (No) প্রস্তুতের কথা ঘোষণা করেছেন। মৌলটি কিন্তু কয়েকটি লেবরেটরীর সহায়তায় প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে। যেমন কুরিয়াম-244 দিয়েছিলেন ইউ. এস. এ.-র অ্যারাগোন ন্যাশানাল লেবরেটরী অব সায়েন্স আর কার্বন-13 নেওয়া হয়েছিল বৃটেনের হারওয়েল লেবরেটরী থেকে।



$$^{244}_{96}Cm + {}^{13}_{6}C \longrightarrow {}^{251}_{102}No + 6{}^{1}_{0}n$$

অথবা $^{244}_{96}Cm + {}^{13}_{6}C \longrightarrow {}^{253}_{102}No + 4{}^{1}_{0}n$

অন্যান্য সমস্থানিক অপেক্ষা নোবেলিয়াম-253-এর অর্ধজীবনকাল বেশী হলেও মাত্র 10 মিনিট। 1958 সালে বৈজ্ঞানিক ঘিয়রসো, সীবোর্গ প্রভৃতি কার্বন-12 ব্যবহার করেও নোবেলিয়াম-254 পেয়েছিলেন, কিন্তু তা এত ক্ষণস্থায়ী (অর্ধজীবন কাল 3 সেকেণ্ড) যে, সহজেই ফের্মিয়াম-250-এ পরিবর্তিত হয়।

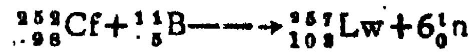


$$^{246}_{96}Cm + {}^{12}_{6}C \longrightarrow {}^{254}_{102}No + 4{}^{1}_{0}n$$



$$^{254}_{102}No \longrightarrow {}^{250}_{100}Fm + \alpha$$

প্রধানতঃ উপরিউক্ত বিজ্ঞানীরাই 1961 সালে মৌল-103-এর কথা ঘোষণা করেন এবং সাইক্লোট্রোনের আবিষ্কর্তা আর্নেষ্ট লরেন্স-এর সম্মানার্থে এই মৌলের নামকরণ হয় লরেন্সিয়াম (Lw)। ক্যালিফোর্নিয়ামের উপর বোরন-10 বা বোরন-11-এর বিক্রিয়ায় Lw-257 পাওয়া গেছে। মৌলটির অর্ধজীবনকাল মাত্র 8 সেকেণ্ড।



$$^{252}_{98}Cf + {}^{11}_{5}B \longrightarrow {}^{257}_{103}Lw + 6{}^{1}_{0}n$$



$$^{252}_{98}Cf + {}^{10}_{5}B \longrightarrow {}^{257}_{103}Lw + 5{}^{1}_{0}n$$

এই লরেন্সিয়ামকে দিয়ে পর্যায়-সারণীর (Periodic table) অ্যাক্টিনাইড শ্রেণী (Actinide series) সম্পূর্ণ হয়ে গেল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় অ্যাকটিনাইড শ্রেণীর মৌলগুলির সঙ্গে ল্যান্থানাইড শ্রেণীর (Lanthanide series) মৌলগুলির ধর্মের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। যেমন ল্যান্থানামের (La) সঙ্গে অ্যাক্টিনিয়ামের (Ac), সিরিয়ামের (Ce) সঙ্গে থোরিয়ামের (Th) ইত্যাদি। সুতরাং প্রশ্ন থাকে—এর পরের মৌলগুলির স্থান কোথায় হবে ?

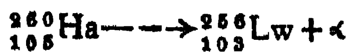
1957 সালে রুশ বিজ্ঞানীরা 104তম মৌলের কথা বলেছেন এবং প্লুটোনিয়াম-242-কে নিয়ন-22 কণা দিয়ে আঘাত করে একে সংশ্লেষিত করেছেন। বিজ্ঞানী ইগোর কুর্চাটোভের নামানুসারে এর নাম হয়েছে কুর্চাটোভিয়াম (Kurchatovium, সঙ্কেত সঠিক ভাবে জানা যায় নি)। এই মৌল এত দুঃস্থ যে, এক সেকেণ্ডের ভগ্নাংশ সময়েই এটি ভেঙে ইটারবিয়াম ($^{174}_{70}Yb$) ও সেলেনিয়াম ($^{80}_{34}Se$)-এ রূপান্তরিত হয়।

105-তম মৌলের কথা জানিয়েছেন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের লরেন্স রেডিয়েশান লেবরেটরীর বিজ্ঞানীরা 1970 সালের আমেরিকান ফিজিক্যাল সোসাইটির অধিবেশনে। মৌলটি প্রস্তুত করেছেন অ্যালবার্ট ঘিয়রসো এবং তাঁর সহকর্মীরা। বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী অটো হানের নামানুসারে এই মৌলের নাম হয়েছে হানিয়াম

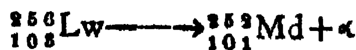
(Hahnium-Ha), ক্যালিফোর্নিয়াম-249-এর উপর নাইট্রোজেন-15 দিয়ে আঘাত করে হানিয়ামের-260 সমস্থানিককে প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে। এই সমস্থানিকটির অর্ধজীবনকাল 1·60 সেকেণ্ডের কাছাকাছি। আলফা কণা দিয়ে মৌলটি লরেন্সিয়ামে পরিবর্তিত হয়; এই লরেন্সিয়াম আবার আলফা কণা দিয়ে মেণ্ডেলিভিয়াম 252 দেয়।



$$^{249}_{98}Cf + ^{15}_{7}N \longrightarrow ^{260}_{105}Ha + 4^{1}_{0}n$$



$$^{260}_{105}Ha \longrightarrow ^{256}_{103}Lw + \alpha$$



$$^{256}_{103}Lw \longrightarrow ^{252}_{101}Md + \alpha$$

এর আগেও 1967 সালে রুশ বিজ্ঞানীরা মৌল-105-কে তৈরি করবার কথা জানান এবং তাঁরা বলেছিলেন অ্যামেরিসিয়াম-243-কে নিয়ন কণা দিয়ে আঘাত করে এই মৌল পাওয়া সম্ভব।

অ্যাক্টিনাইড শ্রেণী সম্পূর্ণ হওয়ার পরে আবিষ্কৃত মৌলগুলিকে পর্যায়-সারণীর সপ্তম পর্যায়েই রাখবার প্রস্তাব করা হয়েছে। উল্লিখিত সর্বশেষ মৌল দুটিকে যথাক্রমে হাফনিয়াম (Hf) ও ট্যান্টালামের (Ta) নীচে নীচে অর্থাৎ 5(a) ও 6(a) গ্রুপে পর পর রাখা হয়েছে।

ইউরেনিয়ামোত্তর মৌলগুলির অর্ধজীবনকাল দেখে এই ধারণা হতে পারে যে, পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের স্থায়িত্ব কমে যায়। তাহলে তো অতি ভারী মৌলের (Super heavy element) অস্তিত্ব থাকা উচিত নয়। কিন্তু অতি ভারী মৌলগুলি অর্থাৎ যাদের পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক 110-এর উপরে, তাদের অবস্থিতির কথা জানা গেছে। পারমাণবিক গঠনের উপর নির্ভর করে তাত্ত্বিক গণনা (Theoretical calculation) থেকে 114-র কাছাকাছি পারমাণবিক ক্রমাঙ্কের মৌলগুলির ক্ষেত্রে 'বিশেষ স্থিরতার' (Island of stability) কথা বলেছেন টাটা ইনষ্টিটিউট অব ফাণ্ডামেণ্টাল রিসার্চ, বোম্বে। সম্প্রতি মৃত উল্কা ও চান্দ্র ধূলায় অতি ভারী মৌলের অস্তিত্বের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। নিউক্লীয় তত্ত্ব (Nuclear theory) লেবরেটরীতেই 106-তম মৌলের প্রস্তুতির প্রতিশ্রুতি দেয় এবং বিজ্ঞানীরাও 118-তম মৌল পর্যন্ত সংশ্লেষণের আশা করছেন। এই সমস্ত মৌলের স্থান হবে পর্যায়-সারণীতে সপ্তম পর্যায়ে—যথাক্রমে মৌল 73 থেকে মৌল 86-এর নীচে নীচে এবং নীতিগতভাবে এরা গ্রুপ ধর্ম মেনে চলবে। আজ তাই ইউরেনিয়ামোত্তর মৌলগুলি পর্যায়-সারণীতে এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার দাবী রাখে।

বহু সন্তান জন্মের রহস্য

স্বপনকুমার রায়চৌধুরী

ছোট পরিবার সুখী পরিবার—দুটি কিংবা তিনটি সন্তানই যথেষ্ট। পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের কল্যাণে এই ধরণের বিজ্ঞাপন এখন আর নূতন নয়। বুদ্ধিমান মা-বাবা বেশী সন্তানের আগমন সম্পর্কে দিন দিন বেশী সজাগ হচ্ছেন। কিন্তু যখন কোন মা একসঙ্গে একাধিক সন্তান প্রসব করেন, তখন কি পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের কিছু বলবার থাকতে পারে? যমজ সন্তান জন্মের কথা সকলের জানা আছে। কিন্তু একসঙ্গে দুটির বেশী সন্তান জন্মের ঘটনা যথেষ্ট সংখ্যায় না ঘটলেও একেবারে অসম্ভব ব্যাপার নয়।

পৌরাণিক যুগে গান্ধারী এক সঙ্গে একশতটি সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন, সগর রাজা তো ষাট হাজার সন্তানের জনক ছিলেন। কিন্তু পৌরাণিক যুগের ওসব ঘটনার কথা আপাততঃ থাক। আধুনিক যুগের কয়েকটি ঘটনার কথা বলি। 1960 সালের 9ই জানুয়ারী জার্মেনীতে একসঙ্গে সাতটি সন্তান জন্মের একটি ঘটনা ঘটে। 1967 সালের মার্চ মাসে মারিয়া টেরেসা নামে 21 বছর বয়স্কা এক মহিলা মেক্সিকো সিটি হাসপাতালে এক সঙ্গে আটটি সন্তানের জন্ম দেন। মিশরের রাজধানী ইজিপ্ট শহরে সাম্প্রতিক কালে এক-সঙ্গে ছয়টি সন্তানের জন্মের কথাও বিজ্ঞানীরা নথিভুক্ত করেছেন।

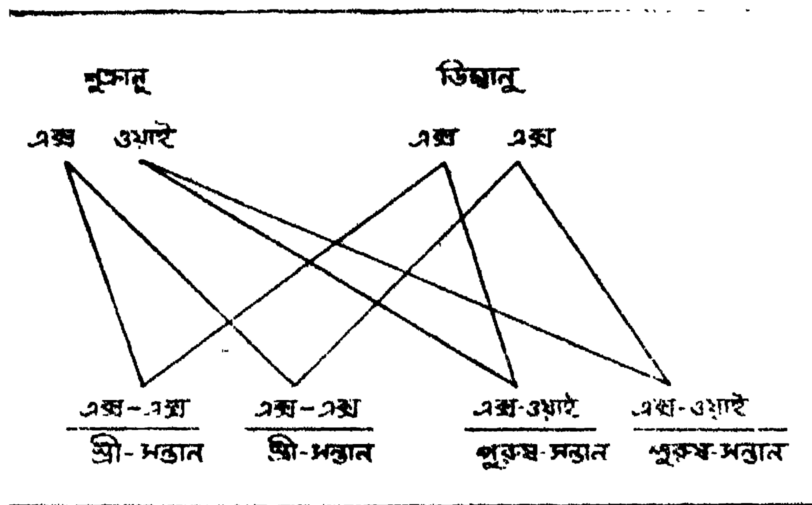
প্রতিটি সন্তানের জন্মদানের জন্য মা-বাবা যৌথভাবে তাঁদের দায়িত্ব পালন করেন। পুরুষের শুক্রাণুর সঙ্গে স্ত্রীর ডিম্বাণুর মিলনের ফলেই সন্তান জন্মগ্রহণ করে। শুক্রাণু দুই রকমের। এক ধরণের শুক্রাণু বহন করে ওয়াই-ক্রোমোসোম এবং অপর ধরণের শুক্রাণু বহন করে এক্স-ক্রোমোসোম। ডিম্বাণু সব সময়েই এক্স-ক্রোমো-সোম বহন করে। যদি এক্স-ক্রোমোসোম বহনকারী কোন শুক্রাণুর সঙ্গে ডিম্বাণু মিলিত হয়, তবে স্ত্রী-সন্তান সৃষ্টিকারী ভ্রূণের জন্ম হয়। অপর পক্ষে ওয়াই ক্রোমোসোম বহনকারী শুক্রাণুর সঙ্গে ডিম্বাণুর মিলনের ফলে জন্ম হয় পুরুষ সন্তান সৃষ্টিকারী ভ্রূণের। 1নং চিত্র থেকে সহজেই বোঝা যাবে, কেমন করে স্ত্রী এবং পুরুষ সন্তানের জন্ম হয়।

সাধারণতঃ প্রতিটি সুস্থ এবং পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী-লোকের ডিম্বাশয় থেকে প্রতি আঠাশ দিন অন্তর একটি করে পরিপক্ক ডিম্বাণু বেরিয়ে এসে জরায়ুর মধ্যে আশ্রয় নেয়। এই সময়ে শরীরে কতকগুলি গ্রন্থি থেকে (বিশেষ করে পিটুইটারী গ্রন্থি থেকে) বিশেষ ধরণের হর্মোন নিঃসৃত হতে থাকে এবং এদের সাহায্যে জরায়ুর মধ্যস্থিত একটি স্থান ভ্রূণধারণের উপযোগী হয়ে ওঠে। ঠিক এই সময়ে যদি কোন শুক্রাণু জরায়ুর মধ্যে ঢুকে ডিম্বাণুর সঙ্গে মিলিত হতে পারে, তবেই দেখা দেয় সন্তান জন্মের সম্ভাবনা।

এ তো গেল স্বাভাবিকভাবে ভ্রূণ সৃষ্টির কথা। কিন্তু অঘটন অনেক ঘটে। এমনও হতে পারে, একটির জায়গায় দুটি কিম্বা আরো বেশী ডিম্বাণু ডিম্বাশয় থেকে বেরিয়ে এসে প্রত্যেকেই তারা শুক্রাণুর সঙ্গে মিলিত হতে সক্ষম হয়, তবে ঠিক ততগুলি সন্তান জন্মের সম্ভাবনা থাকে।

আবার অন্য রকম ঘটনাও ঘটতে পারে। এমনও হতে পারে, স্বাভাবিকভাবে একটি মাত্র ডিম্বাণু ডিম্বাশয় থেকে বেরিয়ে এসে একটি মাত্র

ভ্রূণেরই সৃষ্টি করে। এই ভ্রূণটি যদি যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবার আগেই কোন কারণে ভেঙ্গে গিয়ে দুটি বা তারও বেশী খণ্ডে বিভক্ত হয়ে যায়, তবে ভ্রূণটি যতগুলি খণ্ডে বিভক্ত হয়, জরায়ুর মধ্যে ততগুলি সন্তানই পূর্ণতা লাভ করতে থাকে। উল্লেখযোগ্য যে, এভাবে সৃষ্ট সন্তানের সকলেই যমজ সন্তানদের চেহারাতেই শুধু মিল থাকে না, অনেক ক্ষেত্রে তাদের অনুভূতি এবং চিন্তাধারার মধ্যেও যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। এর কারণ প্রথম উপায়ে সৃষ্ট একই ভ্রূণ থেকে যখন একাধিক সন্তানের জন্ম হয়, তখন ঐ সব সন্তানের জিনের গঠন একই রকমের হয়ে থাকে এবং



1নং চিত্র

সমলিঙ্গের হবে। কিন্তু বহু সন্তান জন্মের প্রথম যে পদ্ধতির কথা বলেছি, তাতে কয়টি স্ত্রী এবং পুরুষ সন্তান জন্মাবে, তার কোন ঠিক নেই। কেন না, ভ্রূণ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই ভাবী সন্তানের লিঙ্গ নির্দিষ্ট হয়ে যায়। কাজেই যখন প্রাথমিকভাবে সৃষ্ট একটি ভ্রূণ থেকে বহু সন্তানের জন্ম হয়, তখন তারা প্রত্যেকে একই লিঙ্গের হয়। অপর পক্ষে বিভিন্ন ভ্রূণ থেকে সৃষ্ট সন্তানের লিঙ্গ একও হতে পারে বা ভিন্নও হতে পারে।

প্রাথমিকভাবে সৃষ্ট একই ভ্রূণ থেকে যখন একাধিক সন্তানের জন্ম হয়, তখন সেই সন্তানেরা কেবল সমলিঙ্গেরই হয় না, আরো অনেক রকমের বৈশিষ্ট্যও তাদের একই রকমের হয়ে থাকে। একথা আজ সকলেরই জানা আছে যে, কেবল মানুষই নয়, প্রতিটি প্রাণীর প্রতিটি বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে তার জিনের গঠনের উপর।

অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের স্তন্যপায়ীদের, যেমন—কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি প্রাণীর মধ্যে একসঙ্গে বহু সন্তানের জন্ম খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। এদের শারীরিক গঠন এবং প্রক্রিয়াও এই ঘটনার অনুকূল। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে এক সঙ্গে বহু সন্তানের জন্ম আকস্মিক ঘটনা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই ব্যাপারে বিজ্ঞানীদের অনুসন্ধিৎসার অন্ত নেই। তবে আজ পর্যন্ত এই সম্বন্ধে যতটুকু জানা গেছে, তার চেয়ে—না-জানা তথ্যের পরিমাণ অনেক বেশী।

উড়িষ্যায় সাম্প্রতিক প্রলয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড়

নেপালচন্দ্র রায়সরকার*

গত অক্টোবর মাসের শেষে উড়িষ্যার উপকূলে যে প্রলয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস হয়ে গেল, তার বিবরণ আপনারা সকলেই খবরের কাগজে পড়েছেন। এই দুর্যোগে দশ হাজারের মত লোকের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া বহু কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতিও হয়েছে।

এ ধরণের ঘূর্ণিঝড় বা সাইক্লোন আমাদের এ অঞ্চলে খুব নতুন কিছু নয়। 1970 সালের নভেম্বর মাসে আর এক প্রলয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড়ে বাংলাদেশের ভোলা, হাতিয়া, সন্দ্বীপ প্রভৃতি স্থানের কয়েক লক্ষ অধিবাসী জলোচ্ছ্বাসে ভেসে গিয়েছিল। স্বভাবতঃই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে—এ ধরনের ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস কেন হয়? ঘূর্ণিঝড়ের সাইক্লোন নামকরণ 1848 সালে ক্যাপ্টেন হেনরী পেডিংটন করেছিলেন। তিনি ছিলেন কলকাতায় তৎকালীন মেরিন কোর্টের প্রেসিডেন্ট। তিনি সাপের কুণ্ডলীর সঙ্গে সাইক্লোনকে তুলনা করেছিলেন।

নিরক্ষীয় অঞ্চলে সমুদ্রের উপর সাধারণতঃ ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন দেশে তাকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়; যেমন—অ্যাটলান্টিকে বলা হয় হারিকেন, পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে বলা হয় টাইফুন, অস্ট্রেলিয়ার উপকূলবর্তী অঞ্চলে বলা হয় উইলি উইলি, আর আমাদের দেশে বলা হয় সাইক্লোন।

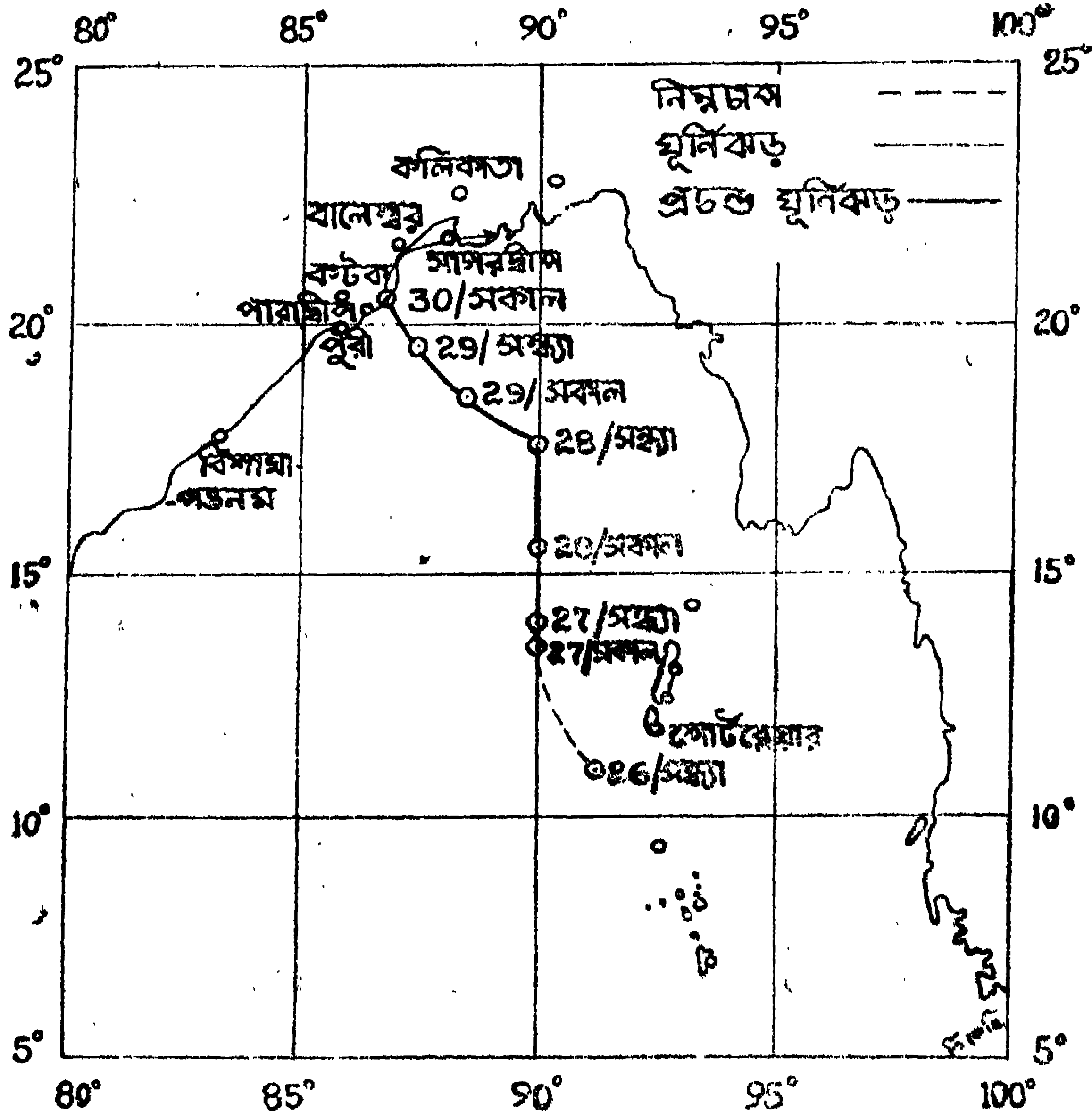
সাইক্লোন যখন প্রবল হয়, তখন তা বায়ুমণ্ডলে একটা বিরাট ঘূর্ণির সৃষ্টি করে। এই ঘূর্ণির প্রভাব 150 কিঃ মিঃ থেকে 1000 কিঃ মিঃ বিস্তৃত এলাকার উপর সাধারণতঃ থাকে এবং ঊর্ধ্বাকাশে এর প্রভাব 10 থেকে 17 কিঃ মিঃ পর্যন্ত হয়। এই বিশাল ঘূর্ণিঝড়ের নিজস্ব একটা গতি থাকে। সেই গতিতে সে দিনে 300 থেকে 500 কিঃ মিঃ পর্যন্ত অতিক্রম করতে পারে। ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রের চারধারে ঘণ্টায় 150 থেকে 250 কিঃ মিঃ জোরে ঝড়ো হাওয়া প্রবাহিত হতে পারে।

ঘূর্ণিঝড়ের দরুণ যে প্রচণ্ড ঝড় ও বৃষ্টির সৃষ্টি হয়, তা জীবননাশ ও সম্পত্তিহানির জন্যে দায়ী। কখনো কখনো ঘূর্ণিঝড়ের সঙ্গে সমুদ্র থেকে জলোচ্ছ্বাস উঠে এসে তীরবর্তী অঞ্চলকে ভাসিয়ে দেয়। এই জলোচ্ছ্বাসের ফলেই প্রাণনাশ হয় সবচেয়ে বেশী। প্রবল বর্ষণের ফলে বড় বড় গাছের গুঁড়ির কাছে মাটি আলগা হয়ে যায়, তখন ঝড়ের মুখে সেগুলি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। সমুদ্রের দিক থেকে প্রবল বাতাস প্রবাহিত হয়ে তীরবর্তী জলরাশিকে উত্তোলিত করে এবং বন্যার সৃষ্টি করে।

আগেই বলেছি সাইক্লোন সৃষ্টি হয় নিরক্ষীয় অঞ্চলে। উত্তর গোলার্ধে সাধারণতঃ 5° থেকে 15° অক্ষরেখার মধ্যে সাইক্লোনের উৎপত্তি হয়। বঙ্গোপসাগরে শরৎকালীন সাইক্লোনগুলি বেশীর ভাগ সময় প্রচণ্ড রূপ ধারণ করে। তবে গ্রীষ্মকালেও এই অঞ্চলে সাইক্লোনের প্রাদুর্ভাব ঘটে। বায়ুতে নিম্নচাপ ক্ষেত্রের সৃষ্টি হলেই সেখানে বৃষ্টিপাতের মাত্রা বেড়ে যায়। সেই নিম্নচাপ ক্ষেত্রটি ক্রমশঃ গভীরতর হয়ে অবশেষে সাইক্লোনে পরিণত হতে পারে। একটি পূর্ণ গঠিত সাইক্লোনের কেন্দ্রস্থলে প্রায় 20 কি. মি. ব্যাসযুক্ত একটি এলাকা মেঘমুক্ত থাকে।

* আঞ্চলিক আবহ কেন্দ্র, আলিপুর, কলিকাতা-27

একে সাইক্লোনের কেন্দ্র বা eye বলা হয়। সেখানে মৃদু বায়ু প্রবাহিত হয়। কিন্তু কেন্দ্র বিন্দু থেকে 30 থেকে 50 কি. মি. দূরে প্রচণ্ড ঝড় ও বৃষ্টি হতে থাকে। প্রবল বৃষ্টিধারার নিকটে এলে ঝড় সাময়িকভাবে কমে যায়; আকাশ প্রায় পরিষ্কার হয়ে যায়, মনে হয় দুর্যোগ বুঝি কেটে গেল। কিন্তু অচিরেই সে ভুল ভেঙে যায়। ক্ষণকাল পরেই উল্টোদিক



1নং চিত্র
উড়িষ্যার ঘূর্ণিঝড়, অক্টোবর, 1971

সম্পৃক্ত মেঘরাশি কুণ্ডলীর আকারে এই কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হয়। সাইক্লোন যখন তীরভূমিতে আঘাত হানে, তখন সেই এলাকার বায়ুর গতি ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। কিন্তু ঝড়ের কেন্দ্র (Eye) থেকে আবার প্রচণ্ড ঝড় সুরু হয় এবং তার সঙ্গে নেমে আসে মুষলধারায় বৃষ্টি। যে বাড়ী ও গাছগুলি ঝড়ের প্রথম চোটে বেঁচে গিয়েছিল, এবার তার মধ্যে অনেকগুলিই ভূমিসাৎ

হতে পারে। সাধারণ মানুষ, যারা দুর্যোগ কেটে গেছে বলে বাড়ীর বাইরে গিয়েছিল, তারাও অনেকে এই ঝড়ের দ্বিতীয় চোটে প্রাণ হারাতে পারে। উড়িষ্যার সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড়েও এই মেঘমুক্ত কেন্দ্র (Eye) 229/30শে অক্টোবর রাত্রি 2টা থেকে 4টার মধ্যে পারাদ্বীপের উপর দিয়ে চলে যায়। কাছাকাছি একটি জাপানী পারাদ্বীপের কাছ থেকে ঝড়ের প্রকোপ কমতে থাকে এবং তার গতিপথে পরিবর্তন দেখা যায়। ঝড়টি কিছুক্ষণ উত্তরমুখে ধাবিত হয়ে পরে বালেশ্বরের কাছাকাছি এসে উত্তর-পূর্ব দিকে সুন্দর বনের মধ্যে প্রবেশ করে। ঝড়ের আয়ু এখানেই প্রায় শেষ হয়ে যায়। এই ঝড় বঙ্গোপসাগরে উদ্ভূত হয়ে যে গতিপথ ধরে এসে



2নং চিত্র

জাহাজ ছিল, তার নাম হেলিও মারু। এই জাহাজটি ঘন্টায় 175 কি. মি. বেগে ঝড় এবং 2·8 থেকে 3 মিটার (9 থেকে 11 ফুট) উঁচু জোয়ারের জল মেপেছিল। বালেশ্বরের নিকট এক উপকূলবর্তী স্থানে জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা 6 মিটারের (20 ফুট) কাছাকাছি উঠেছিল। উড়িষ্যা এবং গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে ক্ষতিসাধন করেছে, সেই গতিপথ 1নং চিত্রে দেখানো হলো।

আজকাল কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে ভূপৃষ্ঠের মেঘের ছবি তোলা হচ্ছে এবং সেই ছবিগুলি বেতার-তরঙ্গ মারফৎ পাঠানো হচ্ছে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরে এই ছবিগুলির একটি গ্রাহক-

যন্ত্র আছে। এই ছবি থেকে সাইক্লোনের কেন্দ্রস্থলের সঠিক অবস্থান ও তার প্রবলতা বোঝা যায়। 29শে অক্টোবর সকালে যে চিত্রটি পাওয়া গিয়েছিল, তাতে এই ঘূর্ণিঝড়টিকে সুস্পষ্ট দেখা যায়। এই চিত্রের একটি প্রতিলিপি (2নং চিত্র) দেওয়া হলো। এই চিত্রে সাইক্লোনের কেন্দ্র (Eye) সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। 20° ডিগ্রী অক্ষরেখা ও 87° ডিগ্রী দ্রাঘিমাংশের নিকট যে কালো বিন্দুটি পরিলক্ষিত হচ্ছে, সেটাই সাইক্লোনের কেন্দ্র (Eye)।

ঘূর্ণিঝড়ের এই প্রলয়ঙ্করী ধ্বংসলীলা দেখে আমাদের মনে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে যে, বিজ্ঞানে এমনকি কোন উপায় নেই, যা দিয়ে এই ঝড়গুলিকে সমুদ্রবক্ষেই প্রশমিত করা যায়। জলীয় বাষ্পে সম্পৃক্ত মেঘের উপর silver iodide গুঁড়া প্রয়োগ করে অ্যাটলান্টিকের হারিকেন নামক ভীষণ ঘূর্ণিঝড়কে আংশিকভাবে কিছু ক্ষণের জন্যে প্রশমিত করা গেছে। কিন্তু এই ব্যবস্থা এতই ব্যয়সাধ্য যে, ভারতের পক্ষে এরূপ প্রচেষ্টা চালানো প্রায় অসম্ভব। আমাদের চাই এমন একটি ব্যবস্থা, যার দ্বারা আমরা সঠিকভাবে বলতে পারবো যে, ঝড় অমুক জায়গায় আঘাত করবে। তখন সেই জায়গায় ও তার আশেপাশের সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চল থেকে লোক অপসারণ করলেই অন্ততঃ প্রাণহানির সংখ্যাটা আমরা অনেক কমিয়ে ফেলতে পারবো। সেই ব্যবস্থাই আমাদের দেশে হতে চলেছে। সমুদ্র তীরে শক্তিশালী রেডার যন্ত্র বসিয়ে ঝড়ের আঘাত হানার সঠিক খবর দেওয়া সম্ভব। বিশাখাপত্তনে এই ধরণের রেডার যন্ত্র একটি ইতিমধ্যেই বসানো হয়েছে এবং শীঘ্রই কলকাতা ও পারাদ্বীপ বন্দরে বসানো হবে। এই সব ব্যবস্থা সম্পন্ন হলে আশা করা যায় যে, এই ধরণের ঘূর্ণিঝড়ের দ্বারা যে প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়, তার পরিমাণ অনেকটা কমানো সম্ভব হবে।

জীবন-মরণ সমস্যা

হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বুদ্ধিবৃত্তি উন্নত হবার সুরু থেকেই জীবের জন্ম ও মৃত্যু সম্বন্ধে মানুষের কৌতূহলের অন্ত নেই। একথা অনস্বীকার্য যে, কোন না কোন সময়ে সকল প্রাণীরই সজীব দেহখানি নির্জীব হয়ে যায় এবং তার জীবনাবস্থার অবসান ঘটে। সৃষ্টির সুরু থেকে আজ অবধি এর কোন ব্যতিক্রম দেখা যায় নি।

আদিম কাল থেকেই মৃত্যু সম্বন্ধে দেশ ও জাতিভেদে নানা জল্পনা-কল্পনা ও অনুমান প্রচলিত আছে। দার্শনিকেরা সূক্ষ্ম যুক্তিবিচারের দ্বারা মৃত্যু ও তার পরবর্তী অবস্থা সম্বন্ধে নানাভাবে ব্যাখ্যা করবার প্রয়াস পেয়েছেন। জীবজগৎকে ঈশ্বরের সৃষ্টি অনুমান করে নিয়ে বিভিন্ন ধর্মমতে মৃত্যুকে নানা প্রকারে ব্যাখ্যা করা হয়। এসব হলো অনুমান ও কল্পনার কথা।

অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্য এই মৃত্যু সম্বন্ধে চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নানা গবেষণা করে চলেছেন। মৃত্যুর নিরীখ কি, মৃত্যুকে কিভাবে নিবারণ বা বিলম্বিত করা যায়, সে বিষয়ে আবহমান কাল পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।

আমরা বলি প্রাণ বেরিয়ে গেল। প্রাণ যে কি বস্তু, তা কিন্তু সঠিক জানা নেই। প্রাণ বেরিয়ে যাবার পর যে অবস্থা, তাকেই মৃত্যু বলা হয়। যে ভাবেই হোক, এটা কঠোর সত্য যে, এই অবস্থার পর ব্যক্তির হৃদ্‌যন্ত্র ও শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায় এবং দেহটি একটি জড় বস্তুতে পরিণত হয়। এরপর ঐ দেহের উপর কোন উদ্দীপকই (Stimulus) আর সাড়া জাগাতে পারে না এবং কোন প্রকারেই ব্যক্তিটির দেহে পূর্বের কর্মক্ষমতা ও চেতনা অর্থাৎ প্রাণের লক্ষণগুলির পুনরুদ্ভব করানো সম্ভব হয় না। এই অবস্থাই হলো মৃত্যু।

তাহলে মৃত্যু কি? শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়াই কি মৃত্যু? কিন্তু শ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার পর হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া অব্যাহত থাকে। অনতিবিলম্বে যদি কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়া (Artificial respiration) বা যন্ত্রের (Respirator) সাহায্যে শ্বাসক্রিয়া পুনঃপ্রবর্তিত করা যায়, তাহলে ব্যক্তি জীবিত হয়ে ওঠে। তাহলে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়াই কি মৃত্যু? দেখা গেছে, হৃদ্‌যন্ত্র স্তব্ধ হয়ে যাবার পর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বক্ষাস্থির (Sternum) উপর চাপ দিয়ে (External cardiac massage) অথবা অস্ত্রোপচার করে হৃদ্‌যন্ত্রকে মর্দিত করে (Internal cardiac massage) উত্তেজিত করা যায়, তাহলে কোন কোন ক্ষেত্রে হৃদ্‌যন্ত্র পুনরায় স্বাভাবিকভাবে কর্মক্ষম হয়ে ওঠে।

এই সব কারণে মৃত্যুর সঠিক বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা দেওয়া খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। সাধারণতঃ কোন অসুখের পর চিকিৎসকেরা পরীক্ষা করে যখন রোগীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন, তখন সকলে সেই সিদ্ধান্তকেই মেনে চলেন। অনেক অভিজ্ঞ এবং বিচক্ষণ ব্যক্তিরাও মৃত্যুর লক্ষণ সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবহিত। সাধারণতঃ এই মরণের সিদ্ধান্ত ভুল হবার দৃষ্টান্ত অতিশয় বিরল। বহুক্ষণ যাবৎ মৃত ব্যক্তির বিষয়ে কোন ভুলের অবকাশই থাকে না।

চিকিৎসকেরা হৃদ্‌যন্ত্রের স্পন্দন ও শ্বাসক্রিয়ার আন্দোলন থেকেই জীবিত কি মৃত স্থির করেন। তিন মিনিটের অধিককাল শ্বাসক্রিয়া ও হৃদ্‌স্পন্দন বন্ধ থাকলে সেই ব্যক্তিকে মৃত বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এগুলি অবশ্য রোগ ও জরাগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষেই প্রযোজ্য।

আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃত ব্যক্তিকে ঔষধ এবং নানাবিধ প্রক্রিয়ার দ্বারা বাঁচাবার চেষ্টা ব্যর্থ হলে তবে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করা উচিত। যেমন—জলে ডোবা ব্যক্তির কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসক্রিয়া প্রবর্তনের চেষ্টা করতে হবে। আকস্মিক দুর্ঘটনায় আতঙ্কে (Shock) মৃত ব্যক্তিকে একই সঙ্গে কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়া ও হৃদ্‌যন্ত্রের মর্দন (Cardiac massage) করে বাঁচাবার চেষ্টা ব্যর্থ হলে মৃত বলে ঘোষণা করা সঙ্গত।

দেখা যাচ্ছে, কোন কোন ক্ষেত্রে শ্বাসক্রিয়া ও হৃদ্‌স্পন্দন উভয় কার্য বন্ধ হবার পরেও ব্যক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব। তাহলে মৃত ব্যক্তিটি কি মরণের পর আবার পুনর্জীবন লাভ করলো? আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হলেও ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়। শ্বাস ও হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হলেও শরীরের অন্যান্য অংশ ও কোষতন্তু (Tissues) তৎক্ষণাৎ অকর্মণ্য হয়ে পড়ে না। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি কোষগুলিকে খাদ্য সরবরাহ করা যায়, তাহলে সেগুলি পূর্বের মতই সক্রিয় হয়ে থাকে। কোষের খাদ্য হলো অক্সিজেন, হৃদ্‌যন্ত্রই ধমনী মারফৎ সকল কোষে অক্সিজেন সরবরাহ করে। জীবনধারণের পক্ষে হৃদ্‌যন্ত্র যদিও প্রধান অঙ্গ এবং অপরিহার্য, কিন্তু হৃদ্‌যন্ত্র বিকল হলেই তৎক্ষণাৎ কোন ব্যক্তিকে অপরিবর্তনীয়ভাবে মৃত বলে স্বীকার করা বিজ্ঞানসম্মত নয়।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা এই বিষয় নিয়ে গবেষণার দ্বারা একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হবার চেষ্টা করছেন।

দেহের সকল যন্ত্র ও কোষতন্ত্র নির্দিষ্ট কার্য (Function) সাধন করে স্নায়ুতন্ত্রের (Nervous system) আয়ত্তাধীনে। স্নায়ুতন্ত্রের মূল কেন্দ্র হলো মস্তিষ্ক। মস্তিষ্কের কোষগুলি যদি অক্সিজেনের অভাবে অকর্মণ্য হয়ে যায়, তাহলে ঐ কোষগুলির দ্বারা পরিচালিত দেহের নির্দিষ্ট অঙ্গ বা কোষগুলিও অকর্মণ্য হয়ে পড়বে। কোনও উপায়েই তাকে আর কর্মক্ষম করা সম্ভব নয়, অর্থাৎ অন্যান্য অংশের কোষগুলিরও অপরিবর্তনীয় মৃত্যু হয়।

পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, মস্তিষ্কের কোষগুলিতে যদি অক্সিজেন সরবরাহ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়, তাহলে ব্যক্তিবিশেষ 45 সেকেণ্ডের মধ্যে অচেতন হয়ে পড়বে। অক্সিজেন সরবরাহ যদি 1 মিনিটের অধিককাল বন্ধ থাকে, তাহলে মস্তিষ্কের আংশিকভাবে অপূরণীয় ক্ষতি হবে। যদি 5 মিনিটের অধিককাল বন্ধ থাকে, তাহলে গুরুমস্তিষ্কের আবরণের (Cerebral cortex) সকল কোষের কর্মক্ষমতা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যায়। মস্তিষ্কের কোষের কর্মক্ষমতা বিনষ্ট হয়ে যাওয়াই বৈজ্ঞানিক মতে প্রকৃত অপরিবর্তনীয় মৃত্যু। মস্তিষ্কের এই মৃত্যু একমাত্র যন্ত্রের সাহায্যেই প্রমাণ করা সম্ভব।

চিকিৎসকেরা বাহ্যিক লক্ষণ দেখে যে মৃত্যু ঘোষণা করেন, তাকে বলা যেতে পারে আধিভৌতিক মৃত্যু (Somatic death)। এর পর দেহের অন্যান্য অঙ্গ ও কোষতন্ত্রর ধারাবাহিক ভাবে মৃত্যু ঘটে—একে কোষগত মৃত্যু বলা হয় (Cellular death)। সাধারণের কাছে বাস্তব স্বার্থের দিক থেকে আধিভৌতিক মৃত্যুকেই প্রামাণ্য হিসাবে গ্রহণ করায় কোন ক্ষতি নেই।

অপরিবর্তনীয় মৃত্যু এবং শেষের মুহূর্তটি নির্ধারিত করবার বৈজ্ঞানিক আবশ্যকতা ব্যতীত আর একটি দিক বিবেচনা করা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

অধুনা মৃত ব্যক্তির শরীরের অংশবিশেষ বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে জীবিত অসুস্থ ব্যক্তির দেহে অন্তর্বাসন (Transplantation) করে তাকে সুস্থ করবার রীতি প্রচলিত হয়েছে।

একটু আগেই বলা হয়েছে, ব্যক্তির আধিভৌতিক মৃত্যুর পরেও কিছু সময় শরীরের নানা অংশের কোষতন্ত্রর ক্রমাগত কার্যকারিতা বজায় থাকে। যেমন মূত্রাশয় (Kidney) আরও এক ঘণ্টার মত, মাংসপেশীর কোষতন্ত্র আরও কয়েক ঘণ্টার মত কর্মক্ষমতা বজায় রাখে। এই আবিষ্কারের উপর নির্ভর করে মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই মৃত ব্যক্তির অংশবিশেষ অপর ব্যক্তির দেহে অন্তর্বাসন করানো হয়। এই প্রসঙ্গে হৃদ্‌যন্ত্র বদলের কথাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হৃদ্‌যন্ত্র অন্তর্বাসনের চমকপ্রদ সংবাদ সকল পাঠকই অবগত আছেন। এখন প্রশ্ন ওঠে, যে হৃদ্‌যন্ত্রটি অন্য ব্যক্তিকে কর্মক্ষম করে তুলতে পারে, সে যন্ত্রটিকে বিচ্ছিন্ন করে নেবার পূর্বে তার অপরিবর্তনীয় প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে নির্ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল কিনা। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বার্থ ছাড়া আইনগত সমস্যাও দেখা দেয়।

এই সব কারণে ব্যক্তির জীবনাবস্থার শেষের মুহূর্তটি বৈজ্ঞানিক উপায়ে অবিসংবাদিতভাবে নির্ধারিত করবার আবশ্যকতা দেখা দিয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (W. H. O.) থেকে অপরিবর্তনীয় মৃত্যুর একটা সর্ববাদিসম্মত সংজ্ঞা নির্ধারিত করবার চেষ্টা হচ্ছে। নানা দেশে এই পরিপ্রেক্ষিতে নতুন আইন প্রণয়নেরও চেষ্টা চলছে।

আলিগড়ে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের 59তম অধিবেশন

মূল সভাপতি ও শাখা-সভাপতিদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

অধ্যাপক ডাব্লিউ. ডি. ওয়েষ্ট
মূল সভাপতি

অধ্যাপক ওয়েষ্ট 1901 সালে ইংল্যাণ্ডের বোর্নমাউথে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর শৈশবের তিন বছর উত্তর বোর্নিওতে অতিবাহিত করেন। এখানে তাঁর বাবা প্রথম রেলপথ নির্মাণ করেন। তিনি ক্যান্টারবারির কিংস্ স্কুল এবং কেম্ব্রিজের সেন্ট জন কলেজে শিক্ষা লাভ করেন। ন্যাচারাল সায়েন্সেস ট্রাইপস-এর উভয় অংশে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি উইনচেষ্টার পুরস্কার এবং হার্কনেস বৃত্তি (ই. আর. গি-এর সঙ্গে যৌথভাবে) লাভ করেন। 1923 সালে তিনি ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষায় যোগদান করেন এবং 1946 সাল থেকে 1951 সাল পর্যন্ত এই সংস্থার ডিরেক্টর ছিলেন। অবসর গ্রহণের কিছুদিন পরেই সাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের প্রধান এবং অধ্যাপক হিসাবে যোগদানের জন্যে আমন্ত্রিত হন।

ভারতবর্ষে অধ্যাপক ওয়েষ্টের কাজের প্রধান ক্ষেত্র হচ্ছে মধ্যপ্রদেশ এবং সিমলা হিমালয়। ভারতীয় ভূতত্ত্বে সুপরিচিত মধ্যপ্রদেশের প্রাচীন পার্বত্যাঞ্চলে দেওলাপার শিলাস্তর, হিমালয় অঞ্চলের সিমলা ক্লিপ ইত্যাদি বিশেষ ধরণের শিলাস্তরের অস্তিত্বের বিষয় তিনি প্রমাণ করেন। 1935 সালের কোয়েটা ভূমিকম্প ও তজ্জনিত ক্ষতির কারণ সম্বন্ধে তিনি অনুসন্ধান করেন। আগ্নেয়শিলায় অবস্থিত সৌরাষ্ট্রের ডেকান ট্র্যাপের মধ্যে খনিত কয়েকটি গভীর গর্ত সম্বন্ধে তিনি অনুসন্ধান চালান।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিন্দুকুশের উত্তরে জুরাসিক সাইঘানে কয়লা আবিষ্কারের জন্যে অধ্যাপক ওয়েষ্ট একদল খননকারী ও সমীক্ষককে নিয়ে উত্তর আফগানিস্থানে যান। এই কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ আফগান সরকার তাঁকে ষ্টার অব আফগানিস্থান উপাধি প্রদান করেন। ভারতবর্ষে বিজ্ঞান ও ভূতাত্ত্বিক শিক্ষার উন্নতিতে অধ্যাপক ওয়েষ্টের দান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 1932 সাল থেকে 1938 সাল পর্যন্ত তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। 1933 সালে অধ্যাপক জে. এন. মুখার্জীর সহযোগিতায় তিনি কংগ্রেসের রজত জয়ন্তী অধিবেশনের ব্যবস্থাপনা করেন। 1937 সালে তিনি ভূতত্ত্ব বিভাগের সভাপতি ছিলেন এবং 'ভারতবর্ষে ভূমিকম্প' সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন।

ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষায় ডিরেক্টরের পদ গ্রহণ করবার পর তিনি এই সংস্থার প্রসারণের প্রথম পর্যায়ের পরিকল্পনা করেন এবং 1951 সালে এই সংস্থার শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন।

তিনি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, দি মাইনিং জিওলজিক্যাল অ্যাণ্ড মেটালার্জিক্যাল ইনস্টিটিউট অব ইণ্ডিয়া এবং ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন অব জিওহাইড্রোলজিষ্ট-এর সভাপতি ছিলেন। অধ্যাপক ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল সায়েন্স অ্যাকাডেমির ফাউণ্ডেশন ফেলো। তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির পি. এন. বোস্ স্মৃতি পদক এবং লণ্ডনের জিওলজিক্যাল সোসাইটির লিয়েল পদক লাভ করেন। 1947 সালে ভারত সরকার তাঁকে সি. আই. ই উপাধি প্রদান করেন। বর্তমানে তিনি সাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে কর্মরত আছেন।

ডক্টর এ. পি. মিত্র
সভাপতি—পদার্থবিদ্যা শাখা

ডক্টর এ. পি. মিত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এস-সি ও ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি অষ্ট্রেলিয়ার সি-এস-আই-আর-ও-এর রেডিও-ফিজিক্স বিভাগে কলোম্বো প্ল্যানের ফেলো (1951), 1952-53 সালে পেনসিলভ্যানিয়া ষ্টেট ইউনিভার্সিটির ইঞ্জিনীয়ারিং রিসার্চে ভিজিটিং সহকারী অধ্যাপক, 1953-54 সালে সহযোগী অধ্যাপক এবং 1957-68 সালে ভিজিটিং অধ্যাপক ছিলেন।

তিনি 1954 সালে ভারতের সি-এস-আই-আর-এ রেডিও রিসার্চ কমিটির সেক্রেটারী হিসাবে যোগদান করেন। 1958 সাল থেকে ন্যাশনাল লেবরেটরীর রেডিও প্রোপেগেশন ইউনিটের প্রধান হিসাবে আছেন। এছাড়া বর্তমানে তিনি এন. পি. এল.-এর ডেপুটি ডিরেক্টর।

তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু হচ্ছে—অ্যাটমোস্ফেরিক ফিজিক্স এবং অ্যারোনমি, আয়নোস্ফেরিক ফিজিক্স, আয়নোস্ফেরিক রেডিও-অ্যাস্ট্রোনমি, অ্যাটমোস্ফেরিক আয়ন কাইনেটিক্স এবং স্পেশ রিসার্চ। তিনি অষ্ট্রেলিয়ার সি. এ. সেইনের সহযোগিতায় রিয়োমিটার টেকনিক আবিষ্কারের অগ্রনায়ক। এই টেকনিক সোলার এফেক্ট, পোলার ক্যাপ অ্যাবসরপশন ইভেন্ট ও অ্যাটমোস্ফেরিক নিউক্লিয়ার ডিটোনেশন ইত্যাদি সহ বিভিন্ন ভূ-পদার্থতাত্ত্বিক বিষয় অনুশীলনে এখন ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। 'স্যাটেলাইট ড্র্যাগ ডেটা'র উপর ভিত্তি করে একেবারে প্রাথমিক একটি অ্যাটমোস্ফেরিক ডেনসিটি মডেলের উন্নতি বিধান করে স্পুট্নিক উৎক্ষেপণের কিছুদিন বাদে তিনি ভারতে মহাকাশ গবেষণার প্রবর্তন করেন।

ডক্টর মিত্র ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কমিটি ফর দি আই-জি-ওয়াই, ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কমিটি ফর আই-কিউ-এস-ওয়াই-র সেক্রেটারী ছিলেন এবং বর্তমানে রেডিও এবং টেলিকমিউনিকেশন রিসার্চ কমিটি এবং ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কমিটি ফর দি ইউ-আর-এস-আই-এর (ইণ্টারন্যাশনাল সায়েন্টিফিক রেডিও ইউনিয়ন) সেক্রেটারী। সম্প্রতি তিনি নিউ কোসপার (COSPAR) প্যানেল অন স্পেশ এডুকেশন অ্যাণ্ড ট্রেনিং-এর চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছেন।

ডক্টর মিত্র স্পেশ সায়েন্স রিভিউ (হল্যাণ্ড), জার্নাল অব অ্যাটমোস্ফেরিক অ্যাণ্ড টেরেস্ট্রীয়াল ফিজিক্স (ইউ. কে.), ইলেকট্রনিক্স লেটারস অব আই. ই. ই (ইউ. কে), জার্নাল অব পিওর অ্যাণ্ড অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্স (ভারত), জার্নাল অব দি ইনষ্টিটিউট অব টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনীয়ারস (ভারত) প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য।

1955 সালে ডক্টর মিত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ এবং মৌয়াট স্বর্ণপদক লাভ করেন। তিনি 1961 সালে ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সেস অব ইণ্ডিয়া এবং আমেরিকান জিওফিজিক্যাল ইউনিয়নের ফেলো এবং 1963 সালে ইণ্টারন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব অ্যাস্ট্রোনটিক্স-এর করেসপণ্ডিং সদস্য নির্বাচিত হন।

ডক্টর মিত্র আয়নোস্ফিয়ার এবং অ্যারোনমি, রেডিও-অ্যাস্ট্রোনমি, স্পেশ সায়েন্স প্রভৃতি বিষয়ে 90টিরও বেশী বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ প্রকাশ করেছেন।

ডক্টর জি. এস. সাহারিয়া
সভাপতি—রসায়ন শাখা

ডক্টর গোবিন্দস্বরূপ সাহারিয়া 1913 সালে 8ই নভেম্বর উত্তর প্রদেশের আলিগড় জেলার পিলখানা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। আলিগড়ের ধর্মসমাজ হাই স্কুলের পাঠ সমাপ্ত করে 1933 সালে আগ্রা কলেজ থেকে স্নাতক পরীক্ষার

উত্তীর্ণ হন। ছোটবেলায় তিনি হিন্দী, উর্দু ও পার্শী ভাষা ভাল করে আয়ত্ত করেন। 1935 সালে তিনি আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়নে মাস্টার ডিগ্রী লাভ করেন। অধ্যাপক আর. ডি. দেশাইয়ের তত্ত্বাবধানে গবেষণা করে তিনি 1938 সালে পি-এইচ. ডি ডিগ্রী লাভ করেন। 1940 সালের প্রায় শেষ পর্যন্ত তিনি আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগে কর্মরত ছিলেন। তারপর তিনি কুন্নুরে নিউট্রিশন রিসার্চ লেবরেটরীতে রিসার্চ স্কলার হিসাবে যোগদান করেন।

তিনি সাইক্লোহেক্সেন রিং-এর বাহ্যিক গঠন সম্পর্কিত বিষয়ে অনুশীলন করেন। তাঁর গবেষণা এবং তৎকালীন প্রচলিত এই বিষয় সম্পর্কিত তথ্যের ভিত্তিতে সাইক্লোহেক্সেনের বোট এবং চেয়ার ফর্মের অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রথম রাসায়নিক প্রমাণ পাওয়া যায়। এই গবেষণার প্রামাণিকতা সম্বন্ধে 1954 সালে চার্লস সি. প্রাইস এবং তাঁর সহকর্মীরা সমালোচনা করেন। কিন্তু সাহারিয়া এবং তাঁর সহকর্মীদের দ্বারা এই কাজের পুনরাবৃত্তির ফলে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে, 4 এবং 3 মিথাইল সাইক্লোহেক্সেন-1 : 1 ডাইকার্বোক্সিলিক অ্যাসিডের দুটি আইসোমেরিক ফর্মের প্রস্তুতি ও পৃথকীকরণের জন্যে উদ্ভাবিত পদ্ধতিটি ত্রুটিহীন।

1945 সাল থেকে ডক্টর সাহারিয়া দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগে শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত আছেন। এর মধ্যে কিছুদিন তিনি রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের জৈব রসায়নের অধ্যাপক ছিলেন।

1951 সালে তিনি লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজ অব সায়েন্স অ্যাণ্ড টেকনোলজীতে স্যার রেজিনাল্ড প্যাট্রিক লিনস্টেড এবং অধ্যাপক এল. এন. আওয়েনের সঙ্গে সাইক্লোহেপটেন-1 ও 2-ডায়োলস সম্বন্ধে গবেষণা করেন।

1961 সালে ডক্টর সাহারিয়া আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জৈব রসায়নে ডি. এস-সি ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি প্রায় 75টি গবেষণা-পত্র প্রকাশ করেছেন। তিনি রয়্যাল ইনষ্টিটিউট অব কেমিষ্ট্রি ও কেমিক্যাল সোসাইটির ফেলো, ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি এবং ইণ্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস অ্যাসোসিয়েশনের আজীবন সদস্য। হিন্দীতে তিনি "ভোজন ও স্বাস্থ্য" শীর্ষক একটি পুস্তক লিখেছেন।

ডক্টর সাহারিয়া হিন্দী বৈজ্ঞানিক পরিভাষা কমিটি, বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে হিন্দী-পুস্তক প্রকাশন কমিটির সদস্য। 1954 সাল থেকে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের রসায়ন বিভাগীয় কমিটির সদস্য এবং 1965 ও 1966 সালে যথাক্রমে কলিকাতা ও চণ্ডীগড়ে অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান অধিবেশনের বিভাগীয় রেকর্ডার ছিলেন।

অধ্যাপক টি. পাতি
সভাপতি—গণিত শাখা

অধ্যাপক ত্রিবিক্রম পাতি 1929 সালের 23শে অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কটকের র‍্যাভেনশা কলেজিয়েট স্কুল ও কলেজ থেকে শিক্ষালাভ করেন। 1948 সালে তিনি গণিতে প্রথম শ্রেণীর অনার্সসহ স্নাতক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। 1950 সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিতশাস্ত্রে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অধ্যাপক পাতি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 1953 সালে ডি. ফিল. এবং 1956 সালে ডি. এস-সি. ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি বিভিন্ন পুরস্কার, পদক, বৃত্তি ও ফেলোশিপ লাভ করেন। তিনি ন্যাশানাল ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সেস অব ইণ্ডিয়ার ফেলো এবং গণিতে প্রথম ন্যাশন্যাল রিসার্চ ফেলো। জব্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের পূর্বে তিনি হীরাকুঁদ ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের গণিত বিভাগের প্রধান এবং এলাহাবাদ

বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের সহকারী অধ্যাপক ছিলেন।

ফোরিয়ার অ্যানালিসিস ও অ্যাবসোলিউট সামেবিলিটি (Absolute Summability) সম্পর্কে তাঁর গবেষণা সুবিদিত। তাঁর গবেষণা-পত্র আন্তর্জাতিক বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর তত্ত্বধানে গবেষণা করে অনেকে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেছেন। তিনি ইণ্ডিয়ান জার্নাল অব ম্যাথামেটিক্স-এর প্রথম সম্পাদক এবং ম্যাথামেটিক্স ষ্টুডেণ্ট-এর সহযোগী সম্পাদক। তিনি ম্যাথামেটিক্যাল রিভিউস-এর পর্যালোচক। তিনি টরোণ্টোয় ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং অধ্যাপক ছিলেন এবং পাশ্চাত্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি 'ফাংকশনস অব এ কমপ্লেক্স ভ্যারিয়েবল', 'ম্যাট্রিক্স থিওরী' ও 'ফাংকশনাল অ্যানালিসিস'—এই তিনটি নিবন্ধ রচনা করেছেন। বর্তমানে অধ্যাপক পাতি 'মনোগ্রাফ অন অ্যাবসোলিউট সামেবিলিটি' সম্পর্কে কর্মরত আছেন।

অধ্যাপক আর. পি. রায়
সভাপতি—উদ্ভিদবিদ্যা শাখা

বিহারের দ্বারভাঙ্গা জেলার গঙ্গাপুর গ্রামে 1921 সালের জানুয়ারী মাসে অধ্যাপক রায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এস-সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি 1950 সালের অক্টোবর মাসে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্যার আর. এ. ফিসারের সঙ্গে জেনেটিক্স এবং ডক্টর ডি. জি. ক্যাটচেসাইডের সঙ্গে সাইটোজেনেটিক্সের বিষয় অনুশীলন করেন। 1953 সালের জানুয়ারী মাসে তিনি পি-এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। 1953 সালের মার্চ মাসে ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান হিসাবে যোগদান করেন।

এম. এস-সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার অল্প কিছুদিন বাদে 1945 সালের মে মাসে ডক্টর রায় সাবুরের বিহার কৃষি কলেজে উদ্ভিদবিদ্যার লেক্‌চারারের পদে যোগদান করেন। সাবুরে দু-বছর কাজ করবার পর তিনি পাটনা বিজ্ঞান কলেজে যোগদান করেন এবং এখান থেকেই সরকারী বৃত্তি নিয়ে 1950 সালে কেম্ব্রিজে যান।

তাঁরই প্রচেষ্টায় পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের প্ল্যাণ্ট সাইটোজেনেটিক্সে বর্তমানে কৃতী গবেষক সম্প্রদায় গঠিত হয়েছে। যদিও জেনোম অ্যানালিসিস এবং গমোৎপাদনে জেনেটিক্স সম্পর্কিত গবেষণা সুরু করেছিলেন, কিন্তু পাটনায় তিনি ব্যাপক আকারে সঙ্কর গমের উৎপাদন সম্পর্কিত গবেষণা করবার পক্ষে প্রয়োজনীয় সুবিধা পান নি। সেই জন্যে তিনি ফার্নের সাইটোজেনেটিক ও সঙ্করোৎপাদন সম্পর্কে গবেষণা সুরু করেন। পরে তিনি Dipterocarpaceae, Lecythidaceae, Myrtaceae প্রভৃতি পরিবারের অর্থকরী উদ্ভিদ সম্বন্ধে গবেষণা সুরু করেন। এর মধ্যে ভারতে কতকগুলি সাইটোজেনেটিক অনুসন্ধান-কার্যের তিনিই সূত্রপাত করেন।

অধ্যাপক রায়ের তত্ত্বাবধানে তাঁর গবেষণাগার থেকে 100টিরও বেশী মৌলিক গবেষণা-পত্র দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ডক্টর রায় ফ্রান্স, নেদারল্যাণ্ড, জার্মেনী ও সুইডেনের জেনেটিক্স সম্বন্ধীয় গবেষণা কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করেছেন।

তিনি গত ছয় বছর যাবৎ ভারতীয় উদ্ভিদ-তাত্ত্বিক সমিতির কর্মসচিব, সোসাইটি অব সাইটোলজিষ্ট অ্যাণ্ড জেনেটিসিষ্ট (ইণ্ডিয়া)-র প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য এবং এই সোসাইটির মুখপত্র 'দি জার্নাল অব সাইটোলোজি অ্যাণ্ড জেনেটিক্স'-এর প্রধান সম্পাদক। তিনি লণ্ডনের লিনিয়াস সোসাইটি, ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স, বোটানিক্যাল

সোসাইটি এবং ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল সায়েন্স অ্যাকাডেমির (এফ. এন. এ) ফেলো।

ডক্টর (কুমারী) এ. জর্জ
সভানেত্রী—পরিসংখ্যান শাখা

ডক্টর (কুমারী) আলিআম্মা জর্জ কেরল বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ইউ. এস. এ-র চ্যাপেল হিল-এর নর্থ ক্যারোলিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন।

1945 সালে তিনি কেরল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগে যোগদান করে এবং 1957 সাল থেকে এপর্যন্ত ঐ বিভাগের প্রধান ও অধ্যাপিকা হিসাবে নিয়োজিত আছেন।

তাঁর গবেষণার ক্ষেত্র হচ্ছে—মাল্টিভ্যারিয়েট অ্যানালিসিস অ্যাণ্ড পপুলেশন মডেল। এই বিষয়ে তাঁর অনেক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি অন্যের সঙ্গে যৌথভাবে 'Tables of the distribution of Inter-birth Intervals" শীর্ষক একটি পুস্তক প্রকাশ করেছেন।

প্রধানতঃ তাঁরই প্রচেষ্টায় 1963 সালে কেরল বিশ্ববিদ্যালয়ে ডেমোগ্রাফি সম্বন্ধে দু-বছরের একটি পোষ্ট-গ্রাজুয়েট কোর্স চালু হয়েছে। ডেমোগ্রাফি সম্বন্ধে এম. এস-সি ও পি-এইচ. ডি ডিগ্রী প্রদান ভারতবর্ষে প্রথম কেরল বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই সুরু হয়। তিনি বায়োমেট্রিক সোসাইটি, ইন্টারন্যাশানাল ইউনিয়ন ফর দি সায়েন্টিফিক ষ্টাডি অব পপুলেশন, দি ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাসোসিয়েসন, দি পপুলেশন অ্যাসোসিয়েসন অব ইণ্ডিয়া, দি ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব এগ্রিকালচারাল ষ্ট্যাটিস্টিক্স, ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট এবং ইণ্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যা।

তিনি তিন বছর কেরল বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের এবং প্রায় বারো বছর উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সদস্যা ছিলেন। তিনি দক্ষিণ ভারতের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষামূলক সংস্থার সদস্যা এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের পরিসংখ্যান পর্যালোচনা কমিটির সদস্যা হিসাবেও কাজ করেছেন। ভারত সরকার কর্তৃক গঠিত সেন্ট্রাল ফ্যামিলি প্লানিং ইনস্টিটিউটের ইভ্যালুয়েশন কমিটির তিনি সদস্যা।

অধ্যাপিকা জর্জ জার্মেনীর মুনষ্টার-এ ও মিউনিকে অনুষ্ঠিত যথাক্রমে ইন্টার ফোনেটিক সায়েন্স এবং জার্মান ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের সম্মেলন এবং যুগোশ্লাভিয়ার বেলগ্রেডে অনুষ্ঠিত বিশ্ব জনসংখ্যা সম্মেলন ও ইন্টারন্যাশানাল ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও তিনি লণ্ডনে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর দি সায়েন্টিফিক ষ্টাডি অব পপুলেশন-এর বার্ষিক সম্মেলন ও ইন্টারন্যাশানাল ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের অধিবেশনে যোগদান করেন। তিনি ইউ. কে, ইউরোপ, ইউ. এস. এ, ক্যানাডা, জাপান, ফরমোসা, থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে ডেমোগ্রাফি ও জনসংখ্যা অনুশীলন কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করেন।

অধ্যাপক কমল এন. শর্মা
সভাপতি—শারীরতত্ত্ব শাখা

অধ্যাপক শর্মা ব্যাঙ্গালোরের সেন্ট জন মেডিক্যাল কলেজের শারীরতত্ত্ব বিভাগের চেয়ারম্যান এবং বিহেভিয়ার ও নিউরোফিজিওলোজি শাখার প্রধান। তিনি ইউ. এস. এ-র ম্যাসাচুসেটস্থিত ইউ. এস. আর্মি ন্যাটিক লেবরেটরীর পায়োনিয়ারিং রিসার্চ ডিভিশনের ভিজিটিং কনসালট্যান্ট।

অধ্যাপক শর্মা উত্তর প্রদেশের মুসৌরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি লক্ষ্ণৌর কিং জর্জেস মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম. বি. বি. এস এবং এম. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন এবং 1955 সালে ঐ কলেজের শারীরতত্ত্ব বিভাগে যোগদান

করেন। 1956 সালে তিনি নতুন দিল্লীর অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্স-এ যোগদান করেন। 1964 সালে সেন্ট জন মেডিক্যাল কলেজে যোগদানের পূর্বে তিনি ইউ. এস. এ-র ইলিনয়েস বিশ্ববিদ্যালয় ও ইউনিভার্সিটি অব রচেষ্টার মেডিক্যাল স্কুল-এ গবেষণার কাজে ব্যাপৃত ছিলেন।

অধ্যাপক শর্মার 70টির ও বেশী মৌলিক গবেষণা নিবন্ধ দেশ-বিদেশের বিখ্যাত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। বিখ্যাত 'হ্যাণ্ডবুক অব ফিজিওলজির' লেখকদের মধ্যে তিনিও অন্যতম। সম্প্রতি তিনি ডক্টর শ্রীমতী এস. ছন্না-শর্মা ও ডক্টর জেকবের সঙ্গে যৌথভাবে "The Canine Brain in Stereotaxic Coordinates" মনোগ্রাফটি লিখেছেন। তিনি কয়েকটি বিখ্যাত শারীরতত্ত্ব বিষয়ক আন্তর্জাতিক পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য।

অধ্যাপক শর্মার গবেষণার ক্ষেত্র হচ্ছে—নিউরো ফিজিওলোজি ও বায়োকন্ট্রোল সিস্টেম। পেরিফেরাল নার্ভে দীর্ঘস্থায়ী ইলেকেট্রোড প্রোথিতকরণের পদ্ধতি তিনি আবিষ্কার করেন এবং আন্ত্রিক ব্যবস্থার বহিঃসঞ্চালক নিয়ন্ত্রণের বিষয় প্রতিপাদন করেন। বর্তমানে তিনি অপুষ্টি, দীর্ঘস্থায়ী ক্ষুধা, স্থূলতার বিভিন্ন পরিবর্তনশীল অবস্থায় খাদ্য গ্রহণে ইচ্ছা ও অনিচ্ছার স্নায়বিক নিয়ন্ত্রণ নির্ণয়ীকরণ প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন।

তিনি ফুলব্রাইট বৃত্তি, যুক্তরাষ্ট্রের পাব্লিক হেলথ পোষ্ট ডক্টরাল বৃত্তি, শকুন্তলা আমিরচাঁদ গবেষণা বৃত্তি (আই-সি-এম-আর) এবং বিভিন্ন গবেষণামূলক বৃত্তি লাভ করেন। তিনি ইউ. এস. এ, ইউ. কে, ইউরোপ এবং জাপানে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলন, সিম্পোসিয়াম ও সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।

অধ্যাপক আনওয়ার আন্সারী

সভাপতি—মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষামূলক বিজ্ঞান শাখা

1922 সালের 10ই জুলাই অধ্যাপক আন্সারী লক্ষ্ণৌতে জন্মগ্রহণ করেন। 1937 সালে আরবী ভাষায় ডিষ্টিংশনসহ লক্ষ্ণৌর সরকারী হুসেনাবাদ উচ্চ বিদ্যালয় থেকে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 1943 সালে তিনি আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মনস্তত্ত্বসহ দর্শনে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ঐ সালেই তিনি লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বর্গীয় অধ্যাপক এন. এন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে গবেষণা করেন। 1946 সালে তিনি উর্দু সাহিত্যে এম. এ ডিগ্রী লাভ করেন। 1948 সালে তিনি স্নাতকোত্তর ছাত্র হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্ব বিভাগে যোগদান করেন। 1949 সালের শেষভাগে তিনি যুক্তরাজ্যে যান। 1954 সালে তিনি পি. এইচ-ডি ডিগ্রী লাভ করেন। 1954 সালে ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে মনস্তত্ত্বের লেকচারার এবং 1959 সালে মনস্তত্ত্বের রীডার নিযুক্ত হন। 1961 সালে তিনি ক্যানাডা কাউন্সিল কর্তৃক সিনিয়র রিসার্চ ফেলো নির্বাচিত হন এবং 1961-'62 সালে ক্যানাডার ডালহৌসী বিশ্ববিদ্যালয়ে (হ্যালিফাক্স) গবেষণা করেন। 1964 সালে তিনি আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্ব বিভাগের প্রধান হিসাবে নিযুক্ত হন।

তিনি দেশ-বিদেশের বহু সংস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন। তিনি বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য। তিনি আই-এস-সি-এ-র মনস্তাত্ত্বিক ও শিক্ষামূলক শাখার বিভাগীয় কমিটির সদস্য, 1967 ও 1968 সালে ঐ বিভাগের রেকর্ডার ছিলেন। তিনি 1964 ও 1966 সালে যথাক্রমে ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অব সাইকোলজিষ্ট (ইউ. এস. এ) এবং অ্যাসোসিয়েশন বর হিউম্যানিষ্টিক সাইকোলজির

(ইউ. এস. এ) ফেলো ছিলেন। শিক্ষকতা ও গবেষণার তত্ত্বাবধান করা ছাড়াও তিনি মনস্তত্ত্ব বিষয়ক নিজস্ব কয়েকটি গবেষণা প্রকল্প পরিচালনা করেন। তিনি কয়েকটি মৌলিক গবেষণা-পত্রও প্রকাশ করেছেন। তাঁর বর্তমান গবেষণার প্রধান বিষয়বস্তু হচ্ছে—নন্দন বিজ্ঞানের সামাজিক মনস্তত্ত্ব, উচ্চাকাঙ্খার স্তর প্রভৃতি।

অধ্যাপক এস. এন. ঘোষ

সভাপতি—ইঞ্জিনিয়ারিং ও ধাতু-বিজ্ঞান শাখা

অধ্যাপক ঘোষ এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অব সায়েন্স-এর প্রাক্তন ডীন এবং ফলিত পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান। 1918 সালের 1লা ফেব্রুয়ারী তিনি জন্মগ্রহণ করেন। 1948 সালে তিনি কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. এস-সি. ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেডিও-ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স বিভাগে শিক্ষকতার কাজে যোগদান করেন। 1950 সালে অধ্যাপক ডাব্লিউ. গর্ডির তত্ত্বাবধানে মাইক্রোওয়েভ স্পেকট্রোস্কোপি সম্বন্ধে গবেষণার জন্যে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। তারপর অধ্যাপক আর. ভি. পাউণ্ডের তত্ত্বাবধানে গবেষণার জন্যে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। এরপর তিনি যুক্তরাষ্ট্রের কেম্ব্রিজ রিসার্চ লেবরেটরীতে রকেট ও কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে ঊর্ধ্ব বায়ুমণ্ডল ও মহাশূন্যের সমস্যা সম্বন্ধে গবেষণা চালান।

1956 সালে বিদেশ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত পদার্থবিদ্যা বিভাগে যোগদান করেন এবং তদবধি সেখানে আছেন। অধ্যাপক ঘোষ ঊর্ধ্ব বায়ুমণ্ডল ও মহাকাশ পদার্থবিদ্যা, মাইক্রোওয়েভ এবং আণবিক পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেছেন। ঐ সব বিষয়ে তিনি প্রায় 100টি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছেন।

তিনি ভিজিটিং প্রোফেসর, আন্তর্জাতিক সম্মেলনে নিমন্ত্রিত ও রিসার্চ স্কলার হিসাবে বিভিন্ন দেশ পরিদর্শন করেছেন। তিনি দেশ-বিদেশের বহু বৈজ্ঞানিক সংস্থার সদস্য ও ফেলো। অধ্যাপক ঘোষ ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সের সহ-সভাপতি। তিনি দেশ-বিদেশ থেকে অনেক পুরস্কার পেয়েছেন।

ডক্টর হরিনারায়ণ

সভাপতি—ভূতত্ত্ব ও ভূগোল শাখা

1922 সালে সেপ্টেম্বর মাসে হরিনারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে এম. এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং 1946 সালে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের লেক্‌চারার নিযুক্ত হন। সেখান থেকেই গবেষণা করে ডি. ফিল. ডিগ্রী লাভ করেন। 1950 সালে UNESCO ফেলোশিপ পেয়ে তিনি অষ্ট্রেলিয়ায় যান। 1952 সালে সিড্‌নী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা বিভাগে যোগদান করেন। ডক্টর হরিনারায়ণ ব্যাপকভাবে অষ্ট্রেলিয়ায় অভিকর্ষ ও চৌম্বক সমীক্ষা পরিচালনা করেন এবং পূর্ব ও মধ্য অষ্ট্রেলিয়ায় তাঁর এই অনুসন্ধানের ফলে ভূত্বকের গঠন-বিন্যাস প্রভৃতি বিষয়ে নতুন তথ্য জানা গেছে। 1954 সালে তিনি সিড্‌নী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। 1956 সালে দেশে প্রত্যাবর্তন করে ডক্টর নারায়ণ ও. এন. জি. সি-তে যোগদান করেন এবং রিসার্চ ও ট্রেনিং ইনষ্টিটিউটের প্রথম ডিরেক্টর হন (1962-64)। 1964 সালে তিনি হায়দরাবাদের ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক্যাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের ডিরেক্টর নিযুক্ত হন। তিনি vibration spectra of molecules and crystals, gravity and magnetic surveys,

susceptibility of rocks, palaeomagnetism, heat flow and seismology প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণা করেছেন। তাঁর পরিচালিত সমীক্ষার ফলেই মধ্যপ্রদেশ ও মহীশূরে নতুন খনিজের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া গেছে।

ডক্টর হরিনারায়ণ নানা সংস্থার সঙ্গে জড়িত। তিনি বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। 1972 সালে ক্যানাডার অটোয়ায় অনুষ্ঠিতব্য 24শ আন্তর্জাতিক ভূতাত্ত্বিক কংগ্রেসের 'ভূ-পদার্থতাত্ত্বিক' অনুসন্ধান' শীর্ষক অধিবেশনের কো-চেয়ারম্যান হিসাবে আমন্ত্রিত হয়েছেন।

ডক্টর টি. রামচন্দ্র রাও

সভাপতি—প্রাণী ও কীটতত্ত্ব শাখা

ডক্টর রাও 1907 সালে মহীশূরে জন্মগ্রহণ করেন। মহীশূর, ব্যাঙ্গালোর এবং কলিকাতায় তাঁর শিক্ষাজীবন অতিবাহিত হয়। তিনি 1945-46 সালে লণ্ডন স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন অ্যাণ্ড হাইজিন-এ রকফেলার ফাউণ্ডেশন ফেলো ছিলেন এবং অধ্যাপক পি. এ. বাক্সটনের তত্ত্বধানে গবেষণা করেন।

মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ফড়িং-এর ক্রোমোসোম নিয়ে গবেষণা করেন। পরে তিনি বিখ্যাত ম্যালেরিয়ারোগ-বিশেষজ্ঞ ডক্টর পল এফ. রাসেলের তত্ত্বাবধানে রকফেলার ফাউণ্ডেশনের ম্যালেরিয়া অনুসন্ধান কমিটির কাজে যোগ দেন এবং ম্যালেরিয়া মহামারীর কারণ সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা করেন। 1942 সালে তিনি বোম্বাই জনস্বাস্থ্য বিভাগের নবগঠিত ম্যালেরিয়া সংস্থায় কীটতত্ত্ববিদ্ হিসাবে যোগদান করেন। ক্রমে তিনি মহারাষ্ট্র সরকারের জনস্বাস্থ্য বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর হন। আধুনিক ম্যালেরিয়া নিবারক কর্মসূচীর উন্নতি সাধনে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ভারতে ম্যালেরিয়া উচ্ছেদের জাতীয় কর্মসূচীর মূল্যায়নের জন্যে 1970 সালে ভারত সরকারের উদ্যোগে গঠিত আন্তর্জাতিক দলের তিনি নেতা ছিলেন। Kyasanur Forest Disease-এর (ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত একটি নূতন ভাইরাস-রোগ) প্রাকৃতিক ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ উৎসাহ ছিল। 1970 সালের আগষ্ট মাস থেকে তিনি ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চের সদর দপ্তরে সংশ্লিষ্ট আছেন। এখানে তিনি মশার প্রজনন নিয়ন্ত্রণ ও ভাইরাস গবেষণার প্রসার সম্পর্কিত প্রকল্পগুলির উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করছেন। তিনি বিভিন্ন দেশও পরিদর্শন করেছেন।

ডক্টর শচীন রায়

সভাপতি—নৃতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব শাখা

ডক্টর শচীন রায় বাংলা দেশের রংপুর জেলায় 1920 সালের 10ই সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি নৃতত্ত্বে এম. এস-সি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন (1945)। তিনি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এজেন্সীর আদিবাসীদের সম্বন্ধে থিসিস দাখিল করে পি-এইচ. ডি ডিগ্রী লাভ করেন। 1945-'46 সালে ডক্টর রায় পশ্চিম বঙ্গ সরকারের রিসার্চ স্কলার হিসাবে কর্মজীবন সুরু করেন। তারপর তিনি গুজরাট রিসার্চ সোসাইটির রিসার্চ স্কলার ও 1946-'48 সালে ভারতের নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষার রিসার্চ কর্মী হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। 1948-'56 সাল পর্যন্ত তিনি নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষায় সহকারী নৃতত্ত্ববিদ হিসাবে কাজ করেন। 1956 সাল থেকে 1960 সাল পর্যন্ত তিনি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এজেন্সীর কাল-চারাল রিসার্চ অফিসার (ডেপুটেশনে) হিসাবে কাজ করেন। 1960 সালে তিনি সিডিউল্ড কাস্ট ও সিডিউল্ড ট্রাইব কমিশনের সিনিয়র রিসার্চ অফিসার নিযুক্ত হন।

1960 সালে ডক্টর রায় ন্যাশনাল মিউজিয়মের কীপার ও নৃতত্ত্ববিভাগের প্রধান হিসাবে নিযুক্ত হন। ডক্টর রায় উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এজেন্সী, আসাম, বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, কেরল, মধ্য প্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের উপজাতিদের সম্বন্ধে গবেষণা করেছেন।

ডক্টর রায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক। তিনি বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেছেন এবং নানা আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। Wenner-Gren ফাউণ্ডেশন ফেলো-সিপ পরিকল্পনায় তিনি বিভিন্ন দেশে বক্তা হিসাবে আমন্ত্রিত হন। তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন।

ডাঃ এন. ভি. ভাদুড়ী

সভাপতি—চিকিৎসা ও পশু-চিকিৎসা শাখা

ডাঃ ভাদুড়ী 1929 সালে এম. বি. পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। তিনি 1930 সালে কলিকাতার স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনে ডাঃ পি. এ. ম্যাপ্‌লিষ্টোনের অধীনে হুকওয়ার্ম গবেষণা বিভাগে সহকারী রিসার্চ ওয়ার্কার হিসাবে যোগদান করেন। তিনি মানুষের কৃমি ও কৃমি-নাশক পদার্থ সম্বন্ধে গবেষণা করেন। 1940 সালে তিনি এম. এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং 1943 সালে কিছুদিন ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ভেটারিনারী রিসার্চ-এ কাজ করেন। তিনি মানুষের ফাইলেরিয়াসিস সম্বন্ধে গবেষণায় উৎসাহী হন এবং ফাইলেরিয়াসিস গবেষণা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হন। মানুষ ও প্রাণিদেহের পরজীবী, schistosomiasis-এর সম্ভাব্য বিস্তার, ফাইলেরিয়াসিস-এর নিদানতত্ত্ব এবং এর কেমোথিরাপী, ফাইলেরিয়াসংক্রান্ত সংক্রমণে লিম্ফ্যাটিক-এর অনুশীলন ও বিভিন্ন কৃমিনাশক পদার্থ সম্পর্কে গবেষণায় তাঁর মূল্যবান দান আছে। স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন, অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব হাইজিন অ্যাণ্ড পাব্লিক হেল্‌থ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণিবিদ্যার স্নাতকোত্তর শাখার ছাত্রদের তিনি কৃমিতত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষাদান করতেন।

ডাঃ ভাদুড়ী ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ-এর ফাইলেরিয়াসিস গবেষণার উপদেষ্টা কমিটির সদস্য ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ফাইলেরিয়াসিস নিয়ন্ত্রণের জন্যে গঠিত সাউথ প্যাসিফিক কমিশনের উপদেষ্টা ছিলেন। তিনি 1961 সালে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ-এর উদ্যোগে গঠিত জাতীয় ফাইলেরিয়া নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর (ভারত) অ্যাসেসমেণ্ট কমিটির সদস্য ছিলেন।

ডক্টর এস. কে. মুখার্জী

সভাপতি—কৃষি-বিজ্ঞান শাখা

1914 সালে ডক্টর মুখার্জী জন্মগ্রহণ করেন। 1945 সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. এস-সি ডিগ্রী লাভ করেন। 1943-'46 সালে ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে তিনি সহকারী মৃত্তিকা-সমীক্ষা আধিকারিক হিসাবে কাজ করেন।

1947 সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রীডার নিযুক্ত হন। 1957-'60 সালে তিনি

ইন্দোনেশিয়ায় ইউনেস্কো কনসালট্যান্ট হিসাবে নিয়োজিত হন। তারপর তিনি কলিকাতার ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অব সায়েন্সের ম্যাক্রোমলিকিউল বিভাগে রসায়নের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। তারপর তিনি কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নের অধ্যাপক ও ফ্যাকাল্টি অব সায়েন্সের ডীন হিসাবে যোগদান করেন (1961)। 1965 সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষিবিষয়ক রসায়নের পি. সি. রায় অধ্যাপক নিযুক্ত হন। 1968 সালে তিনি কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হন।

তিনি কমিটি অন সায়েন্স অ্যাণ্ড টেক্‌নোলজি, বসু বিজ্ঞান মন্দিরের কাউন্সিল, ন্যাশনাল কমিশন অন এগ্রিকালচারের (ভারত সরকার) সদস্য, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অব সায়েন্সের সভাপতি।

তিনি মৃত্তিকা ও মৃত্তিকা-খনিজের ভৌত-রাসায়নিক ধর্মাবলী, আয়ন বিনিময়, ক্লে মেম্ব্রেন ইলেক্‌ট্রোড ও সয়েল অরগ্যানিক ম্যাটার প্রভৃতি বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা করেছেন। তিনি ও তাঁর সহযোগীরা প্রায় 60টি মৌলিক গবেষণা-পত্র প্রকাশ করেছেন।

"অমর জীববিন্দু প্রতি পুনর্জন্মে নূতন গৃহ বাঁধিয়া লয়। সেই আদিম জীবনের অংশ বংশপরম্পরা ধরিয়া বর্তমান সময় পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। আজ যে পুষ্প-কলিকাটি অকাতরে বৃন্তচ্যুত করিতেছি, ইহার অণুতে কোটি বৎসর পূর্বের জীবনোচ্ছ্বাস নিহিত রহিয়াছে। কেবল তাহাই নহে, প্রতি জীবের সম্মুখেও বংশপরম্পরাগত অনন্ত জীবন প্রসারিত। সুতরাং বর্তমানকালের জীব অনন্তের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান। তাহার পশ্চাতে যুগযুগান্তরব্যাপী ইতিহাস ও সম্মুখে অনন্ত ভবিষ্যৎ।"

আচার্য জগদীশচন্দ্র

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জানুয়ারী — 1972

রজত জয়ন্তী বর্ষ — প্রথম সংখ্যা



বিমান-নিঃসৃত প্রচণ্ড শব্দ মন্দীভূত করবার অভিনব ব্যবস্থা

ছবির ডান দিকে অবস্থিত চাকার উপর স্থাপিত যে নলাকার একটি যন্ত্র দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, ওটা শব্দের তীব্রতা হ্রাস করবার যন্ত্র। পশ্চিম জার্মেনীর এইচ. এফ. বি.—এর ইঞ্জিনিয়ারদের নির্মিত এই যন্ত্রটি বিমান-নিঃসৃত শব্দের তীব্রতা হ্রাস করবে। এটি জেট বিমানের ইঞ্জিনের সঙ্গে লাগালে ইঞ্জিন থেকে নিঃসৃত শব্দ সাধারণ গাড়ীর শব্দের চেয়ে বেশী হবে না।

অঙ্কের ম্যাজিক

একটা ম্যাজিক দেখিয়ে তুমি তোমার বন্ধু-বান্ধবদের সহজেই অবাক করে দিতে পার। বন্ধুদের মধ্যে একজনকে তুমি বলবে তোমাকে না দেখিয়ে একটা কাগজে 3 অঙ্কের যে কোন একটি সংখ্যা লিখতে এবং ঐ সংখ্যার ঠিক পিছনে আবার ঐ সংখ্যাটি বসাতে। এখন তাহলে 6 অঙ্কের একটি সংখ্যা (যেমন 358358) তৈরি হলো। এইবার তুমি তোমার বন্ধুকে সংখ্যাটিকে 13 দিয়ে ভাগ করতে বলবে এবং সকলকে জানিয়ে দেবে যে, ভাগশেষ যত থাকবে, তত পয়সা তুমি তোমার বন্ধুটিকে দান করবে। দেখো, তোমার ঐ বন্ধু বেচারী ঠিকই বলবে, ভাগশেষ কিছুই থাকছে না। তখন তুমি মন্তব্য করবে, 13 সংখ্যাটা 'অলুক্ষুণে' বলেই বোধহয় সে কিছু পেল না।

অতঃপর ভাগফল যা হয়েছে, তোমাকে না জানিয়ে দ্বিতীয় একজন বন্ধুকে তা জানিয়ে দিতে বলবে। দ্বিতীয় বন্ধুটিকে তুমি বলবে ঐ ভাগফলকে 11 দিয়ে ভাগ করতে এবং ঘোষণা করে দেবে যে, এবার যত ভাগশেষ থাকবে, তত টাকা তুমি তোমার এই বন্ধুটিকে দেবে। দেখবে, তোমার এই হতভাগ্য বন্ধুকেও বলতে হচ্ছে, ভাগশেষ একেবারে শূন্য হয়েছে। এক্ষেত্রে তোমার মন্তব্য হবে, 11 সংখ্যাটা 13-এর বড় কাছাকাছি বলেই বোধহয় তার ভাগ্যে কিছু জুটলো না।

এইবার ভাগফল যা হয়েছে, তোমাকে না জানিয়ে তৃতীয় একজন বন্ধুকে জানাতে বলবে। এই বন্ধুটিকে তুমি বলবে সংখ্যাটিকে 7 দিয়ে ভাগ করতে এবং ঘোষণা করবে যে, যত ভাগশেষ থাকবে, ততগুলি দশ টাকার নোট তুমি এ বন্ধুকে দেবে। সবাই অবাক হবে এই শুনে যে, তোমার তৃতীয় বন্ধুও বলছে, ভাগশেষ কিছুই নেই। তুমি তখন মন্তব্য করবে, তোমার দান করবার খুবই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু দান নেবার মত লোক পাওয়া গেল না।

অতঃপর তোমার তৃতীয় বন্ধুকে তুমি বলবে ভাগফলটি তোমায় জানিয়ে দিতে। সে যে সংখ্যাটি জানাবে, তারই পুনরাবৃত্তি করে তুমি তোমার প্রথম বন্ধুকে বলবে এই 3 অঙ্কের সংখ্যাটি সে তার কাগজে প্রথমে লিখেছিল। সে নিশ্চয়ই তা স্বীকার করবে। তখন তুমি কিছু না বলে কেবল ঐন্দ্রজালিকসুলভ একটুখানি মুচকি হাসি হাসবে।

জয়ন্ত বসু*

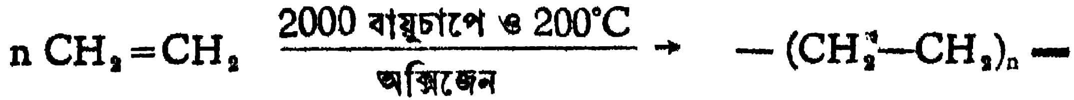
---

* সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা—9

পলিথিন

আজকাল পলিথিনের বালতি, গেলাস, মগ, প্যান, ডেকচি প্রভৃতি জিনিষ ধাতুনির্মিত জিনিষকেও টেক্কা দিচ্ছে। এর কারণ হলো—এগুলি হাল্কা, শক্ত, ক্ষয়-রোধক এবং দামেও সস্তা।

পলিথিন কথাটি এসেছে পলি (অর্থাৎ বহু) ও ঈথিলিন কথা দুটির যোগাযোগের ফলে ; অর্থাৎ বহু সংখ্যক ঈথিলিন অণু পরস্পর যুক্ত হয়ে যে বহুগুণক যৌগ প্রস্তুত করে, তাই পলিথিন। ঈথিলিন একটি গ্যাসীয় অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন, কিন্তু যখন উচ্চচাপ ও উচ্চতাপে অনুঘটকের উপস্থিতিতে হাজার হাজার ঈথিলিন অণু যুক্ত হয়ে উচ্চতর আণবিক ওজনের পলিথিন অণু গঠন করে, তখন আণবিক ওজন বৃদ্ধির ফলে সেটি শক্ত ও তাপসহ এক ধরণের প্লাষ্টিকজাতীয় পদার্থে পরিণত হয়। এই ধরণের পদার্থকে বহুযৌগ বলে এবং যে বিক্রিয়ায় এটি প্রস্তুত হয়, তাকে বহু-সংযোজন (পলিমেরিজেশন) বলে।



$$n\,CH_2{=}CH_2 \xrightarrow[\text{অক্সিজেন}]{\text{2000 বায়ুচাপে ও 200°C}} —(CH_2—CH_2)_n—$$

পলিথিন প্রস্তুতের সমীকরণ দেখতে সহজ। কিন্তু এটা তৈরি করা বেশ কঠিন। এক্স-রশ্মির পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, এই বহুযৌগের সব অণুগুলি সরাসরি সরল রেখায় যুক্ত থাকে না। প্রতি 50টি সংযোজনের পর একটি করে আড়াআড়ি সংযোজন হয়ে থাকে। বোধ হয় অক্সিজেনের উপস্থিতি এই আড়াআড়ি সংযোজনে সাহায্য করে।

বর্তমানে পলিথিন প্রস্তুতের দুটি শিল্প-পদ্ধতি রয়েছে—(1) উচ্চচাপ পদ্ধতি, (2) নিম্নচাপ পদ্ধতি।

উচ্চচাপ পদ্ধতি—এই পদ্ধতিতে বিশুদ্ধ গ্যাসীয় ঈথিলিনকে অল্প পরিমাণ অনুঘটকের (অক্সিজেন বা পারক্সাইড) উপস্থিতিতে 200°C-এ উত্তপ্ত একটি টিউবের মধ্য দিয়ে 1000 থেকে 2000 বায়ুচাপে চালনা করা হয়। প্রতিবার চালনা করবার ফলে প্রায় 15% থেকে 25% ঈথিলিন পলিথিনে পরিণত হয়। এই পলিথিনকে উপ-যুক্ত চাপে দ্রবীভূত করা হয় এবং অব্যবহৃত ঈথিলিন গ্যাসকে পুনরায় ব্যবহার করা হয়। এরপর উপযুক্ত তাপ ও চাপের প্রভাবে এই দ্রবণ থেকে পলিথিনের নানাবিধ জিনিষ প্রস্তুত করা হয়।

নিম্নচাপ পদ্ধতি—এই পদ্ধতিটি প্রথম জার্মেনীর কার্ল জাইগলার উদ্ভাবন করেন। এই পদ্ধতিতে সাধারণ বায়ুচাপে একটি ধাতব অ্যালকিল অনুঘটকের (যেমন

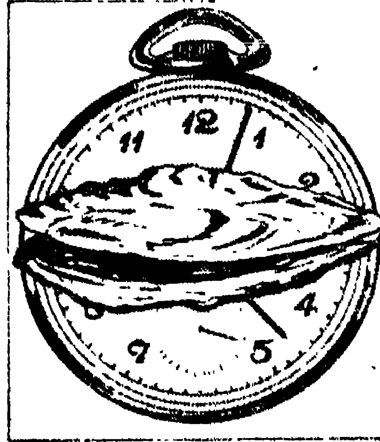
ট্রাইঈথিলিন অ্যালুমিনিয়াম) উপস্থিতিতে 60° থেকে 70°-তে ঈথিলিন গ্যাসকে উত্তপ্ত করে পলিথিন প্রস্তুত করা হয়। এই পদ্ধতিতে প্রস্তুত পলিথিনের উৎপাদন খরচ পড়ে পূর্বের পদ্ধতির অর্ধেক। এই পদ্ধতিতে অনুঘটকের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

পলিথিনের কতকগুলি বিশেষ গুণের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এছাড়া এর অদ্ভুত তড়িদ্ধর্ম এবং জলশোষণ ক্ষমতা না থাকবার জন্যে এটি সমুদ্রের নিম্নেকার টেলিগ্রাফের তার সংযোগের কাজে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া নিম্ন ঘনত্বের নমনীয় অথচ শক্ত রাসায়নিক পদার্থ নিরোধক বলে ফিল্ম প্রস্তুতিতে এবং রাসায়নিক পদার্থ রাখবার শিশি-বোতল তৈরি করবার জন্যে এটি ব্যবহৃত হয়। পলিথিনের এতগুলি গুণ থাকায় এটিকে শ্রেষ্ঠ প্লাষ্টিক বললেও অত্যুক্তি হয় না।

শ্রীসুকুমার শেঠ

জেনে রাখ

আটলান্টিক মহাসাগর থেকে একটি জীবন্ত ঝিনুক নিয়ে প্রায় 1500 কিলোমিটার দূরবর্তী দেশের অভ্যন্তরভাগে অবস্থিত এক গবেষণাগারে স্বাভাবিক পরিবেশে রাখা হয়েছিল। সেই সময় থেকেই দেখা যায়—

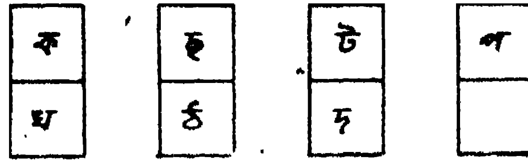


আটলান্টিকের স্রোতের ঠিক নির্দিষ্ট সময়ানুযায়ী খাদ্য সংগ্রহের জন্যে ঝিনুকটি মুখ খুলে রাখে। কিছুদিন পরে অবশ্য দেখা যায়, স্থানীয় স্রোতজলের জোয়ারের সময়ানুসারেই সে মুখ হাঁ করবার সময় পরিবর্তন করেছে। নিম্নস্তরের প্রাণীদের সময়-জ্ঞান সম্পর্কিত পরীক্ষালব্ধ জ্ঞান থেকে জীব-বিজ্ঞানীরা মনে করেন—ঝিনুকজাতীয় প্রাণীরা পৃথিবীর স্রোত-জলের জোয়ার-ভাটা উৎপত্তির চন্দ্রের অভিকর্ষজ টান অনুভব করতে পারে।

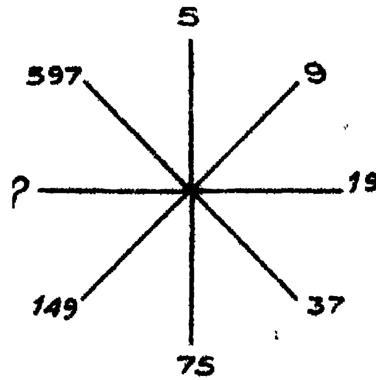
পারদর্শিতার পরীক্ষা

বুদ্ধির সমস্যা সমাধানে তোমাদের মধ্যে কে কেমন পারদর্শী, তা বোঝবার জন্যে নীচে 6টি প্রশ্ন দেওয়া হলো। উত্তর দেবার জন্যে মোট সময় 6 মিনিট। এই সময়ের মধ্যে যার সঠিক উত্তরের সংখ্যা 6, 5, 4, 3, 2, 1 বা 0 হবে, তার পারদর্শিতা যথাক্রমে খুব বেশী, বেশী, একটু বেশী, চলনসই, একটু কম, কম বা খুব কম ; অন্যভাবে বলতে গেলে সে হচ্ছে যথাক্রমে খুব চালাক, চালাক, একটু চালাক, না-চালাক না-বোকা, একটু বোকা, বোকা বা খুব বোকা।

1. ছবির ফাঁকা ঘরটিতে কোন্ অক্ষর বসবে ?

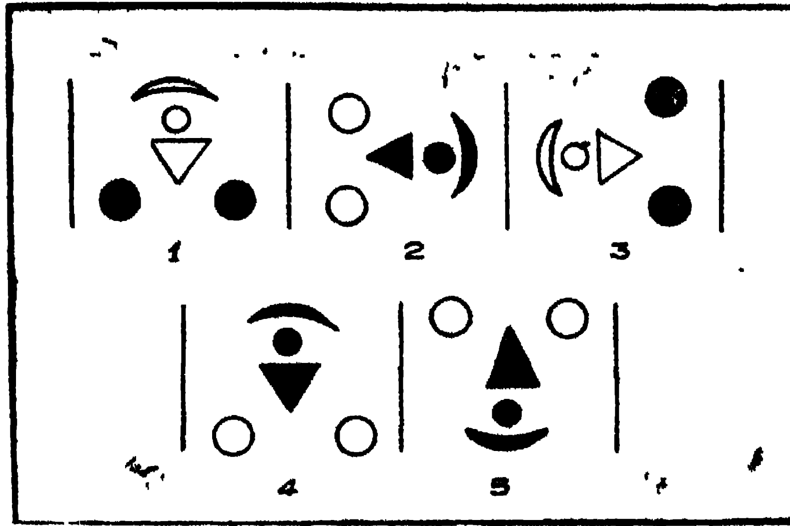


2. ছবির ?-চিহ্নিত স্থানে কোন্ সংখ্যা লেখা সঙ্গত হবে ?



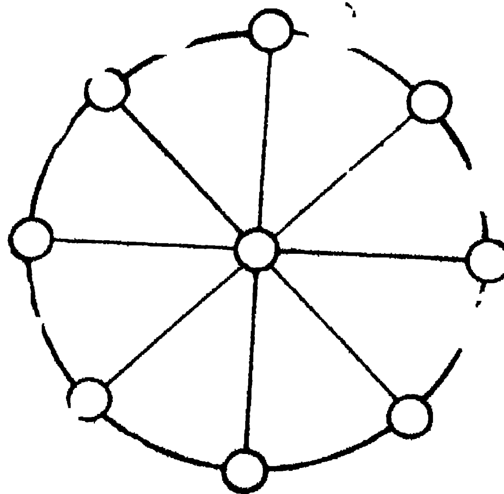
3. মোটামুটি হিসাবে জানা গেছে যে, মানুষের মাথায় গড়ে 1,50,000 চুল থাকে। যদি প্রতি মাসে 3,000 পুরনো চুল পড়ে গিয়ে নতুন চুল গজায়, তাহলে এক একটি চুল গড়ে কত সময় মানুষের মাথায় থাকে ?

4. 1 থেকে 5 নম্বর দেওয়া ছবিগুলির মধ্যে কোন্‌টির জুড়ি নেই ?



5. 1 থেকে 9 পর্যন্ত অঙ্কের এক একটিকে ছবির এক একটি গোল ঘরের মধ্যে এমনভাবে বসাও যাতে যে কোন ব্যাসের তিনটি ঘরের অঙ্কগুলির যোগফল 15 হয়।

(একাধিক সমাধান সম্ভব হলে যে কোন একটি দিতে পারলেই যথেষ্ট হবে।)



6. 8-কে 8 বার ব্যবহার করে কিভাবে 1,000 পাওয়া যেতে পারে ?

(উত্তর 59নং পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।)

প্রজ্ঞানন্দ দাশগুপ্ত ও জয়ন্ত বসু*

* সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা—9

সমাজ-কল্যাণে পারমাণবিক শক্তি

পারমাণবিক শক্তি শুধু ধ্বংসাত্মক কাজেই ব্যবহৃত হয় না—সমাজের কল্যাণ সাধনেও এর ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তিন হাজার টন উৎকৃষ্ট কোন জ্বালানী যে শক্তি উৎপাদন করে থাকে, এক কিলোগ্রাম পারমাণবিক ইন্ধন তাই করবে। গবেষণার দ্বারা আজ পর্যন্ত বহু রকম হিতকর কার্যে এর প্রয়োগ সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া পারমাণবিক শক্তি উদ্ভাবিত হবার পর সুদূর ভবিষ্যতে বিশ্বে কয়লা, তেলের অনটনের যে আশঙ্কা এতদিন ছিল, তা কমেছে। এবার রসায়নের এক নবশাখা—রেডিও-কেমিস্ট্রি গঠিত হয়েছে। এই রেডিও শব্দটির অর্থ তেজস্ক্রিয়তা—পারমাণবিক শক্তির সঙ্গে এটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে প্রতিনিয়ত অদৃশ্য তেজস্ক্রিয় রশ্মি বিকিরিত হয়।

অনেক পদার্থ স্বভাবতঃই তেজস্ক্রিয়। অপর নিস্তেজ পদার্থের উপর তেজস্ক্রিয় বিকিরণ প্রক্ষেপ করলে তাও কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থে পরিণত হয়ে থাকে। এগুলির নাম তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ। মূল পদার্থের নামের সঙ্গে সংখ্যা যোগ করে এদের নামকরণ করা হয়ে থাকে, যেমন—আয়োডিন—তেজস্ক্রিয় আয়োডিন-131 ; কোবাল্ট—কোবাল্ট-60 প্রভৃতি আইসোটোপ করা হয়েছে। এর জন্যে প্রয়োজন পারমাণবিক চুল্লীর। এর মধ্যে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটতে থাকে। ফলে তৈরি হয়—(1) ষ্টীম ও তড়িৎ শক্তি এবং (2) তেজস্ক্রিয় কৃত্রিম আইসোটোপ। এই চুল্লীর জ্বালানী ইউরেনিয়াম ও থোরিয়াম। এই কাজের একটি বড় সমস্যা হলো চুল্লীর ভস্ম দূরীকরণ। এর তেজস্ক্রিয়াও অত্যন্ত ক্ষতিকর। তবে এর দ্বারা জমির সার তৈরি, প্লাষ্টিক তৈরির কাজ হচ্ছে বলে সমস্যার সমাধান হয়েছে। জনকল্যাণে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার সম্ভব করেছে এই সকল তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ।

কল-কারখানা, যন্ত্রপাতি এবং যানবাহনে প্রচুর শক্তির প্রয়োজন। এজন্যে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্য প্রকার শক্তির অনুপাতে তা এখন 3% হলেও, কয়েক বছরে তা 15% হবে বলে বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন। পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে একটি জলযান সারা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করবে মাত্র একবার জ্বালানী নিয়ে। তেজস্ক্রিয় ইউরেনিয়ামের সাহায্যে মহাকাশযান চললে বিশ্বের জ্বালানীর সাশ্রয় হবে এবং যানে বেশী স্থান পাওয়া যাবে। বরফির মত আকারের এক খণ্ড পারমাণবিক জ্বালানীর সাহায্যে বৃহৎ অট্টালিকায় আলো-পাখা-পাম্প প্রভৃতি সব কাজ চলবে বহুকাল ধরে।

শিল্পপ্রতিষ্ঠানে যন্ত্রপাতির সঙ্গে পারমাণবিক শক্তির সরঞ্জামাদি রেখে উন্নত দ্রব্য তৈরি করা সম্ভব। নিখুঁৎ ঢালাইয়ের কাজে, সঠিক বেধযুক্ত ধাতুর পাত তৈরি করতে, সূক্ষ্মভাবে বস্তুর আপেক্ষিক গুরুত্ব পরিমাপে, সূক্ষ্ম যন্ত্রাদি গঠনে পারমাণবিক

শক্তির দরকার হয়ে থাকে। ঘর্ষণে যন্ত্রাদির কতটা ক্ষয় হয় এবং রং কতদিন চলতে পারে, তা নির্ণয়েও এর প্রয়োজন হয়।

আজকাল কৃষিক্ষেত্রে মাটির উর্বরতা, উপযুক্ত সার নির্ণয়ের ব্যাপার, কীটের কবল থেকে ক্ষেতে এবং গুদামে শস্যাদি সংরক্ষণে পারমাণবিক শক্তির খুবই প্রয়োজন। সমুদ্রজল লবণমুক্ত করা এবং সেই সঙ্গে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা প্রভৃতি কাজে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার হচ্ছে। এতে খরচও বেশী নয়।

চিকিৎসায় নতুন অস্ত্র তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ। থাইরয়েডঘটিত রোগ, গলগণ্ড, মাথার ভিতরের টিউমার পরীক্ষায়, ক্যান্সারের কেন্দ্র নির্ণয়ে আয়োডিন-131 ভাল কাজ করে। চক্ষুঃপীড়ায় ষ্ট্রন্সিয়াম-90, ক্যান্সারে কোবাল্ট-60 সুফল প্রদান করে। ফস্ফরাস আইসোটোপের সাহায্যে রক্তের লাল কণিকার হিসাব করা চলে। দেহের বহির্দিকের বিকৃতির প্রতিকারে ষ্ট্রন্সিয়াম আইসোটোপ কার্যকরী হয়ে থাকে। লিউকেমিয়া, বহুমূত্র, শোথ, হৃদ্‌রোগের গবেষণায় আইসোটোপসমূহ অনেক কাজে আসবে বলে মনে হয়।

পারমাণবিক শক্তি সংক্রান্ত আইন 1948 সালে আমাদের লোকসভায় গৃহীত হয়েছে। গঠিত হয়েছে পারমাণবিক শক্তি পরিষদ। 1955 সালে বোম্বাইয়ের ট্রম্বেতে পারমাণবিক চুল্লী স্থাপিত হয়েছে। এর জ্বালানীর জন্যে প্রয়োজনীয় উপাদান আমাদের দেশে যথেষ্ট আছে। ত্রিবাঙ্কুরে মোনাজাইট বালুকায় থোরিয়াম আছে। আমাদের দেশে পরমাণু-শক্তির অনুশীলন হয় শান্তির জন্যে, মারণাস্ত্র তৈরির জন্যে নয়।

প্রকৃতির রাজ্যে প্রাপ্ত এই নূতন পারমাণবিক শক্তিকে সুনিয়ন্ত্রিত করতে পারলে বিশ্বের অশেষ কল্যাণ সাধিত হবে—তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কৃবিকা কর

উত্তর

(পারদর্শিতার পরীক্ষা)

1. শ

[ব্যঞ্জনবর্ণের তালিকা অনুযায়ী ক ও ঘ-এর মধ্যে বাদ পড়েছে 2টি অক্ষর (খ, গ), ছ ও ঠ-এর মধ্যে 4টি অক্ষর এবং ট ও দ-এর মধ্যে 6টি অক্ষর; অর্থাৎ বাদ-পড়া অক্ষরগুলির সংখ্যা যথাক্রমে 2, 4 ও 6। সুতরাং প-এর পর 8টি অক্ষর বাদ দিয়ে শ বসাতে হবে।]

2. 299

[5 থেকে সুরু করে ডান দিক দিয়ে পর পর সংখ্যাগুলি লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, আগের সংখ্যাকে 2 দিয়ে গুণ করে তা থেকে যথাক্রমে 1 বিয়োগ বা যোগ করলে পরের সংখ্যাটি পাওয়া

যাচ্ছে; 5×2−1=9, 9×2+1=19, 19×2−1=37, 37×2+1=75, 75×2−1=149। সুতরাং ঈপ্সিত সংখ্যাটি হবে 149×2+1=299। আবার সংখ্যাটি যে 299, তার অন্য প্রমাণ হলো, পরবর্তী সংখ্যা হচ্ছে 597=299×2−1]

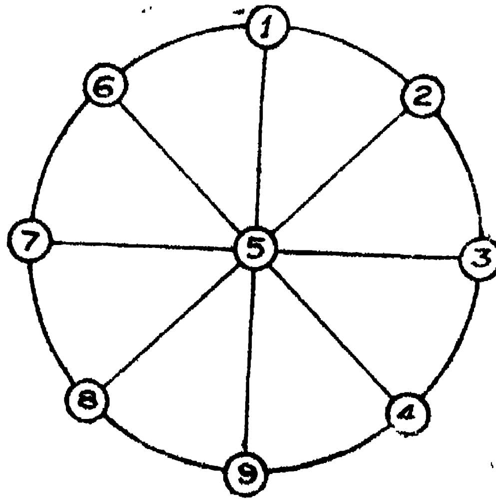
3. 4 বছর 2 মাস

[ধরা যাক, এখন একটি নতুন চুল গজালো। মাথার অন্য চুলগুলি অপেক্ষাকৃত পুরনো। সুতরাং পড়পড়তা হিসাব অনুযায়ী সেগুলি আগে পড়ে গেলে তারপর এটি পড়বে অর্থাৎ এখন থেকে যতগুলি চুল পড়বে, তাদের মধ্যে 1,50,000 তম হবে এটি। যেহেতু প্রতি মাসে 3,000 চুল পড়ে যায়, অতএব 1,50,000 চুল পড়তে সময় লাগবে 50 মাস বা 4 বছর 2 মাস। সুতরাং চুলটি ঐ সময় মাথায় থাকবে। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, এক একটি চুল গড়ে 4 বছর 2 মাস মানুষের মাথায় থাকে।]

4. 4 নম্বর ছবি।

[1 নম্বর হচ্ছে 5 নম্বরের এবং 2 নম্বর হচ্ছে 3 নম্বরের জুড়ি। যে কোন জুড়ির প্রথমটিকে 180° ঘোরালে এবং সাদা চিহ্নগুলিকে কালো ও কালো চিহ্নগুলিকে সাদা করলে দ্বিতীয়টি পাওয়া যায়।]

5.



একটি সমাধান

[5-কে কেন্দ্রের ঘরটিতে রেখে 1, 2, 3 ও 4-কে যথাক্রমে 9, 8, 7 ও 6-এর বিপরীত ঘরে বসাতে হবে। উদাহরণ হিসাবে একটি সমাধান উপরে দেওয়া হলো।]

6. 888+88+8+8+8

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন 1. : নাইট্রোগ্লিসারিন, টি. এন. টি. এবং অ্যামোনিয়াম পিকরেট কি ?

জীবন ঘোষ, জলপাইগুড়ি,

প্রশ্ন 2. : হিমোগ্লোবিন সাধারণতঃ কি উপাদানে তৈরি এবং হিমোগ্লোবিন প্রধানতঃ কি কাজে লাগে ?

শঙ্করলাল কুণ্ডু, খানাকুল,

উত্তর 1. : নাইট্রোগ্লিসারিন, টি. এন. টি. এবং অ্যামোনিয়াম পিকরেট—এই তিনটিই হচ্ছে বিস্ফোরক পদার্থ।

নাইট্রিক ও সালফিউরিক অ্যাসিডের মিশ্রণের সঙ্গে গ্লিসারিনের বিক্রিয়ায় নাইট্রোগ্লিসারিন তৈরি হয়। নাইট্রোগ্লিসারিন খুব সহজেই বিস্ফোরিত হয়। এমন কি, তৈরি হবার সময় যে তাপের সৃষ্টি হয়, তাই বিস্ফোরিত হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। তাই উপযুক্ত সতর্কতার সঙ্গে এটি প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। অতি সহজে বিস্ফোরিত হয় বলে একে অ্যাসিটোনের সঙ্গে মিশিয়ে রাখা হয়—যা সহজে বিস্ফোরিত হয় না। বিশুদ্ধ নাইট্রোগ্লিসারিন পেতে হলে এই মিশ্রণে গরম বাতাস প্রয়োগ করা হয়, ফলে অ্যাসিটোন বাষ্পীভূত হয়ে যায় এবং বিশুদ্ধ নাইট্রোগ্লিসারিন পড়ে থাকে। প্রধানতঃ অন্যান্য বিস্ফোরকের সঙ্গে মিশিয়ে নাইট্রোগ্লিসারিন ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

সাধারণতঃ টারজাতীয় পদার্থের সঙ্গে নাইট্রিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় টি. এন. টি. বা ট্রাইনাইট্রোটলুইন প্রস্তুত করা হয়। এর বিস্ফোরক ক্ষমতা খুবই বেশী। যুদ্ধে এই বিস্ফোরক অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

গরম জলে পিকরিক অ্যাসিডের দ্রবণের সঙ্গে অ্যামোনিয়ার বিক্রিয়ায় অ্যামোনিয়াম পিকরেট তৈরি হয়। অন্যান্য বিস্ফোরকের মত অ্যামোনিয়াম স্পর্শকাতর নয়। এই জন্যে গোলা-গুলি তৈরির কাজে এই বিস্ফোরক ব্যবহার করা হয়।

উত্তর 2. : লোহা, গ্লোবিন এবং প্রোটোপরফাইরিন—এই তিনটি পদার্থই হচ্ছে হিমোগ্লোবিনের উপাদান; অর্থাৎ হিমোগ্লোবিন হচ্ছে একটি মিশ্র প্রোটিন। হিমোগ্লোবিনের—হিম এবং গ্লোবিন—এই দুই অংশ আছে। হিম অংশের পরিমাণ খুবই কম। হিম হচ্ছে একটা ধাতব যৌগ—এর জন্যেই রক্তকে লাল দেখায়। আর রংবিহীন গ্লোবিনে আছে দুটি পলিপেপটাইড শৃঙ্খল—যাদের মধ্যে আছে বহু ধরণের অ্যামিনো-অ্যাসিড।

ইদানীং বিভিন্ন প্রকার হিমোগ্লোবিনের সন্ধান পাওয়া গেছে—এমন কি, একই দেহে বিভিন্ন প্রকার হিমোগ্লোবিনেরও অস্তিত্ব ধরা পড়েছে।

হিমোগ্লোবিন বাতাসের অক্সিজেনকে দেহের সমস্ত কোষে এবং তন্তুতে প্রয়োজনমত সরবরাহ করে এবং দেহের অপ্রয়োজনীয় কার্বন ডাই-অক্সাইড সংগ্রহ করে ফুস্ফুসের সাহায্যে দেহ থেকে বের করতে সাহায্য করে; অর্থাৎ হিমোগ্লোবিন শ্বাসকার্য পরিচালনা করে।

শ্যামসুন্দর দে*

---

* ইনস্টিটিউট অব রেডিও-ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স; বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-9

শোক-সংবাদ

পরলোকে ডক্টর বশী সেন

বিশিষ্ট উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী ডক্টর বশী (বশীশ্বর) সেন গত 31শে অগাষ্ট '71 পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় 85 বছর এবং তিনি তাঁর পত্নী শ্রীমতী গারট্রুড এমারসেনকে রেখে গেছেন। সেন দম্পতি নিঃসন্তান।

বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর শহরে 1887 সালে বশী সেনের জন্ম। 1911 সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এস-সি. পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন এবং এম. এস-সি পড়তে পড়তে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর সংস্পর্শে এসে বসু-বিজ্ঞান মন্দিরে যোগদান করেন এবং তাঁরই প্রেরণায় উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে গবেষণা সুরু করেন। আচার্য জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে তিনি প্রায় 12 বছর সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপান পরিভ্রমণ করেন।

1924 সালে বন্ধুদের এবং লণ্ডনের রয়েল সোসাইটির কাছ থেকে অর্থ সাহায্য নিয়ে তিনি বাগবাজারের বোসপাড়া লেনে ভাড়াটিয়া বাড়িতে বিবেকানন্দ গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করেন এবং জীব ও উদ্ভিদ কোষের অন্তর্বর্তী অংশগুলির (Protoplasmic colloids) ভৌত প্রকৃতি সম্পর্কে গবেষণা সুরু করেন। তাঁর গবেষণালব্ধ ফলাফল ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গবেষণার কার্যক্ষেত্র সম্প্রসারিত হওয়ায় ডক্টর সেন 1936 সালে তাঁর বিবেকানন্দ গবেষণাগার উত্তরপ্রদেশের আলমোড়ায় স্থানান্তরিত করেন। গবেষণাগারের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনের জন্যে 1959 সালে এটিকে উত্তরপ্রদেশ সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ডক্টর বশী সেন আমৃত্যু ঐ গবেষণাগারের অবৈতনিক অধ্যক্ষরূপে কাজ করে গেছেন। এই গবেষণাগার এখন ভারতের কৃষি গবেষণাগারগুলির মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে।

1948 সালে এই গবেষণাগার থেকেই আমাদের দেশে সর্বপ্রথম সঙ্কর ভুট্টার জন্ম হয়। আমাদের দুটি প্রধান খাদ্য—ধান ও গম উৎপাদনের উন্নতিতে এই গবেষণাগারের বিশেষ অবদান আছে। V. L-8 ধান এবং V. L-404 গমের প্রচুর ফলন এখানেই উদ্ভাবিত হয়। এখানে যে সঙ্কর

পিঁয়াজ উদ্ভাবিত হয়েছে, তার এক-একটির ওজন দেড় কিলোগ্রাম পর্যন্ত হতে দেখা গেছে। উদ্ভিদ ও কৃষি-বিজ্ঞানে বিশিষ্ট অবদানের জন্যে 1957 সালে ডক্টর বশী সেনকে 'পদ্মভূষণ' সম্মাননায় ভূষিত করা হয়। 1962 সালে তিনি ওয়াটুমল



ডক্টর বশী সেন

(Watumull) পুরস্কার লাভ করেন। 1971 সালের মার্চ মাসে উত্তর প্রদেশের পন্থনগর কৃষি-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি সম্মানসূচক ডি. এস-সি ডিগ্রী লাভ করেন।

অধুনা মেক্সিকোর বিভিন্ন বামনজাতীয় গম প্রচুর ফলনের জন্যে ভারতে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। কিন্তু 1965 সালেরও আগে আমাদের দেশে বামনজাতীয় গমের উদ্ভব হয়েছিল বিবেকানন্দ গবেষণাগারে। উন্নত জাতীয় বজরা, জোয়ার, যব, ওট, মিষ্টি আলু ও বহু শাক-সব্জী সৃষ্টির জন্যে এই গবেষণাগার প্রসিদ্ধ। ডক্টর বশী সেন এই দেশে প্রয়োজনীয় পশুখাদ্যেরও প্রবর্তন করেন। Giant Star grass, Love Grass এবং Kudzu-র প্রয়োজনীয়তা তিনি পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করেন। এই গবেষণাগারে লম্বা আঁশযুক্ত কার্পাস, রেমি তন্তু এবং নানারকম বিদেশী ফলের প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শিত হয়েছে। এই গবেষণাগারের আর একটি কৃষিবিষয়ক বিশিষ্ট অবদান হচ্ছে মূল্যবান আহারযোগ্য ছত্রাকের (Edible mushroom) চাষ করবার সহজ প্রণালী।

ডক্টর সেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের কৃষিবিষয়ক উপদেষ্টা ছিলেন। তিনি ইংল্যাণ্ডের Physiological Society of Great Britain এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Botanical Society of America-র সদস্য ছিলেন এবং বহু আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে যোগদান করেন। দেশ-বিদেশের বহু বিশিষ্ট বিজ্ঞান পত্রিকায় তাঁর দেড়-শ'রও বেশী গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

মানুষ হিসাবে ডক্টর বশী সেন ছিলেন নিরহঙ্কার, পরোপকারী ও সহৃদয়। শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর তিনি অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন।

পরলোকে ডক্টর বিক্রম এ. সরাভাই

পারমাণবিক শক্তি কমিশন ও ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার চেয়ারম্যান বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডক্টর বিক্রম এ. সরাভাই 30শে ডিসেম্বর ভোরে ত্রিবান্দ্রমের সরকারী পর্যটন হোটেল কোভালাম প্যালেসে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র 52 বছর।

ডক্টর বিক্রম আম্বালাল সরাভাই 1919 সালের 12ই অগাষ্ট জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আমেদাবাদের গুজরাট কলেজে শিক্ষা গ্রহণের পর কেম্ব্রিজের সেন্ট জন্স কলেজে শিক্ষালাভ করেন। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছিল। এরপর তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করে ব্যাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সে পরলোকগত বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার সি. ভি. রামনের তত্ত্বাবধানে

মহাজাগতিক রশ্মির বিকিরণ সম্বন্ধে গবেষণা করেন (1940-'45)।

1946 সালে ডক্টর সরাভাই ইংল্যাণ্ডে যান এবং কেম্ব্রিজে ক্যাভেণ্ডিস লেবরেটরীতে নিউক্লিয়ার ফিজিক্স সম্পর্কে গবেষণা করেন। এখান থেকেই তিনি পি-এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন।

1948 সালে আমেদাবাদে ফিজিক্যাল রিসার্চ লেবরেটরী স্থাপনাবধি ডক্টর সরাভাই এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। 1958 ও 1961 সালে তিনি ম্যাসাচুসেট্‌স্‌ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির নিউক্লিয়ার সায়েন্স লেবরেটরীর ভিজিটর ছিলেন। 1953 সালে ফ্রান্সে, 1955 সালে মেক্সিকোয়, 1956 সালে ষ্টকহোমে, 1957 সালে ইটালীতে, 1959 সালে মস্কোয়, 1960 সালে কিয়োটাতে এবং 1961 সালে জাপানে অনুষ্ঠিত বিশেষজ্ঞ বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে তিনি ব্যক্তিগতভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং তথ্যাদি উপস্থাপিত করেন।

আমেদাবাদ বয়নশিল্পের গবেষণা সংস্থা স্থাপনায় ডক্টর সরাভাই সক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং 1947 সাল থেকে 1955 সাল পর্যন্ত এই সংস্থার আংশিক সময়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি ভারতের রাসায়নিক শিল্পের উন্নতি সাধনে বিশেষভাবে সক্রিয় ছিলেন এবং 1956 সালে জাপানে উৎপাদক সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধি-দলের নেতৃত্ব করেন। তিনি 1965 সাল পর্যন্ত ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্টের অবৈতনিক অধ্যক্ষ ছিলেন।

ডক্টর সরাভাই বিশুদ্ধ ও ফলিত পদার্থবিভার আন্তর্জাতিক ইউনিয়নের মহাজাগতিক রশ্মি কমিশনের সদস্য ছিলেন। তিনি ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স, লণ্ডন ফিজিক্যাল সোসাইটি ও কেম্ব্রিজ ফিলোসফিক্যাল সোসাইটির ফেলো এবং আমেরিকান ফিজিক্যাল সোসাইটির সদস্য ছিলেন। এছাড়াও তিনি দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক কমিটি ও সংস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

1962 সালের গোড়ার দিকে ভারতবর্ষে মহাকাশসম্বন্ধীয় গবেষণার দায়িত্বভার তিনি গ্রহণ করেন এবং পারমাণবিক শক্তি বিভাগের উদ্যোগে মহাকাশ গবেষণার জন্যে গঠিত ভারতীয় জাতীয় কমিটির প্রথম চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। ভারতের মহাকাশ গবেষণায় ডক্টর সরাভাইয়ের অবদান চিরস্মরণীয়। থুম্বা বিষুবরৈখিক রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্র ও আমেদাবাদে পরীক্ষামূলক কৃত্রিম উপগ্রহ সংযোগ কেন্দ্র স্থাপনায় তাঁর উদ্যোগ স্মরণীয়।

1966 সালে ডক্টর সরাভাই পারমাণবিক শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যানপদে আসীন হন। পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের জন্যে ভারতের পরিকল্পনাকে ডক্টর সরাভাই নতুন উৎসাহের সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যান এবং ভারতের পারমাণবিক নীতিকে কার্যকরী করতে সাহায্য করেন।

প্রধান সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেস 37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

রজত জয়ন্তী বর্ষ | ফেব্রুয়ারী, 1972 | দ্বিতীয় সংখ্যা

স্বাস্থ্য ও তেজস্ক্রিয় বিকিরণ

শ্রীপ্রদীপকুমার দত্ত*

বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আজকাল তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ বা সমস্থানিকের ব্যবহার সারা পৃথিবী জুড়ে ক্রমবর্ধমান। তাছাড়া মহাকাশে পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ আমাদের বায়ুমণ্ডলকে দূষিত করেছে। বায়ুমণ্ডলে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের পরিমাণ বেড়ে গেছে এই সব বোমার বিস্ফোরণে। মানুষের স্বাস্থ্যের উপর এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে বাধ্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যে পারমাণবিক বোমা জাপানের উপর ফেলা হয়েছিল, মানুষের উপর তার বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জের আজও চলেছে। বোমার বিস্ফোরণের ফলে নির্গত তেজস্ক্রিয় বিকিরণ শুধু তখনকার বোমাকবলিত লোকদেরই ক্ষতি করে নি, তাদের বংশধরদেরও ক্ষতি করেছে। তাই তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ও স্বাস্থ্যের উপর তার প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে পৃথিবীর নানা দেশে বৈজ্ঞানিকেরা গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। কোন্ কোন্ ধরণের বিকিরণ মানুষের কোনও ক্ষতি করে না, আর কাদের ক্ষতি করবার ক্ষমতা বেশী, কি ধরণের ক্ষতি তারা করে, তার প্রতিষেধকই বা কি প্রভৃতি তাঁদের গবেষণার বিষয়। বর্তমান প্রবন্ধে এই সম্বন্ধে কিছু আভাস দেবার চেষ্টা করবো।

তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ থেকে যে বিকিরণ হয়, তা দেহের পেশী, অস্থিমজ্জা ও রক্তকোষকে আয়নিত করে। এই দেহাংশগুলি বেশী পরিমাণে আয়নিত হলেই দেহের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে ওঠে—এমন কি, মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। আয়নিত হবার ফলে দেহকোষের গঠন পরিবর্তিত হতে পারে এবং সুস্থ দেহকোষগুলির বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যাবার আশঙ্কা থাকে। তেজস্ক্রিয় বিকিরণের ফলে অনেক জটিল অসুখ দেখা দিতে

* পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগ, আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কলেজ, কোচবিহার

পারে, যার প্রকাশ খুব ধীরে ধীরে আমাদের অগোচরেই ঘটতে থাকে।

তেজস্ক্রিয় বিকিরণ বলতে আমরা প্রধানতঃ তিনটি জিনিষ বুঝি—আলফা কণা, বিটা কণা ও গামা রশ্মি। তেজস্ক্রিয় পদার্থের বিয়োজনে (Disintegration) এই তিন রকম কণা পাওয়া যায়; অর্থাৎ তেজস্ক্রিয় পদার্থ বিয়োজিত হবার সময় তাথেকে এই তিন রকম কণার সব কয়টি বা কোন কোনটি বেরিয়ে আসে। তাকেই আমরা বলি তেজস্ক্রিয় বিকিরণ। এদের মধ্যে আলফা কণাকে সহজেই কাচ কিংবা রবারের আবরণের সাহায্যে আটকে দেওয়া যায়। ফলে সামান্ত সাবধানতা অবলম্বন করেই তাদের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। বিটা কণা হলো উচ্চশক্তিসম্পন্ন ইলেকট্রন-স্রোত। এরা 2 মিলিমিটার পুরু কাচের প্লেট ভেদ করে চলে যেতে সক্ষম। তাই চামড়ার উপর এদের প্রভাব কয়েক মিলিমিটারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। বিটা কণার প্রভাবে চামড়া বড় জোর পুড়ে যেতে পারে। এর চেয়ে বেশী ক্ষতি করবার ক্ষমতা বিটা কণার নেই। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, আলফা ও বিটা কণার ভেদ-শক্তি খুব কম হবার ফলে মানুষের ক্ষতি করবার ক্ষমতা এদের খুব বেশী নেই। কিন্তু সমস্যা গামা রশ্মিকে নিয়ে—এদের ভেদশক্তি খুবই বেশী। ফলে এরাই মানুষের দেহের সব-চেয়ে বেশী ক্ষতি করতে পারে। ভেদশক্তি বেশী হওয়ায় চামড়া ছাড়িয়েও এদের ক্ষতিকর প্রভাব দেহের অভ্যন্তরে হবার সম্ভাবনা রয়েছে। সীসা ও কংক্রীটের দেয়ালের সাহায্যে গামা রশ্মিকে বাধা দিয়ে এদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে। উল্লিখিত তিন রকম কণা ছাড়া নিউট্রন, মহাজাগতিক রশ্মি এবং রঞ্জেন রশ্মিও মানুষের শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর।

তেজস্ক্রিয় বিকিরণের ফলে ক্ষতির পরিমাণ মূলতঃ তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে—(1) শোষিত শক্তির পরিমাণ, (2) শক্তি শোষণের হার এবং (3) শোষণের প্রক্রিয়া, অর্থাৎ দেহের কোথায় কেমনভাবে বিকিরণ এসে পড়ছে। তেজস্ক্রিয় বিকিরণের শক্তির পরিমাপের জন্যে বিভিন্ন একক আছে। এদের মধ্যে কুরী রঞ্জেন, রঞ্জেন ইকুইভ্যালেন্ট ফিজিক্যাল (Roentgen equivalent physical) বা সংক্ষেপে rep এবং রঞ্জেন ইকুইভ্যালেন্ট ম্যান বা rem প্রধানতঃ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। প্রতি সেকেণ্ডে কোনও তেজস্ক্রিয় পদার্থের $3{\cdot}7 \times 10^{10}$ সংখ্যক বিয়োজনের ফলে যে পরিমাণ তেজস্ক্রিয় বিকিরণ হয়, তা হলো এক কুরী। রঞ্জেন হলো এমন পরিমাণ বিকিরণ, যা স্বাভাবিক চাপ ও তাপে 1 ঘনসেন্টিমিটার বা 0·001293 গ্রাম বাতাসকে এমনভাবে আয়নিত করে, যাতে আয়নিত বায়ুতে মোট আয়নের পরিমাণ হয় 1 e.s.u.। রঞ্জেন কেবলমাত্র রঞ্জেন রশ্মি এবং গামা রশ্মির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। সব রকম বিকিরণের ক্ষেত্রে যে এককটি ব্যবহার করা হয়, তা হলো rep (রেপ)। যে পরিমাণ বিকিরণের ফলে নরম তন্তুর প্রতি গ্রাম 93 আর্গ শক্তি শোষণ করে, তা হলো 1 রেপ। rem (রেম) হলো বিকিরণের জৈব (Biological) একক। এক রঞ্জেন গামা রশ্মির কোনও জৈব বস্তুর উপর ক্রিয়াকে rem দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

তেজস্ক্রিয় বিকিরণ যে সব ক্ষতি করতে পারে, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—(1) লিউকে-মিয়া, হাইপোপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া (Hypoplastic anaemia) প্রভৃতি অসুখ, বা দেহের রক্তের ক্ষতিকারক এবং আয়ু হ্রাসকারী, (2) রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা হ্রাস, (3) অবাঞ্ছিত সোমাটিক এবং জেনেটিক প্রতিক্রিয়া (Somatic & Genetic effect), (4) ম্যালিগন্যান্ট টিউমার (Malignant tumour), যা মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়,

(5) চর্মের ক্যান্সার, (6) ক্রমবিকাশমান ভ্রূণের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি। এই সব অঘটন সঙ্গে সঙ্গে নাও ঘটতে পারে। অনেক পরে—এমন কি, দশ বছর পরেও বিকিরণের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ফলের প্রকাশ দেখা দিতে পারে।

নিরাপদে যে পরিমাণ তেজস্ক্রিয় বিকিরণ দেহে গ্রহণ করা যেতে পারে, তার একটা সীমা আছে। যে পরিমাণ বিকিরণের ফলে দেহের ক্ষতি হতে পারে, তার এক-দশমাংশ পর্যন্ত বিকিরণ শরীরের পক্ষে নিরাপদ। তেজস্ক্রিয় নিরাপত্তার আন্তর্জাতিক কমিশন (International Commission on Radioloigcal Protection) নিরাপদে গ্রহণযোগ্য তেজস্ক্রিয় বিকিরণের পরিমাণ নির্দেশ করেছেন। 18 বছরের বেশী বয়স্ক মানুষের গোনাড (Gonads) বা দেহের রক্ত উৎপাদনকারী ইন্দ্রিয়সমূহ এবং চোখের লেন্স বাঁচাবার জন্যে গ্রহণযোগ্য বিকিরণের যে সর্বোচ্চ সীমা তাঁরা নির্দেশ করেছেন, তা $D=5(N-18)$ সমীকরণের দ্বারা প্রকাশ করা যায়। এখানে D হলো rem-এ বিকিরণের সর্বোচ্চ সীমা এবং N হলো বয়স (বছরে)।

18 বছর বয়সের পর যাদের সব সময় তেজস্ক্রিয় বিকিরণের মধ্যে কাজ করতে হয়, তাদের ক্ষেত্রে সপ্তাহে গ্রহণযোগ্য বিকিরণের নিরাপদ সীমা হলো 100m rems। অবশ্য প্রথম সপ্তাহে 300m rems পর্যন্ত নিরাপদ। তাছাড়া পর পর 13 সপ্তাহের মধ্যে সে আরও 3 rems বিকিরণ অতিরিক্ত গ্রহণ করলেও তা ক্ষতিকর হবে না। 13 সপ্তাহের শেষে এই পরিমাণ বিকিরণ সে একবারেই নিতে পারে। তবে একবারে সমস্তটা না নেওয়াই ভাল। 18 বছরের কম বয়স্কদের জন্যে বছরে 5 rem এবং 30 বছর বয়স্কদের জন্যে বছরে 60 rem পর্যন্ত বিকিরণের নিরাপদ সীমা।

চোখ ও রক্ত উৎপাদনকারী ইন্দ্রিয় ছাড়া দেহের অপরাপর অংশের জন্যে বিকিরণের পরিমান $D=5(N-18)$ অপেক্ষা সামান্য বেশী হলেও তা নিরাপত্তার সীমা অতিক্রম করে না। উল্লিখিত ইন্দ্রিয়দ্বয় ছাড়া দেহের অন্যান্য অংশের জন্যে যে অতিরিক্ত পরিমাণ বিকিরণ নিরাপদে গ্রহণযোগ্য, তা হলো হাত ও পায়ের জন্যে সপ্তাহে গড়ে 1·5 rem এবং এছাড়া অন্যান্য অংশের জন্যে সপ্তাহে গড়ে 0·6 rem। বিভিন্ন পরিমাণ বিকিরণের ফল নীচের তালিকায় দেওয়া হলো।

বিকিরণের মাত্রা (রঞ্জেনে)	সম্ভাব্য ফল
0·3	
2·5	বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না।
25-50	রক্তে কিছু পরিবর্তন আসতে পারে, তবে তা মারাত্মক কিছু নয়।
50-100	ক্ষতিকারক। রক্তকোষের পরিবর্তন হয়। তবে মানুষকে অক্ষম করে না।
100-200	ক্ষতিকর। মানুষকে অক্ষম করে দিতে পারে। শতকরা 10 জনের মৃত্যু পর্যন্ত হবার সম্ভাবন থাকে।
400	শতকরা 50 জনের মৃত্যু।
600	„ 75 „ „
800	„ 90 „ „
1000	„ 95 „ „

প্রতিকার—শরীরে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের অবাঞ্ছিত ফল দূর করা খুব সহজ নয় বরং প্রায় অসম্ভব বলা যেতে পারে। কারণ বিকিরণের ফলে দেহের যে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে, তাকে আর পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে আসা সম্ভব নয়। তবুও ভিটামিন বি-6 বা পাইরাইডক্সিন হাইড্রোক্লোরাইড প্রয়োগ করে নৌ-পীড়া, গা-বমি ভাব, লিউকেমিয়া, ডারমাটাইটিস প্রভৃতি রোগ উপশম করা হয়। ভিটামিন বি-12 বা সাইনোকোবালেমিনও তেজস্ক্রিয় ক্ষতির কিছু প্রতিকার করতে পারে।

ট্র্যান্সফিউসন থিরাপি (Transfusion therapy) তেজস্ক্রিয় অসুস্থতার চিকিৎসায় ফলপ্রসূ। এর সাহায্যে অবাঞ্ছিত এবং নষ্ট কোষগুলিকে দেহ থেকে বের করে দেওয়া সম্ভব হয়। 4-ডাইমিথাইল-5 সালফানিলামাইড-এর মত সালফোনামাইড চোখের ক্ষতি দূর করবার ক্ষমতা রাখে।

তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ সিজিয়াম-137 এবং 134 থেকে নির্গত বিকিরণ দেহের পেশীকে আক্রমণ করে। ফলে পেশীর মধ্যে জ্বালা ভাব, ব্যথা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা যায়। উপরিউক্ত বিকিরণের ফলে মিউকাস মেমব্রেনও আক্রান্ত হয়। এই সব রোগের প্রতিকারের জন্তে ইথোহেপ্টাজিন সাইট্রেট, অ্যাসিটাইল স্যালিসাইলিক অ্যাসিডসহ মেপ্রোবামেট প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়।

ইংরেজী প্রবাদবাক্য "Prevention is better than cure" তেজস্ক্রিয় বিকিরণজাত রোগ এবং তার প্রতিকারের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাই বিকিরণের ফলে রোগ হবার পর তার নিরাময়ের ব্যবস্থা করা ছাড়াও আরও যেটা জরুরী বেশী, তা হলো বিকিরণের প্রতিষেধক ব্যবস্থা। বিকিরণের পরিমাণ, তার ক্ষতি করবার ক্ষমতা প্রভৃতির উপর নির্ভর করে প্রতিষেধক ব্যবস্থাও বিভিন্ন হয়। আইসোটোপ থেকে বেশ কিছু দূরে থেকে কাজ করলে বিকিরণ ব্যস্তানুপাতিক বর্গসূত্র (Inverse square law) মেনে চলায় তার প্রাবল্য কমে যায় এবং ফলে বিকিরণের ক্ষতি করবার ক্ষমতাও হ্রাস পায়। দূর থেকে চালনা করবার জন্তে দূরনিয়ন্ত্রিত চিমটা (Remote control tongs), টুইজার (Tweezers), যান্ত্রিক হাত (Mechanical hands), দূরনিয়ন্ত্রিত পিপেটার প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া হয়। এছাড়া দস্তানা ও গাউন ব্যবহার করা অবশ্য প্রয়োজন। বিকিরণের পরিমাণ নিরাপদ সীমা অতিক্রম যাতে না করে, সেটাও সব সময় লক্ষ্য রাখতে হবে। আর তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ নিয়ে যাঁরা কাজ করবেন, তাঁদের উচিত মাঝে মাঝে তাঁদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো এবং কোনও রকম অস্বস্তি বোধ করলেই উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা।

কোপার্নিকাস ও বৈজ্ঞানিক বিপ্লব

বিশ্বপ্রিয় মুখোপাধ্যায়*

সভ্যজগতের মানুষ যেমন বর্তমান যুগের অসামান্য ব্যক্তিদের বিশেষভাবে সম্মানিত করে এবং তাঁদের অবদান সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করে, তেমনি অতীতের অসামান্য ব্যক্তি বা মহাপুরুষদের কীর্তি সম্বন্ধেও তারা আলোচনা করে বা তাঁদের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করে। ভবিষ্যতকে যথার্থভাবে বোঝবার জন্যে আমরা যেমন বর্তমান কালের বিশিষ্ট মনীষী বা বিজ্ঞানীদের ষাট বা সত্তর বছর পূর্তির দিনে তাঁদের কাজের গুরুত্ব গভীরভাবে বিবেচনা করি, ঠিক তেমনি বর্তমানকে যথার্থভাবে বুঝতে হলে অতীতের মনীষীদের কীর্তি আলোচনা ও সমীক্ষণেরও দরকার আছে।

প্রায় সোয়া-চার-শ' বছর আগে যে বিজ্ঞানী একটি বিরাট বৈজ্ঞানিক বিপ্লব এনেছিলেন, তাঁর পঞ্চশত বার্ষিক জন্মোৎসব উদ্‌যাপন করবে সারা পৃথিবীর বিজ্ঞান-জগৎ 1973 সালের 19শে ফেব্রুয়ারী। এই বিজ্ঞানীর নাম কোপার্নিকাস (Copernicus)। তিনি পোল্যাণ্ডের অধিবাসী ছিলেন, জাতে হয়তো জার্মান, কিন্তু তাঁর শিক্ষা-দীক্ষার উপর অধিকাংশ প্রভাবটাই ছিল ইটালীর। ইটালীতে তিনি জ্যোতির্বিদ্যা, আইন, চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্রে অধ্যয়ন করেন। তাঁর প্রধান পেশা ছিল ডাক্তারী কিন্তু তাঁর চিন্তাভাবনায় প্রাধান্য পায় জ্যোতির্বিদ্যা।

কোপার্নিকাসের অবদানের কথা বলবার আগে একটি ভূমিকার প্রয়োজন। খৃষ্টীয় 2য় শতকের বিখ্যাত গ্রীক জ্যোতির্বিদ্‌ প্টলেমাইয়স বা টলেমি (Ptolemy) চন্দ্র-সূর্য ও গ্রহাদির চলাচলের বিষয় বর্ণনা করতে গিয়ে যে অ্যারিস্টোটলীয় তত্ত্বের অবতারণা করেন, তাতে কল্পনা করা হয়েছিল যে, পৃথিবী সব জ্যোতিষ্কের গতিপথের কেন্দ্রে নিশ্চল এবং তাকে সূর্য বৃত্তাকার পথে পরিক্রমণ করছে এবং মঙ্গল, বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহ শুধু যে বৃত্তাকার পথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে—তাই নয়, তারা তাদের কক্ষপথের সীমানায় আবার ছোট ছোট বৃত্তাকার পথে পাক খাচ্ছে। তাদের চলার পথ যেন অনেক ফাঁসের (Loops) প্যাঁচ দেওয়া বৃত্তাকার পথ (Epicycles)। গ্রীক বিজ্ঞানে জ্যামিতি পেয়েছিল সর্বোচ্চ স্থান, তাই জ্যোতিষ্কসমূহের আকাশবিহার বর্ণনা করতে গিয়ে টলেমি কখনও পদার্থতাত্ত্বিক কারণ দেখিয়ে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেন নি। কেন গ্রহগুলি এই রকম পাক খেতে খেতে চলে আর বৃত্তাকার পথে কেন চন্দ্র-সূর্য ঘোরে, তা ব্যাখ্যা করবার কোনও দরকারই বোধ করেন নি—যেহেতু গ্রীক জ্যামিতিবিদের চোখে বৃত্ত একটি উৎকৃষ্ট জ্যামিতিক সত্তা; অতএব জ্যোতিষ্কেরা তো স্বাভাবিকভাবেই বৃত্তাকার পথে ঘুরবে! যদিও প্রাচীন গ্রীক জ্যামিতিবিদ্‌ অ্যাপোলোনিয়াস (Apollonius) উপবৃত্ত, পরাবৃত্ত, অধিবৃত্ত (Ellipse, Hyperbola, Parabola) প্রভৃতি জ্যামিতিক সত্তার অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছিলেন, তবুও 17 শতক পর্যন্ত কারোর মনে হয় নি যে, গ্রহ-উপগ্রহের কক্ষপথ উপবৃত্তাকারও হতে পারে—কারণ বৃত্তের মহিমায় সবাই ছিল অভিভূত।

টলেমির মূল উদ্দেশ্য ছিল একটি সুষ্ঠু ও সংহত

* ডিপার্টমেন্ট অব হিউম্যানিটিজ, আই. আই. টি. খড়্গপুর।

জ্যামিতিক চিত্রবিন্যাস সৃষ্টি করা, যা দিয়ে নিখুঁৎ ও নির্ভরযোগ্যভাবে জ্যোতিষ্কগুলির চলাফেরার বর্ণনা ও হিসাব করা যায়। তাদের গতিবিধির পদার্থতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা নিয়ে টলেমি মাথা ঘামান নি। কিন্তু এই সুষ্ঠু জ্যামিতিক জ্যোতির্বিদ্যা এমন একটা জটিল চিত্র সৃষ্টি করেছিল যে, প্রায় আশীখানা বৃত্ত ও এপিসাইকেলের বিচিত্র সমাবেশ ছাড়া সেই বর্ণনা সম্পূর্ণ হতো না। অতি প্রাচীন কাল থেকেই গ্রীক বিজ্ঞান-সাধকেরা বিশ্বাস করতে সুরু করেন যে, প্রকৃতি (Nature) সরল ও মিতব্যয়ী অথচ টলেমির জটিল চিত্রের সঙ্গে এই মূল বিশ্বাসের একটা গরমিল দেখা দিল। টলেমি শান্তি পেলেন না, কিন্তু মনকে বোঝালেন—আমার বর্ণনা যখন সব জ্যোতিষ্ক গতিবিধির সঠিক হিসাব দিতে পারছে, তখন জটিলতায় কি আসে যায়। যাহোক, টলেমির জ্যোতির্বিদ্যার উপর নির্ভর করেই আরবীয় বিজ্ঞানীরা বহু শতক ধরে তাঁদের নানা প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক হিসাব মোটামুটি সন্তোষজনকভাবে সম্পন্ন করেছেন।

প্রায় দ্বাদশ শতকে পশ্চিম ইউরোপের খৃষ্টীয় পণ্ডিতরা স্পেনীয় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সংস্পর্শে এসে টলেমিকে যথার্থভাবে চিনলেন এবং 16 শতক পর্যন্ত টলেমির জ্যোতির্বিদ্যাকেই আঁকড়ে রইলেন, যদিও তার আগে থেকেই কোনও কোনও পণ্ডিতমহল পৃথিবীর নিশ্চলতার বিশ্বাসকে সন্দেহ করতে আরম্ভ করেছিলেন।

16 শতকের গোড়ার দিকেই কোপার্নিকাস অনুভব করেছিলেন যে, টলেমির জটিল চিত্র কখনও সরল ও মিতব্যয়ী প্রকৃতির বাস্তব সত্তার বর্ণনা হতে পারে না। তিনি বুঝলেন যে, গ্রহসমূহের নানা রকম গতিবিধি বর্ণনা করতে গিয়ে টলেমি যে সংখ্যক বৃত্তের ও এপিসাইকেলের বিন্যাস সৃষ্টি করেছিলেন, তা একান্ত অনাবশ্যক। কোপার্নিকাসের মূল উদ্দেশ্য হলো টলেমির জ্যামিতিক চিত্রের এমন একটা বদল করা, যাতে গ্রহগুলির বিভিন্ন গতিবিধিকে যতটা সম্ভব কম সংখ্যক বৃত্তের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়। বৃত্তের সংখ্যা কমাতে হলে কল্পনা করা দরকার যে, সূর্য বিশ্বের কেন্দ্রে নিশ্চল এবং পৃথিবী অন্যান্য গ্রহগুলির মতই সূর্য প্রদক্ষিণ করছে এবং নিজের অক্ষে ঘুরছে। এই তাত্ত্বিক পরিবর্তনের প্রয়োজন কোপার্নিকাস নিজের যুক্তি-বোধ থেকেই অনুভব করেছিলেন। তাছাড়া পুরনো গ্রীক পুঁথির সংস্পর্শে এসে তিনি জানতে পারেন যে, পিথাগোরাস, আরিস্তার্খস প্রমুখ প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিতেরা প্রদক্ষিণরত পৃথিবীর কল্পনা করেছিলেন এবং পৃথিবী নিজে রোজ এক পাক খায়, তাও বলেছিলেন। এতে কোপার্নিকাসের সুবিধা হল আরিস্টোটলীয় ও টলেমীয় অতি প্রভাবশালী প্রাচীন তত্ত্বকে প্রাচীন যুগেরই একটি বিস্মৃত তত্ত্বের নজির দেখিয়ে আঘাত করা। সূর্য-কেন্দ্রিক তত্ত্বে পৌঁছাবার জন্যে কোপার্নিকাসকে নূতন নূতন আরো নিখুঁৎ পর্যবেক্ষণ এবং তথ্যের উপর নির্ভর করতে হয় নি, পূর্বের পর্যবেক্ষণ ও তথ্যের ভিত্তিতেই কি করে তাত্ত্বিক জটিলতা কমানো যায়, সেটাই ছিল কোপার্নিকাসের চিন্তা। একটা উন্নততর বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে পৌঁছাতে গেলে কল্পনাশক্তির ভূমিকা যে কত বড়, তার একটি দৃষ্টান্ত কোপার্নিকাসের নূতন তত্ত্ব। তিনি দেখালেন যে, সূর্যকে কেন্দ্রে নিশ্চলভাবে রাখলে এবং পৃথিবীকে চলমান করলে, অন্যান্য গ্রহগুলির অদ্ভুত ফাঁস খাওয়া কক্ষপথগুলি (Epicycles) লুপ্ত হয় এবং মাত্র ত্রিশটি বৃত্তাকার কক্ষপথের সাহায্যে জ্যোতিষ্কদের গতিবিধিকে অনেক সরল ও আরো সুষ্ঠুভাবে বর্ণনা করা যায়।

কোপার্নিকাস টলেমীয় তত্ত্বের যে সংস্কার করলেন, সেটাও অবশ্য জ্যামিতিক সংস্কার, অর্থাৎ তিনিও ব্যাখ্যা করেন নি—কেন গ্রহগুলি

বৃত্তাকার পথে ঘোরে। এই পদার্থতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা গ্রীকদের জ্যামিতি-সর্বস্ব দৃষ্টিতে যতটা নিষ্প্রয়োজন মনে হয়েছিল, কোপার্নিকাসের চোখেও ততটাই। তবে তাঁর নিছক জ্যামিতিক সংশোধনই ভবিষ্যতের জ্যোতির্বিদ্যাকে নিরর্থক জটিলতা থেকে মুক্ত করেছিল। তাঁর জ্যামিতিক চিত্রেও যেটুকু জটিলতা থেকে গিয়েছিল, তাও তিনি ঘোচাতে পারতেন, যদি উপলব্ধি করতেন যে, গ্রহগুলি ঘোরে উপবৃত্তাকার পথে, নিটোল বৃত্তাকার পথে নয়। তাঁর মৃত্যুর (1543) প্রায় অর্ধশতক পরে জার্মান জ্যোতির্বিদ কেপ্‌লার অনেক তথ্য বিশ্লেষণ করে বুঝতে পারেন যে, মঙ্গল বা বৃহস্পতির কক্ষপথকে উপবৃত্ত হিসাবে দেখলে জ্যোতিষিক বর্ণনা আরো অনেক সহজ ও সুষ্ঠু হয়। কেন গ্রহ-উপগ্রহগুলি বৃত্তাকার বা উপবৃত্তাকার পথে ঘোরে, তার যথার্থ পদার্থতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেন নিউটন 17 শতকের দ্বিতীয়ার্ধে।

কোপার্নিকাস তাঁর নূতন তত্ত্বের বই (De Revolutionibus Orbium Coelestium অর্থাৎ জ্যোতিষ্কদের পরিক্রমণ বিষয়ে) পোপকে উৎসর্গ করে লেখেন যে, বৈজ্ঞানিক সত্যকে প্রচার করা তিনি কর্তব্য মনে করেন। কিন্তু যাঁর উপর বইটি প্রকাশনের ভার পড়ে, তিনি গির্জার কোপদৃষ্টি এড়াবার জন্যে ভূমিকায় মন্তব্য করেন যে, এই নূতন তত্ত্বটি সরল, বোধগম্য ও সুবিধাজনক গাণিতিক তত্ত্ব মাত্র, এই তত্ত্ব প্রকৃতির আসল সত্তা বর্ণনার দাবী করে না। এই আপোষের আশ্রয় নিয়ে লেখক নিশ্চয় পোপকে খুশী করতে চান নি। কিন্তু তাঁর হাতে মুদ্রিত বইটি যখন পৌঁছায়, শোনা যায়, তখন তিনি মৃত্যুশয্যায়, প্রতিবাদ জানাবার উপায় তখন নেই। 1543 সালে তাঁর মৃত্যুর পর সেই শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত রোমান ক্যাথলিক গীর্জা তাঁর মতবাদকে আক্রমণ করবার কোনও দরকার বোধ করেন নি, কারণ অধিকাংশ পণ্ডিতেরাই নূতন তত্ত্বটির ব্যবহারিক সুবিধা গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু সেটিকে প্রকৃতির বাস্তব বর্ণনা হিসাবে স্বীকৃতি দেন নি, ঠিক যেমন গত শতাব্দীর কোনও কোনও বিশিষ্ট রসায়নবিদ্ ও পদার্থ-বিজ্ঞানী নানা ক্রিয়া-প্রক্রিয়া ব্যাখ্যার সুবিধার জন্যে পরমাণুবাদকে (Atomism) ব্যবহার করেছেন, অথচ বর্তমান শতকের গোড়া পর্যন্তও পরমাণুর বাস্তব অস্তিত্ব মানতে চান নি।

16 শতকের শেষে যখন ইটালীর নির্ভীক দার্শনিক ব্রুনো (Bruno) এবং তারপরে গ্যালিলিও কোপার্নিকাসের তত্ত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে বদ্ধপরিকর হলেন, তখন থেকেই গীর্জা এই ধর্মদ্রোহী মতবাদটিকে দমন করতে উদ্যত হলো। ব্রুনো সূর্য-কেন্দ্রিক-তত্ত্বের যে সমর্থন জানালেন, তার ভিত্তি ছিল দার্শনিক যুক্তিবাদের উপর। আর, গ্যালিলিও যে সমর্থন জানালেন, তার ভিত্তি দূরবীক্ষণের অকাট্য পর্যবেক্ষণ। যুক্তি এবং পর্যবেক্ষণ—এই দুটি জিনিষই ছিল গীর্জার পরম শত্রু। ব্রুনোকে পুড়িয়ে মারা হয় (1600) এবং গ্যালিলিওকে কারারুদ্ধ করা হয় (1633)। কিন্তু 17 শতকের মধ্যেই বিজ্ঞান-জগৎ এই তত্ত্বকে বরণ করে নেয় এবং তাকে ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে নিউটনের যুগান্তকারী জ্যোতির্বিদ্যা। অবশ্য রোমান ক্যাথলিক গীর্জার ঘুম ভাঙলো অনেক পরে, মাত্র গত শতকের প্রথমার্ধে সূর্য-কেন্দ্রিক তত্ত্ব গীর্জার স্বীকৃতি পেল।

গোয়েন্দা-সহায়ক রঞ্জেন রশ্মি

জীমূতকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়

শহরতলীর একটি মাঝারী আকারের দোতলা বাড়ীতে মালিক সপরিবারে বাস করতেন। একদিন দুপুর রাতে ঐ বাড়ীতে আগুন লেগে যায়—আশেপাশের লোকজন এবং দমকলের চেষ্টার ফলেও কিছুই রক্ষা করা সম্ভব হলো না। সবই পুড়ে ছাই হয়ে গেল। বাসীন্দারা সবাই নিরাপদে আছেন, কিন্তু বাড়ীর কর্তার কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। ছাইগাঁদার মধ্যে খোঁজাখুঁজি করে আগুনে পোড়া সম্পূর্ণ বিকৃত একটা মৃতদেহ পাওয়া গেল। কিন্তু বিকৃত দেহটা কি বাড়ীর মালিকের, না অন্য কারোর—তা বোঝবার কোন উপায় ছিল না। পুলিসের তদন্তেও মৃতদেহের সঠিক পরিচয় নির্ণয় করা সম্ভব হলো না। অবশেষে তাদের রঞ্জেন রশ্মির পরীক্ষার শরণ নিতে হলো। বিকৃত দেহের একটা এক্স-রে ফটো নেওয়া হলো। কিছুকাল আগে তার বুকের একটা এক্স-রে ছবি তোলা হয়েছিল। সেই ছবিতে বুকে একটি জখমের দাগ ছিল। এবার অগ্নিদগ্ধ বিকৃত দেহের এক্স-রে ফটোতেও ঠিক একই জায়গায় সে রকম একটা দাগের সন্ধান পাওয়ার ফলে দগ্ধ, বিকৃত দেহটি যে গৃহকর্তার, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহের অবকাশ রইলো না। এই সূত্র ধরে অগ্রসর হবার ফলে অগ্নিকাণ্ডের প্রকৃত কারণ ও গৃহকর্তার মৃত্যুর রহস্যও উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল।

উপরের ঘটনাটি হচ্ছে রঞ্জেন রশ্মির সাহায্যে অপরাধ তদন্তের একটি দৃষ্টান্ত। এমনি বহু কাজে আজ রঞ্জেন রশ্মি পুলিশ, তথা গোয়েন্দাদের এক অমূল্য সহায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন দেখা যাক, এই রঞ্জেন রশ্মি কিভাবে তদন্তের কার্যে সাহায্য করতে পারে।

পরিচয়

অনেকেই হয়তো জানেন, রঞ্জেন রশ্মি হচ্ছে এমন এক তড়িৎ-চুম্বকীয় বিকিরণ, যা সাধারণ আলোক রশ্মি বা বিকিরণের মতই চরিত্রবিশিষ্ট। কিন্তু তফাৎ এই যে, এর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য খুব ছোট — দৃষ্টিগোচর আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের এক হাজার ভাগের এক ভাগের মত। তাই এই রশ্মির ভিতরে প্রবেশ করবার বা বাধা ভেদ করবার যথেষ্ট শক্তি আছে। যে সব কঠিন বস্তু—যেমন কাঠ, শরীরের মাংস সাধারণ আলোর প্রবেশে বাধা দেয়, তারাও রঞ্জেন রশ্মির প্রবেশপথে কোন প্রতিবন্ধক নয়, রঞ্জেন রশ্মি তাদের ভেদ করে অপর পৃষ্ঠে পৌঁছাতে পারে।

রঞ্জেন রশ্মির ভেদ করবার ক্ষমতা নির্ভর করে তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের উপর। যে রঞ্জেন রশ্মির তরঙ্গের দৈর্ঘ্য বেশী, তাদের বাধা ভেদ করবার ক্ষমতা কম। একে বলা হয় নরম বা মৃদু রঞ্জেন রশ্মি। আবার যে রঞ্জেন রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অপেক্ষাকৃত ছোট, তাদের বাধা ভেদ করবার ক্ষমতা বেশী। এদের বলা হয় প্রখর রঞ্জেন রশ্মি। কোন কোন অপরাধসংক্রান্ত ঘটনার তথ্যানুসন্ধানে শুধুমাত্র প্রখর রঞ্জেন রশ্মির দরকার হয়, সে ক্ষেত্রে মৃদু রঞ্জেন রশ্মি কোন কাজেই আসে না। তেমনি এর বিপরীত দৃষ্টান্তও আছে। অতএব দেখা যাচ্ছে, অপরাধ তদন্তে মৃদু ও প্রখর উভয় প্রকার রশ্মিরই উপযোগিতা রয়েছে। তাই উভয়েই স্থান পেয়েছে আধুনিক ফরেনসিক গবেষণাগারে।

রেডিওগ্রাফি পদ্ধতি

অপরাধ তদন্তে রঞ্জেন রশ্মিকে কাজে লাগানো হয় রেডিয়োগ্রাফি পদ্ধতিতে। রেডিওগ্রাফি হচ্ছে রঞ্জেন রশ্মির সাহায্যে বস্তুবিশেষের আলো-ছায়াচিত্র গ্রহণ। এই চিত্র গৃহীত হয় রঞ্জেন রশ্মিসচেতন ফিল্ম বা স্বচ্ছ পাত্‌লা পাতে। সোজা কথায়, রেডিওগ্রাফির মর্ম হচ্ছে—অদৃশ্য রঞ্জেন রশ্মিকে প্রতিহত করবার ক্ষমতা বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন রকম; যেমন—কোন ভারী বস্তুর এই রশ্মিকে প্রতিহত করবার ক্ষমতা হাল্কা জিনিষের চেয়ে বেশী। এই কারণেই রঞ্জেন রশ্মি সহজেই কাগজ, মাংস বা কাঠ ভেদ করে যেতে পারে, কিন্তু হাড়, লোহার পাত্‌, সীসা প্রভৃতি ভেদ করে যেতে পারে না। ফলে রঞ্জেন রশ্মির গতিপথে এসব পড়লে সেখানে ছায়ার সৃষ্টি হয়।

রঞ্জেন রশ্মির প্রয়োগ

রোগ নির্ণয় ও দাঁত পরীক্ষার কাজে রঞ্জেন রশ্মির ব্যবহার অনেক দিন থেকেই চলে আসছে। এই রশ্মি একাধারে যেমন যন্ত্রশিল্প সংক্রান্ত কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে, তেমনি সম্প্রতি অপরাধ তদন্তের কাজেও এর প্রচলন হয়েছে।

অপরাধ তদন্তের কাজে যে সব ক্ষেত্রে রঞ্জেন রশ্মি ব্যবহার করা হয়েছে, তার কয়েকটির কথা বলছি। এর আগে প্রবন্ধের সুরুতেই একটি ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথম রঞ্জেন রশ্মির ব্যবহার হয় গোপন ও বেআইনী আগ্নেয়াস্ত্র ও অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধারের কাজে অথবা গৃহের আসবাবপত্র ও দেয়াল ইত্যাদি তল্লাশীর কাজে।

রঞ্জেন রশ্মির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার একটি হচ্ছে—সন্দেহজনক পার্সেল ও প্যাকেট প্রভৃতির গোপন তল্লাসীর কাজে। আজকের দিনে নানা ব্যাপারে সন্ত্রাস ও নাশকতামূলক কার্যকলাপ খুব বেড়ে যাবার ফলে সতর্কতার প্রয়োজনও বেশী করে দেখা দিয়েছে। নিরাপত্তার জন্যে দরকার লুকানো বোমা ও বিস্ফোরক পদার্থ খুঁজে বের করা এবং সেই সঙ্গে দুষ্কৃতকারীর সন্ধান করা। এই ভাবে অনুসন্ধানের ফলে বিস্ফোরণ ঘটবার আগেই বোমা বা বিস্ফোরক থেকে সাবধান হওয়া যায়।

রঞ্জেন রশ্মি ধাতুনির্মিত কোন যান্ত্রিক কাঠামোতে ত্রুটি বা খুঁৎ প্রভৃতি থাকলে তার সঠিক প্রকৃতি নির্ণয়ে সাহায্য করতে পারে। এই ভাবে নাশকতা ও দুর্ঘটনা নিবারণ করা সম্ভব হয়।

পরিচয়হীন মৃতদেহ রঞ্জেন রশ্মিতে পরীক্ষা করে সেই দেহের দাঁত ও হাড়ের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ ও তা নিখোঁজ লোকের দৈহিক বিবরণের সঙ্গে মিলিয়ে মৃতের সঠিক পরিচয় নির্ধারণ করা চলে। মৃতদেহের অস্থি রঞ্জেন রশ্মিতে পরীক্ষা করে তার বয়স ও শারীরিক বৈশিষ্ট্যাদি নির্ণয় করা সম্ভব। ভেঙ্গে-যাওয়া হাড় শরীরের কোন্ অংশ থেকে এসেছে, তা বলা চলে।

অনেক সময়েই দেখা গেছে, চোর ও চোরা-চালানকারীরা ক্ষুদ্রাকৃতির মূল্যবান বস্তু তাদের শরীরের গোপন অংশে লুকিয়ে রাখে। কখনও বা গলার ভিতরে ঢুকিয়ে দেয় অথবা একেবারে গিলেই ফেলে। এরূপ ক্ষেত্রে রঞ্জেন রশ্মি সেই লুকায়িত বস্তুর অস্তিত্বের অব্যর্থ সন্ধান দিতে পারে। এই অদৃশ্য চোখকে ফাঁকি দেবার কোন উপায় নেই। এছাড়া রঞ্জেন রশ্মির সাহায্যে তালাবদ্ধ কাঠ বা চামড়ার বাক্স না খুলেও তাতে কোন নিষিদ্ধ বস্তু লুকোনো আছে কিনা, তা সহজেই ধরা যেতে পারে। এই কারণে শুল্ক বিভাগের কাজেও রঞ্জেন রশ্মি খুবই সহায়ক।

খেলার ঘুঁটির মধ্যে সোনা লুকোনো থাকলে রঞ্জেন রশ্মির সাহায্যে তা ধরা সম্ভব। কোন

পয়সা মেকি, না আসল তা অনায়াসেই বোঝা যায় রঞ্জেন রশ্মির পরীক্ষায়, বিশেষ করে মেকি পয়সায় যদি সীসা থাকে।

মৃদু রঞ্জেন রশ্মিও নানা কাজে ব্যবহৃত হয়। নামকরা চিত্রকলা জাল, না আসল—তা ধরা যায় রঞ্জেন রশ্মির সাহায্যে। প্রাচীন চিত্রকলার ধাতব অংশ ও অপেক্ষাকৃত আধুনিক চিত্রকলার ধাতব অংশের মধ্যে পার্থক্য থাকায় সহজেই তা রঞ্জেন রশ্মিতে ধরা পড়ে।

দামী বা কম দামী পাথর, আসল ও নকল হীরা চেনা যায় রঞ্জেন রশ্মির সাহায্যে। ঝিনুকের বুকে মুক্তার অস্তিত্বও আবিষ্কার করা যায় রঞ্জেন রশ্মির সাহায্যে।

নকল ও আসল চামড়ার তারতম্যও বোঝা যায় রঞ্জেন রশ্মির সাহায্যে অতি সহজেই। ফলে কতকগুলি ক্ষেত্রে তদন্তের কাজে সূত্র অনুসন্ধানের অনেক সুবিধা হয়।

অনেক সময় যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত, নিখোঁজ, বা গুপ্তচরসংক্রান্ত কাজ বা অন্য ব্যাপারে ধরাপড়া পদাতিক, নৌ বা বিমান বাহিনীর লোকের সঠিক পরিচয় উদ্ধারের জন্যে তাদের নাম, পরিচয়জ্ঞাপক ক্রমিক নম্বর এবং অন্যান্য বিবরণ সংগ্রহ করবার প্রয়োজন হয়। অনেক সময় তাদের পরিধেয় বস্ত্রের গোপন ও অপ্রকাশ্য অংশে, যেমন—কলারের ভাঁজের তলায় বা প্যান্টের পকেটের ভিতরে ছাপানো থাকে এই সব বিবরণ। প্রায়ই পোষাকের গায়ে ছাপানো এই সব বিবরণ অনেক দিন একটানা ব্যবহারে অথবা ধোলাইয়ের দরুণ থেবড়ে অথবা ঝাপসা ও অস্পষ্ট হয়ে যায়, তখন তাদের পাঠোদ্ধার সম্ভব হয় রঞ্জেন রশ্মির সাহায্যে। ছাপার রঙে যদি সীসা বা অন্য ভারী ধাতু থাকে, তবে রঞ্জেন রশ্মি এই কাজে খুবই সাহায্য করতে পারে।

খাঁটি দলিল ও জাল দলিল প্রভৃতির পার্থক্য বিচারেও রঞ্জেন রশ্মি প্রভূত সাহায্য করতে পারে। কালি কতটা শুষে গেছে কাগজে অথবা কাগজের গঠন কি রকম—তাই দিয়ে রঞ্জেন রশ্মি নির্ণয় করে দলিল আসল, কি জাল। জাল ও আসল টাকার নোটের পার্থক্য বিচারেও মৃদু রঞ্জেন রশ্মি নোটের জলছাপ, নিরাপত্তা সূত্র ও কাগজের গঠন পরীক্ষা করতে সাহায্য করে।

অন্যান্য ব্যবহার

বস্তুর স্বকীয়তা ও পরিচয় নির্ণয়, তথা সনাক্তকরণেও রঞ্জেন রশ্মি অনেক সাহায্য করতে পারে। যে বস্তুকে রঞ্জেন রশ্মিতে বিশ্লেষণ করতে হবে, তার খানিক সূক্ষ্ম চূর্ণের নমুনা একটা সরু পরীক্ষা-নলে নেওয়া হয়। পরে একটি মাত্র তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের রঞ্জেন রশ্মি সেই নলের উপর প্রক্ষেপ করা হয়। রঞ্জেন রশ্মি এই নলের বস্তুর উপর কতটা প্রতিফলিত ও বিচ্ছুরিত হবে, তা নির্ভর করছে বস্তুটির আসল স্বরূপের উপর; অর্থাৎ বস্তুটি কি জিনিষ, তার উপর। কারণ দেখা গেছে, প্রতিটি বস্তুরই বিকিরণ-ধর্ম অন্যের চেয়ে আলাদা—এক বস্তুর বিকিরণের ধরণের সঙ্গে কখনই অন্যের মিল হবে না। এবারে তুলনাধীন বিভিন্ন বস্তুর বিকিরণের নমুনার চিত্র তুলে রাখা হয়। এর ফলে যদি দেখা যায় দুটি বস্তুর চিত্রে বিকিরণের ছবি অবিকল এক রকম উঠেছে, তবে নিঃসন্দেহে উভয় বস্তু এক ও অভিন্ন। এদের সঙ্গে অন্য কোন বস্তুরই বিকিরণের ছবি মিলবে না। এর দ্বারাই রঞ্জেন রশ্মির সাহায্যে দুটি বস্তু এক না আলাদা এবং কোন বস্তুর আসল পরিচয় নির্ণয় করা যায়।

রঞ্জেন রশ্মি কোন রাসায়নিক মিশ্রণের ভিতর থেকেও মিশ্রিত বস্তুগুলিকে পৃথকভাবে চিনিয়ে দিতে পারে। রঞ্জেন রশ্মির বিচ্ছুরণ ছবিতে দেখা যায় কতকগুলি বাঁকা বাঁকা রেখা। প্রতিটি বাঁকা রেখাই সাধারণতঃ কোন যৌগিক পদার্থের অস্তিত্ব বোঝায়। অবশ্য অনেকগুলি বাঁকা রেখা একই বস্তুকে নির্দেশ করতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোন পরীক্ষাধীন রঙের মধ্যে পরীক্ষার ফলে হয়তো পাওয়া গেল বেরিয়াম উপাদান। এক্স-রে ক্যামেরার সাহায্যে প্রমাণিত হবে, এই বেরিয়াম কি আকারে রয়েছে—কার্বোনেট না সালফেটরূপে।

দুটি জিনিষের নমুনার তুলনামূলক পরীক্ষার জন্যে ফটোর বিচ্ছুরণ-ছবি, তথা নক্সা দুটিকে পাশাপাশি রাখা হয়। যদি আরও বিস্তৃত ও সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ আবশ্যক হয়, তবে বাঁকগুলির মধ্যে পরস্পরের দূরত্ব ও তাদের ঘনত্ব বিচারের দ্বারাও পদার্থটিতে বিদ্যমান অন্য বস্তু সম্পর্কে তাদের আপেক্ষিক পরিমাণ সম্বন্ধে ধারণা করা যায়।

সুবিধা

এই পদ্ধতিতে বস্তুর বিচারে অনেক সুবিধা থাকায় গত কয়েক বছর যাবৎ অপরাধ তদন্ত ও আদালত সংক্রান্ত গবেষণাগারে এর বহুল প্রচলন হয়েছে। অন্যান্য সুবিধার মধ্যে এতে থাকে পরীক্ষার জন্যে অতি সামান্য পরিমাণ (মাত্র কয়েক মিলিগ্রাম) নমুনা। অথচ পরীক্ষার ফল স্থায়ীভাবে ধরে রাখা যায় ফটোগ্রাফির ফিল্মে। তাছাড়া দামী পাথর, মণিমুক্তা পরীক্ষায়ও রঞ্জেন রশ্মির ফলাফল সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য। বিভিন্ন বিচিত্র ধর্মের বস্তুর নমুনা, যেমন—কাদামাটি, সূক্ষ্ম চূর্ণ, শুকনো ও ভিজে রং, মাদক দ্রব্য, রবার, কাচ, কাপাস তুলা, রেয়ন ও পশমের আঁশ পরীক্ষা করে তাদের স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত নির্ভরযোগ্য উপায়ে অভ্রান্ত রায় দেওয়া সম্ভব।

এই পদ্ধতিতে মাটির তৈরি জিনিষেরও সুষ্ঠুভাবে তুলনামূলক পরীক্ষা করা যায়। সিমেন্টের গুণাগুণ এবং রাসায়নিক উপাদানও বিশ্লেষণ করা চলে। তাছাড়া এতে বাড়্তি সুবিধা এই যে, পরীক্ষার কাজে ব্যবহৃত নমুনার যদি কোন বাজে বা দূষিত জিনিষও থাকে, তাতেও পরীক্ষণে কোন অসুবিধার সৃষ্টি হয় না বা বিশ্লেষণের পর নমুনাটি অব্যবহার্য হয়ে পড়ে না।

বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে রঞ্জেন রশ্মির সর্বাধুনিক প্রয়োগ হচ্ছে স্পেক্‌ট্রোস্কোপি বা বর্ণালীবীক্ষণে একে কাজে লাগানো। রাসায়নিক বিশ্লেষণের অনেক বাস্তব উপায়ের চেয়ে এটা কম কার্যকরী নয়। এই পদ্ধতির দ্রুত ও বহুল প্রসার ঘটবার ফলে এটা প্রায় বর্ণালীচিত্র বিশ্লেষণ ও অবলোহিত রশ্মি বর্ণালীবীক্ষণের সমপর্যায়ে উঠেছে।

যে হারে যান্ত্রিক ও কলা-কৌশলগত উন্নতি হয়ে চলছে, তাতে রঞ্জেন রশ্মি বর্ণালীবীক্ষণ যে বস্তু বা বস্তুর অবলেপ বিশ্লেষণে এক মূল্যবান হাতিয়ারে পরিণত হবে—তাতে কোন সন্দেহ নেই। রঞ্জেন রশ্মি মারফৎ অণুবিশ্লেষণ ও ইলেকট্রন অনুসন্ধান সম্প্রতি সারা বিশ্বের অপরাধ-বিজ্ঞানীদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। ক্যামেরার বদলে অতি সচেতন কাউন্টার যন্ত্রের সাহায্যে আলোক রশ্মি বিচ্ছুরণ রেখার বাঁকের (Diffraction curve) তাৎপর্য উদ্ধারের চেষ্টায় সময়ের অনেক সাশ্রয় হবে। এই উপায়ে মুহূর্তের মধ্যে কোন বস্তু বিশ্লেষণ করে ফেলা যায়।

তাই বিশেষ করে অপরাধ তদন্তে তথা গোয়েন্দার কাজের সহায়করূপে রঞ্জেন রশ্মির উপযোগিতা দিনের পর দিন ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে।

প্রাণের ক্রিয়াকলাপ

শ্রীমাধবেন্দ্রনাথ পাল

প্রাণ কি শুধু শক্তিমাত্র ?

শক্তি বলিতে কাজ করিবার সামর্থ্য বুঝায়। অনেকের মতে, প্রাণ হইল শক্তি প্রয়োগের এক প্রকার প্রণালী বা ব্যাপারবিশেষ। সুইচ্ টিপিলে তড়িৎ-স্রোত প্রবাহিত হইয়া পাখা চালায়, ঘূর্ণায়মান পাখা হাওয়া ঠেলিয়া দিয়া কাজ করে—তাই বলিয়া পাখার প্রাণ আছে বলা চলে না। মোটরের ইঞ্জিনে পেট্রোল পোড়াইলে গাড়ী চলিয়া লোকজন ও মালপত্র বহনের কাজ করে বলিয়া ইঞ্জিনে প্রাণ সঞ্চারিত হইয়াছে মনে করা হাস্যকর। রেডিওর চাবি ঘুরাইয়া দিলে বিভিন্ন ভাষাভাষী কত মানুষের কত কথা, কত গান এবং কত পাখীর কূজন ও জন্তু-জানোয়ারের গর্জন শুনিতে পাওয়া যায় বলিয়া তড়িৎ-শক্তি চালিত রেডিওকে প্রাণবন্ত ভাবিলে কেমন হয় ? কম্পিউটর ইলেক্ট্রনিক কৌশলে অতি দ্রুত গতিতে অঙ্কের জটিল সমস্যা সমাধান করিয়া দেয় বলিয়া উহাকে মানুষের মত বুদ্ধিমান জীব বলা যাইবে কি ? সুতরাং প্রাণ শক্তি প্রয়োগের একপ্রকার প্রণালী বা ব্যাপারবিশেষ বলিলে প্রাণ কি তাহা বুঝিবার উপায় থাকে না।

তাই বলিয়া প্রাণ ও শক্তির মধ্যে কোন সম্পর্ক নাই, তাহা বলা চলে না বরং শক্তি ও প্রাণের মধ্যে নিবিড় ও অচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান। বিজ্ঞানীরা জানিতে পারিয়াছেন যে, ছোট ছোট ইট দিয়া যেমন পাকা বাড়ীর কাঠামো গঠিত হয়, অনেকটা সেই রকম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষের সাহায্যে জীবন্ত প্রাণীদেহ বা উদ্ভিদদেহ নির্মিত হইয়া থাকে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, প্রত্যেকটি কোষের ভিতর প্রাণের ক্রিয়াকলাপ চলিতেছে বলিয়া জীবদেহে প্রাণের সঞ্চার সম্ভব হয়। এই সকল কোষ যে উপাদানে গঠিত, তাহার বৈজ্ঞানিক নাম প্রোটোপ্লাজম (Protoplasm)। গ্রীক ভাষায় প্রোটো অর্থে আদি ও প্লাজম অর্থে রূপ—এই দুইটি শব্দ হইতে প্রোটোপ্লাজম শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রোটোপ্লাজম বলিতে প্রাণের আদি রূপের আভাস মিলে অথচ প্রোটোপ্লাজম বলিলে কোন বস্তু বা অনেক বস্তু এবং বহু ঘটনা, যাহা এখনও সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় নাই—এই সমস্ত বিষয়কে বুঝিবার এক অসম্পূর্ণ চেষ্টা মাত্র অথবা অজ্ঞতার বদলে এক পরিপাটি ভাষারূপ বুঝায় মাত্র। জীবন্ত পদার্থ ভিন্ন অন্যত্র পাওয়া যায় না বলিয়া প্রোটোপ্লাজম জৈব পদার্থবিশেষ। জৈব পদার্থ মাত্রেই কার্বন নামক মৌলিক পদার্থ বর্তমান এবং কার্বনঘটিত জৈব পদার্থ বৃহৎ কলেবরের অণুর সমাহারে রচিত। এই সকল বৃহৎ কলেবর কার্বন-ঘটিত অণু সাধারণতঃ অজৈব বা জড় পদার্থ, যেমন বায়ুমণ্ডলে বিদ্যমান কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস হইতে রচিত হয়। কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস হইতে কার্বন মৌল আহরণ করিতে ও আহৃত কার্বন মৌলকে জৈব পদার্থের রূপদান করিবার জন্য শক্তির প্রয়োজন হয়। অতএব প্রাণ ও শক্তির মধ্যে সম্পর্ক কত নিবিড়, তাহা বুঝিতে আর অসুবিধা হয় না। কিন্তু শক্তি মাত্রেই প্রাণ তাহা যেমন ঠিক নহে, আবার শক্তি ছাড়া প্রাণের অস্তিত্ব সম্ভব, ইহাও ভাবা যায় না। প্রাণ বলিতে শক্তি এবং ততোধিক কিছু একটা ব্যাপার বুঝিবার চেষ্টা হইয়াছে মাত্র। কিন্তু সেই চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল না হইবার ফলে প্রাণের রহস্য বহুলাংশে ঢাকা পড়িয়া আছে।

প্রাণের আধার—কোষ

হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন দুইটি স্বতন্ত্র মৌল ও গ্যাস। জলের মধ্যে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন বর্তমান বলিয়া বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু দুইটি ভিন্ন ভিন্ন গ্যাসীয় পদার্থ হইতে তরল পদার্থ জলের উদ্ভব হইয়াছে, ইহা ভাবিলে অবাক হইতে হয়। বিজ্ঞানীদের ধারণা, প্রকৃতিতে এমন ব্যাপার সম্ভব হইয়াছে এই জন্য যে, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পরমাণুর মধ্যে সচরাচর আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায় না, অথচ সেই পরমাণুগুলির মধ্যে বলপ্রয়োগে আকর্ষণ ঘটাইলে হাইড্রোজেনের দুইটি পরমাণু অক্সিজেনের একটি পরমাণুর সহিত মিলিয়া জোটবদ্ধ হয় এবং নিজ নিজ গ্যাসীয় সত্তা হারাইয়া জলের একটি অণুতে পরিণত হয়। জলের অণুর গঠন অত্যন্ত সরল এবং ইহাতে মাত্র তিনটি পরমাণু বর্তমান। কিন্তু যে সকল জৈব পদার্থের সাহায্যে প্রোটো-প্লাজম গঠিত, তাহারা একাধিক হইতে শত সহস্রাধিক পরমাণুর সাহায্যে গঠিত হয়। এইরূপ বৃহৎদাকৃতির জৈব অণুর ধর্ম যে কত স্বতন্ত্র ও বিচিত্র হইতে পারে, জলের অণুর গঠন হইতে তাহার কিছুটা আভাস পাওয়া সম্ভব

বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করিয়াছেন যে, কোষ অত্যন্ত ক্ষুদ্রকায় এবং অনেক ক্ষেত্রে এইরূপ ক্ষুদ্রকায় একটিমাত্র কোষের সাহায্যে একটি জীবদেহ রচিত হয়; যেমন—অ্যামিবা নামক আদি জীব। তবে অধিকাংশ জীবই বহুসংখ্যক কোষের সাহায্যে নির্মিত; যেমন—প্রাপ্তবয়স্ক কোন মানুষের দেহে 60,000,000,000.000, বা ষাট শত সহস্র কোটি কোষ বর্তমান থাকিতে পারে। কোষ যে কত ক্ষুদ্র, ইহা হইতে তাহা অনুমান করা যায়। ইহাদের এক-একটির পরিমাপ 0·5 হইতে 5 মাইক্রন পর্যন্ত—এক মাইক্রন হইল 0·001 মিলিমিটার। এক মাইক্রন পরিমিত কোন কোষের এক লক্ষটি পর পর সাজাইতে পারিলে উহারা মাত্র এক মিটার স্থান জুড়িয়া থাকিবে। মানুষের দেহকোষের পরিমাপও এইরূপ 0·5 হইতে 5 মাইক্রনের মধ্যে হইয়া থাকে। কোষ কোনটি গোলাকার ও কোনটি আয়তাকার ইত্যাদি হইতে পারে। স্নায়ুজালের অন্তর্গত কোষ অত্যন্ত দীর্ঘাকার ও সূক্ষ্ম; উহারা টেলিগ্রাফের তারের মত কাজ করিয়া থাকে। আবার কোন কোন কোষের কোনরূপ নির্দিষ্ট আকার থাকে না, যেমন—অ্যামিবার কোষের আকার সর্বদা পরিবর্তনশীল।

ব্যাক্টিরিয়া ও উদ্ভিদদেহের অন্তর্গত কোষের বহির্দেশের চতুর্দিক ঘিরিয়া একটি দৃঢ় ও কঠিন প্রাচীর বা আবরণ থাকে। অন্যান্য শ্রেণীর কোষের চতুর্দিকে তেমন প্রাচীর বা আবরণ না থাকিলেও একটি সূক্ষ্ম ঝিল্লীর আবরণ বর্তমান। উদ্ভিদ ও ব্যাক্টিরিয়ার কোষ-প্রাচীরের ঠিক ভিতরের দিকে এইরূপ সূক্ষ্ম ঝিল্লী থাকে।

কোষের প্রায় সমুদ্য বস্তু উহার কেন্দ্রস্থলে ঘনভাবে জড় হইয়া থাকে। ইহারা নিউক্লিয়াস (Nucleus) বা কেন্দ্রীন নামে পরিচিত। যেমন স্পর্শমণির সংস্পর্শে যাহা কিছু আসে, তাহা স্বর্ণে পরিণত হয় বলিয়া কথিত, তেমনি নিউ-ক্লিয়াসের অন্তর্গত কয়েকটি উপকরণের আশ্রয়ে প্রাণের যাদুপ্রভাব নিহিত এবং উহাদের সংস্পর্শ ও আচরণে প্রাণের ক্রিয়াকলাপ চালনা সম্ভব হয়।

কোষের অভ্যন্তর ভাগে কত বিচিত্র ধরণের সূক্ষ্ম সাজসজ্জা আছে তাহা ভাবা শক্ত। প্রকৃত পক্ষে জীবদেহ যে নিউক্লিয়াসসমন্বিত কোষের মিলনের ফলে নির্মিত হইয়াছে, তাহা সাধারণের পক্ষে ধারণা করা এক কঠিন ব্যাপার।

কোষের মূল উপকরণ

অধিকাংশ কোষের শতকরা 75 ভাগ জলে

পূর্ণ এবং জলই জীবদেহের প্রধান উপকরণ, যাহা ছাড়া প্রাণ সম্ভব হয় না। অবশিষ্ট স্থান প্রধানতঃ প্রোটিন, ডিঅক্সি-রিবোনিউক্লিক অ্যাসিড (সংক্ষেপে D.N.A.), রিবোনিউক্লিক অ্যাসিড (সংক্ষেপে RNA), লিপিড এবং কার্বো-হাইড্রেট নামক জৈব পদার্থে পূর্ণ থাকে। ইহারা বৃহৎ আকৃতির বিশেষ বিশেষ জৈব পদার্থের অণু এবং এই সকল উপকরণের সমবায়ে কোষের নানা ধরণের সাজসজ্জা ও কাঠামো গঠিত হইয়া থাকে।

প্রোটিন অতিকায় বৃহৎ বৃহৎ অণুর সাহায্যে রচিত। ইহার এক-একটি অণুতে ন্যূনাধিক 5000 পরমাণু বর্তমান থাকিতে পারে। মূলতঃ নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন সালফার, ফস্‌ফরাস ইত্যাদি মৌলের পরমাণু প্রোটিনের অণুতে থাকিতে পারে। জলের পরই প্রোটিনের অণু কোষের অধিকাংশ স্থান জুড়িয়া থাকে। অ্যামিনো অ্যাসিড নামক কতক-গুলি জৈব অ্যাসিড আছে, যাহাদের সম্মিলনে প্রোটিন অণু রচিত হয়। প্রায় 400 অ্যামিনো অ্যাসিড শৃঙ্খলের মত পরস্পর সংলগ্ন হইয়া জট পাকাইয়া গোলাকার, চ্যাপ্টা চাকৃতি অথবা দীর্ঘাকার প্রোটিন অণুর রূপ ধারণ করে। কোষের মধ্যে একপ্রকার স্বতন্ত্র প্রোটিন বর্তমান। এইগুলিকে বলা হয় জৈব অনুঘটক বা এনজাইম (Enzyme), যাহার সংস্পর্শে প্রাণের প্রভাবে পদার্থের যাবতীয় রূপান্তরণ-প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়।

DNA কোষের মধ্যে বর্তমান অণুগুলির মধ্যে সবপেক্ষা বৃহত্তম এবং উহাদের এক-একটি অণুতে দশ লক্ষ পর্যন্ত পরমাণু থাকিতে পারে। ইহারা অত্যন্ত স্বতন্ত্র প্রকৃতির অণু। ইহাদের মধ্যে জীবের বংশধারার স্বাতন্ত্র্য এবং কোষের ভিতরকার ক্রিয়াকলাপে নক্সা ও পরিকল্পনা নিহিত থাকে। নিউক্লিওটাইড নামক একপ্রকার পদার্থের সম্মিলনে DNA অণু রচিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে তিন সহ নিউক্লিওটাইড অণু পরস্পর সংলগ্ন হইয়া এক-একটি DNA অণু রচনা করে। মোটের উপর চারি প্রকার নিউক্লিওটাইড লক্ষ্য করা গিয়াছে এবং উহারা শৃঙ্খলিত হইয়া যে DNA অণু রচনা করে, তাহা এক-একটি স্বতন্ত্র ধরণের কুণ্ডলী (Helix) পাকাইয়া থাকে। এই চারি প্রকার নিউক্লিওটাইড যে ভিন্ন ভিন্ন ক্রমপর্যায়ে সজ্জিত থাকে, তদনুসারে বংশধারার স্বাতন্ত্র্যমূলক তথ্য সঙ্কেতে নির্দেশিত হয়। এইরূপ সাঙ্কেতিক নির্দেশকে প্রাণের ভাষা (Language of life) বলা হইয়াছে।

রিবোনিউক্লিক অ্যাসিড বা RNA অণু দেখিতে DNA অণুর মত। এই সকল অণুও নিউক্লিওটাইড নামক পদার্থের সমবায়ে রচিত। তবে DNA অণুতে বর্তমান নিউক্লিওটাইড হইতে এই সকল নিউক্লিওটাইড কিছু স্বতন্ত্র ও পৃথক। RNA অণু কোষের নানা কাজ করিয়া থাকে এবং DNA অণুতে নিহিত ভবিষ্যৎ ক্রিয়াকলাপের নক্সা ও পরিকল্পনানুযায়ী সংবাদ ও নির্দেশ কোষের অবশিষ্ট অংশ, তথা জীবদেহের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ভিন্ন ভিন্ন কোষগুলির কার কি কাজ এবং কিভাবে তাহা সম্পাদন করিতে হইবে, তাহার নির্দেশ বহন করিয়া নেয়। স্মরণীয় যে, DNA ও RNA নিউক্লিয়াস হইতে উৎপন্ন হয়।

লিপিড বলিতে স্নেহজাতীয় পদার্থ (মাখন, চর্বি ইত্যাদি), মোম, কোলেষ্টেরল প্রভৃতি অন্যান্য ষ্টেরলজাতীয় পদার্থ এবং অপরাপর চর্বি-সদৃশ পদার্থকে বুঝায়। কোষের ঝিল্লী নির্মাণে ইহাদের প্রয়োজন হয়। কোষের অনেকখানি স্থান জুড়িয়া ঝিল্লী বর্তমান, সুতরাং লিপিডের ভূমিকাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

কার্বোহাইড্রেট শর্করাজাতীয় পদার্থ। সহস্র সহস্র গ্লুকোজ অণু পরস্পর সংলগ্ন হইয়া সম্মিলিত অবস্থায় এক এক ধরণের কা

রচনা করে। কোষের প্রাচীর নির্মাণ করিতে একপ্রকার কার্বোহাইড্রেটের প্রয়োজন এবং উহাকে বলা হয় সেলুলোজ। কার্পাস তুলায় সেলুলোজ থাকে। কার্পাস বস্ত্র চিবাইলে মিষ্ট স্বাদ পাওয়া যায় এই জন্য যে, উহার অণু বিদীর্ণ হইলে টুক্‌রা টুক্‌রা গ্লুকোজ অণুতে পরিণত হয়। শক্তির মূল উৎস হইল গ্লুকোজ এবং কার্বোহাইড্রেটের মধ্যে জীবের প্রয়োজনীয় শক্তি ইন্ধনরূপে সঞ্চিত থাকে।

প্রাণের ক্রিয়াকলাপ

আহার—যে কোন প্রকার জীব, তা সে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অ্যামিবাই হউক, কি মানুষই হউক, তাহাদের আচার-ব্যবহার নিরীক্ষণ করিলে প্রাণের কতকগুলি সাধারণ ক্রিয়াকলাপ সকল জীবের মধ্যেই বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। আহার এই প্রকার একটি ক্রিয়া। বাহিরের পরিবেশ হইতে সাধারণ অজৈব বা জড় পদার্থ অথবা অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য আহরণ করা জীবমাত্রের অপরিহার্য কাজ। উহাকে আহারক্রিয়া বলে। আহার না করিলে জীব বাঁচিয়া থাকিতে, বৃদ্ধি পাইতে বা বংশবিস্তার করিতে পারে না। ঝিল্লীর ভিতর দিয়া কোষের মধ্যে খাদ্যদ্রব্য অনুপ্রবেশ করে অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে কোষ কখনও কখনও উক্ত খাদ্যদ্রব্য জড়াইয়া ধরিয়া নিজেদের মধ্যে টানিয়া লয়। দ্বিতীয় প্রণালী একটি বিশেষ ব্যবস্থা, যেমন—অ্যামিবা এইভাবে পরিবেশ হইতে খাদ্য আহরণ করে। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য সকল জীবের ক্ষেত্রে প্রথমোক্ত ঝিল্লী পথে আহার্য কোষের মধ্যে আনীত হয়।

পাক-বিপাক—আহৃত খাদ্যদ্রব্য জীর্ণ হইলে খণ্ডে খণ্ডে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে পরিণত হয় এবং ঐ সকল পদার্থ হইতে কোষের চাহিদামত উহার নানা ধরণের সাজসজ্জা ও কাঠামোর উপযোগী উপাদান বা উপাদানের অংশসমূহ রকমারী পদার্থ রচিত হইয়া থাকে। এইরূপে খাদ্যদ্রব্য জীর্ণ হইবার সময়ে উহা হইতে শক্তি মুক্ত হয় এবং উক্ত মুক্ত শক্তির প্রভাবে রকমারী উপাদান বা উপাদানের অংশসমূহ রচিত হয়। খাদ্যদ্রব্য জীর্ণ হইলে কিভাবে শক্তি মুক্ত হইয়া থাকে, তাহা এখনও সম্পূর্ণরূপে জানা যায় নাই। যাই হউক, কোষের অভ্যন্তরে খাদ্যদ্রব্য জীর্ণ হইবার ফলে যে সকল রূপান্তর সাধিত ও শক্তি নির্গত হয়, সেই সকল ব্যাপারকে বিপাক ক্রিয়া বা বৈজ্ঞানিক ভাষায় মেটাবলিজম (Metabolism) বলা হয়। কোন পদার্থ জীর্ণ বা ধ্বংস হইয়া সরল-প্রকৃতির নূতন পদার্থের উদ্ভব, যাহা বিশ্লেষণ এবং জীর্ণ বা ধ্বংসপ্রাপ্ত পদার্থ হইতে জটিল প্রকৃতির নূতন পদার্থের উদ্ভব, যাহা সংশ্লেষণ নামে পরিচিত, ধ্বংসাত্মক ও রচনাত্মক এই উভয়বিধ রূপান্তর সাধন বিপাকক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত।

বর্জনীয় পদার্থ পরিত্যাগ বিপাকক্রিয়ার ফলে এমন কতকগুলি পদার্থ উৎপন্ন হয়, যাহা প্রাণের কার্যের উপযোগী হয় না, বরং সেইগুলি থাকিলে প্রাণের সহায়তা না হইয়া বিঘ্ন সৃষ্টি হয়, উহাদিগকে বলা হয় বর্জনীয় পদার্থ। এই সকল পদার্থ পরিত্যাগ করা কোষের একটি সাধারণ ধর্ম। যেমনভাবে ঝিল্লীপথে খাদ্যদ্রব্য অনুপ্রবেশ করে, অনুরূপভাবে বর্জনীয় পদার্থ উহার ভিতর দিয়া বহির্গত হইয়া যায়। আবার অনেক ক্ষেত্রে কোন কোন কোষের স্থানে স্থানে বর্জনীয় পদার্থ বিশেষভাবে সঞ্চিত হয়। সেই সকল স্থান ভ্যাকুওল (Vacuole) নামে পরিচিত এবং বর্জনীয় পদার্থে ভর্তি হইয়া গেলে কোষ উহাদিগকে যথাসময়ে ঠেলিয়া বাহিরে দূর করিয়া দেয়।

বৃদ্ধি ও পুষ্টি—বিপাকক্রিয়ার পরিণামে রকমারী পদার্থ উৎপন্ন হয়। উহাদের ভিতর হইতে DNA অণুর উপাদান তৈয়ারি হয় এবং উহাদের সকলকে সাজাইয়া কোষের

ভিতর রচনাত্মক অন্যান্য উপাদান বা উপাদানের অংশসমূহ গড়িয়া উঠিতে থাকে। ক্রমে ক্রমে কোষ নিজ চাহিদা অনুযায়ী আপন সাজসজ্জায় সজ্জিত হইতে থাকে। উহা আকারে বড় হইতে থাকে এবং ওজনে বাড়িতে থাকে। এইভাবে ক্রমশঃ জীবের বৃদ্ধি ও পুষ্টিলাভ হয়।

বংশবিস্তার—বৃদ্ধি পাইতে পাইতে জীবের মধ্যে আপনার মত আর একটি জীব রচনা করিবার তাগিদ দেখা দেয়। অপর আর একটি কোষের উপযোগী যাবতীয় পদার্থ উৎপন্ন হইলে উহারা মূল কোষ হইতে স্বতন্ত্র হইবার জন্য উন্মুখ হয় এবং যথাসময়ে অপর একটি পৃথক কোষে পরিণত হয়। ইহাই জীবের সহজ ও সরল বংশবিস্তারের উপায়। ইহা ছাড়া বহু কোষ নানাবিধ জটিল প্রণালীর সাহায্যে নিজের মত ভিন্ন আর একটি কোষ নির্মাণ করিয়া থাকে। বংশবিস্তার বিশেষ এক ধরণের বৃদ্ধি ও পুষ্টি ছাড়া আর কিছু নয়।

উত্তেজনা—যে পরিবেশে কোষ বিরাজ করে, সেখান হইতে উহা নানারূপ উত্তেজনা পাইতে পারে। আলোক, তাপ, বৈদ্যুতিক আঘাত, কোন রাসায়নিক পদার্থ বা আরও নানারূপে উত্তেজনা আসিতে পারে। উত্তেজনার অভিমুখে অগ্রসর হইয়া বা উহা হইতে দূরে সরিয়া গিয়া কোষ সাড়া দিতে পারে। কোষের আকার বদল বা উহার ভিতর নানাবিধ রাসায়নিক রূপান্তর সাধনের মধ্য দিয়াও সাড়া মিলিয়া থাকে। উত্তেজনার সাড়া দিবার নাম স্পর্শ-কাতরতা।

আহার, বিপাক, বর্জনীয় পদার্থ পরিত্যাগ, বৃদ্ধি ও পুষ্টি, বংশবিস্তার এবং উত্তেজনা এই ছয়টি সাধারণ কর্ম ভিন্ন কোষের বিশেষ বিশেষ কাজ আছে। স্নায়ু-কোষ (Nerve Cell) জীব-দেহের একস্থান হইতে অন্য স্থানে উত্তেজনা (Impulse) বহন করিয়া লইয়া যায়। পেশীতে অবস্থিত কোষ সঙ্কোচন ও প্রসারণের ফলে বল ও গতিবিধি উৎপন্ন হয়। উদ্ভিদের সবুজ পাতায় অবস্থিত কোষ সূর্যালোকের তেজ সংগ্রহ করিয়া উহার সাহায্যে জল ও কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস হইতে গ্লুকোজ সংশ্লেষণ করে এবং অক্সিজেন নির্গত হয়। প্রাণীদেহে রক্তের কোষ (Blood cell) অক্সিজেন গ্যাস এক স্থান হইতে স্থানান্তরে বহন করিয়া নিয়া যায় এবং দেহের মধ্যে উৎপন্ন কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস বাহির করিয়া আনে।

প্রাণ ও মন—কোষের অভ্যন্তরে বিপাক ক্রিয়াজনিত রূপান্তরসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া বিজ্ঞানীরা কোষে কিভাবে শক্তি নির্গত হয়, কিভাবে বিভিন্ন কোষনির্গত শক্তির ব্যবহার হয় ইত্যাদি বহু বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু বহু বিষয়ে এখনও আরও অনেক কিছু জানিবার আছে। মানুষের মন বলিয়া যে ব্যাপারটি আছে, সে বিষয়ে বিজ্ঞানীরা খুব বেশী দূর অগ্রসর হইয়াছেন বলা যায় না। মন কি কেবলমাত্র মানুষের কোষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, না উহা অন্যান্য সকল জীবের কোষের মধ্যেও তৎপর?—সেই প্রশ্নের উত্তর মিলিয়াছে কি না, জানা নাই। অথচ মজার ব্যাপার এই যে, মানুষ জানিব বলিয়া মনে করিলেই চেষ্টা হয় ও চেষ্টা হইতে পরিণামে জানা যায়। সুতরাং এত কিছু জ্ঞান আহরণের মূলে মনের বলই তৎপর হয় বেশী। মনের সহিত প্রাণের কিরূপ সম্পর্ক কিংবা প্রাণ ও মন স্বতন্ত্র কি না—এই সকল বিষয় রহস্যে ঢাকা পড়িয়া আছে। তাঁহা ভেদ করিব বলিয়া মানুষ মনে করিলে অবশ্যই একদিন তাহা সম্ভব হইবে।

জ্বালানী ও শক্তি

মনমোহন ঘোষ

সাধারণ অর্থে জ্বালানী বলতে তাকেই বোঝায়, যার প্রজ্বলনে আগুন তথা তাপ সৃষ্টি হয়; যেমন—কাঠ, কয়লা, বিভিন্ন তেল ইত্যাদি। রাসায়নিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, এগুলি সবই কার্বনবহুল। প্রধানতঃ বাতাসের অক্সিজেনের সংস্পর্শে এই কার্বনের দহনের ফলে এদের প্রজ্বলনে তাপের সৃষ্টি হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, জ্বালানী পুড়িয়ে আমরা পাচ্ছি তাপ, যা এক প্রকার শক্তি। আমরা জ্বালানী ব্যবহার করি কোন কাজ করবার উদ্দেশ্যে। এই কাজ করবার ক্ষমতাকেই আমরা শক্তি বলে থাকি। তাহলে জ্বালানী থেকে আমরা নিশ্চয়ই শক্তি পেয়ে থাকি। জ্বালানীর ভিতরকার এই শক্তিকে জানতে হলে কার্বনের দহন প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করা দরকার। এই শতাব্দীর প্রথম দিকে আইনস্টাইন প্রমাণ করেন, পদার্থমাত্রেই শক্তির একটি ভাণ্ডার এবং এই পদার্থের বিলোপ সাধনে ঐ সুপ্ত শক্তির বিকাশ সম্ভব। এই জ্বালানীর দহন তার এক বড় প্রমাণ। বস্তুতঃ জ্বালানী দহনে উদ্ভূত তাপ—তার দাহ্য পদার্থের রূপান্তরের ফলে উদ্ভূত শক্তির একটি বিশেষ রূপ। এই শক্তি ক্ষেত্রবিশেষে আলোক শক্তি রূপেও দেখা দেয়। পদার্থ হিসাবে জ্বালানীর বিশেষ গুণ হচ্ছে এই যে, এর ভিতরকার সুপ্ত শক্তিকে আমরা ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিতরূপে বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে আমাদের কাজে লাগাতে পারি। শক্তির নিয়ন্ত্রিত উৎসকেই জ্বালানীরূপে ধরলে আমাদের সম্মুখে বহু জিনিষই জ্বালানী বলে মনে হবে। যেমন—খাদ্য, যা খেয়ে আমরা জীবনী শক্তি পাই, তা নিশ্চয়ই আমাদের জীবনী শক্তির জ্বালানী। এরকম সকল জ্বালানীকে একযোগে কেনা সম্ভব নয়। সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গীতে আমরা যাদের জ্বালানী বলে থাকি, প্রথমে তাদের কথায় আসা যাক। এরা প্রধানতঃ তিন প্রকার—কঠিন, তরল ও গ্যাসীয়।

কঠিন জ্বালানী—যেমন কাঠ ও কয়লা আমাদের অতি পরিচিত ও বহুল প্রচলিত জ্বালানী। জ্বালানী হিসাবে অবশ্য কাঠের চেয়ে কয়লার ব্যবহারই উৎকৃষ্ট। কারণ এদের দাহ্য পদার্থ হচ্ছে কার্বন এবং কয়লাতে কাঠের চেয়ে কার্বনের পরিমাণ বেশী থাকায় এর জ্বালানী গুণ কাঠের চেয়ে বেশী। এই কয়লা পাওয়া যায় খনি থেকে। কিন্তু সদ্যঃপ্রাপ্ত খনিজ কয়লাকেই জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা অর্থনৈতিক দিক থেকে ক্ষতিকর। তাছাড়া এর প্রজ্বলনে এত ধোঁয়ার সৃষ্টি হয় যে, ঘনবসতি-পূর্ণ নাগরিক জীবন এর ব্যবহারে অস্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে। সদ্যঃপ্রাপ্ত এই খনিজ কয়লাকে কেন্দ্র করে আজ গড়ে উঠেছে এক বিরাট রাসায়নিক শিল্প—যেখানে কয়লাকে বায়ুশূন্য অবস্থায় পাতিত করে এর জ্বালানী-মূল্যের চেয়ে আরও অধিক মূল্যবান রাসায়নিক পদার্থসমূহ উৎপাদন করা হয়। এই পাতিত কয়লার জ্বালানী গুণ কিন্তু নষ্ট হয় না এবং জ্বালানী হিসাবে এর ব্যবহারে কম ধোঁয়া হয়। কয়লাতে কার্বনের পরিমাণ হিসাবে একে চার ভাগে ভাগ করা হয়—(1) পিট—কার্বন 60%; (2) লিগ্নাইট—কার্বন 67%; (3) বিটুমিনাস—কার্বন 88·5%; (4) অ্যানথ্রাসাইট—কার্বন 74%। কার্বনের তারতম্যে এদের জ্বালানী গুণও বিভিন্ন। কয়লার নিজস্ব এই জ্বালানী গুণ ছাড়াও এই

কয়লা থেকেই আমরা আরও নানারকম তরল ও গ্যাসীয় জ্বালানী পেতে পারি। স্টীম ইঞ্জিন চালনায়, বিভিন্ন ধাতু নিষ্কাশন চুল্লীতে এবং গৃহস্থালীর কাজে তাপোৎপাদক হিসাবে কয়লা আজও অপরিহার্য ও উৎকৃষ্ট।

তরল জ্বালানী—তরল জ্বালানী বলতে আমরা প্রধানতঃ পেট্রোলিয়ামের কথাই আলোচনা করব। কয়লার মত পেট্রোলিয়ামও আমরা খনি থেকে পাই। বহু আগেই যদিও এই পেট্রোলিয়ামের সঙ্গে মানুষের পরিচয় ছিল, তথাপি 1859 সালে প্রথম পেনসিলভেনিয়াতে কূপ খনন করে পেট্রোলিয়াম তোলা হয়। পেট্রোকেমিক্যাল উৎপাদনে এই পেট্রোলিয়াম গড়ে তুলেছে এক বিরাট শিল্প-রসায়ন। এই খনিজ তেলটি বিভিন্ন হাইড্রোকার্বন যৌগের একটি সংমিশ্রণ মাত্র। এদের মধ্যে প্রধান দাহ্য উপাদান হচ্ছে প্যারাফিন ও গন্ধবহ (Aromatic) হাইড্রোকার্বন যৌগ। কার্বন ও হাইড্রোজেন সংযোগে গঠিত এই হাইড্রোকার্বনগুলির মধ্যেই মূলতঃ পেট্রোলিয়ামের দাহ্যতা প্রচ্ছন্ন। বিভিন্ন স্ফুটনাঙ্কবিশিষ্ট এই হাইড্রোকার্বন যৌগের মিশ্রণ তথা খনিজ পেট্রোলিয়ামকে আংশিক পাতন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন তাপমাত্রায় পাতিত করলে আমরা বিভিন্ন গুণের অনেক রকম তরল জ্বালানী পেতে পারি। যেমন 70°—100°C-এর মধ্যে পাতিত অংশকে গ্যাসোলিন বা পেট্রল বলা হয়। বিমান চালনায় ও বিভিন্ন মোটর ইঞ্জিনের জ্বালানীরূপে এটি ব্যবহৃত হয়। 150°—300°C-এর মধ্যে পাতিত অংশ হচ্ছে আমাদের অতি পরিচিত জ্বালানী কেরোসিন। 350°C-এর উপরের তাপমাত্রায় পাতিত অংশকে ডিজেল তেল বলা হয়। ডিজেল ইঞ্জিন চালাতেই এটি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়।

যে সব দেশে খনিজ পেট্রোলিয়ামের অভাব, সেখানে কয়লায় হাইড্রোজেনেশন প্রক্রিয়ায় কৃত্রিম উপায়ে পেট্রল তৈরি করা হয়। রাসায়নিক বিচারে এই প্রক্রিয়ায় কার্বনের সঙ্গে (কয়লা) প্রায় 400—450°C তাপমাত্রায় 200 গুণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপে হাইড্রোজেন মিশিয়ে হাইড্রোকার্বন যৌগ পেট্রল তৈরি হয়। একে বার্জিয়াস (Berzius) পদ্ধতি বলে। অপর একটি প্রক্রিয়া যেখানে কার্বন-মনোক্সাইডের (CO) সঙ্গে 200°C তাপমাত্রায় হাইড্রোজেনের বিক্রিয়ায় হাইড্রোকার্বন যৌগ পেট্রল তৈরি হয়, তাকে ফিসার-ট্রপাস পদ্ধতি বলে। তরল জ্বালানীতে সাধারণতঃ এর ভিতরকার স্থিতিশক্তি বিভিন্ন যান্ত্রিক কৌশলে বিভিন্ন যানবাহনে গতিশক্তিতে এবং অনেক ক্ষেত্রে আলোক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

গ্যাসীয় জ্বালানী—রাশিয়া ও আমেরিকার বিভিন্ন জায়গায় ভূগর্ভ থেকে এক রকম গ্যাস নির্গত হতে দেখা যায়। আগুনের সংস্পর্শে এই গ্যাসটি জ্বলে ওঠে। বহুদিন আগে থেকেই গ্যাসটির এই প্রজ্বলন ক্ষমতা ওদেশের মানুষকে বিস্ময়াভিভূত করেছিল। বর্তমান যুগের বিজ্ঞানীরা গ্যাসটির এই প্রজ্বলন ক্ষমতাকে জানবার জন্যে একে বিশ্লেষণ করে দেখেছেন যে, এর প্রধান দাহ্য উপাদান হচ্ছে হাইড্রোকার্বন যৌগ মিথেন। তাছাড়া এতে রয়েছে আরও অনেক শিল্পজাত রাসায়নিক দ্রব্য। উপযুক্ত পদ্ধতিতে গ্যাসটির দাহ্য উপাদান থেকে অবাঞ্ছিত দ্রব্য আলাদা করে গ্যাসটিকে ঐসব দেশে আলোকদায়ী ও তাপোৎপাদক জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে আরও যে সব কৃত্রিম গ্যাসীয় জ্বালানী ব্যবহার করা হয়, সেগুলি প্রধানতঃ দাহ্য গ্যাস—হাইড্রোজেন, মিথেন, কার্বন মনোক্সাইড, অ্যাসিটিলিন—প্রভৃতির বিভিন্ন অনুপাতের মিশ্রণ। কিছু অদাহ্য গ্যাস, যেমন—নাইট্রোজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইডও কিছু মাত্রায় মিশ্রিত থাকে। এই গ্যাসীয় জ্বালানীগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—কোল গ্যাস, ওয়াটার গ্যাস ও প্রডিউসার গ্যাস।

কোল গ্যাস—কয়লার অন্তর্ধূম পাতনের (Destructive distillation) সময় যে গ্যাসীয় পদার্থের সৃষ্টি হয়, তার দহনক্ষমতা প্রথম আবিষ্কার করেন 1668 সালে জন ক্লেটন নামে ইংল্যাণ্ডের একজন বিজ্ঞানী। বিটুমিনাস কয়লার অন্তর্ধূম পাতনে যে গ্যাসীয় পদার্থের সৃষ্টি হয়, তাথেকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় পরিস্রুত করে অবাঞ্ছিত দ্রব্য বিতাড়িত করবার পর যে গ্যাস পাওয়া যায়, সেটাই কোল গ্যাস নামে পরিচিত। এর ভিতর দাহ্য গ্যাসগুলি হচ্ছে—হাইড্রোজেন, মিথেন, অ্যাসিটিলিন, ও কার্বন মনোক্সাইড।

ওয়াটার গ্যাস—কয়লাকে প্রায় 1000°C তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করে তার উপর দিয়ে জলীয়-বাষ্প পাঠিয়ে এই গ্যাসটি তৈরি করা হয়। এটি প্রায় সম-আয়তনের কার্বন মনোক্সাইড ও হাইড্রোজেন গ্যাসের মিশ্রণ।

বিক্রিয়া :—কয়লা—(C)—জলীয় বাষ্প (H_2O)→ $CO+H_2$.

এছাড়াও এতে রয়েছে 1% মিথেন, 6% নাইট্রোজেন ও 3% কার্বন ডাইঅক্সাইড। উপরের বিক্রিয়াটি তাপহারক, তাই ঐ বিক্রিয়া কিছুক্ষণ চলবার পর কয়লার তাপমাত্রা হ্রাস পায় এবং তার ফলে কার্বন মনোক্সাইডের সঙ্গে অদাহ্য কার্বন ডাইঅক্সাইডও তৈরি হতে থাকে [$C+2H_2O \rightarrow CO_2+2H_2$]। তাই পুনরায় তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্যে বিক্রিয়া-কক্ষে জলীয় বাষ্পের পরিবর্তে কিছুক্ষণ শুষ্ক বায়ু পাঠানো হয়। এই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তির দ্বারাই একটানা ওয়াটার গ্যাস তৈরি হয়।

প্রডিউসার গ্যাস—এই গ্যাসটি অপেক্ষাকৃত কম তাপোৎপাদক। কারণ এর ভিতর বেশীর ভাগই থাকে অদাহ্য গ্যাস নাইট্রোজেন (64%)। এই গ্যাসটি তৈরি করা হয় প্রায় 1000°C তাপমাত্রায় উত্তপ্ত কয়লার উপর পরিমিত শুষ্ক বায়ুপ্রবাহ চালিয়ে।

কয়লা 2(C) + বায়ু (O_2) → 2CO

গ্যাসটির দাহ্য গ্যাসের পরিমাণ কার্বন মনোক্সাইড 20%, হাইড্রোজেন 10%, মিথেন 8%, অদাহ্য গ্যাস কার্বন ডাইঅক্সাইড 4%। উপরিউক্ত গ্যাসগুলি ছাড়াও কিছু কিছু গ্যাসীয় মিশ্রণ, যেমন অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন ও অ্যাসিটিলিন যথাক্রমে অক্সিহাইড্রোজেন ও অক্সিঅ্যাসিটিলিন শিখা নামে অতি উচ্চ তাপোৎপাদক হিসাবে ওয়েল্ডিং-এর কাজে ব্যবহৃত হয়।

যন্ত্রযুগের মানুষ হয়ে আমরা দৈহিক শক্তি ছেড়ে বিভিন্ন কাজকর্মে আজকাল যন্ত্রশক্তির উপর বেশী নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি। হিসাব করে দেখা গেছে, গত দুই শতাব্দীতে মাথাপিছু শক্তির ব্যবহার বেড়ে গেছে দু-হাজার গুণ। শক্তির এই ব্যবহার ও তার সঙ্গে পৃথিবীর লোক সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েই চলেছে। কিন্তু এতক্ষণ যন্ত্রশক্তির উৎস হিসাবে যে সব জ্বালানীর কথা আমরা আলোচনা করলাম, সেই সব খনিজ জ্বালানী অদূর ভবিষ্যতে একদিন ভূগর্ভ থেকে নিঃশেষিত হয়ে যাবে। তাহলে সে দিন বর্তমান যন্ত্রনির্ভরশীল মানুষের অবস্থা কি হবে?

বিজ্ঞানীরা বেশ কিছুদিন আগে থেকেই সেই বিপদের সমাধানের চেষ্টা সুরু করেছেন এবং সাফল্যলাভের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে তাঁরা আজ পৌঁছে গেছেন বৃহৎ শক্তির উৎস পারমাণবিক জ্বালানীর দ্বারে। আরও যে শক্তির ব্যবহার মানুষ জ্বালানীর পরিবর্তে করবার চেষ্টা করেছে ও করবে—সেটি হলো সৌরশক্তি।

পূর্বে আলোচিত জ্বালানীসমূহের যে বিক্রিয়ায় পদার্থ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়, সেই বিক্রিয়ায় জ্বালানী পদার্থের পরমাণুর বহির্ভাগের ইলেকট্রনসমূহই অংশগ্রহণ করে। কিন্তু পরমাণুর কেন্দ্রীন এই বিক্রিয়ায় অবিকৃত থাকে। পরমাণুর গঠন-প্রকৃতি আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, পর-

মাণুর প্রায় সমগ্র ভরবিশিষ্ট কেন্দ্রীনে নিউট্রন ও প্রোটন কণার এক অতি উচ্চ বন্ধন শক্তি বর্তমান। কোন বিক্রিয়ায় যদি এই পরমাণুর কেন্দ্রীনকে অংশগ্রহণ করিয়ে তার ভিতরে বর্তমান ঐ উচ্চশক্তিকে কিছু অংশে বিমুক্ত ও নিয়ন্ত্রিত করা যায়, তবে পৃথিবীর সমগ্র জ্বালানী-সম্পদ সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হয়ে গেলেও মানুষের শক্তির অভাব ঘটবে না। তেজস্ক্রিয় পদার্থ-সমূহ থেকে এই শক্তি স্বতঃই নির্গত হচ্ছে, কিন্তু তা মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। 1939 সালে অটো হান এবং স্ট্র্যাসম্যান প্রথম পরমাণু-কেন্দ্রীনের এই প্রচণ্ড শক্তির নিয়ন্ত্রিত বিমুক্তি ঘটান। এই প্রক্রিয়াতে আপাতশক্তিহীন ইউরেনিয়াম পরমাণু-কেন্দ্রীনকে বিশেষ কৌশলে নিউট্রনের আঘাতে বিভাজিত করে এক নিয়ন্ত্রিত প্রচণ্ড শক্তির বিকাশ ঘটানো হয়। এই প্রক্রিয়ায় এক গ্র্যাম ইউরেনিয়াম থেকে যে শক্তি পাওয়া যায়, তা প্রায় 2.1 টন গ্যাসোলিনের দহনে উদ্ভূত শক্তির সমান।

বিজ্ঞানীরা সৌরবিকিরণকেও শক্তির উৎসরূপে ব্যবহারের চেষ্টা বহু আগে থেকেই করে আসছেন। কিন্তু সরাসরি এই বিকিরণকে শক্তির উৎসরূপে ব্যবহার করা কঠিন ও ব্যয়সাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য একটা কথা এখানে মনে রাখা দরকার যে, পৃথিবীতে যেখান থেকে যতটুকু শক্তিই আমরা পাই না কেন, তা কিন্তু পরোক্ষভাবে ঐ সূর্যেরই অবদান। সরাসরি সৌরবিকিরণকে ব্যবহার করবার উদ্দেশ্যে 1932 সালে ক্যালিফোর্নিয়ায় একটি সৌরচুল্লী নির্মিত হয়। এই চুল্লীতে বক্রতল আয়না ব্যবহার করে সৌরতাপ কেন্দ্রীভূত করে 3500°C পর্যন্ত তাপমাত্রা পাওয়া গেছে। বহু দেশে আজ-কাল রান্নার কাজে সৌর কুকারেরও ব্যবহার সুরু হয়েছে। আমেরিকায় ঘর গরম করবার জন্যে সৌর-বিকিরণকে সরাসরি কাজে লাগানো হচ্ছে।

প্রবাল দ্বীপের জন্ম-রহস্য

শ্রীমুকুট ঘোষাল

দিগন্তপ্রসারী সাগরজলের মাঝে জেগে থাকা প্রবাল দ্বীপ তার রহস্যময় সৌন্দর্যে যুগে যুগে মানুষকে মুগ্ধ করছে। আধুনিক যুগের বিজ্ঞানীরা শুধুমাত্র তার সৌন্দর্যেই মুগ্ধ হয়ে থাকেন নি, তাঁরা প্রবাল দ্বীপকে বিজ্ঞানের দৃষ্টি দিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন, চেষ্টা করেছেন তার জন্ম রহস্য ব্যাখ্যার। উনবিংশ শতকের মাঝা-মাঝি থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর নানা প্রান্তে অসংখ্য ভূতত্ত্ববিদ্ আর সমুদ্র-বিজ্ঞানী প্রবাল দ্বীপকে আরও ভালভাবে জানবার এবং তার জন্ম-রহস্য ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করছেন। এই যুগের আধুনিকতম যন্ত্রপাতি আর প্রযুক্তিবিদ্যা সেই গবেষণার পথ অনেক প্রশস্ত হয়েছে। কিন্তু প্রবাল দ্বীপের জন্ম-রহস্য আজও প্রশ্নাতীত ভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় নি।

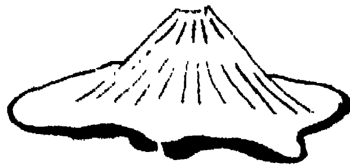
প্রবাল দ্বীপের বৈশিষ্ট্য

অতি ক্ষুদ্র সামুদ্রিক প্রাণী প্রবাল কীট তাদের দেহপঞ্জর দিয়ে গড়ে তোলে প্রবাল দ্বীপ। অগণিত মৃত আর জীবিত প্রবালের দেহাবশেষ লক্ষ লক্ষ বছর ধরে জমীভূত হতে থাকে সাগরতলে। তাদের এই সাধনা পূর্ণতা পায় প্রবাল দ্বীপের

জন্মে। ভূতাত্ত্বিক পরীক্ষায় জানা গেছে যে, প্রবালের সঙ্গে ঝিনুক, শঙ্খ ইত্যাদি শক্ত আবরণযুক্ত নানা ধরণের সামুদ্রিক প্রাণী একত্রে স্তূপীভূত হয়। সেই কারণে প্রবাল দ্বীপকে জৈবিক স্তূপ (Organic mound) বলাই যুক্তিসঙ্গত। এই প্রবাল দ্বীপ সাধারণতঃ উষ্ণমণ্ডলে 25° উঃ এবং 25° দঃ অক্ষাংশের মধ্যে অগভীর সমুদ্রে দেখা যায়। তার কারণ, একমাত্র এই অঞ্চলের সাগরই প্রবালের জীবনধারণ ও বৃদ্ধির পক্ষে অনুকূল।

প্রবাল দ্বীপসমূহকে তাদের গঠন-বৈচিত্র্য অনুযায়ী মোটামুটি ছয় ভাগে ভাগ করা যায়; যেমন—

1. প্রবাল-বেলা—এগুলি সরাসরি পাথুরে



1নং ক চিত্র—প্রবাল-বেলা

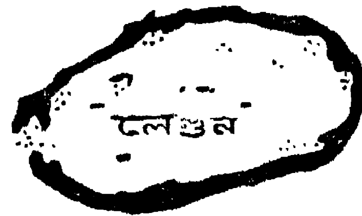
তটভূমির গায়ে গড়ে ওঠে ও তটভূমির অনুরূপে বৃদ্ধি পায় (1নং ক চিত্র)।

2. প্রবাল-প্রাচীর—এই প্রাচীর তটভূমি থেকে দূরে সৃষ্টি হয় এবং তটভূমি থেকে একটি গভীর লেগুনের (সমুদ্রজাত অগভীর উপহ্রদ) দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে (1নং খ চিত্র)।

3. প্রবাল-বলয়—এই ধরণের প্রবাল দ্বীপ



1নং খ চিত্র—প্রবাল-প্রাচীর



1নং গ চিত্র—প্রবাল-বলয়

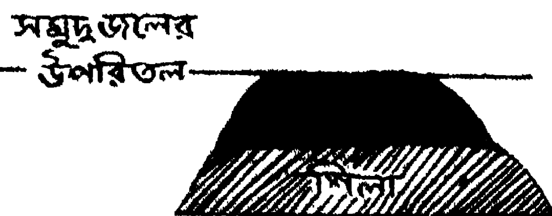
একটি লেগুনকে কেন্দ্র করে বলয়াকারে গড়ে ওঠে (1নং গ চিত্র)।

4. ক্ষুদ্র প্রবাল দ্বীপ—এগুলি সাধারণতঃ কোন বড় লেগুনের ভিতরে উৎপন্ন হয়। এগুলি দুই রকমের হয়ে থাকে; যেমন—দণ্ডাকার বা Pinnacles বা Knolls এবং ক্ষুদ্র প্রবাল বসতি বা প্যাচ রিফ (Patch reef) (1নং ঘ চিত্র)।

5. টেবিলসদৃশ প্রবাল দ্বীপ—(Table reef) —এই বৃহৎ প্রবাল দ্বীপগুলির কোন লেগুন থাকে না (1নং ঙ চিত্র)

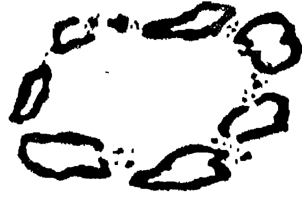


1নং ঘ চিত্র
K—দণ্ডাকার, P—প্যাচ রিফ



1নং ঙ চিত্র
টেবিল রিফ

6. ফারোস (Faros)—এগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবাল-বলয় ও দ্বীপের সমষ্টি এবং সামগ্রিকভাবে



1নং চ চিত্র—ফারোস

কোন বড় প্রবাল-বলয় বা প্রাচীরের অংশ (1নং চ চিত্র)।

প্রবাল দ্বীপের জন্ম-রহস্য

গত দেড় শত বছর ধরে বিজ্ঞানীরা প্রবাল দ্বীপের জন্ম-রহস্যের একটা সুষ্ঠু ব্যাখ্যা দেবার জন্যে চেষ্টা করে আসছেন। কিন্তু তাঁদের সেই অক্লান্ত সাধনা আজও পূর্ণতা লাভ করে নি। নানা রকম মতবাদ গড়ে উঠেছে দিনে দিনে, আবার বদ্‌লে গেছে—বাতিল হয়েছে সেই সব বেলা সৃষ্টি করে (2নং ক চিত্র)। দ্বিতীয় পর্যায়ে ঐ দ্বীপের অধোগমনের সঙ্গে সঙ্গে প্রবাল-বসতি ক্রমশঃ গভীর জলে নেমে যায়। কিন্তু প্রবাল মতবাদ। এই সব মতবাদকে দুটি শ্রেণীতে ফেলা যায়। একদল বিজ্ঞানীর মতে, প্রবাল দ্বীপ সৃষ্টির পিছনে প্রভাব বিস্তার করেছিল সমুদ্রজলের উপরিতলের পরিবর্তন। আর একদল কিন্তু এই মতবাদে বিশ্বাসী নন।

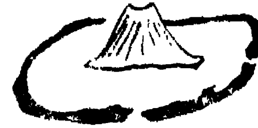
বিভিন্ন যুগে যে সব মতবাদ বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল, সেগুলির মধ্যে তিনটি মতবাদকে অধিকাংশ বিজ্ঞানী সমর্থন করেন। ঐ মতবাদগুলির সারাংশ নীচে দেওয়া হলো—

(ক) ভূপৃষ্ঠের অধোগমন মতবাদ—1837 সালে বিখ্যাত মনীষী চার্লস ডারউইন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রথম প্রবাল দ্বীপের জন্ম-রহস্য ব্যাখ্যা করেন। তাঁর মতে, ভূপৃষ্ঠের অধোগমনই প্রবাল দ্বীপ সৃষ্টির কারণ। তিনি বলেন, প্রবাল দ্বীপ সৃষ্টির প্রাথমিক পর্যায়ে প্রবাল কীট কোন পাথুরে দ্বীপের গায়ে বাসা বাঁধে এবং প্রবাল-



2নং ক চিত্র—প্রাথমিক পর্যায়

কীট গভীর জলে বাঁচতে পারে না। তাই অগভীর জলের পরিবেশ রক্ষা করবার জন্যে তারা ক্রমাগত উপর দিকে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর



2নং খ চিত্র—দ্বিতীয় পর্যায়

ফলে প্রবাল-প্রাচীর গড়ে ওঠে (2নং খ চিত্র)। শেষ পর্যায়ে ভূপৃষ্ঠের ক্রমাগত অধোগমনের ফলে পাথুরে দ্বীপটি সম্পূর্ণ ডুবে যায়, কিন্তু তার চার-



2নং গ চিত্র—শেষ পর্যায়

ধারের প্রবাল-প্রাচীর সমুদ্রজলের উপরিতলের উপর প্রবাল-বলয়রূপে জেগে থাকে (2নং গ চিত্র)।

ডারউইনের এই ব্যাখ্যা অত্যন্ত সরল ও যুক্তিপূর্ণ হলেও প্রশ্নাতীত নয়। বিজ্ঞানীরা এর বিরুদ্ধে নানা রকম প্রশ্ন তুলেছেন। ডারউইনের মতবাদে প্রবাল-বেলা, প্রাচীর ও বলয়কে প্রবাল দ্বীপ সৃষ্টির তিনটি পর্যায় বলা হয়েছে, কিন্তু অনেক

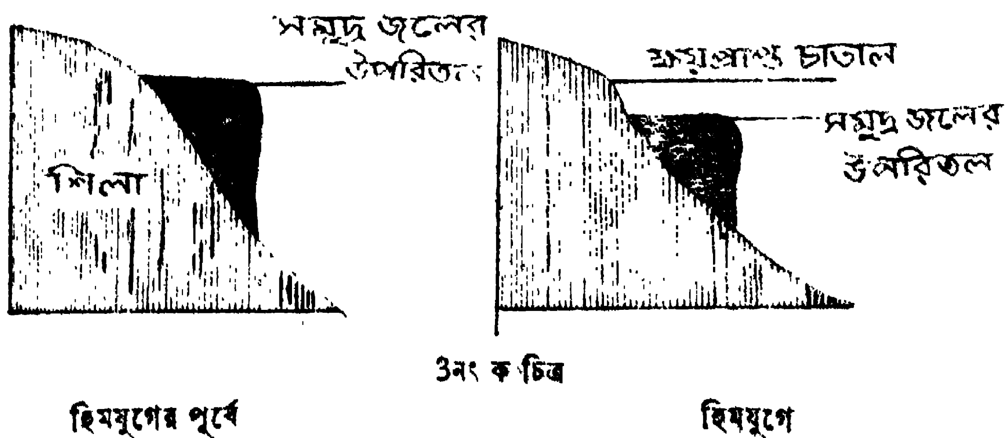
ক্ষেত্রেই এই তিনটি পর্যায়ের সহাবস্থান দেখা যায়। দ্বিতীয়তঃ পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রবাল কীট গভীর জলেও বেঁচে থাকতে পারে। সুতরাং ভূপৃষ্ঠের অধোগমনের সঙ্গে সঙ্গে প্রবাল-বসতি উপর দিকে বৃদ্ধি না পেতেও পারে। আবার বহু প্রবাল-বলয় কোন পাথুরে দ্বীপকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে নি। সুতরাং ডারউইনের মতবাদ সব ক্ষেত্রে কার্যকরী নয়।

বর্তমান যুগের অনেক বিজ্ঞানী অবশ্য এই সব প্রশ্নের জবাব দেবার চেষ্টা করেছেন এবং অনেকেই এই মতবাদকে আংশিক পরিবর্তন করে মেনে নিয়েছেন।

(খ) নিমজ্জিত উচ্চভূমি মতবাদ—1880 সালে জে. জে. মারে একটি নূতন মতবাদের প্রচলন করেন। তিনি ভূপৃষ্ঠের অধোগমনকে প্রবাল দ্বীপ সৃষ্টির অপরিহার্য অঙ্গরূপে মেনে নেন নি। তাঁর মতে, সাগরতলের কোন নিমজ্জিত উচ্চভূমির উপর প্রবাল কীট তাদের বসতি স্থাপন করে এবং উপর দিকে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই ভাবে বৃদ্ধি পেয়ে তারা প্রবাল দ্বীপের জন্ম দেয়। পরে সাগর জলের রাসায়নিক ক্রিয়ায় প্রবাল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে লেগুনের সৃষ্টি হয়।

এই ব্যাখ্যাও বিজ্ঞানীদের সন্তুষ্ট করতে পারে নি। তাঁরা বলেছেন, সাগর জলের রাসায়নিক ক্রিয়ায় লেগুন সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয় এবং লেগুনের তলদেশ পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, সেখানে ক্ষয়কার্যের বদলে অধক্ষেপই (Deposition) প্রাধান্য লাভ করে। আধুনিক যুগে গার্ডিনার এবং অ্যাগাসিজ এই মতবাদের সমর্থক ছিলেন। তাঁরা মারের তত্ত্বকে কিছু পরিবর্তন করে কার্যোপযোগী করবার চেষ্টা করেন।

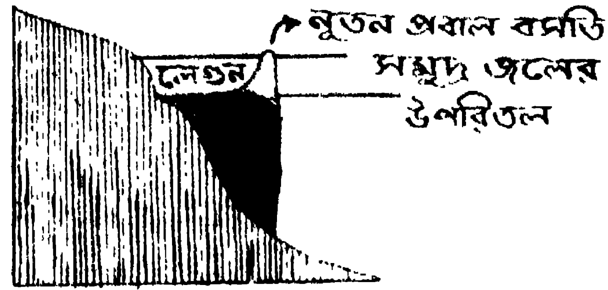
(গ) সমুদ্রজলের উপরিতল পরিবর্তন মতবাদ—1910 সালে আর. ও. ড্যালি এক সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রবাল দ্বীপের জন্ম-রহস্য ব্যাখ্যা করেন। তিনি পৃথিবীর অধিকাংশ লেগুনের গভীরতার একটা সমতা লক্ষ্য করে তাদের জন্মকে পৃথিবীব্যাপী সংঘটিত কোন ঘটনার ফল বলে ধরে নেন। তাঁর মতে, এই ঘটনা ছিল প্লিস্টোসিন (Pliestocene) হিমযুগের সমুদ্রজলের উপরিতল পরিবর্তন। এই হিমযুগের আগমনে সাগরজলের একটা বড় অংশ জমে গিয়ে বরফে পরিণত হয়, ফলে সমুদ্রজলের উপরিতলের পতন ঘটে। এই সময় সাগরজলের তাপমাত্রাও অনেক কমে যায়। এই পরিবেশে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে তটভূমিসংলগ্ন প্রবাল-বসতি বিনষ্ট হয়ে যায় ও তটভূমিগুলি সামুদ্রিক ঢেউয়ের আঘাতের সামনে উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। সামুদ্রিক ঢেউয়ের আঘাত



3নং ক চিত্র

হিমযুগের পূর্বে হিমযুগে

এই সব তট ভূমি ও তৎসংলগ্ন প্রবাল-বসতি ক্ষয়-প্রাপ্ত চাতালের (Truncated bench) রূপ নেয় (3নং ক চিত্র)। হিমযুগের অবসানে সাগর জলের তাপমাত্রা এবং সমুদ্রজলের উপরিতল বৃদ্ধি পেতে থাকে। তখন যে সব প্রবাল কীট জীবিত ছিল, তারা সেই ক্ষয়প্রাপ্ত চাতালের বাইরের কানায় নূতন বসতি স্থাপন করে ও সমুদ্রজলের উপরিতল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উপর দিকে বাড়তে থাকে। এভাবে এক নূতন প্রবাল-প্রাচীরের সৃষ্টি হয়। পুরনো তটভূমি ও নূতন প্রবাল-প্রাচীরের মাঝের ক্ষয়প্রাপ্ত চাতালের অংশ লেগুনের রূপ নেয় (3নং খ চিত্র)।



3নং খ চিত্র—হিমযুগের শেষে

এই মতবাদটি বহুলাংশে যুক্তিপূর্ণ হলেও প্রশ্নাতীত নয়। এর বিরুদ্ধে বলা হয়েছে যে, পৃথিবীর সব লেগুনের গভীরতা সমান নয়। সুতরাং তাদের সবাইকে একই সমুদ্রজলের উপরিতলের পতনের ফলে সৃষ্ট বলা যায় না। দ্বিতীয়তঃ হিমযুগের শীতল সাগরজলে প্রবাল কীটের মৃত্যু সম্পর্কে সঠিক কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। তৃতীয়তঃ বিভিন্ন লেগুনের তলদেশ পরীক্ষা করে জানা গেছে যে, তারা সকলেই ঢেউয়ের ক্ষয়কার্যের ফলে সৃষ্ট চাতালের অংশ নয়।

সুতরাং বিভিন্ন মতবাদ পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে যে, এদের কোনটিই সম্পূর্ণ নির্ভর-যোগ্য নয়। 1923 সালে ডাব্লিউ. এম. ডেভিস প্রবাল দ্বীপের জন্ম-রহস্য ব্যাখ্যাকারী বিভিন্ন মতবাদ আলোচনা করে তাঁর বিখ্যাত পুস্তক 'The Coral Reef Problem' প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে তিনি নানা তথ্য বিশ্লেষণ করে ডারউইনের মতবাদকে কিছুটা পরিমার্জিত আকারে গ্রহণ করেন। তিনি অবশ্য অন্যান্য কয়েকটি মতবাদের অংশবিশেষও কাজে লাগান। তাঁর এই বিশ্লেষণ এক নূতন মতবাদের সৃষ্টি করে। এই মতবাদকে বিমিশ্র মতবাদ বলা যেতে পারে। তবুও অতি সাম্প্রতিক কালে ডেভিসের মতবাদ সর্বজনস্বীকৃত হতে পারে নি। তাঁর ব্যাখ্যার ত্রুটিও বিজ্ঞানীদের নজরে পড়ছে। সুতরাং প্রবাল দ্বীপের জন্ম-রহস্য আজও সম্পূর্ণ ভাবে উদ্‌ঘাটিত হয় নি। আশা করা যায়, অদূরভবিষ্যতে এই তর্কের সুষ্ঠু মীমাংসা সম্ভব হবে।

সঞ্চয়ন

মানুষের তৈরি হৃৎপিণ্ড কার্যকরী হতে বিলম্ব নেই

ওয়াশিংটন শহরের 20 মাইল উত্তরে একটি পশুপালন প্রতিষ্ঠানে সাদা ও কালোয় মিশ্রিত রঙের একটি বাছুর স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে ও তৃপ্তির সঙ্গে ঘাস খাচ্ছে।

সাধারণ দর্শকের পক্ষে আন্দাজ করা সম্ভব নয় যে, প্রাণীটিকে একটি যন্ত্রের সাহায্যে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। যন্ত্রটি এর দেহের মধ্যে হৃৎপিণ্ডকে চালু রেখে রক্ত চলাচলে সাহায্য করছে। গবেষকেরা যন্ত্রটির নাম দিয়েছেন কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড-সহায়ক ব্যবস্থা। যন্ত্রটি প্রাণীর পেটে ও বুকের মধ্যে বসানো থাকে। এই যন্ত্রটি মানুষের তৈরি সম্পূর্ণ একটি হৃৎপিণ্ডের পূর্বাভাস।

যন্ত্রটির সাহায্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে এই বাছুটির মত কয়েকটি প্রাণীকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড কর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবে এই সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হচ্ছে। উদ্দেশ্য হলো, অসুস্থ হৃৎপিণ্ডের বদলে এই যান্ত্রিক হৃৎপিণ্ড বসিয়ে দেওয়া, যাতে মানুষ স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্র সরকার 1964 সালে প্রকল্পটি চালু করেছিলেন। বিরাট যে সব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রকল্প রয়েছে, সেগুলির তুলনায় এই কার্যসূচী সামান্য মাত্র, কিন্তু এর ফল ব্যাপক হতে পারে।

কার্যসূচীর অস্থায়ী প্রধান ডক্টর লাওয়েল টি. হারমিসন 18জন কর্মী নিয়ে বার্ষিক 90 লক্ষ ডলার ব্যয়ে এর কাজ চালান। হাসপাতাল, বিশ্ববিদ্যালয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের লেবরেটরী ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত গবেষণার কাজেই বেশীর ভাগ অর্থ ব্যয়িত হয়। এই রকম 60টি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বর্তমানে 80টি গবেষণার চুক্তি চালু আছে।

প্রকৃত হৃৎপিণ্ডের মতই কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড মূলত: একটি পাম্প বিশেষ। কিন্তু এর নির্মাণ তত সহজ নয়। দেহে ঠিক মত বসে যাবার জন্যে কৃত্রিম হৃৎপিণ্ডটিকে ছোট করা দরকার। এমনভাবে এটি তৈরি করতে হবে, যাতে এথেকে মানুষের দেহের কোন ক্ষতি না হয়। এর মোটর ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি নির্ভরযোগ্য হওয়া চাই, কারণ সেগুলির উপর মানুষের জীবন নির্ভর করছে।

পাম্পটির যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় দেহের পরিবর্তনশীল প্রয়োজনের উপযোগী করে তুলতে হবে পাম্পটিকে।

শীঘ্রই এরূপ একটি সম্পূর্ণ কৃত্রিম হৃৎপিণ্ডের প্রাথমিক মডেল প্রাণীর দেহে পরীক্ষা করা হবে বলে আশা করা যায়।

অনবরত তালে তালে সম্প্রসারিত হবার মত উপাদানের অভাবই কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড নির্মাণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা। আবার রক্ত-প্রবাহ প্রবাহ জমাট না বেঁধে অব্যাহত থাকবে অথচ কোষ প্রভৃতির কোন ক্ষতি হবে না, এরকম সম্পূর্ণ উপযোগী উপাদানও পাওয়া যায় না। বর্তমানে কার্যসূচীর অর্থভাণ্ডারের এক-তৃতীয়াংশ ব্যয় হচ্ছে রক্তের অনুকূল উপাদানের সন্ধানেই।

কৃত্রিম হৃৎপিণ্ডে রোগীর নিজের দেহের কোষ লাগিয়ে এই সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান সম্পর্কে পরীক্ষা করা হচ্ছে। জীবজন্তুর উপর পরীক্ষা করে দেখা গেছে, রোগীর পায়ের অভ্যন্তরস্থ রক্তনালিকা থেকে কোষ চেঁচে নিয়ে যদি কৃত্রিম হৃৎপিণ্ডে

লাগিয়ে দেওয়া যায়, তবে সেখানে কোষ বৃদ্ধি পেয়ে নলাকৃতি একটি আস্তরণের সৃষ্টি করে। সেই আস্তরণের ভিতর দিয়ে রক্তস্রোত প্রবাহিত হবে।

এদিকে ডক্টর হারমিসন ও তাঁর সহকর্মীরা হৃৎপিণ্ডের সহায়ক যন্ত্রপাতি উন্নয়নের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রথম পর্যায়ের এই সব যন্ত্রপাতির মধ্যে রয়েছে অ্যাম্বুলেন্স ও হাসপাতালে ব্যবহারযোগ্য জরুরী যন্ত্র। এগুলির সাহায্যে চিকিৎসা সুরু হবার সময় পর্যন্ত রোগীকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে।

দ্বিতীয় পর্যায়ের যন্ত্রপাতিগুলি অস্ত্রোপচার বা অসুস্থতার পর হৃৎপিণ্ডকে বিশ্রাম দেবার জন্যে উদ্ভাবিত সাময়িক ব্যবস্থা।

তৃতীয় পর্যায়ের যন্ত্রপাতি দিয়ে স্থায়ী সাহায্যের ব্যবস্থা হয়। অসুখে হৃৎপিণ্ডের ক্ষতি যদি নিরাময়ের যোগ্য না থাকে, তখনই এই সব যন্ত্রপাতির ব্যবহার হয়।

এই কর্মসূচীর লক্ষ্য হলো, সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হৃৎপিণ্ডের বদলে স্থায়ী যান্ত্রিক হৃৎপিণ্ড স্থাপন করা। রোগীর ব্যক্তিগত প্রয়োজনমাফিক এই যান্ত্রিক হৃৎপিণ্ড তৈরি করা যাবে, আবার বিভিন্ন আকারের কৃত্রিম যন্ত্র তৈরি করে সঞ্চয় করে রাখা যাবে।

কিন্তু তথাপি মানুষের দেহে মানুষের হৃৎপিণ্ড বসাবার ব্যবস্থা একেবারে অচল হবে না। যেমন, শিশুদের ক্ষেত্রে তাদের বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে যান্ত্রিক হৃৎপিণ্ড বদল করতে হবে। এই সমস্যার চেয়ে শিশুদের দেহে যান্ত্রিক হৃৎপিণ্ডের পরিবর্তে মানুষের হৃৎপিণ্ড বসানোই শ্রেয়ঃ। কারণ মানুষের হৃৎপিণ্ড দেহের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আকারে বাড়ে।

অসম্ভব মনে হলেও আশা করা যাচ্ছে, আগামী দশ বছরের মধ্যে কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড ব্যাপকভাবে ব্যবহারের জন্যে নির্মিত হবে। তবে এজন্যে জনসাধারণের সমর্থন প্রয়োজন।

শুক্রগ্রহ

শুক্রগ্রহ সম্পর্কে মিখাইল মারোভ লিখেছেন— শুক্রগ্রহ সূর্য থেকে দ্বিতীয় গ্রহ। পৃথিবী থেকে এর ন্যূনতম দূরত্ব হলো 40 কোটি কিলোমিটার। এই গ্রহটি প্রায় বৃত্তাকারে সূর্য থেকে 1080 লক্ষ কিলোমিটার দূর দিয়ে ঘোরে। শুক্রগ্রহে এক বছর পৃথিবীতে 224·7 দিনের সমান। এই গ্রহের ব্যাসার্ধ পৃথিবীর গড় ব্যাসার্ধ থেকে 620 কিলোমিটার কম। এখানকার ভর পৃথিবীর ভরের চেয়ে 80 শতাংশের একটু বেশী। সূর্যের নিকটতর বলে শুক্রগ্রহ দ্বিগুণ সূর্যতেজ পায়। কিন্তু জমাট-বাঁধা যে মেঘের স্তর সর্বদা তাকে ঘিরে থাকে, তার প্রতিবিম্বও দ্বিগুণ এবং তার ফলে দুই গ্রহে যে সূর্যরশ্মি বিকিরিত হয়, তার পরিমাণ প্রায় সমান সমান।

বিগত দশকে বেতার-জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির উন্নতি এবং মহাকাশ অভিযানের ফলে বিজ্ঞানীরা কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছেন, যা শুক্রগ্রহ ও পৃথিবী যমজ— এই তথ্যকে নাকচ করে।

কক্ষপথে আবর্তন করতে শুক্রগ্রহ যে সময় নেয়, তা পৃথিবীর একটি দিনের চেয়ে 243 গুণ বেশী দীর্ঘ। আর এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে, পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহ যেদিক দিয়ে ঘোরে, শুক্রগ্রহ তার উল্টো দিক দিয়ে ঘোরে। শুক্রগ্রহে এক বছরে দু-বার সূর্য ওঠে এবং দু-বার অস্ত যায়। আর শুক্রগ্রহের একদিন পৃথিবীর 116·8 দিনের সমান। ঐ গ্রহে কোন ঋতু পরিবর্তনের ব্যাপার নেই। শুক্রগ্রহ যখন পৃথিবীর নিকটবর্তী হয়, তখনই তার একটা দিক আমরা দেখতে পাই।

অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব বেতার-তরঙ্গ মারফৎ পৃথিবী থেকে শুক্রগ্রহের পৃষ্ঠদেশ দেখা যায়। এই গ্রহের বায়ুমণ্ডল ভেদ্য। অবলোহিত বিকিরণের বৈশিষ্ট্যের ফলে শুক্রগ্রহের বায়ুমণ্ডলের কিছু রাসায়নিক উপাদান আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে। প্রায় সঠিকভাবে মেঘস্তরের তাপ এবং চাপ নিরূপণ করাও সম্ভব হয়েছে। অবশ্য চাক্ষুষ পরিমাপণ মেঘস্তরের বায়ুমণ্ডল সংক্রান্ত কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না।

পঞ্চাশ দশকের শেষের দিকে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা শুক্রগ্রহের অসাধারণ উচ্চ বেতার উজ্জ্বলতার তাপ আবিষ্কার করেন—300—400 ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। তার ফলে গ্রহের আয়নমণ্ডলের অতি-ঘনতা, বায়ুমণ্ডলে উজ্জ্বল বিদ্যুৎ-স্ফুরণ, ইলেকট্রনের গতির ফলে চুম্বক প্রান্তরে রশ্মিবিচ্ছুরণ এবং বেতার প্রবাহ সম্পর্কে বিশ্বাস জন্মায়। যাহোক অসাধারণ উচ্চ বেতার উজ্জ্বলতার তাপের কারণ এবং শুক্রগ্রহের বায়ুমণ্ডল এবং তার পৃষ্ঠদেশের তাপ সম্পর্কিত প্রশ্নের কোন উত্তর এখনও পাওয়া যায় নি।

ভেনেরা 4, 5 এবং 6-এর অনুসন্ধানের ফলে শুক্রগ্রহের রাসায়নিক গঠন সম্পর্কে তথ্য জানা গেল। আগে মনে হয়েছিল, এই গ্রহের আবহাওয়ায় নাইট্রোজেন আছে, কিন্তু নাইট্রোজেন নেই। শুক্রগ্রহের আবহাওয়ায় অক্সিজেনও একেবারেই নেই। মেঘস্তরের কাছে এক শতাংশেরও কম জলীয়বাষ্প আছে।

ভেনেরা-7 মহাকাশযান স্বয়ংক্রিয় অনুসন্ধান চালিয়ে অনেক প্রশ্নেরই উত্তর দিয়েছে। এই প্রথম একটি মহাকাশযান এই গ্রহে অবতরণ করলো। আমরা বলতে পারি যে, এই মহাকাশযানটিকে ভীষণ উত্তাপ সহ্য করতে হয়েছিল। যে উত্তাপে তামা, সীসা গলে যায়, তার চেয়েও বেশী উত্তাপ। এই উত্তাপ সহ্য করেই পৃথিবীতে খবর পাঠানো সম্ভব হয়েছিল। সুতরাং আমরা বুঝতে পারি, শুক্রগ্রহে অবতরণ কত কঠিন ব্যাপার। সে সমস্যার এখন সমাধান হয়েছে।

ভেনেরা-7 নির্মাণও সোভিয়েট মহাকাশ বিজ্ঞানের আর এক সাফল্য। অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে লক্ষ লক্ষ কিলোমিটার দূরে স্বয়ংক্রিয় এই মহাকাশযানের সাফল্যপূর্ণ এই অভিযান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই অভিযানের ফলে অভাবনীয় বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। শুক্রগ্রহের আবহাওয়া অত্যন্ত ঘন ও উত্তপ্ত।

পৃথিবী এবং শুক্র—এই দুটি গ্রহের ভূতাত্ত্বিক এবং অন্যান্য উপাদানের কি কি অমিল আছে, যার ফলে এই দুই প্রতিবেশী গ্রহের আবহাওয়ায় পার্থক্য সৃষ্টি করেছে? স্বয়ংক্রিয় মহাকাশযানের অভিযানের ফলে গ্রহলোকের এরকম অনেক জটিল প্রশ্নের উত্তর হয়তো মিলবে।

আমরা এটা জানি যে, বিরাট মেঘমণ্ডল থেকে জন্ম নেবার সময় গ্রহগুলির আবহাওয়া প্রায় একই রকম ছিল এবং তাদের রাসায়নিক উপাদানও ছিল অনেকটা সূর্যের রাসায়নিক উপাদানের মত। যাহোক বিবর্তনের ধারায় ক্রমশঃ অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। যেমন, মঙ্গলগ্রহে একটুও অক্সিজেন নেই এবং চাঁদের অগভীর আবহাওয়ার কোন গ্যাসীয় পদার্থ নেই।

পৃথিবীর আবহাওয়ায় প্রচুর পরিমাণ অক্সিজেন আছে। কিন্তু শুক্রগ্রহে কিছুমাত্র অক্সিজেনও নেই। তদুপরি শুক্রগ্রহের মেঘস্তরের উপরের তাপমাত্রা পৃথিবীর তাপমাত্রার চেয়ে বেশী।

কিন্তু শুক্রগ্রহ এখনো প্রহেলিকাময়—যেমন বলা যায় শুক্রগ্রহের মেঘপুঞ্জের গঠন এবং উপাদানের কথা। তাদের প্রকৃতি সম্পর্কে অনেক তথ্য আছে। আমরা মনে করি, এই মেঘের উপাদান হলো এক মাইক্রন পরিমাণ হিম স্ফটিক-বিন্দু। শুক্রগ্রহের আবহাওয়ার উপরিভাগে কিভাবে কি ঘটছে, সেই বিষয়ে আমাদের কোন পরিষ্কার ধারণা নেই। শুক্রগ্রহের আবর্তন পদ্ধতি

কেন অস্বাভাবিক, তার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ এখনো খুঁজে পাওয়া যায় নি।

শুক্রগ্রহের পৃষ্ঠদেশ সম্ভবতঃ তপ্ত লাল নিষ্প্রাণ এক মরুভূমি। পৃষ্ঠদেশের ভীষণ তাপের ফলে পৃথিবীর মত কোন প্রাণের জন্ম এখানে সম্ভব নয়। অবশ্য আমরা একথা বলতে পারি না যে, মেঘপুঞ্জে সাধারণ প্রাণের জন্ম অসম্ভব—কেন না, এখানকার পরিবেশ প্রাণধারণের উপযোগী, প্রায় পৃথিবীর মত।

স্বয়ংক্রিয় মহাকাশযানের অভিযানের ভিতর দিয়ে শুক্রগ্রহের আবহাওয়া ও তার পৃষ্ঠদেশ সম্পর্কে গবেষণায় যে সূচনা হয়েছে, অদূর ভবিষ্যতেই তার ফলে শুক্রগ্রহের রহস্য উন্মোচিত হবে বলে মনে হয়।

ভৌত জ্যোতির্বিজ্ঞানের জনক যোহানেস কেপ্‌লার

(1571-1630)

(400তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি)

শ্রীবৈদ্যনাথ বসু*

যোহানেস কেপ্‌লার (Johannes Kepler) জার্মেনীর ভেইল (Weil) নগরে 1571 সালে 27শে ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। সেই কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতার যুগে কেপ্‌লার ছিলেন এক বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক প্রতিভা। একাধারে তিনি ছিলেন গণিতবিদ্, পদার্থ-বিজ্ঞানী ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী, যদিও গ্রহমণ্ডলীর গতিসূত্রের আবিষ্কারই তাঁর প্রধানতম কীর্তি। সূর্য, চন্দ্র এবং গ্রহমণ্ডলীর (ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটো তখনও আবিষ্কৃত হয়নি) গতি ও অবস্থান ইত্যাদি নিয়ে অতি প্রাচীনকাল থেকেই নানাদেশীয় পণ্ডিতেরা চিন্তা-ভাবনা করেছেন। কিন্তু এই বিষয়ে পর্যবেক্ষণ-যোগ্য ঘটনাবলীর একটা সুষ্ঠু ব্যাখ্যা সর্বপ্রথম আসে ক্লডিয়াস টলেমীর (Claudius Ptolemy) কাছ থেকে। এই ব্যাখ্যা তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন তাঁর জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ Almagest-এ। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম দিকে টলেমীর আবির্ভাব হয় আলেকজান্দ্রিয়া মহানগরীতে। তাঁর বিখ্যাত সৃষ্টি Almagest-এর একটা বিরাট অংশই জ্যোতির্বিজ্ঞানের আলোচনায় সমৃদ্ধ। এই গ্রন্থে টলেমী চন্দ্র, সূর্য ও গ্রহাদির গতি ও অবস্থিতি সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করেছেন, যদিও পরবর্তী কালে তা ভুল প্রমাণিত হয়েছে, কিন্তু তাঁর সেই ব্যাখ্যা কোপার্নিকাসের (Copernicus, 1473-1543) আমল পর্যন্ত অভ্রান্ত বলে স্বীকৃত হয়েছে। কোন ভুল মতবাদকে এত দীর্ঘকাল যাবৎ অভ্রান্ত বলে গ্রহণ করবার মত নজীর বিজ্ঞানের ইতিহাসে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

গ্রহের গতি ও অবস্থান সম্বন্ধে একটু লক্ষ্য করলে যে দুটি জিনিস প্রথমেই নজরে আসে, তা হলো এই যে, স্থির নক্ষত্রনিচয় এবং পরস্পরের সাপেক্ষে গ্রহগুলির অবস্থান ক্রমাগত বদ্‌লায় এবং বছরের বিভিন্ন সময়ে তাদের ঔজ্জ্বল্যের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে, অর্থাৎ পৃথিবী থেকে তাদের দূরত্ব বদ্‌লায়। অপর পরিলক্ষিত বিষয়

* গণিত বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-32

হলো, পৃথিবীর সাপেক্ষে গ্রহগুলির গতি কখনও পৃথিবীর সঙ্গে একই দিকে অর্থাৎ সম্মুখ গতি (Direct motion) আবার কখনও বিপরীত দিকে অর্থাৎ বিপরীত গতি (Retrograde motion)। এই ঘটনাবলী ব্যাখ্যা করবার জন্যে টলেমী বলেছেন যে, বিশ্বের স্থির কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে পৃথিবী। চন্দ্র, সূর্য এবং গ্রহগুলি পৃথিবীর চারদিকে বৃত্তাকার পথে আবর্তন করে এবং নক্ষত্র খচিত আকাশ গোলকটি (Celestial sphere) 24 ঘণ্টায় একবার করে ঘুরে আসে। কিন্তু কোন গ্রহ যদি পৃথিবীকে কেন্দ্র করে বৃত্তাকার পথে ঘোরে, তাহলে গ্রহটির ঔজ্জ্বল্যের তারতম্য হওয়া উচিত নয় অথচ কার্যক্ষেত্রে সুস্পষ্ট তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। এই অসুবিধা দূর করবার জন্যে টলেমী প্রত্যেক গ্রহের গতিকে ছুটি বৃত্তীয় গতির মোট ফলরূপে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে, প্রত্যেকটি গ্রহ একটি অধিবৃত্তাকার (Epicycle) পথ পরিক্রমা করে, আর অধিবৃত্তটির কেন্দ্রবিন্দু বৃত্তাকার পথে (Deferent) পৃথিবীর চার দিকে ঘোরে। পৃথিবীর উত্তর মেরু থেকে দেখলে অধিবৃত্তে গ্রহের গতি এবং তার কেন্দ্রের পৃথিবী পরিক্রমার গতি—দুই-ই ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে অর্থাৎ সম্মুখদিকে।

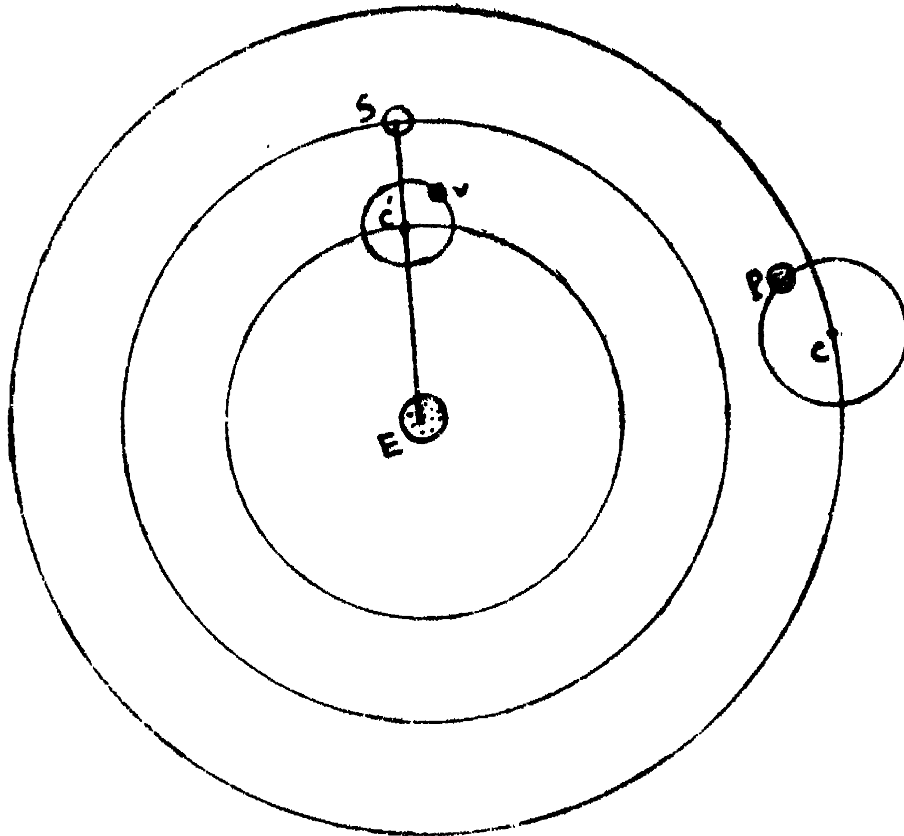


যোহানেস কেপ্‌লার

1নং চিত্রে পৃথিবীর সাপেক্ষে গ্রহের এই গতি বোঝানো হয়েছে। P কোন একটি প্রধান গ্রহ (Superior planet), এটি C কেন্দ্রিক অধিবৃত্তে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে গতিশীল, অধিবৃত্তটির কেন্দ্র C আবার বৃত্তপথে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে পৃথিবীকে পরিক্রমা করে। এই দুটি গতির যোগফল সম্মুখদিকে হলে গ্রহটির সম্মুখগতি হবে; যোগফল বিপরীতমুখী হলে গ্রহটির বিপরীত গতি দেখা যাবে। এভাবে

টলেমী গ্রহের সম্মুখ ও বিপরীত গতির ব্যাখ্যা করেছেন।

আবার পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, বছরের কোন সময়েই সূর্য থেকে বুধ এবং শুক্রের কৌণিক দূরত্ব যথাক্রমে 28 এবং 48 ডিগ্রীর বেশী হয় না। টলেমীর মতে এটা সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়, যদি আমরা ধরে নিই যে, বুধ বা শুক্রের অনুবৃত্তের কেন্দ্র C´ সর্বদা পৃথিবী ও সূর্যকে যুক্তকারী সরলরেখার উপরে থাকে (1নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। এই অবস্থায় ঐ দুটি গ্রহের দেখা যায় যে, টলেমীর ভূ-কেন্দ্রিক বিশ্বের মতবাদ পর্যবেক্ষিত বহু ঘটনার মোটামুটি সুন্দর ব্যাখ্যা দেয়। এই ব্যাখ্যা তৎকালীন লোকের ধর্মীয় সংস্কার ও বিশ্বাসের সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। তৎকালীন লোকের দুটি বিষয় সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। প্রথমতঃ, বিশ্বের স্থির কেন্দ্র হচ্ছে পৃথিবী। দ্বিতীয়তঃ চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ প্রভৃতি যেহেতু স্বর্গীয় পবিত্র বস্তু, সেহেতু তাদের গতিপথ হবে নিখুঁৎ এবং বৃত্তপথই হলো একমাত্র নিখুঁৎ পথ। টলেমীর ভূ-কেন্দ্রিক গ্রহমণ্ডলের মতবাদ



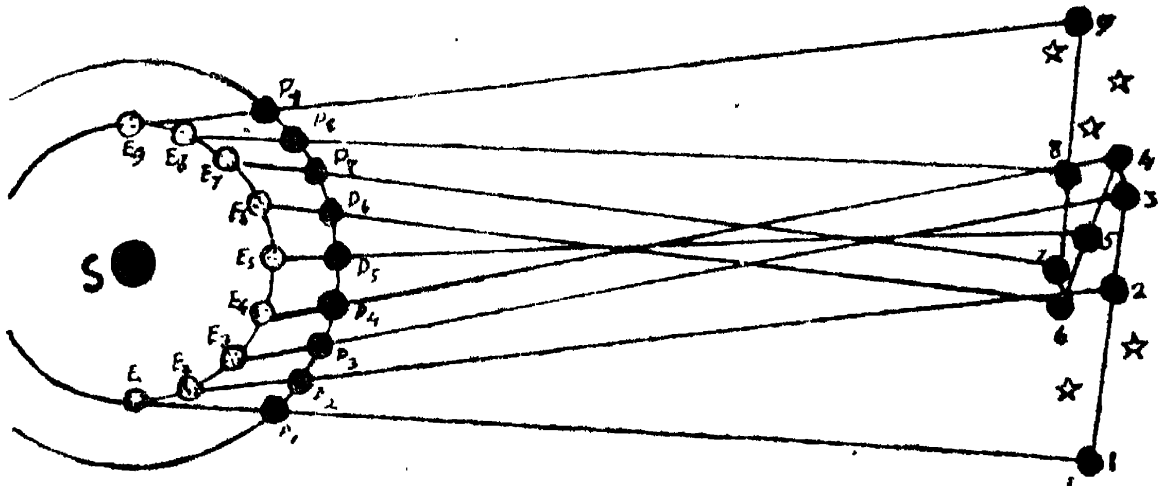
1নং চিত্র
E—পৃথিবী (স্থির), S—সূর্য, P একটি প্রধান গ্রহ এবং V একটি অপ্রধান গ্রহ; C এবং C´ যথাক্রমে এদের অনুবৃত্তের কেন্দ্র। C এবং C´ বিন্দুদ্বয় পৃথিবীর চারদিকে বৃত্তপথে আবর্তন করে।

অবস্থান কখনই সূর্য থেকে খুব বেশী দূরে হওয়া সম্ভব নয়। আবার প্রত্যেক গ্রহের অনুবৃত্তে পরিক্রমার ফলে পৃথিবী থেকে তার দূরত্ব বদলায়, ফলে গ্রহটির ঔজ্জ্বল্যের তারতম্য হয়। অতএব উক্ত বিষয় দুটির সঙ্গে অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই মতবাদ প্রাচীন এবং মধ্যযুগের লোকের কাছে এত সন্তোষজনক বিবেচিত হয়েছিল যে, প্রায় দেড়হাজার বছর ধরে এর সত্যতা সম্বন্ধে কেউ

প্রশ্ন করেন নি বা কোন বিকল্প ব্যাখ্যার কথা ভাবেন নি। প্রথম বিকল্প ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেন কোপার্নিকাস, যোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে।

গ্রহমণ্ডলীর গতিবিধি বিশেষভাবে পর্যালোচনা করে কোপার্নিকাস দেখলেন যে, যদি সূর্যকে কেন্দ্রবিন্দু এবং পৃথিবীসমেত অন্যান্য গ্রহগুলিকে সূর্যের চারদিকে আবর্তনশীল ধরা যায়, তাহলেও গ্রহগুলির সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণযোগ্য ঘটনাবলীর বেশ সুষ্ঠু ব্যাখ্যা করা যায় এবং সে ব্যাখ্যা টলেমীর ভূ-কেন্দ্রিক ব্যাখ্যার চেয়ে আরও ভাল হয়। অবশ্য কোপার্নিকাসের মতেও গ্রহগুলির গতিপথ এক-একটি বৃত্ত এবং ঔজ্জ্বল্যের তারতম্য ব্যাখ্যা করবার জন্যে তিনি অনুবৃত্তেরও আশ্রয় নিয়েছিলেন। এই সৌরকেন্দ্রিক পদ্ধতিতে গ্রহমণ্ডলীর আবর্তন, তাদের ঔজ্জ্বল্যের তারতম্য, সম্মুখ ও বিপরীত গতি প্রভৃতি সুষ্ঠুভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। 2নং চিত্রে মঙ্গলগ্রহের সম্মুখ ও একটি সরলরেখা ধরে এদিক-ওদিক যাতায়াত করছে। কিন্তু উক্ত কক্ষদ্বয় ভিন্ন সমতলে অবস্থিত হওয়ায় মঙ্গলগ্রহের যাতায়াতের পথে একটি ফাঁস (Loop) তৈরি হয়।

কোপার্নিকাসের সৌরকেন্দ্রিক পদ্ধতি টলেমীর ভূ-কেন্দ্রিক পদ্ধতির চেয়ে উৎকৃষ্ট মনে হলেও তিনি কিন্তু এই পদ্ধতির স্বপক্ষে কোন প্রমাণ উপস্থাপিত করতে পারেন নি। তিনি প্রমাণ করে দেখাতে পারেন নি যে, পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগুলি সত্যাই সূর্যের চারদিকে ঘোরে। তাঁর মতবাদ গড়ে উঠেছিল একটা সুস্থ বিকল্প চিন্তাধারা অবলম্বন করে, কোন গাণিতিক ভিত্তির উপর তিনি তা প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি। পৃথিবী যদি সূর্যের চারদিকে ঘোরে, তবে কোন জ্যোতিষ্কের বিচ্ছুরিত আলোর গতির সাপেক্ষে পৃথিবীর নিজস্ব গতির দরুণ উক্ত জ্যোতিষ্কের অপেরণজনিত (Aberration) কিছুটা স্থানচ্যুতি



2নং চিত্র
পৃথিবী (E) এবং মঙ্গলের (P) কক্ষপথে বিভিন্ন সময়ে অবস্থান এবং আকাশের গায়ে তাদের অভিক্ষেপ দেখানো হয়েছে। চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ অবস্থান পর্যন্ত মঙ্গলের গতি বিপরীত।

বিপরীত গতির ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পৃথিবী এবং মঙ্গলের কক্ষপথ যদি একই সমতলে অবস্থিত হতো, তাহলে মনে হতো, মঙ্গলগ্রহ এই সময়ে আকাশে ঘটবে। বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে এই স্থানচ্যুতি ধরা যায়। আবার বছরের বিভিন্ন সময়ে কক্ষপথে পৃথিবীর বিভিন্ন অবস্থানের জন্যে দূর নক্ষত্রের

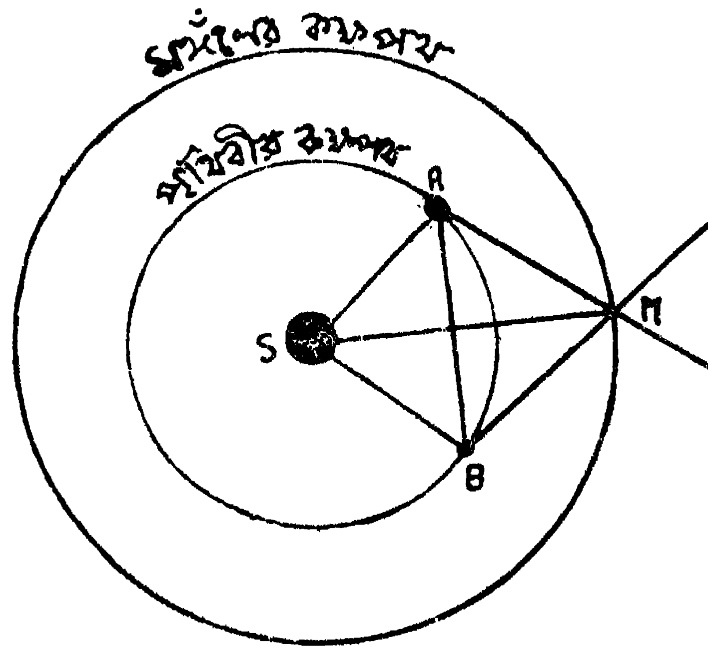
অবস্থানের লম্বনজনিত (Parallax) পরিবর্তন ঘটবে। কিন্তু এই পরিবর্তন এত কম হয় যে, কোপার্নিকাসের সময়ের যন্ত্রপাতির দ্বারা তা নির্ণয় করা হয়তো সম্ভব ছিল না। নক্ষত্রের অবস্থানের অপেরণজনিত পরিবর্তন ব্র্যাড্‌লী (Bradley) আবিষ্কার করেন 1727 সালে; আর বিখ্যাত গণিতবিদ্ বেসেল (Bessel) 1838 সালে নক্ষত্রের অবস্থানের লম্বনজনিত পরিবর্তন আবিষ্কার করেন। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের কথা এই যে, কোপার্নিকাসের সৌরকেন্দ্রিক মতবাদ যেহেতু গীর্জার পুরোহিতদের ধর্মবিশ্বাসের পরিপন্থী ছিল, সেহেতু তারা প্রবল চাপে কোপার্নিকাসকে তাঁর মতবাদ তুলে নিতে বাধ্য করেছিলেন। কোপার্নিকাস সাময়িকভাবে এই চাপের কাছে নতি স্বীকার করেন। কিন্তু মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে তাঁর এই মতবাদ তিনি পুস্তকাকারে প্রকাশ করে গিয়েছিলেন।

কোপার্নিকাসের সৌরকেন্দ্রিক মতবাদ প্রকাশিত হবার প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে চন্দ্র-সূর্য-গ্রহমণ্ডলীর গতি-প্রকৃতি নিয়ে দীর্ঘদিন বিশেষভাবে গবেষণা করেন টাইকো ব্রাহী (Tycho Brahe)। টাইকো ছিলেন ডেনমার্কের অধিবাসী। তথাকার রাজার আনুকূল্যে তিনি প্রাগের (Prague) অদূরে একটি অতি আধুনিক সুসজ্জিত মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রায় 28 বছর ধরে গ্রহের গতিবিধি ও অবস্থান পর্যবেক্ষণ করেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, দূরবীক্ষণযন্ত্র তখনও আবিষ্কৃত হয় নি। কিন্তু টাইকো অন্যান্য যে সব যন্ত্রপাতি তাঁর মানমন্দিরে সংগ্রহ করেছিলেন, সেগুলি তখনকার দিনে সর্বাপেক্ষা উন্নত ও নিখুঁৎ ধরণের ছিল। এরূপ উন্নত যন্ত্রের সাহায্যে বহু চেষ্টা সত্ত্বেও কিন্তু টাইকো নক্ষত্রের অবস্থানের লম্বনজনিত কোন পরিবর্তন ধরতে পারেন নি। এর একমাত্র কারণ যদিও নক্ষত্রের অতি দূরত্ব, কিন্তু টাইকোর সময়ে নক্ষত্রের এই বিপুল দূরত্ব সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিল না। সব দেখে শুনে টাইকো সিদ্ধান্ত করলেন যে, পৃথিবী নিশ্চয়ই স্থির এবং কোপার্নিকাসের সৌরকেন্দ্রিক মতবাদ ভুল। তিনি সৌরজগৎ সম্বন্ধে এক নতুন মতবাদ উপস্থাপিত করলেন। তাঁর মতে, পৃথিবী স্থির এবং সূর্য ও চন্দ্র বৃত্তাকার পথে পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে। কিন্তু অন্যান্য গ্রহ বৃত্তাকার পথে সূর্যের চারদিকে ঘোরে। টাইকোর এই মতবাদ যদিও কখনও গ্রহণযোগ্য হয় নি, তথাপি লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, তাঁর মতবাদের পেছনে ছিল একটি যথার্থ বৈজ্ঞানিক গবেষণা-পদ্ধতি। তিনি নক্ষত্রের অবস্থানের লম্বনজনিত পরিবর্তন যন্ত্র দিয়ে মেপে বের করবার জন্যে দীর্ঘদিন ধরে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তা সত্ত্বেও যখন কিছু খুঁজে পান নি, তখনই কেবল তিনি উপরিউক্ত সিদ্ধান্তে এসেছিলেন। শুধুমাত্র কল্পনার উপর নির্ভর করেই তিনি তাঁর মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করেন নি।

টাইকো যদিও তাঁর দীর্ঘদিনের পর্যবেক্ষণের ফলকে যথাযথ কাজে লাগাতে পারেন নি, কিন্তু তাঁর উন্নত ধরণের পর্যবেক্ষণ ছিল তখনকার তুলনায় মোটামুটি নির্ভুল এবং তিনি সেগুলি সবই লিপিবদ্ধ করেছিলেন। টাইকোর মৃত্যুর পর তাঁর সহকর্মী যোহানেস কেপ্‌লার সেগুলি নিয়ে দীর্ঘদিন গবেষণা করেন। কেপ্‌লার প্রথম থেকেই কোপার্নিকাসের সৌরকেন্দ্রিক মতবাদে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তিনি এবারে এই মতবাদকে গাণিতিক তথ্যের ভিত্তিতে প্রমাণ করবার জন্যে কঠোর সাধনায় ব্রতী হলেন। এখানেই কেপ্‌লারের বৈজ্ঞানিক প্রতিভার উৎকর্ষতার প্রমাণ পাওয়া যায়। কেপ্‌লার বুঝলেন যে, কোপার্নিকাসের মতবাদ যদি ঠিক হয়, তাহলে প্রতিটি গ্রহের কক্ষপথের আকার জ্যামিতিক নিয়মে নির্ণয় করা যায়। এটা কিভাবে করা যায়, দেখা যাক।

মঙ্গলগ্রহের কথাই ধরা যাক। মঙ্গলগ্রহ প্রতি 780 দিন পর পর সূর্যের বিপরীত দিকে পৃথিবী ও সূর্যের সঙ্গে একই সরলরেখায় আসে (Opposition)। এই সময়ের মধ্যে পৃথিবী সূর্যকে দু-বার সম্পূর্ণ পরিক্রমা করে আরও প্রায় 50 ডিগ্রী এগিয়ে এসেছে। যেহেতু ঐ সময়ে মঙ্গল ও পৃথিবী একই সরলরেখায় অবস্থিত, অতএব মঙ্গল এই 780 দিনে (360+50) ডিগ্রী গিয়েছে। তাহলে মঙ্গলের সূর্য পরিক্রমার কাল দাঁড়ালো 687 দিন। অতএব 687 দিন পর পর মঙ্গল তার কক্ষপথের একই বিন্দুতে ফিরে আসে। এই তথ্য জানবার পর সূর্য থেকে পৃথিবীর তুলনায় মঙ্গলের দূরত্ব সহজ জ্যামিতিক উপায়েই নির্ণয় করা যায় (3নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

দিনেই দূর নক্ষত্রগুলির সাপেক্ষে মঙ্গলের অবস্থান নির্ণয় করা যায়। আবার ঐ নক্ষত্রগুলির এবং সূর্যের মধ্যরেখা অতিক্রমের সময় (Time of transit) এবং সূর্যের অবনমন (Declination) দেখে ঐ নক্ষত্রগুলির সাপেক্ষে সূর্যের অবস্থানও নির্ণয় করা যায়। এভাবে SAM এবং SBM কোণদ্বয় জানা যায়। এখন যদি পৃথিবীর কক্ষপথকে একটি বৃত্ত ধরা হয় (আসলে ঠিক বৃত্ত নয়, সামান্য উৎকেন্দ্রতা আছে, মঙ্গলের কক্ষপথের উৎকেন্দ্রতা থেকে অনেক কম), তাহলে SA=SB, এরা প্রত্যেকেরই জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক একক দূরত্বের সমান (Astronomical unit of distance) এবং এই দূরত্বের মাপকাঠিতে ত্রিকোণমিতির সাহায্যে AB এবং শেষ পর্যন্ত সূর্য থেকে মঙ্গলের দূরত্ব SM নির্ণয়



3নং চিত্র

কেপ্‌লার কর্তৃক সূর্য থেকে মঙ্গলের দূরত্ব নির্ণয়।

ধরা যাক, কোন একদিন এবং তার 687 দিন পরে মঙ্গলের অবস্থান M ; ঐ দিনগুলিতে পৃথিবীর অবস্থান যথাক্রমে A এবং B। উভয়

করা যায়। এভাবে কেপ্‌লার কক্ষপথের বিভিন্ন অবস্থানে সূর্য থেকে মঙ্গলের দূরত্ব নির্ণয় করেছেন। বলা বাহুল্য, তাঁর কাজের অধিকাংশ উপকরণই

তিনি পেয়েছিলেন টাইকোর লিপিবদ্ধ তথ্য থেকে। কিন্তু এই উপকরণকে সফলভাবে কাজে লাগাতে তিনি দীর্ঘদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন এবং এই পরিশ্রমের ফল তিনি যেভাবে প্রকাশ করেছিলেন, তাথেকেই তাঁর নির্ভীক অনুসন্ধিৎসু বৈজ্ঞানিক মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

টলেমী থেকে কোপার্নিকাস এবং টাইকো, সব বৈজ্ঞানিকেরাই একটি বিষয়ে একমত ছিলেন যে, জ্যোতিষ্কগুলি সবাই বৃত্তপথে চলে। তাদের নিখুঁত বৃত্তপথ ছাড়া অন্য কোনরূপ পথে চলবার কল্পনা ছিল তখনকার দিনের ধর্মবিশ্বাসের পরিপন্থী। সৌরকেন্দ্রিক বা ভূ-কেন্দ্রিক মতবাদের প্রবক্তারা কেউই এর ব্যতিক্রম কখনও কল্পনা করেন নি। কিন্তু বিভিন্ন অবস্থানে মঙ্গলের দূরত্বের একটি সম্পূর্ণ নক্সা তৈরি করবার পর কেপ্‌লার এক চমকপ্রদ তথ্য আবিষ্কার করলেন। তিনি দেখলেন যে, মঙ্গলের কক্ষপথ বৃত্ত নয়, একটি উপবৃত্ত, যার একটি নাভি (Focus) সূর্যে অবস্থিত। অনেক হিসাবনিকাশ করে কেপ্‌লার আরও দেখলেন যে, মঙ্গলের কক্ষপথের যে অংশ সূর্যের নিকটবর্তী তথায় গ্রহটির গতি অপেক্ষাকৃত দ্রুত; সূর্য থেকে দূরবর্তী অংশে গতি ধীর। কিন্তু কোন একটা নির্দিষ্ট সময়ের আরম্ভে ও শেষে গ্রহটির অবস্থান বিন্দুকে সূর্যের সঙ্গে যোগ করলে উপবৃত্তের যে অংশ ছেদ করে, তার ক্ষেত্রফল কক্ষপথের সব জায়গায় সমান। অতএব কেপ্‌লার গ্রহের গতি সম্বন্ধীয় প্রথম দুটি সূত্র আবিষ্কার করলেন এবং তা 1609 সালে Astronomia Nova (New Astronomy) গ্রন্থে প্রকাশিত হলো। সূত্র দুটি এই—

প্রথম সূত্র: প্রত্যেক গ্রহ সূর্যের চারদিকে একটি উপবৃত্তাকার পথে ঘোরে, এই উপবৃত্তের একটি নাভি সূর্যে অবস্থিত।

দ্বিতীয় সূত্র: সূর্য ও গ্রহের সংযোগকারী ব্যাসার্ধ সমান সময়ের ব্যবধানে উপবৃত্তের সমান অংশ ছেদ করে।

লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, কেপ্‌লার শুধু সৌরকেন্দ্রিক মতবাদের সত্যতাই প্রমাণ করেন নি, গ্রহগুলির যে নিখুঁৎ (বৃত্ত) পথে চলে না, তাও প্রতিষ্ঠিত করলেন। সেই ধর্মান্ধতা ও অন্ধ-বিশ্বাসের যুগে এই তথ্য প্রকাশ করা এক দুঃসাহসিক কাজ ছিল। যাজকদের নির্দেশে কোপার্নিকাসের লাঞ্ছনার কথা তিনি ভোলেন নি, যদিও তারপর প্রায় এক শতাব্দী কেটে গেছে। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার সঙ্গে কেপ্‌লারের ছিল প্রচণ্ড সাহস ও আত্মপ্রত্যয়। তাই তিনি আবিষ্কৃত সত্য নির্ভয়ে প্রকাশ করতে পেরেছিলেন। দুটি কারণ হয়তো কেপ্‌লারের অনুকূল ছিল, যার ফলে তিনি যাজকদের কোপদৃষ্টি এড়াতে পেরেছিলেন। প্রথমতঃ, কোপার্নিকাসের পরবর্তী প্রায় এক শতাব্দীর মধ্যে মানুষের স্বাধীন চিন্তা অনেক বেশী প্রসারলাভ করেছিল। বর্তমান যুগ অনেক আগেই আরম্ভ হয়েছিল, যার ফলে পুরোহিতদের সাম্রাজ্যের ভিৎ অনেকটাই ধ্বসে পড়েছিল। এর চেয়েও বড় কারণ সম্ভবতঃ এই যে, কেপ্‌লার তাঁর সিদ্ধান্তে এসেছিলেন সহজ গাণিতিক হিসাবের মধ্য দিয়ে, যার মধ্যে ভুল দেখানো কারও পক্ষে সহজ ছিল না। অপর-পক্ষে, তাঁর পূর্বসূরীদের মতবাদের পেছনে এমন কোন গাণিতিক তথ্য ছিল না, যার সত্যতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া যায়।

কেপ্‌লারের পরবর্তী 10 বছরের ব্যাপক গবেষণার আংশিক ফল তাঁর গ্রহের গতি সম্বন্ধীয় তৃতীয় সূত্রের আবিষ্কার। 1619 সালে প্রকাশিত De Harmonice Mundi (Harmony in Nature) গ্রন্থে লিখিত এই সূত্রটি হলো: কোন গ্রহের আবর্তনকালের বর্গফল তার সূর্য থেকে গড় দূরত্বের ঘনফলের সঙ্গে সমানুপাতিক; অর্থাৎ, P_1, P_2 যদি দুটি গ্রহের আবর্তনকাল

এবং A_1, A_2 তাদের সূর্য থেকে গড় দূরত্ব হয়, তাহলে $P_1^2 : P_2^2 = A_1^3 : A_2^3$। বছরকে সময়ের একক এবং জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক এককে দূরত্বের একক ধরে যে কোন গ্রহের আবর্তনকাল পর্যবেক্ষণ করে এই সূত্রের সাহায্যে তার সূর্য থেকে গড় দূরত্ব নির্ণয় করা যায়।

গ্রহের গতিসূত্রগুলি আবিষ্কার করতে কেপ্‌লার যে আত্মপ্রত্যয়, অধ্যবসায় ও বৈজ্ঞানিক প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন, তা বিস্ময়কর। উপকরণসমূহের সার্থক বিশ্লেষণই ছিল তাঁর আবিষ্কারের গোড়ার কথা। অবশ্য, কোন্‌ ভৌত নিয়মে গ্রহের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হয়, তা কিন্তু ছিল কেপ্‌লারের অজানা। সে নিয়ম আবিষ্কার করেছিলেন স্যার আইজাক নিউটন, কেপ্‌লারের গতিসূত্র আবিষ্কারের প্রায় 50 বছর পরে। নিউটন দেখিয়েছেন যে, তাঁর মহাকর্ষীয় সূত্রানুযায়ী সূর্যের আকর্ষণের ফলে প্রত্যেক গ্রহ একটি সৌরনাভ উপবৃত্তে সূর্যকে আবর্তন করবে এবং সূর্য ও গ্রহের সংযোগকারী ব্যাসার্ধ সমান সময়ের ব্যবধানে এই উপবৃত্তের সমান অংশ ছেদ করবে। অতএব কেপ্‌লারের প্রথম ও দ্বিতীয় সূত্রের ভৌত নিয়মানুযায়ী ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। নিউটন আরও দেখালেন যে, কেপ্‌লারের তৃতীয় সূত্রটি পুরাপুরি ঠিক নয়। ঐ সূত্রে সূর্য এবং গ্রহের ভরও বিবেচনা করতে হবে এবং সঠিক সূত্রটি হবে — $(M+m_1)P_1^2 : (M+m_2)P_2^2 = A_1^3 : A_2^3$। এখানে M সূর্যের এবং m_1, m_2 সংশ্লিষ্ট গ্রহদ্বয়ের ভর। লক্ষ্য করা দরকার যে, গ্রহগুলির ভর সূর্যের ভরের তুলনায় এত কম যে $(M+m_1)$ এবং $(M+m_2)$-এর মধ্যে পার্থক্য অতি সামান্য। এই সামান্য পার্থক্য যে কেপ্‌লারের নজর এড়িয়ে গিয়েছিল, সেটা কিছু অস্বাভাবিক নয় এবং এই পার্থক্যকে উপেক্ষা করলেই উপরের সূত্রটি থেকে কেপ্‌লারের আদি সূত্রটি পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে দেখা গেছে যে, উপরের সূত্রটি জ্যোতির্বিজ্ঞানে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছে। কারণ যুগ্ম-নক্ষত্রের (Binary stars) ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে এই সূত্রটির সাহায্যে ঐ সব নক্ষত্রের ভর নির্ণয় করা যায়। নক্ষত্রের ভর নির্ণয়ের ব্যাপারটি জ্যোতির্বিজ্ঞানের নানা দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

বাভেরিয়ার রেটিস্‌বন শহরে 1630 খৃষ্টাব্দের 15ই নভেম্বর এই মহামনীষী দেহত্যাগ করেন।

বিজ্ঞান-সংবাদ

ফটোন—সূর্যের চেয়ে হাজার গুণ উজ্জ্বল

মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা পদার্থবিদ্‌দের তত্ত্বাবধানে গবেষণা চালিয়ে ফটোন সৃষ্টি করেছে। ফটোন হলো 10 লক্ষ কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন আলোর উৎস। এই আলোর ঔজ্জ্বল্য সূর্যের চেয়ে হাজার গুণ বেশী।

এই আলো বিচ্ছুরণের কাজ এভাবে চলে— একটি উচ্চ শক্তিসম্পন্ন প্রবাহ দুটি ব্যাটারীতে শক্তি সঞ্চার করে। তাদের মধ্যে যে শক্তি সঞ্চিত ছিল, তা বিশেষ পদ্ধতিতে শক্ত অ্যালুমিনিয়ামের তারে জ্বলে ওঠে এবং তার ফলে একটা আলোক বিস্ফোরণের শব্দ হয়। এই শব্দ একটা বন্দুকের গুলি ছোঁড়বার শব্দের মত। তার স্থায়িত্ব হলো এক সেকেণ্ডের 2 হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র। এই জন্যেই এরকম বিপুল পরিমাণ আলোক-শক্তি নির্গত হয়।

এই আলোক বিচ্ছুরণের সময় ফটোমিটার কাজ করে এবং বিচ্ছুরণের ঘটনাকে ধরে রাখে। এই ঘটনা এক সেকেণ্ডের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ সময় মাত্র স্থায়ী হয়। একটি স্পেক্ট্রোমিটার বিচ্ছুরণের তাপ নির্ণয় করে। কার্যসূচী অনুযায়ী সমস্ত যন্ত্রপাতিই যুগপৎ কাজ করে।

গবেষকদের যে দলটি ফটোন সৃষ্টি করেছে, তাঁদের নেতৃত্ব করছেন সহযোগী অধ্যাপক আন্দ্রেই আলেকজান্দ্রোভ। তিনি বলেছেন যে, এপর্যন্ত যা চক্ষু দিয়ে প্রত্যক্ষ করা যায় নি এবং লেসার ব্যবহারের যে সম্ভাবনার ক্ষেত্র এখনও অজ্ঞাত রয়েছে, সে সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবার জন্তে এই আলোর উৎস সন্ধানের প্রয়োজন। নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পরিমাণ আলোর বিকিরণ অত্যন্ত জরুরী। বিজ্ঞানী বলেছেন যে, ফটোনের দ্বারা গবেষণা চালালে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

মঙ্গলগ্রহে জীবনের সন্ধান

অ্যাকাডেমিশিয়ান গিওর্গি পেত্রোভ বলেছেন, মঙ্গলগ্রহে জীবনের অস্তিত্ব আছে কিনা—প্রধানতঃ সে সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাবার জন্তে মার্স-2 এবং মার্স-3 স্টেশনকে মঙ্গলগ্রহে পাঠানো হয়েছে।

এটি একটি কেন্দ্রীয় ও প্রধান সমস্যা হলেও এর সঙ্গে অন্যান্ত বহুবিধ ব্যাপারও জড়িত। তার মধ্যে আছে গ্রহের পরিবেশ সম্পর্কে গবেষণা চালানো। মার্স-2 এবং মার্স-3 জ্যোতিঃপদার্থবিদ্যা বিষয়ক যে গবেষণা চালিয়েছিল, তার চূড়ান্ত তালিকা দেওয়া হলো—অবলোহিত রশ্মি নির্গমনের দ্বারা ভূমির উত্তাপ নিরূপণ, কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ সারণীতে আবহমণ্ডলের দৃষ্টিগ্রাহ্য গভীরতা নির্ণয়ের দ্বারা এই গ্রহের জমির উচ্চতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালানো, গ্রহের জমি এবং আবহাওয়ার গুণাবলী সম্পর্কে ফটোমেট্রিক গবেষণা চালানো, আবহাওয়ায় জলীয় বাষ্পের অস্তিত্বের পরিমাণ নিরূপণ, গ্রহের রশ্মি-বিকিরণ থেকে ভূমির তাপ নিরূপণ এবং আবহাওয়ার অতিবেগুনী রশ্মি বিকিরণ সম্পর্কে গবেষণা চালানো।

মঙ্গলগ্রহে অনুসন্ধান চালাবার জন্তে মার্স স্টেশনগুলিতে যে সব যন্ত্রপাতি আছে, তাতে অবলোহিত রেডিওমিটারে দুটি ছোট দূরবীক্ষণ যন্ত্র আছে, তার একটিকে গ্রহে কাজের উপযোগী আর অপরটিকে মহাকাশে কাজের উপযোগী করে তোলা হয়েছিল। সমগ্র রেডিওমিটারটি হাতের তালুর উপর রাখা যায়। তার ওজন এক কিলোগ্র্যামের একটু বেশী। এটি শূন্যাঙ্কের 100 ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড নীচের শীতল বস্তুর নির্গমন মাপতে পারে।

মঙ্গলগ্রহের তাপমাত্রা খুবই কম। যে পথ নিরক্ষরেখা অতিক্রম করেছে, সেই পথে অগ্রসর হয়ে মার্স 3 মঙ্গলগ্রহের তাপ নির্ণয়ের প্রথম যে চেষ্টা চালায়, তাতে দেখা যায় যে, মঙ্গলগ্রহের তাপমাত্রা শূন্যাঙ্কের 15 ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড নীচে।

একটি বিশেষ ধরণের দৃষ্টিগ্রাহ্য যন্ত্রের সাহায্যে জলীয় বাষ্পের পরিমাপ নেওয়া হয়। খুব সহজেই এই যন্ত্রট এক মিটার পথে সামান্ত জলীয় বাষ্পও আবিষ্কার করতে পারে। মোটামুটি একই পরিমাণ জলীয় বাষ্প মঙ্গলগ্রহের সেই পথের আবহাওয়ার ঘনত্বের মধ্যে আছে। মার্স-2 এবং মার্স-3-তে একটি করে রেডিও-দূরবীক্ষণ যন্ত্র বসানো আছে। এগুলি গ্রহের বেতার-তরঙ্গ এবং তাদের তীব্রতার ও মেরুকরণের মাপ গ্রহণ করে। এই মাপ নির্ণয় থেকে যে তথ্য পাওয়া যায়, তার ফলে গভীরতায় তাপ নিরূপণ এবং ভূমির গঠনের ঘনত্ব নিরূপণ করাও সম্ভব হয়। মঙ্গলগ্রহগামী

মহাকাশযানে যে স্বয়ংক্রিয় রেডিও-দূরবীক্ষণ যন্ত্র বসানো থাকে, তা আকারে খুব বড় নয়। এর সাহায্যে 100 থেকে 150 ব্যাসার্ধযুক্ত পরিধির রশ্মি বিকিরণ মাপাও সম্ভব।

মার্স-2 ও মার্স-3-এ একটি বহুমুখী অতি-বেগুনী রশ্মির ফটোমিটার আছে। এর সাহায্যে মঙ্গলগ্রহের উপরিভাগের আবহাওয়ার উজ্জ্বলতা মাপা যায়।

রেখাঙ্কন ও বর্ণালীভাষ্য

একপর্ণা দাশ

রেখাঙ্কন ও বর্ণালীভাষ্য সহজ বোধগম্য করবার জন্যে কয়েকটি কথা সুরুতে বলা প্রয়োজন। মানুষের মনের ভাব প্রকাশ পায় ভাষার মাধ্যমে—কিন্তু শিশুমনে যেমন প্রকাশনার ভঙ্গী ভাষার অভাবে সম্পূর্ণ নয়, প্রাপ্তবয়স্কের তেমনই মনের কথা সর্বত্র প্রকাশ করা সম্ভব হয় না।

যে কথাটি মুখে বলা যায় না লেখনী বা রেখাঙ্কনের মধ্যে সে কথাটি ফুটে ওঠে বিশেষজ্ঞের কাছে। ধরুন যে লোকটির হস্তলিপির সঙ্গে আপনি পরিচিত, মানসিক উত্তেজনাবশে সেই লিখনভঙ্গীও পাল্টে যায়। সহজ লেখা ও উত্তেজনা বা নিস্তেজনাবশে লেখার পার্থক্য একটু অনুধাবন করলেই বোঝা সম্ভব।

ছবি অঙ্কনের ব্যাপারেও সেই একই প্রক্রিয়া প্রকট হয়ে ওঠে। সাধারণতঃ রেখাচিত্রের যে ধরণ সুস্থ মানসিকতার প্রতিচ্ছবি, মানসিক অস্থিরতায় তারই অন্য রূপ ফুটে ওঠে।

আবার ছবিতে রং ফলাবার ব্যাপারে যে রঙের ব্যবহার হয়, তার মধ্যেও এই ধরণের প্রকাশ দেখা যায়।

মনের বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বিশেষ বিশেষ রঙের বিচিত্র প্রতিক্রিয়া মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বের নির্দেশক, বিভিন্ন অবস্থাভেদে বহু সংখ্যক ব্যক্তি-চরিত্রের বিশেষত্ব লক্ষ্য করলে সাধারণভাবে এই বিষয়ে আলোকপাত সম্ভব।

ভিন্ন মানসিক অবস্থায় অর্থহীন হিজিবিজি রেখাঙ্কনও মানসিক অবস্থা নিরূপণের সহায়ক। যেমন—শান্ত পরিবেশে যে ছেলেটি হাতে খড়ি পেলে স্বাভাবিক রেখা টানবে, সে-ই আবার উত্তেজিত অবস্থায় ঐ খড়ি দিয়েই অস্বাভাবিক হিজিবিজি রেখা টেনে যাবে।

পৃথিবী জোড়া আনন্দ মেলায় রঙের বিচিত্র সমারোহ কি অর্থহীন? এই বৈচিত্র্য মনে কি সাড়া জাগায় না? গাছের পাতার সবুজ রং চোখ জুড়িয়ে দেয়, পাকা ফসলের সোনালী রং জাগায় আনন্দ—জাগায় আশা। প্রজাপতির ডানায় ও পাখীর পালকের অপরূপ বর্ণ সমাবেশ অন্তরকে পুলকিত করে তোলে। আকাশের ঘনকৃষ্ণ মেঘ মনে জাগায় ভয়। চাঁদে প্রথম মানুষ তার অপরূপ বর্ণালীতে অভিভূত হয়ে বলে উঠেছিল—সুন্দর! সুন্দর! মরণের আশঙ্কা তাকে স্পর্শ করতে পারে নি। রোরুদ্যমান ছোট্ট শিশুটি লাল খেলনাটি দেখে কান্না ভুলে যায়। মানুষের মনের উপর বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে বিভিন্ন রং।

দেশে দেশে ধর্ম ও সংস্কার রঙের প্রভাব মুক্ত নয়। ভয়ঙ্করী কালীমূর্তির রং কালো, আবার

তার পূজার ব্যবস্থা উগ্র উত্তেজক লাল ফুলে, সিঁদুরে। বৈষ্ণবের শান্তির ধর্ম, গৌরাঙ্গ সাদা উত্তরীয়ে আবৃত শ্বেতচন্দন ও সাদা ফুলের পূজারী। যীশু খৃষ্টের শিরশোভা জরদ রঙের, ইসলামের পতাকা সবুজ।

প্রাপ্তবয়স্কেরা সমাজের প্রচলিত ব্যবস্থার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, তাই কোন্ রঙের শাড়ী কাকে মানায় আর তার সঙ্গে কোন্ রঙের জামা মানানসই হবে কিংবা কোন্ রঙের ওষ্ঠ বা নখরঞ্জনী কার উপযোগী, এই বিচার-বিবেচনা কাল ও সমাজ ধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের পক্ষে বাধ্যতামূলক। এমন কি, ঘর-বাড়ীর রং পর্যন্ত বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী করণীয়।

বিভিন্ন বর্ণ সমাবেশে মানসিক প্রতিক্রিয়ার যান্ত্রিক ও মনস্তাত্ত্বিক স্বরূপ নির্ধারণ পন্থাগুলি দোষমুক্ত না হলেও প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটনের সহায়ক নিশ্চয়ই।

রোগ নির্ণয়ে বা চিকিৎসার ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ প্রভূত আশার সঞ্চার করেছে। আধুনিক মানসিক চিকিৎসার হাসপাতালে রঙের পরিপ্রেক্ষিতে মানসিক প্রতিক্রিয়া দেখবার সে সুযোগ আছে। আমাদের দেশে তার প্রচলন হয় নি, তাই এই বিষয়ে প্রায় সবটুকু জ্ঞান বৈদেশিক হাসপাতাল বা চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের অভিজ্ঞতা থেকে সঞ্চয় করতে হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে এই অভিজ্ঞতার ফল স্বীকার করা কিঞ্চিৎ দুরূহ বলে মনে হলেও এই বিষয়ে চিন্তা করা ও দৃষ্টি দেবার যথেষ্ট অবকাশ আছে বলে মনে করি।

কীট-পতঙ্গ ফুলের রঙে আকৃষ্ট হয়, কিন্তু এরা পছন্দমত রং দেখলেই আকৃষ্ট হয়ে থাকে। সব রং সকল কীট-পতঙ্গের কাছে সমান আকর্ষণীয় নয় অর্থাৎ বিভিন্ন রং এদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন পরাবর্তের সৃষ্টি করে। উজ্জ্বল আলোর টানে কেউ বা জীবন তুচ্ছ করে ছুটে যায় আবার কারোর প্রিয় নিভৃত অন্ধকার।

আবার লাল রং বৃষের মনে যে ভাব জাগায়, কালো বা সবুজ রং সে ভাব জাগাতে পারে না, অথচ সেই লাল টুক্টুকে ফল একটা পাখীর কাছে আকর্ষণীয়—অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন রং ভিন্ন ভিন্ন জীবে উদ্দীপনার সৃষ্টি করে।

মানুষের বেলায় এই রঙের প্রতিক্রিয়া জীবনের প্রতিটি স্তরে পরিদৃশ্যমান। ছোট ছেলে রঙের খেলায় মেতে ওঠে, বয়স্কেরা রঙের মনোনয়ন নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। আবার উদ্দাম আনন্দের হোলি খেলায় রঙের বাহুল্য ও অদ্ভুত সংমিশ্রণে নিজেদের হারিয়ে ফেলে।

শিশুর মনে পরিবেশের প্রভাব সবচেয়ে শক্তিশালী। এই পরিবেশের প্রভাবে গড়ে-ওঠা মনের বিকাশ নানাভাবে হয়ে থাকে। তার মধ্যে রেখাঙ্কন একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। যা সে দেখছে—পৃথিবীর কাছে সে যা পেয়েছে, তারই পরিস্ফূরণ হয় অঙ্কনের মাধ্যমে।

শৈশবের প্রকাশনভঙ্গীতে কৃত্রিমতার স্থান অতি অল্প, তাই শিশু মনস্তত্ত্বের যে প্রকাশ প্রাথমিক অঙ্কনের মধ্যে দেখা যায়, তা শিল্প-চাতুর্যের মূল্যায়নে যতই সামান্য হোক, মনস্তত্ত্বের প্রকাশনায় তা অমূল্য। শিশু তার সৃজনী শক্তির সাহায্যে প্রকাশ করে তার অন্তরের উপলব্ধি ও চেতনা, যার উৎস তার পরিবেশ।

বিশেষজ্ঞের গবেষণা থেকে জানা যায়, আট বছর বয়ঃক্রম পর্যন্ত শিশু পরিবেশের চিত্র আঁকে নিজের মানসিক চিত্রের আদর্শে, বাস্তবের সঙ্গে যার সম্পর্ক বিরল। আট বছরের ঊর্ধ্বে শিশু-মানসিকতার পূর্ণতা বিকশিত হতে থাকে এবং সে পরিবেশের চিত্র নিপুণ হাতে যথাযথ প্রতিকৃতি আঁকবার চেষ্টা করে। দৃশ্যমান জগতের নির্ভুল প্রতিকৃতি চিত্রিত করবার মধ্যে আত্মপ্রসাদ লাভের প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। প্রকৃত জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে এই প্রচেষ্টা জড়িত বটে, কিন্তু জ্ঞানের মাপকাঠি হিসাবে এই তথ্য নির্ভুল নয়।

পরবর্তী কালে শিশু পরিবেশের সঙ্গে আপন-মানসিক অবস্থার অভিযোজনের চেষ্টা করে তাই সে যা দেখে, সেটা আপন মানসিক দৃষ্টিভঙ্গীর সমতা বজায় রেখে চিত্রে প্রতিফলিত করে। কিন্তু মানসিক আবেগের প্রভাবে এই সামঞ্জস্য বিঘ্নিত হতে পারে। এই ভাবাবেগের বিশেষ প্রবণতা ও অঙ্কনভঙ্গী পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। দুটিই গতিশীল প্রবৃত্তি। স্বাভাবিক ক্ষেত্রে উভয়ের সামঞ্জস্য নির্ভুল, কিন্তু যে কোনও একটির সামান্যতম ব্যতিক্রম অঙ্কনের মধ্যে পরিস্ফুট হয়।

অভাব, অভিযোগ বা অনাদর সুস্থ মনো-বিকাশের পরিপন্থী, এর প্রভাবে এদের অঙ্কিত চিত্র নিষ্প্রাণ ও সাংসারিক বিষয়বস্তুর উপর আস্থাহীন। সমবয়স্ক এবং সমান বুদ্ধ্যাঙ্কবিশিষ্ট (I. Q.) দুটি শিশুর ভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন প্রকাশনভঙ্গী দ্রষ্টব্য।

পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে দেখা গেছে যে, নিজের বা আপন পরিবারের চিত্র অঙ্কন শিশুমনের পরিচয় প্রদানে সবচেয়ে উপযোগী। নিজের মনের ভাব যেমন আপন মুখালেখ্যে প্রতিফলিত হয়, তেমনই সংসারে আসক্তি এবং পরিবারবর্গের স্নেহ, প্রেম, ভালবাসার প্রকৃত সত্য এই চিত্রে বিশেষরূপে ধরা পড়ে। যে শিশু সংসারে অনাদৃত বা অবাঞ্ছনীয় হয়ে পড়ে রইলো, যার মনের সকল সুকুমার বৃত্তি ফুটতে পেল না, তার চিত্র হবে খাপছাড়া—ব্যঞ্জনাহীন।

প্রাপ্তবয়স্কেরা রং প্রয়োজন হিসাবে ব্যবহার করে। তাই মানসিক ও সামাজিক সম্পর্কের দর্পণ হিসাবে শিশুর রং পছন্দ বৈশিষ্ট্য ও অর্থপূর্ণ। শিশু যা দেখে বা আঁকে, তাকে প্রাণবন্ত করতে চেষ্টা করে রঙের সাহায্যে। রঙের সম্মোহিনী শক্তি শিশুকে অভিভূত করে। শিশু-মনের আবেগ, প্রাকৃতিক জ্ঞান আর রঙের উদ্দীপনা বিচিত্র ছন্দের সামঞ্জস্যে প্রকাশিত হয়। এই ক্ষেত্রে রঙের প্রতি-ফলন বিষয়বস্তু থেকে মানসিক চেতনার দ্যোতক। বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে রঙের যাদু শিশুমন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তখন আসে অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে প্রাকৃতিক দৃষ্টিভঙ্গীর সম্মিলন, কল্পনার সমাধি—বাস্তবের সৃষ্টি।

সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক বিধিব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতার প্রকাশনও ভিন্ন। আদিম জাতিপুঞ্জের মধ্যে বর্ণালী-বৈচিত্র্যের সমাদর সবিশেষ লক্ষণীয়। প্রাথমিক স্তরে প্রাকৃতিক জৈবিক রঙের প্রচলন ছিল। কিন্তু আধুনিক সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে রাসায়নিক রং তৈরি হচ্ছে কলকারখানায়। প্রাকৃতিক রঙের বিচিত্র সংমিশ্রণ আদিম যুগের মানুষের যে উদ্দেশ্য সাধন করতো, সে এখন কয়েকটি কৃত্রিম রং ও তার সংমিশ্রণে সীমাবদ্ধ হয়েছে।

সব আদিম অধিবাসীর রঙের জ্ঞান সমান নয়। মাওরি সম্প্রদায় গাছের পাতার সবুজ রঙেরই অন্ততঃ পঞ্চাশটি বিভিন্ন বিভাগ বোঝে—সেই তুলনায় অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা রঙের উপলব্ধিতে দরিদ্র—মাত্র লাল, সাদা ও কালো রংই চেনে। এস্কিমোরা বরফের সাদার নানারকম নামকরণ করে। এথেকে সম্প্রদায় বিশেষের কৃষ্টি সূচিত করা সম্ভব।

পাশ্চাত্ত্য জগতে রঙের ব্যবহার এখন প্রায় যান্ত্রিক পর্যায়ে এসে পৌঁচেছে—বাহ্য চাকচিক্যের প্রকাশ এতে বেশী, সূক্ষ্মানুভূতি কম।

শিশুদের রঙের নির্বাচনে প্রকাশন-বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সামাজিক পরিবেশের প্রভাব দেখা যায়। সুস্থ স্বাভাবিক পরিবেশে প্রতিপালিত ছয় থেকে দশ বছরের শিশুদের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে এটা প্রমাণিত হয়েছে। অধিকন্তু বিভিন্ন বয়সে রং নির্বাচনে তারতম্যও দেখা গেছে। শিক্ষা ও প্রযুক্তিবিদ্যায় উপযোগিতা নির্বাচনে এই গবেষণা সহায়ক হতে পারে।

বয়স	বিশিষ্ট রং	অন্যান্য রং
6 বছর	লাল	নীল, সবুজ, বাদামী।
7 বছর	বাদামী	লাল, সবুজ, বাদামী, ধূসর।
9 বছর (86% শিশু নিজস্ব রং পছন্দ করতে শেখে)	লাল, নীল, সবুজ ও বাদামী	গোলাপী ও ফিকে লাল (Mauve)
10 বছর (81% শিশু মিশ্র রং ও ছায়ার (Shade) ব্যবহার ও গোলাপীতে বীতস্পৃহা)।	সবুজ	নীল ও বাদামী

এপর্যন্ত যা বলা হলো, সেটা স্বাভাবিক সুস্থ সমাজে প্রতিপালিত শিশুদের পক্ষে সত্য। অস্বাভাবিক পরিবেশে প্রতিপালিত শিশুদের মানসিক বিকাশের সুযোগ কম এবং এদের রঙের প্রতি আকর্ষণের বৈশিষ্ট্য নেই। এরা প্রায়ই একটা রং, যা স্বাভাবিক শিশুদের থেকে ভিন্ন—বাছাই করে। সুস্থ মানসিক বিকাশের অভাবের পরিপ্রেক্ষিতে ঔজ্জ্বল্যহীন, নিষ্প্রাণ রঙের ব্যবহার দেখা যায়, উপরন্তু এদের অঙ্কিত চিত্র প্রায়ই খাপছাড়া।

পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রণালী :—

(1) বয়স

(2) পারিবারিক ইতিহাস

(3) সমাজ ও অর্থনৈতিক অবস্থা

(4) উপসর্গ

(5) মনস্তত্ত্ব পরীক্ষা

(ক) বুদ্ধাঙ্ক (I. Q.)

বাচনিক (কথিত ভাষা ও অবধারণ শক্তি)

শিল্পনৈপুণ্য

(6) রং ফলানোর বিশেষত্ব।

এই ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে উপসংহারে আসা যায় যে, চিত্রের মাধ্যমে শিশুমনের পরিচয় পাওয়া সম্ভব। তাদের জগৎ, অভাব, অভিযোগ ও অভিলাষ, ভয়-ভাবনা এবং পরিবেশের সঙ্গে আপন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সঙ্গতি সে প্রকাশ করে তার সৃষ্টির মাধ্যমে—যে সৃষ্টি তার নিজস্ব, তার অন্তরের রহস্য জগতের সত্য দর্শন।

পাশ্চাত্ত্যে কম্পিউটারের সাহায্যে এখন হাজার হাজার রঙের প্রতিক্রিয়ার উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে আর তার দ্বারা উপকৃত হচ্ছে চিকিৎসক, কর্ম-নিয়োগকর্তা প্রভৃতি। এমন কি, বিবাহের সঙ্গী নির্বাচনেও এর সাহায্য নেওয়া হচ্ছে।

সব রকম রঙের বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নয়, তাই কয়েকটি রঙের পরিসংখ্যানভিত্তিক উপসর্গ ও নিদান পরিপ্রেক্ষিতে গবেষণালব্ধ ফলের আলোচনা করা হচ্ছে।

লাল—বিশুদ্ধ লাল রং নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে 4500 মিশ্র লাল রঙের নিখুঁৎ জৈবিক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা হয়েছে। লাল রঙের সঙ্গে হলুদ বর্ণ মিশিয়ে জরদ লাল (রক্তিমাভ জরদ) করে ক্যানাডার অধ্যাপক Wolfarth তাঁর ছাত্রদের কয়েক মিনিট দেখতে বলেন। পরে তাদের নাড়ির গতি, রক্তচাপ ও শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি লক্ষ্য করে দেখেন যে, তাদের জৈবিক প্রক্রিয়া দ্রুততর হয়েছে। আবার এদের গাঢ় নীল বর্ণের দিকে দেখতে বলেন ও বিপরীত ফল পান অর্থাৎ জৈবিক প্রক্রিয়া শান্ত হয়ে আসে, নাড়ির গতি, রক্তচাপ ও শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি কমে আসে।

ক্যানাডার এই ছাত্রদের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল সর্বদেশে সর্বজাতিতে ও সকল সামাজিক স্তরে এক—এমন কি, প্রাণী-জগতেও এর তারতম্য দেখা যায় না।

আলজিরিয়ার গবেষক Benoit হাঁসের চোখ কালো কাপড়ে বেঁধে দেখলেন যে, তাদের মিলন-স্পৃহা একেবারে অন্তর্হিত হয়েছে, কিন্তু লাল বা জরদ রং 120 ঘণ্টা ব্যবহার করে দেখেন যে, তাদের মুষ্কের পরিমাপ ও যৌন-প্রক্রিয়া প্রভৃত পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন রঙের পরিবেশে বহু প্রাণী আপন রং বদল করে পরিবেশের সামঞ্জস্য-ভুক্ত হয়। কয়েক জাতীয় মৎস্য জলের গভীরতা অনুযায়ী রঙের সঙ্গে আপন রং থাপ খাইয়ে নেয়। চিংড়ি, এমন কি ব্যাংও খুব দ্রুত আপন রং বদলাতে পারে। কৃকলাসের রং বদল অনেকেই লক্ষ্য করেছেন। Benoit-এর মতে, চোখ থেকে মস্তিষ্কে উত্তেজনাবাহী তন্তুর পরাবর্তে হাইপোফিসিস ও স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে উত্তেজনা প্রবাহিত হয়। শারীরিক উত্তেজনা সৃষ্টিকারী লাল রংকে বলা হয় ergotropism আর নীল রঙের নিস্তেজনা সৃষ্টিকে বলা হয় trophotropism। হৃদ্‌রোগীরা উত্তেজক লাল রং সহ্য করে না। তাদের কাছে শান্ত গাঢ় নীল রং বেশী প্রিয়।

জরদ—লাল রঙের উত্তেজক যেমন মানুষকে লক্ষ্যে পৌঁছাবার প্রেরণা জোগায়, তেমনই হলুদ মেশাতে মেশাতে শেষে তার মানসিক স্থৈর্য নষ্ট হয়ে অস্থিরতার সৃষ্টি করে।

জরদাভ লাল—জরদের সঙ্গে ঘোর লালের সংমিশ্রণে এই রং অস্থিরতা থেকে শান্তির অবস্থা সৃষ্টি করে। এই দুই মিশ্র রঙের প্রতিক্রিয়ার প্রভাব থেকে মনে হয় মিশ্রণের ফলে আদি রঙের মানসিক প্রভাব বিনষ্ট হয়। লাল রং উত্তেজনা ও আক্রমণাত্মক প্রভাববিশিষ্ট হলেও জরদাভ লাল শান্তি ও অসীম উল্লাসের দ্যোতক। সুতরাং রঙের বিচিত্র আকর্ষণ থেকে রোগীর মানসিক অবস্থা নির্ধারণ করা সম্ভব; অর্থাৎ যে জরদাভ লাল পছন্দ করে, সে উত্তেজনায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, এই ধারণা অস্বাভাবিক নয়।

নীলাভ লাল (বেগুনী)—বেগুনী রং লালের প্রভাবমুক্ত নয়। বেগুনীতে লালের উত্তেজনা সংযত হয়। এতে আসে জমক ও আভিজাত্য—আসে সম্মানিত আত্মতুষ্টি।

গোলাপী লাল—লালের সঙ্গে সাদা রঙের সংমিশ্রণের ফল। সাদা মুক্তির প্রতীক—লালের উত্তেজনা শক্তিকে নিষ্প্রভ করে মুক্ত শান্ত পরিবেশের সৃষ্টিকারী।

নীল-জৈবিক ও মনস্তাত্ত্বিক শান্তির প্রতীক। মহাকবি কালিদাসের "তমাল তাল বনরাজি নীলা"—স্বভাবকবি গ্যেটের "Attractive Nothingness" অনন্ত নীল আকাশ, মহাসমুদ্রের গাঢ় নীল মনে উদাস ভাব জাগায়, নিরাসক্ত নির্বাচনের দিকে টেনে নিয়ে যায়।

গাঢ় নীল—পরিপূর্ণ শান্তিতে দেহমন আচ্ছন্ন করে। নাড়ির গতি, রক্তচাপ, শ্বাস-প্রশ্বাস শ্লথ করে নিদ্রার আবেশ আনে। গাঢ় নীল শারীরিক বিশ্রাম আর মানসিক তুষ্টির নিয়ামক, মানসিক তুষ্টি, সুখ ও আনন্দের পরিবাহক। সুখ ও শান্তি পার্থিব সকল চিন্তা ভাবনার রক্ষাকবচ। গাঢ় নীল বিশ্বাস আনে—সকল ভাবনা চিন্তার পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে সাংসারিক বিষয়বস্তুর সঙ্গে ব্যক্তির সামঞ্জস্য ঘটায়।

জার্মেনীতে চিনির মোড়ক তৈরি করে নীল কাগজে—নীল মিষ্টতার প্রতীক—মধুর পরিবেশের সহায়ক। পালি ভাষায় নীলা আর জার্মান ভাষায় Gemut—সৌহার্দ, সদ্ভাব ও সমাহিত অবস্থার দ্যোতক।

সরস্বতীর নীল বসন, মাতা মেরীর নীল পোষাক, আভিজাত্যের নীল রক্ত (Blue blood of nobility), প্রেম-ভালবাসার প্রতীক নীল পুষ্পদল সর্বকালে সর্বদেশে সমাদৃত।

স্থূলদেহীর প্রিয় নীল—এতে তাদের আত্মতুষ্টি আসে—অন্যের নজর এড়াবার প্রচেষ্টা বোঝায়। নীল রং বর্জনকারীদের শান্তি ও

স্নেহের অভাব বোঝায়। সহকর্মী বা বন্ধুবান্ধবদের প্রতি অনাস্থা, ঘৃণা ও তার জীবনের উন্নতির বিরুদ্ধভাব প্রকাশ করে। সে প্রায়ই চপলমতি ও অস্থির। শিশুদের পাঠে অনীহা প্রকাশ করে। শান্ত নীলবর্জিত রঙের পরিবেশে প্রাপ্তবয়স্কের হৃদ্‌রোগ ও রক্ত পরিবহনের বৈকল্য সূচনা সম্ভব। শিশুদের পক্ষে অমনোযোগিতা, শিক্ষায় অনগ্রসরতা প্রভৃতি দেখা যায়।

সবুজ—সবুজ একটি মিশ্র রং—হলুদ ও নীল রঙের সংমিশ্রণ। আশ্চর্যের বিষয়, এই দুটি রঙের পরস্পর বিরোধী প্রবণতা সংঘর্ষে আপন বৈশিষ্ট্য হারায়—ফলে হয় পূর্ণ শান্তি ও স্থিতিস্থাপকতা। যাবতীয় রঙের মধ্যে সবুজ সবচেয়ে শান্ত রং। এই রং নেতিবাচক। আনন্দ, বিশ্বাস, ব্যথা কোন কিছুরই প্রকাশনা এতে নেই, কোন অর্থব্যঞ্জক ধর্মবিহীন, "এ যেন এক পরিপুষ্ট গাভী যে উদাস নেত্রে রোমন্থন করে চলে"—বলেছেন Kandinsky।

গ্যেটে তাঁর "Discourse on colours"-এ বলেছেন এই রং চোখে আনে শান্তি। দুটি মিশ্র রং এক হয়ে ধরা দেয় এবং আদি রং দুটি বৈশিষ্ট্য হারায়—এর বেশী কিছু নয়—না আশা, না আকাঙ্ক্ষা। হলুদের উত্তেজক ও আক্রমণাত্মক শক্তি, নীলের শান্ত সমাহিত ধর্মের সঙ্গে মিলিত হয়ে বিপরীত ধর্ম বজায় রাখে সবুজের মধ্যে। সবুজ স্থিতিশীল—সবুজের শক্তি প্রচ্ছন্ন, এর গতি শক্তি নেই।

Kandinsky আরও বলেন, সবুজ নির্ভরশীল, কিন্তু অনেকে মনে করেন সবুজ নির্ভরশীল নয়, স্থিতিশীল। অণু যেমন বিভাজনশীল, তেমনই সবুজকেও ভাগ করে এর ধর্ম নিরূপণ করা সম্ভব, যদিও এর প্রতিরোধ ক্ষমতা ও প্রবণতা খুব স্পষ্ট। সবুজে বেশী নীল মেশালে মনস্তাত্ত্বিক বিচারে এর দৃঢ়তা, প্রতিরোধ ক্ষমতা ও শান্ত ভাবও বেড়ে যায়। আবার বেশী হলুদ মিশ্রণের ফলে আরও বেশী কোমল, ভদ্র, আবেগময়, অলস ও সৌহার্দ্যের আবেশ আনে।

সবুজাভ নীল (Turquoise) নীলকান্ত মণি—সবচেয়ে মনোমত তাজা রং। গ্রীষ্মপ্রধান বদ্ধ হাওয়ায়, শ্বাসরোধকারী উত্তপ্ত ও ক্লান্ত চোখে স্নেহের স্পর্শ আনে। তাই বাসগৃহ, শীতল পানীয়, প্রসাধনদ্রব্যের মোড়ক, দাঁতের মাজন ইত্যাদিতে এর প্রচলন এত বেশী। এর পরিশোধন গুণ লক্ষণীয় এবং জীবাণু ধ্বংসকারী শক্তিও এই রঙের আছে।

সবুজের মনোবিশ্লেষণ—Ego—অহংভাবের প্রতীক। Kandinsky বিশুদ্ধ সবুজকে মধ্যবিত্তের সঙ্গে তুলনা করেন। বিশুদ্ধ সবুজ নীলাভ সবুজের মত আরোহী নয়, আবার অবরোহীও নয়—কেন্দ্রীভূত নিরাপত্তার নিরাপদ আশ্রয়। ছোট ছোট কর্মধারায় পৃথিবীর প্রতিটি লোকের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কাজ করতে সক্ষম। সবুজ অধ্যবসায় ও দৃঢ়তার প্রতীক। বিশিষ্ট কর্মিতকর্মা ও পাগলেরা সবুজ সহ্য করতে পারে না।

নীলাভ সবুজের ভক্তদের মানসিক বা দৈহিক আবেগপ্রবণতা যদি তারা কোনক্রমে জয় করতে পারে, তবে তারা ঐ রঙের আসক্তি সঙ্গে সঙ্গে বর্জন করে ঐ রঙকেই কঠিন, নিষ্ঠুর ও বিষাক্ত জ্ঞান করতে থাকে। হাসপাতালে এই সব রোগী রেখে রঙের প্রভাব অনুধাবনের ফলে যদি দেখা যায় যে, এদের নীলাভ সবুজের প্রতি আসক্তি ও আস্থা ফিরে আসছে, তবে সেটা তাদের মানসিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত সূচিত করে। হৃদ্‌রোগীরা হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধের ফলে মৃত্যুর কয়েক মাস আগেই নীলাভ সবুজের উপর মাত্রাতিরিক্ত আকর্ষণ প্রকাশ করে, যা দেখে চিকিৎসকের সাবধান হওয়া উচিত।

হলুদ—সবুজ ও জরদ বা লালের সংমিশ্রণে হলুদ বর্ণ হয়। লালের উত্তেজনা ও সবুজের

আবেগ এই রঙের বিশেষত্ব, কিন্তু যেমন লাল ও সবুজের সংমিশ্রণে তৃতীয় রঙের উৎপত্তি হয়, তেমনই এর মনস্তাত্ত্বিক পরিচিতিতে অন্য বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয়।

হলুদ রঙের মানস ভিত্তিক অর্থ—প্রকাশনা। উন্নয়ন ও প্রসারধর্মিতা, আশা ও আনন্দের সম্ভবনায় সমুজ্জ্বল। অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসানকামী মুক্তির পথ নির্দেশক। অবসাদ ও হতাশার নিমজ্জমান ব্যক্তি মুক্তির আশ্বাস পায় এই রঙে। গার্হস্থ্য ধর্মে বঞ্চিত বা বীতরাগবিশিষ্ট সুদূর প্রবাসীর প্রিয় এই রং। আধ্যাত্মবাদী জ্ঞান-যোগীরা এই রং পছন্দ করে। সন্ন্যাসীদের গৈরিক বসন, শিবাজীর গৈরিক পতাকা, বৌদ্ধ ভিক্ষুদের গৈরিক বেশবাস, যীশু খৃষ্টের মূর্তির মাথার উপর হলুদ জ্যোতির্মণ্ডল, পীতবসন বনমালীর প্রতি আকৃষ্ট ভক্তমণ্ডলী এর সাক্ষ্য বহন করে। কখনও বাসনা-কামনার চরম আশায় বঞ্চিতের ক্ষোভ ও হিংসার প্রকাশ পায় হলুদ-প্রীতিতে—"The yellow of envy."

আশাবাদীর পছন্দ হলুদ বর্ণ, আশাহতের কাছে যা বর্জনীয়। দুই শত পুরাতন মস্তপের কাছে হলুদ বর্ণ অপ্রীতিকর বিবেচিত হয়েছিল। এদের পছন্দ বেগুনী রং। হলুদ বর্ণ বর্জনকারী আশাহতেরা হতাশাকে মেনে নেয় না বরং সঞ্চিত ক্ষোভের প্রভাবে অনেক সময় বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। রং নির্বাচনের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এই বিষয় অনেকটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, চরম হতাশার মুহূর্তে শেষ অবলম্বন হিসাবে হলুদ রং বাঞ্ছনীয় বিবেচিত হয়েছে। 1890 খৃষ্টাব্দে ভ্যানগঘের শেষ চিত্র 'সোনালী গমের ক্ষেতের উপর বিদ্যুদ্দাম বিকশিত কালো মেঘের নীচে উড্ডীয়মান কাকের ছবি'—অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের ইঙ্গিত বহন করছে। অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের অনন্ত সম্ভাবনার প্রতীকও হলুদ বর্ণ।

মৌলিক বা মিশ্রিত রঙের সংখ্যাতিরিক্তের জন্যে সব রকম রঙের মানসিক প্রতিফলন বর্ণনা প্রায় অসম্ভব, তবে মিশ্র রঙের মধ্যে মৌলিক রং আপন আপন বৈশিষ্ট্যে প্রকাশিত। যতদূর জানি, রং নিয়ে কোন মৌলিক গবেষণা এপর্যন্ত আমাদের দেশে হয় নি।

পুস্তক-পরিচয়

1. অপরাধ-জগতের ভাষা—শ্রীভক্তিপ্রসাদ মল্লিক; মূল্য—পাঁচ টাকা।

2. অপরাধ-জগতের শব্দকোষ—শ্রীভক্তিপ্রসাদ মল্লিক; মূল্য—পাঁচ টাকা।

প্রকাশক—নবভারত পাবলিশার্স, 72, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-9

কলিকাতা সরকারী সংস্কৃত-মহাবিদ্যালয়ের ও রবীন্দ্রভারতী-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক প্রীতিভাজন ডক্টর শ্রীযুক্ত ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক সম্প্রতি (আশ্বিন 1378) দুইখানি অতি উপযোগী পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন, এবং তদ্দ্বারা বাঙ্গালা ভাষা আলোচনার ক্ষেত্রে একটি সম্পূর্ণ নূতন বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। বই দুইখানি হইতেছে (1) "অপরাধ-জগতের ভাষা", এবং (2) "অপরাধ-জগতের শব্দকোষ"। দুইখানি বইই কলিকাতা 72 মহাত্মা গান্ধী রোড হইতে "নবভারত প্রকাশকমণ্ডলী" কর্তৃক প্রকাশিত, এবং মুদ্রণের পারিপাট্যে ও সজ্জার সৌন্দর্যে বিশেষ লক্ষণীয়—বিশেষতঃ "অপরাধ-জগতের শব্দকোষ" বইখানি সুন্দর পকেট-বইয়ের আকারে সুদৃশ্য বাঁধাইয়ে প্রকাশিত হইয়া দর্শন-মাত্রেই আমাদের আকৃষ্ট করে, এবং অভিধানের মত বই যাহার রস বিশেষজ্ঞগণেরই পক্ষে গ্রহণীয় তাহাকেও যেন সকলের নিকট সুখপাঠ্য করিয়া তোলে। বই দুইখানি বিষয়-বস্তুতে বাঙ্গালা ভাষায় সম্পূর্ণরূপে নূতন। অপরাধ-জগতের মানুষ, চোর-ছেঁচড় 'ডাকাত খুনে' পকেট-মার, ছেলে-ধরা, মেয়ে-ধরা সমাজে ঘৃণ্য হইলেও, ইহাদের জীবন-যাত্রা চাল-চলন, রীতি-নীতি সম্বন্ধে খোঁজ-খবর লইবার আগ্রহ নিরীহ নাগরিক সজ্জনের মধ্যেও যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়—এই আগ্রহ কেন দেখা দেয় তাহা অবশ্য মনস্তত্ত্বের আলোচ্য বিষয়। এই আগ্রহ হইতেই সাধারণ্যে প্রচলিত Crime fiction, Detective stories ইত্যাদির উৎপত্তি। বাঙ্গালা সাহিত্যে এই ধরণের সাহিত্যের যথেষ্ট প্রাচুর্য্য আছে। লোকে পড়ে খুব, অনেকে পড়িতেও ভালবাসে। কিন্তু এইরূপ সাহিত্য বিশেষরূপে প্রচলিত, এমন কি, জনপ্রিয় হইলেও, "সৎসাহিত্য" বলিতে যাহা আমরা বুঝি, সেই পর্যায়ে ইহা কখনও উন্নীত হইতে পারে নাই। অদ্ভুত প্রতিভা এবং অন্তর্দৃষ্টির ফলে ইংরেজ লেখক Conan Doyle-এর মত সাহিত্যকার যে-সমস্ত চমকপ্রদ ঘটনা যে সমস্ত রহস্য বা ধাঁধার সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, Sherlock Holmes-এর মত যেসমস্ত চরিত্র সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, সেগুলির আধার বা পরিবেশ হইতেছে সমাজ-বিরোধী অপরাধ, সন্দেহ নাই; কিন্তু এগুলি রসোত্তীর্ণ হইয়াছে—"দশম রস" যাহাকে বলিতে পারা যায় সেই "রহস্য রস" যেন এইসব রচনায় আবির্ভূত হইয়াছে। এই "রহস্য-রস" বা "রহস্য-বোধ" কেবল sense of mystery অজানার জন্য আকূতি নহে, ইহা হইতেছে sense of the uncanny and mysterious, ভুতুড়ে রহস্য,—ইহা ভীতি, ঘৃণা, জুগুপ্সা ও কৌতূহল মিশ্র এক অভিনব সাহিত্য-রস। লোকে যে জন্য ভূতের গল্প শুনিতে চাহে, গোয়েন্দার গল্প, চোর-ডাকাতের গল্প শুনিবার আগ্রহও সেই প্রকারের। ইহা নিছক্ চিত্ত-বিনোদনের জন্য। কিন্তু অপরাধ-বিজ্ঞান—Criminology—কেন মানুষ অন্যায় অপরাধ, অনুচিত ব্যবহার, সমাজবিরোধী কাজ করে, তাহার আলোচনা, অপরাধ-প্রবণতার উদ্ভব

এবং নিরোধ—ইহা মানব মন এবং মানব প্রচেষ্টার সম্বন্ধে তত্ত্ব-নির্ধারণের একটি বৈজ্ঞানিক পন্থা। এবিষয়ে বাঙ্গালা ভাষায় কিছু কিছু অভিজ্ঞতার আধারে স্থাপিত বিচার ও গবেষণা হইয়াছে। বিখ্যাত পুলিস-কর্মচারী, কলিকাতা পুলিসের ডেপুটি কমিশনার ডক্টর পঞ্চানন ঘোষালের গ্রন্থ ও নিবন্ধাবলীর উল্লেখ এই ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক তাঁহার ভাষাতত্ত্বের জ্ঞান লইয়া অপরাধ-জগতের লোকেদের চিন্তা ও কর্মের পরিচায়ক তাহাদের নিজেদের মধ্যে বাহিরের লোকের কাছ হইতে আত্মরক্ষার জন্য ব্যবহৃত "ঠার" বা বিশেষ শব্দের সংগ্রহ, আলোচনা ও ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। আমার জ্ঞান-গোচর মত, শ্রীমান্ ভক্তিপ্রসাদের পূর্বে এই কার্যে আর কেহ অবতীর্ণ হন নাই। ইনি কয়েক বৎসর যাবৎ এই গবেষণায় ও শব্দ সংগ্রহে আত্মনিয়োজিত রহিয়াছেন। পশ্চিম বাঙ্গালার সমাজ-বিরোধী নানা শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাবে মিলিয়া তাহাদের ভাষা আয়ত্ত করিবার সার্থক প্রয়াস করিয়াছেন, জেল-খানার ভিতরে গিয়া কলিকাতায় ও অন্যত্র ইহাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিয়াছেন। কোথাও, কোথাও ইহাদের মধ্যে বিরূপ ভাব পাইলেও সাধারণতঃ ইঁহার সংগ্রহ-কার্য ভালই হইয়াছে বলিতে হয়। ইহা ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণার অপরিহার্য অঙ্গ বা আধার—Field work বা খোলা মাঠে খোঁজ করা, কেবল কেদারায় বসিয়া পুস্তকাগারের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকিয়া পিষ্ট পেষণ করিয়া গবেষণা বলিয়া চালাইয়া দেওয়া নহে। বই দুইখানি দেখিয়া আমি সত্যসত্যই খুব আনন্দ লাভ করিয়াছি, এবং শ্রীমান্ ভক্তিপ্রসাদকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভি-নন্দন জানাইতেছি। সাধারণ মাতৃভাষাপ্রেমী বাঙ্গালী পাঠক "শব্দকোষ" খানি হইতে প্রচুর তথ্য ও অভিজ্ঞতা—কি করিয়া ভাষাকে বাঁকাইয়া মুচড়াইয়া সমাজ-বিরোধী মানব-শ্রেণী নিজের গুপ্ত উদ্দেশ্যের পক্ষে কার্যকর করিয়া লয়—তাহা লাভ করিবেন। কোথাও-কোথাও বা এই সমস্ত শব্দ ও সেগুলির অর্থের প্রসার বা সঙ্কোচ বা বিকাশ দেখিয়াও চমৎকৃত হইবেন। "শব্দকোষ" বইখানিতে যে-সব শব্দ স্থান পাইয়াছে, সংগ্রহকার তাহার পরিধির সম্বন্ধে ঠিকভাবেই আমাদের জানাইয়া দিয়াছেন—এগুলি মুখ্যতঃ পশ্চিম বঙ্গের (ও কলিকাতা শহরের বিশেষ করিয়া) সমাজ-বিরোধী জনগণের মধ্যে প্রচলিত শব্দ। বাঙ্গালা যাহাদের মাতৃভাষা এই দলে যথেষ্ট পরিমাণে তাহারা থাকিলেও, বিহারী হিন্দী প্রভৃতি পশ্চিমা ভাষাভাষীরাই দলে ভারী, এবং প্রভাবশীল। সংগৃহীত শব্দাবলীর সংখ্যা, বিভিন্ন শ্রেণীর অপরাধীদের মধ্যে ব্যবহৃত শব্দের আপেক্ষিক অনুপাত-সংখ্যাও সংগ্রাহক অঙ্ক কষিয়া জানাইয়া দিয়াছেন। প্রায় 3000 শব্দ এই শব্দকোষের মধ্যে স্থান পাইয়াছে—সংখ্যায় নগণ্য নহে। শব্দগুলি অ-কারাদি ক্রমে সাজানো হইয়াছে, এবং সবচেয়ে মূল্যবান কথা এই—সংগ্রাহক যথাশক্তি প্রত্যেক শব্দের উৎপত্তি জানাইবার প্রয়াস করিয়াছেন। উপরন্তু বিভিন্ন অর্থে একটি শব্দ প্রযুক্ত হইলে, সেইসব বিভিন্ন অর্থ প্রয়োগ হইতে দেখাইয়াছেন—ইহাতে

অপরাধ-জগতের ভাষায় একটি বিশিষ্ট ছাপ বা ধাঁচ পাওয়া যাইবে। একটি গ্রন্থপঞ্জী এবং সাঙ্কেতিক চিহ্নাদির ব্যাখ্যা এই শব্দকোষের মূল্য আরও বাড়াইয়া দিয়াছে।

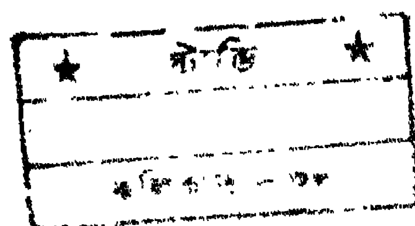
"অপরাধ-জগতের ভাষা" শ্রীযুক্ত ভক্তিপ্রসাদ মল্লিকের নিজ মৌলিক ভাষাতত্ত্ব-মূলক গবেষণার ফল। এই বইও বাঙ্গালায় একবারে নূতন। ইহার আবেদন বা আকর্ষণ অবশ্য প্রধানতঃ ভাষাতত্ত্ব-রসিকদের জন্য, বাঙ্গালা বাক্‌তত্ত্বের অনুশীলকদের জন্য। কিন্তু সাধারণ পাঠকও উহা হইতে প্রচুর কৌতুক ও আনন্দের উপাদান পাইবেন। এই বইয়ের প্রথমে যে "সূচনা", "পশ্চিম বাঙলার অপরাধ-জগৎ", "নিষেধ ও কুসংস্কার', "ইঙ্গিত" ও "ভাষার কারিকুরি" শীর্ষক প্রসঙ্গগুলি আছে, সেগুলি অতি উপাদেয়—ভাব ও তথ্য উভয়েই সমৃদ্ধ—বিশেষতঃ প্রথম দুইটি প্রসঙ্গকে অপরাধ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নূতন উপাদান আনিয়া দিয়াছে বলা যায়। শেষ প্রসঙ্গটিতে বহু শব্দের উৎপত্তি বিষয়ে চিত্তাকর্ষক আলোচনা দেওয়া হইয়াছে। ইহার পরেকার প্রসঙ্গ—"ধ্বনিতত্ত্ব" (Phonetics and Phonology), "রূপতত্ত্ব" (Morphology) এবং "শব্দার্থতত্ত্ব" (Semantics বা Semasiology)। বাক্‌তত্ত্বের শাস্ত্র মতে, অপরাধ-জগতের ভাষার বিশ্লেষণ ও আলোচনা যুক্তিযুক্তভাবে করা হইয়াছে। এই বইখানিতে শ্রীমান্ ভক্তিপ্রসাদ যে একাধারে মানব-প্রেমী, সমাজের সবদিকের প্রতি যে তাঁহার সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও হিতৈষণা-মূলক আকাঙ্ক্ষা আছে, তাহার প্রমাণ দিয়াছেন। ইহার গ্রন্থ-পঞ্জীও উল্লেখনীয়।

দুইখানি বই পরস্পরের পরিপূরক। বই দুইখানি কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া নাড়াচাড়া করিয়াছি। পাঠ করিয়া নূতন তথ্য পাইয়াছি এবং মনে মনে শ্রীমান্ ভক্তিপ্রসাদকে সাধুবাদ দিয়াছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই বইকে বাঙ্গালী পাঠক সাদরে গ্রহণ করিবে। বাঙ্গালা ভাষার একটি অবহেলিত অঙ্গের প্রতি ভাষাতাত্ত্বিক আগ্রহ ইহার মাধ্যমে স্বীকৃত হইবে, এবং দেশবাসীর নিকট হইতে উৎসাহ পাইয়া গ্রন্থকার তাঁহার আরব্ধ সংগ্রহ, বিচার ও গবেষণার ক্ষেত্রে আরও নূতন নূতন তথ্য ও তত্ত্ব চয়ন ও দর্শন করিয়া মাতৃভাষার তথা ভারতীয় মানবিকী বিদ্যার শ্রীবৃদ্ধি করিবেন। ইতি 9 পৌষ 1378, 25 ডিসেম্বর 1971। (যীশুর জন্মদিন—"বড়দিন")॥

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান



ফেব্রুয়ারী — 1972

রজত জয়ন্তী বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যা

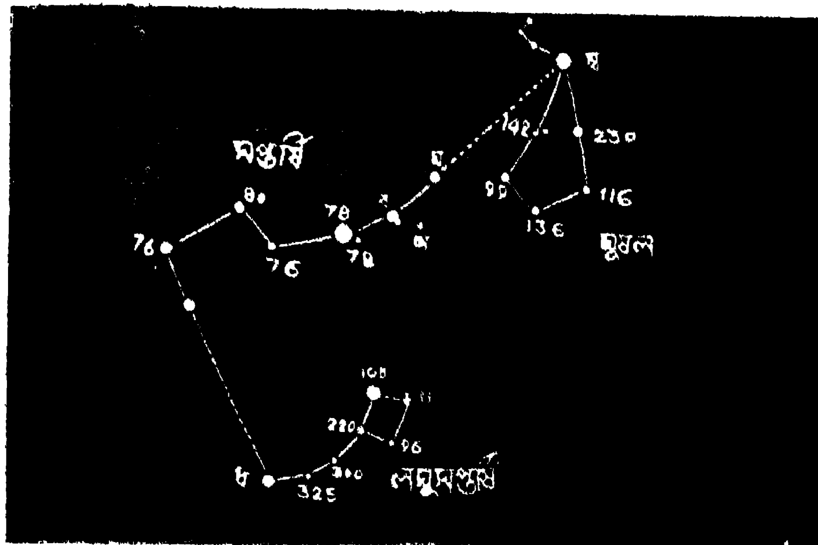


মরুভূমির আক্রমণ থেকে উর্বরা জমি রক্ষা করবার অভিনব ব্যবস্থা

মরুভূমি সংলগ্ন উর্বরা জমি ক্রমশঃ মরুভূমিতে পরিণত হয়ে থাকে। মরু অঞ্চলের এরূপ বিস্তৃতি প্রতিরোধ করবার জন্যে অনেক দিন থেকেই নানা রকমের ব্যবস্থা অবলম্বন করেও সাফল্য লাভ করা সম্ভব হয় নি। সম্প্রতি লিবিয়ার জেফারা অঞ্চলের 400 একর জমিকে নমনীয় একপ্রকার কৃত্রিম রবারের আস্তরণ দিয়ে সাহারা মরুভূমির আক্রমণ থেকে রক্ষা করবার ব্যবস্থা হয়েছে এবং এখন সেখানে 60,000 ইউক্যালিপ্টাস গাছ জন্মানো হয়েছে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে—সংশ্লেষিত রবারের রসের সঙ্গে একরকম খনিজ তেলের মিশ্রণে তৈরি Unisol নামক একপ্রকার তরল পদার্থ জমিতে স্প্রে করা হচ্ছে। এর ফলে খনিজ পদার্থমিশ্রিত জলীয় অংশ বালির বন্ধনশক্তি বাড়িয়ে তোলে এবং ঝরা পাতাগুলি ক্রমশঃ বালির সঙ্গে মিশে গিয়ে উদ্ভিদগুলির পুষ্টির জন্যে উদ্ভিজ্জ সার তৈরি করে।

আকাশের দিকে কিছুক্ষণ

সবার মাথার উপরেই আকাশ আছে। কিন্তু বড় বড় বিজ্ঞানীরা এমন সব কঠিন কঠিন ব্যাপার আকাশ সম্বন্ধে বলেন—মাঝে মাঝে মনে হয়, তারা-ভর্তি আকাশটা বুঝি আমাদের থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে যাদের আকাশ দেখবার সুযোগ নেই, কেউ তাদের পাত্তা দিতে চায় না। তাই এবার আমরা যদি ঠিক করি, ওই আকাশটা কারও একচেটে হতে দেব না, তবে আকাশ-পাগল বিজ্ঞানীরা ছাড়া বোধ হয় অনেকেই তোমরা এগিয়ে আসবে। তথাপি তোমরা, যারা এখনও বড় হবার ছাড়পত্র পাও নি, ইচ্ছা করলে অনেকেই রাতের আকাশের দিকে খালি চোখে তাকিয়েই গ্রহ-নক্ষত্রগুলির অবস্থান ও তাদের পরিচয় পেয়ে প্রচুর আনন্দ ও শিক্ষা লাভ করতে পারবে।



নক্ষত্রমণ্ডলের চিত্র

ধরা যাক, ঠিক উত্তর দিকে আমরা তাকিয়ে আছি। মনে হবে—সমস্ত আকাশটা একটা কালো রঙের গোলক, আর তার গায়ে বিভিন্ন নক্ষত্রগুলি ছবির মত সাজানো রয়েছে। রাত যত বাড়বে, সমস্ত ছবিটা সরতে থাকবে। যে নক্ষত্রটি ছিল মাথার উপর আরও পরে সেটা হেলে পড়বে পশ্চিম দিকে। এটা হয় পৃথিবীর আহ্নিকগতির জন্যে। ঠিক উত্তর দিকে তাকিয়ে থাকলে দেখা যাবে, সবাই নড়লো—সব ছবি সরে গেল, শুধু একটি নক্ষত্র যেমন-কে-তেমন রয়ে গেল। এটিই ধ্রুবতারা বা Polaris। প্রাচীন কাল থেকেই নাবিককে, গ্রামের মানুষকে রাতে পথ দেখিয়েছে ধ্রুবতারা

(চিত্রে ধ)। কারণ ধ্রুবতারা মিলিয়ে যায় দিনের আলোতে, কিন্তু কখনো অস্ত যায় না—এক জায়গা থেকে নড়ে না। কার্যক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হয়, এটি পৃথিবীর কাল্পনিক অক্ষরেখার ঠিক উত্তর প্রান্তে আছে (যদিও সঠিক গাণিতিক হিসাবে ধ্রুবতারা ঠিক উত্তর মেরু বিন্দু থেকে 1° সরে আছে)। আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রে সাজানো ছবিটা দেখতে হলে তাই ধ্রুবতারা দিয়ে সুরু করাই ভাল।

এই ধ্রুবতারাকে নির্দেশ করছে একটি জিজ্ঞাসার চিহ্নের (?) মত নক্ষত্রমণ্ডলের দুটি নক্ষত্র (এদের নির্দেশক বা Pointers বলে)। এই নক্ষত্রমণ্ডলটি আমাদের কাছে অতি পরিচিত সপ্তর্ষিমণ্ডল। এখানে যে নক্ষত্রের মানচিত্র দেওয়া হয়েছে, এবার যদি তোমরা উত্তর দিকের আকাশের সঙ্গে মিলিয়ে দেখ—তাহলে তিনটি নক্ষত্রমণ্ডল ছবির মতই ফুটে উঠবে। সপ্তর্ষিমণ্ডল, লঘু সপ্তর্ষিমণ্ডল ও মুষল বা মুদ্গরমণ্ডল। প্রত্যেক নক্ষত্রমণ্ডল সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা ছাড়াও কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আছে।

হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যায় যাকে সপ্তর্ষিমণ্ডল বলা হয়, প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্যায় বর্ণিত Ursa Major বা Great Bear বা বড় ভালুকের তা একটি খণ্ডাংশ মাত্র। ইংরেজীতে আমাদের সপ্তর্ষিমণ্ডলকে Plough বা Big Dipper বলে। সাতজন প্রাচীন ঋষির নামে সাতটি নক্ষত্র—অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, বশিষ্ঠ, মরিচি-কে নিয়ে এই নক্ষত্রমণ্ডলটি জিজ্ঞাসা চিহ্নের (?) আকারে গঠিত। আরও কয়েকটি নক্ষত্র সপ্তর্ষিমণ্ডলের সাতটিকে নিয়ে একটি বিরাট ভালুকের আকার কল্পনা করা হয় Ursa Major বা Great Bear নক্ষত্রমণ্ডলটিকে। এই চিত্রে শুধু Plough দেখানো হয়েছে। গ্রীসের প্রাচীন ধর্মোপকথার ক্যালিস্তোর সঙ্গে মূল নক্ষত্রমণ্ডলটির সম্পর্ক আছে। বড় ভালুক-এর কয়েকটি নক্ষত্র নিয়ে একটি গতিশীল তারকাপুঞ্জ (Moving star cluster) গঠিত হয়েছে; অর্থাৎ সপ্তর্ষিমণ্ডলকে আজ যেমন দেখাচ্ছে, কয়েক লক্ষ বছর পরে তেমন দেখাবে না। নক্ষত্রপুঞ্জের নক্ষত্রগুলি পরস্পরের সঙ্গে মাধ্যাকর্ষণের দ্বারা বাঁধা থাকে বটে, কিন্তু প্রত্যেকটির একটি আপেক্ষিক গতিবেগ আছে। কাজেই ভবিষ্যতের সপ্তর্ষিমণ্ডল জিজ্ঞাসার চিহ্নের মত দেখাবে না।

বড় ভালুক-এ একটি উল্লেখযোগ্য জিনিষ হলো, পেচক নীহারিকা নামে একটি গ্রহ-নীহারিকা (Planetary nebula)। অবশ্য পেচক নীহারিকা বা Owl nebula এত ক্ষীণ যে, ভাল দূরবীক্ষণযন্ত্র ছাড়া খালি চোখে দেখা সম্ভব নয়। তবে খালি চোখে আমরা যা দেখতে পাই, তা হলো বশিষ্ঠ নক্ষত্রের (চিত্রে ব) বর্ণালীয়-যুগ্ম (Spectroscopic doubles)। সাধারণভাবে বশিষ্ঠ (ব) একটি মাত্র নক্ষত্র মনে হয় এবং হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যায় একে আলাদা করা হয় নি। চিত্রে যেমন আছে (প্রতি নক্ষত্রের পাশের সংখ্যাটি পৃথিবী থেকে নক্ষত্রের দূরত্ব আলোক বর্ষে। এক আলোক বর্ষ $=9{\cdot}46\times10^{12}$

কিলোমিটার বা 6-এর পিঠে 12টি শূন্য মাইল!), তার বড়টি Mizar নামে বিখ্যাত। 1889 সালে বর্ণালী বিশ্লেষণ করে দ্বিতীয়টির অস্তিত্ব জানা যায়, আর তারও পরে তৃতীয় আরও একটির অস্তিত্ব জানা সম্ভব হয়। এই যুগ্ম নক্ষত্রটি পৃথিবী থেকে 78 থেকে 80 আলোক বর্ষ দূরে আছে। বশিষ্ঠের (ব) ক্ষুদ্র নক্ষত্রটির নাম Alcor বা সওয়ার। Mizar থেকে এটি 11·5 মিনিট বৃত্তচাপের দ্বারা বিচ্ছিন্ন (তুলনা করা যায়, চন্দ্রের ব্যাস হলো 31 মিনিট বৃত্তচাপ) আর পৃথিবী থেকে 80 আলোক বর্ষ দূরে অবস্থিত। খুব নিবিষ্টভাবে দেখলে খালি চোখেই এদের আলাদা করা যায়। 1908 সালে জানা যায়, সওয়ার নক্ষত্রটি নিজেই একটি বর্ণালীয় যুগ্ম। সমগ্র আকাশের উত্তর গোলার্ধে বশিষ্ঠই (ব) একমাত্র জটিল বর্ণালীয় যুগ্ম, যা খালি চোখে দেখা সম্ভব। বশিষ্ঠের একটু দূরেই ছোট্ট নক্ষত্রটির নাম অরুন্ধতী (অ), প্রাচীন উপাখ্যানে ঋষি বশিষ্ঠের স্ত্রী। এঁরা পরস্পরের খুব কাছাকাছি থেকেও কোন দিন মিলিত হতে পারবে না। সপ্তর্ষিমণ্ডলের শেষ নক্ষত্রটি মরিচি (ম) পৃথিবী থেকে 163 আলোক বর্ষ দূরে অবস্থিত। বশিষ্ঠ (ব) ও মরিচি (ম)-কে একটি কাল্পনিক সরলরেখা দিয়ে যুক্ত করে রেখাটিকে আরও কিছুটা বর্ধিত করলে অতি উজ্জ্বল ঈষৎ হলুদ রঙের স্বাতীনক্ষত্র (স্ব) বা Arcturus-এর ঠিকানা মিলবে। স্বাতী নক্ষত্রের (স্ব) ব্যাস সূর্যের ব্যাসের চেয়ে প্রায় 23 গুণ বড়। পৃথিবী থেকে স্বাতীর দূরত্ব 35 আলোক বর্ষ, আপেক্ষিকভাবে আমাদের বেশ কাছেই বলতে হবে। স্বাতীর (স্ব) মূল নক্ষত্রমণ্ডলটি হলো মুষলমণ্ডল, অনেকটা গদার মত দেখতে। কয়েকটি বাড়্তি ক্ষীণ নক্ষত্র নিয়ে ল্যাটিন Bootes (বুটিস) নক্ষত্রমণ্ডলের চেহারা হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যার মুষল বা মুদ্গর থেকে সামান্য ভিন্ন (চিত্রে মুষলকেই দেখানো হয়েছে)। স্বাতীই (স্ব) মুষল বা Bootes-এর উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। শুধু চোখে না দেখা গেলে জেনে রাখা ভাল, মুষলে যুগ্ম-তারার ছড়াছড়ি। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো পৃথিবী থেকে 230 আলোক বর্ষ দূরের নক্ষত্র, আরবী নাম Izar। হলুদ রঙের Izar আসলে নক্ষত্র-ত্রয়ী। বড় দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে এর যুগ্মটিকে এত সুন্দর দেখায় যে, যুগ্মটিকে পুলচেরিমা (দারুণ সুন্দর) বলা হয়।

ধ্রুবতারা (ধ) ও আরও ছয়টি ক্ষীণ নক্ষত্র নিয়ে লঘু সপ্তর্ষিমণ্ডল গঠিত। মণ্ডলটির অপর নাম Ursa Minor ও Little Bear বা ছোট ভালুক। সাতটি তারার মধ্যে ধ্রুবতারা বা Polaris সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। নক্ষত্রটির অপর নাম গ্রীক ভাষায় সাইনোসুরা (Cynosura), যার অর্থ কুকুরের লেজ। ধ্রুবতারা (ধ) পৃথিবী থেকে 470 আলোক বর্ষ দূরে ও এটি একটি চল-নক্ষত্র (Variable Star)। 31·97 দিনে বা প্রায় এক মাসে এর উজ্জ্বলতা 2·1 থেকে 2·2 তফাৎ হয়। আরও মজার জিনিষ হলো, আড়াই ইঞ্চি ব্যাসের দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে ধ্রুবতারায় একটি নক্ষত্র-যুগ্ম, এমন কি—তৃতীয় একটি যুগ্মাংশও লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীনকাল থেকেই নাবিকদের

সমুদ্রযাত্রার দিক নির্দেশক হিসাবে ধ্রুবতারার গুরুত্ব অপরিসীম। ভূমির কোনও বিন্দু ও ধ্রুবতারার সংযোজক সরলরেখা ভূমির সঙ্গে যত ডিগ্রী কোণ উৎপন্ন করে, ভূমির সেই বিন্দু বা স্থানের অক্ষাংশও তত ডিগ্রী। লঘু সপ্তর্ষিমণ্ডলের ষষ্ঠ নক্ষত্রটি Pherkad পৃথিবী থেকে 180 আলোক বর্ষ দূরে আরও একটি নক্ষত্র ক্ষীণভাবে—কিন্তু মিলে-মিশে একাকার হয়ে আছে প্রথমটির সঙ্গে, যেটি নিজে পৃথিবী থেকে মাত্র 11 আলোক বর্ষ দূরে (চিত্র দ্রষ্টব্য)।

প্রাথমিকভাবে এই তিনটি নক্ষত্রমণ্ডল দিয়ে আকাশে কিছুক্ষণ তাকানো সুরু করা যায়। বলে রাখা প্রয়োজন, এর চেয়ে আরও বিস্তৃতভাবে অনেক কিছুই জানবার আছে।

সৌম্যেন্দ্রনাথ গুহ

স্মৃতি-কণিকা

কারো মেধা ও স্মৃতিশক্তি তীক্ষ্ণ হলে আমরা সবাই তাকে অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন বলে থাকি। অসাধারণ স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন লোক পৃথিবীতে খুব অল্পই জন্মেছেন। অনন্য প্রতিভাবান ব্যক্তিদেরও অনেক সময় দেখা গেছে, তাদের স্মরণশক্তি প্রখর নয়। প্রতিভা ও স্মৃতিশক্তি দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিষ। প্রতিভার ব্যাপারটা অবশ্য এখনও অনেকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলে মনে করলেও স্মরণশক্তিকে তাঁরা সেরূপ কিছু মনে করেন না।

কোনও কিছু স্মরণ করবার আগে সুস্পষ্ট তিনটি ঘটনা ঘটে। প্রথমে মস্তিষ্কে তথ্যটা ঢোকে, সেখানে সেটা জমা হয় এবং পরে সেটা মনে পড়ে। এই ঘটনাগুলি পর পর ঘটে যায়, যদিও কেমন করে ঘটে, তা সুস্পষ্ট নয়। মাত্র কিছুদিন আগেও ধারণা ছিল, স্মরণের তথ্যগুলি বৈদ্যুতিক উপায়ে মস্তিষ্কে সংরক্ষিত হয়।

মানুষের মস্তিষ্ককে অনেকটা কম্পিউটার মেসিনের সঙ্গে তুলনা করা চলে। হিসেব করে দেখা গেছে, একটা মানুষের স্মরণশক্তিকে কম্পিউটারে ধরে রাখতে গেলে যতটা ম্যাগ্‌নেটিক টেপ লাগবে, তার পরিমাপ সারা পৃথিবীর পরিমাপের সমান।

মস্তিষ্কের এই স্মরণশক্তিকে পরিষ্কার করে বোঝাবার জন্যে তামাম দুনিয়ায় বড় বড় মস্তিষ্ক কাজ করে চলছে। সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা বলছেন যে, স্মৃতিশক্তির ব্যাপারটা প্রকৃতপক্ষে একটি রাসায়নিক ঘটনা এবং এর স্বপক্ষে তাদের যথেষ্ট যুক্তিও আছে। প্রজনন-ক্ষমতা যদি কোষের কিছু অণুর ভিতরের নিউক্লিয়াসে থাকতে পারে, তবে সাধারণ স্মরণ শক্তিই বা মস্তিষ্কের কিছু রাসায়নিক বস্তুর মধ্যে জমা থাকবে না কেন?

স্মৃতিশক্তিকে ধরে রাখে যে সব রাসায়নিক পদার্থ, তাদের আশ্চর্য উপায়ে বিজ্ঞানীরা মস্তিষ্ক থেকে কেবল পৃথকই করেন নি—কৃত্রিম উপায়ে এদের গবেষণাগারে উৎপাদন করতেও সক্ষম হয়েছেন। কয়েকজন বিজ্ঞানী মনে করেন, স্মরণশক্তি আর. এন. এ. (R. N. A) অণুর মধ্যে সংরক্ষিত থাকে। এই R. N. A অণু আবার প্রজননকার্যে D. N. A নিউক্লিক অ্যাসিডের মাধ্যমে তাদের দরকারী কাজগুলি সম্পন্ন করে। স্মরণশক্তি বিলুপ্ত হয়েছে, এরূপ কিছু লোককে R. N. A রাসায়নিকের সাহায্যে চিকিৎসা করে সুফল পাওয়া গেছে। শুধুমাত্র R. N. A-ই নয়—বিজ্ঞানীরা মনে করেন, বিভিন্ন স্মরণশক্তি বিভিন্ন রাসায়নিকের মধ্যে নিহিত থাকে। তাই যদি হয় ও তাদের যদি পৃথক করা সম্ভব হয় এবং কৃত্রিম উপায়ে গবেষণাগারে প্রস্তুত করা যায়, তবে তার ফল হবে সুদূরপ্রসারী।

পার্থসারথি চক্রবর্তী*

*রসায়ন বিভাগ, কৃষ্ণনগর সরকারী কলেজ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

স্কেলের সাহায্যে পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয়

পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয়ের অনেক রকম পদ্ধতি আছে। কিন্তু এই সকল পরিচিত পদ্ধতিতে আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয়ের জন্য বেশ কিছু সংখ্যক যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন যন্ত্রপাতির মধ্যে উদস্থৈতিক তুলাযন্ত্র, আপেক্ষিক গুরুত্ব বোতল, হাইড্রোমিটার, হেয়ার যন্ত্র প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ফলে এই সকল যন্ত্রপাতির অভাবে আমরা পরীক্ষাগার ছাড়া অন্যত্র পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় করিতে পারি না। কিন্তু নিম্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে কোন রকম যন্ত্রপাতি বা বাটখারার সাহায্য না লইয়া কেবল একটি স্কেলের সাহায্যে অতি সহজে পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় করা যাইতে পারে। নিম্নে কেবল জল অপেক্ষা ভারী ও জলে অদ্রাব্য কঠিন পদার্থ এবং তরলের আপেক্ষিক গুরুত্ব কিভাবে স্কেলের সাহায্যে নির্ণয় করা যায়, সেই সম্বন্ধেই আলোচনা করা হইল।

স্কেলের সাহায্যে জল অপেক্ষা ভারী ও জলে অদ্রাব্য কঠিন পদার্থ এবং তরল পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি হইল—(1) একটি স্কেল, (2) সুতা, (3) একটি জলপূর্ণ পাত্র, (4) একটি পরীক্ষাধীন তরল পদার্থে পূর্ণ পাত্র, (5) পরীক্ষাধীন কঠিন পদার্থ, (6) একটি ভারী পদার্থ (পরীক্ষাধীন পদার্থের ওজনের কাছাকাছি ওজনের যে কোন কঠিন পদার্থ), (7) স্ট্যাণ্ড, (8) একটি দণ্ড (বড় স্কেলের অভাবে)।

সমআয়তনের একটি প্রামাণিক পদার্থের তুলনায় কোন পদার্থ যতগুণ ভারী বা হাল্কা, তাহাকে ঐ পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব বলে। কঠিন ও তরল পদার্থের ক্ষেত্রে 4^0 সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার বিশুদ্ধ জলকে প্রামাণিক পদার্থ ধরা হয়। সুতরাং কঠিন ও তরলের ক্ষেত্রে

$$\text{আপেক্ষিক গুরুত্ব} = \frac{\text{পদার্থের ভর}}{4^0 \text{ সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় সমআয়তন জলের ভর}}$$

মনে করা হইল বায়ুতে পদার্থের ভর $= m_1$ gm.

জলে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত অবস্থায় পদার্থের ভর $= m_2$ gm.

তরলে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত অবস্থায় পদার্থের ভর $= m_3$ gm.

$\therefore$ বস্তু কর্তৃক অপসারিত সমআয়তন জলের ভর $= (m_1 - m_2)$ gm.

এবং বস্তু কর্তৃক অপসারিত সমআয়তন তরলের ভর $= (m_1 - m_3)$ gm.

$$\therefore \text{কঠিন পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব} = \frac{\text{বস্তুর ভর}}{4^0 \text{ সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় সমআয়তন জলের ভর}}$$

$$= \frac{m_1}{m_1 - m_2}$$

$$\text{ও তরল পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব} = \frac{\text{তরলের ভর}}{4^0 \text{ সেন্টিগ্রেড তারমাত্রায় তরলের সমআয়তন জলের ভর}}$$

$$= \frac{m_1 - m_3}{m_1 - m_2}$$

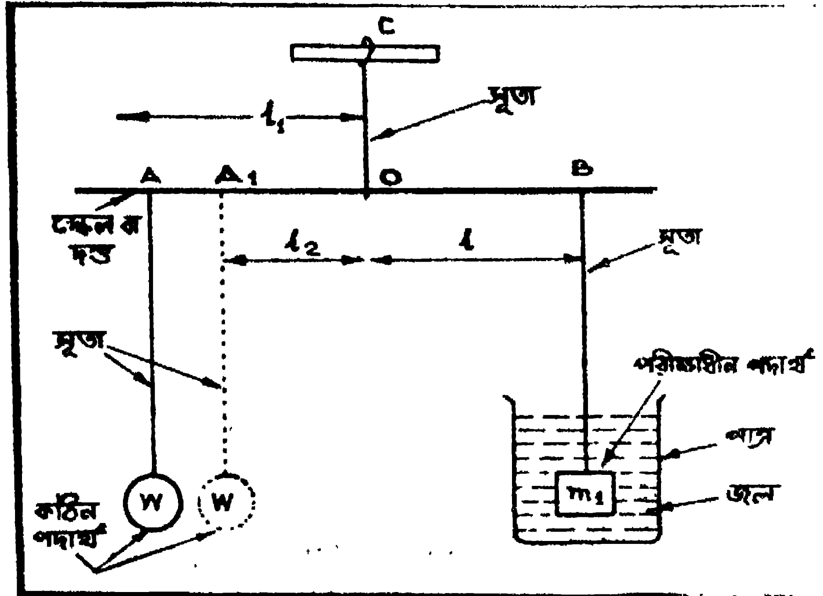
এইবার প্রথমে জল অপেক্ষা ভারী ও জলে অদ্রাব্য কঠিন পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয়ের পদ্ধতি আলোচনা করা হইবে (1নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। স্ট্যাণ্ডের C বিন্দু হইতে CO সুতার দ্বারা AB স্কেল (বড় স্কেল সম্ভব না হইলে সরল দণ্ড) অনুভূমিকভাবে ঝুলিতেছে। B বিন্দুতে পরীক্ষাধীন বস্তুকে সুতার দ্বারা ঝুলানো হইল। এখন স্কেলকে অনুভূমিক করিবার জন্য পরীক্ষাধীন ওজনের কাছাকাছি ওজনের কঠিন পদার্থটি A বিন্দু হইতে সুতার দ্বারা ঝুলানো হইল। এখন পরীক্ষাধীন বস্তুকে একটি জলপূর্ণ পাত্রে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত করা হইল। ফলে পরীক্ষাধীন বস্তুর উপর একটি ঊর্ধ্বচাপ পড়িবে এবং স্কেল আর অনুভূমিক থাকিবে না। A বিন্দুতে ঝুলানো বস্তুকে A_1-তে সরাইলে যেন পুনরায় স্কেল অনুভূমিক হইল। স্কেলের বিভিন্ন দৈর্ঘ্য AO, A_1O ও BO পাঠ করা হইল।

গণনা—মনে করিলাম $AO = l_1$cm, $A_1O = l_1$cm, $OB = l$cm,

ধরা যাক, A হইতে ঝুলানো পদার্থটির ভর $= W$ gm,

বায়ুতে পরীক্ষাধীন কঠিন পদার্থটির ভর $= m_1$ gm.

ও জলে নিমজ্জিত অবস্থায় কঠিন পদার্থটির ভর $= m_2$ gm.



1নং চিত্র

এখন সাম্যাবস্থায় O বিন্দুর চারিদিকে ভ্রামক লইয়া

প্রথম ক্ষেত্রে, $W \times l_1 = m_1 \times l$ ·········(1)

ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, $W \times l_2 = m_2 \times l$ ·········(2)

(1) ÷ (2) করিয়া পাই, $\frac{l_1}{l_2} = \frac{m_1}{m_2}$

$$\therefore \quad \frac{l_1}{l_1 - l_2} = \frac{m_1}{m_1 - m_2}$$

∴ কঠিন পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব $\left(= \frac{m_1}{m_1 - m_2} \right) = \frac{l_1}{l_1 - l_2}$

এক্ষণে স্কেল হইতে সহজে l_1 ও l_2-র মান অর্থাৎ AO ও A_1O-র মান নির্ণয় করিয়া অতি সহজে পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণীত হইবে।

এক্ষণে তরল পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয়ের পদ্ধতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হইতেছে (2নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। পূর্বের মত m_1 ভরবিশিষ্ট বস্তুকে জলে নিমজ্জিত করিয়া স্কেলকে অনুভূমিক করিবার পর বস্তুটিকে পরীক্ষাধীন তরল পদার্থে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত করা হইল। স্কেলটিকে অনুভূমিক করিবার জন্য ভারটিকে A'_1 বিন্দুতে সরানো হইল। A'_1O-এর পাঠ লওয়া হইল।

এক্ষেত্রে মনে করিলাম, $A_1'O = l_3cm$ ও তরল পদার্থে নিমজ্জিত অবস্থায় ভর $= m_3$ gm। এস্থলেও সাম্যাবস্থার জন্য O বিন্দুর চারিদিকে ভ্রামক লইলে,

2নং চিত্র

$$W \times l_1 = m_1 \times l \cdots\cdots\cdots (3)$$

$$W \times l_2 = m_2 \times l \cdots\cdots\cdots (4)$$

ও $W \times l_3 = m_3 \times l \cdots\cdots\cdots (5)$

(3) – (5) করিয়া পাই, $(l_1 - l_3)W = (m_1 - m_3) \times l \cdots\cdots (6)$

(3) – (4) করিয়া পাই, $(l_1 - l_2)W = (m_1 - m_2) \times l \cdots\cdots (7)$

(6) ÷ (7) করিয়া পাই, $\dfrac{l_1 - l_3}{l_1 - l_2} = \dfrac{m_1 - m_3}{m_1 - m_2}$

∴ তরল পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব $\left(= \dfrac{m_1 - m_3}{m_1 - m_2} \right) = \dfrac{l_1 - l_3}{l_1 - l_2}$

কিন্তু l_1, l_2 ও l_3-এর মান স্কেল হইতে পাওয়া যাইবে। ফলে অতি সহজে তরল পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় করা যাইবে।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী ঘোড়াই

পারদর্শিতার পরীক্ষা

পদার্থবিদ্যায় তোমার পারদর্শিতা কেমন, তা বোঝবার জন্যে নীচে 5টি প্রশ্ন দেওয়া হলো। প্রতিটি প্রশ্নের নম্বর 20। উত্তর দেবার জন্যে মোট সময় 2 মিনিট। চেষ্টা করে দেখোদিকিনি, মোট 100-এর মধ্যে তুমি কত নম্বর পাও।

1. কোন্‌টি ঠিক বলো—

   সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে প্রায়

   (ক) 8 সেকেণ্ড
   (খ) 1 মিনিট
   (গ) 8 মিনিট

2. কোন্‌ মাধ্যমটিতে আলোর গতিবেগ সবচেয়ে বেশী ?—

   (ক) জল
   (খ) কাচ
   (গ) হীরা

3. কোন্‌ পদার্থটির বৈদ্যুতিক রোধ সবচেয়ে কম (অর্থাৎ বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা সবচেয়ে বেশী) ?—

   (ক) রূপা
   (খ) তামা
   (গ) অ্যালুমিনিয়াম

4. কোন্‌টির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম ?—

   (ক) আলো
   (খ) বেতার-তরঙ্গ
   (গ) এক্স্‌-রশ্মি X-RAY

5. কোন্‌টি ঠিক বলো—

   (ক) নিউট্রনের ভর প্রোটনের ভরের চেয়ে বেশী
   (খ) নিউট্রনের ভর প্রোটনের ভরের চেয়ে কম
   (গ) নিউট্রনের ভর ও প্রোটনের ভর সমান

(উত্তরের জন্যে 122নং পৃষ্ঠা দেখ)

ব্রহ্মানন্দ দাশগুপ্ত ও জয়ন্ত বসু*

* সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-9

কৃত্রিম রক্ত

কৃত্রিম রক্ত শুনে নিশ্চয়ই তোমরা অবাক হচ্ছ, তাই না? মানুষের দেহে অসংখ্য শিরা, উপশিরার মধ্য দিয়ে যে লোহিতবর্ণের তরল পদার্থটি সর্বদা প্রবাহিত হয়ে প্রাণের স্পন্দনকে সজীব করে রেখেছে, তা যদি কৃত্রিম উপায়ে সংশ্লেষণ করা সম্ভব হয়, তাহলে অবাক হবার কথা বৈকি।

রক্ত একটি অতি প্রয়োজনীয় বস্তু, যা গুরুতর পরিস্থিতিতে দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠে মানুষের জীবনাশঙ্কার সৃষ্টি করে। হাসপাতালে দুর্ঘটনা-কবলিত ও বিভিন্ন অস্ত্রোপচারের রোগীর জন্যে রক্তের বিপুল চাহিদা অনেক সময় চিকিৎসকদের কাছেও সমস্যা রূপে দেখা দেয়। যদিও বিভিন্ন ব্লাড-ব্যাঙ্কে মানুষের রক্ত সংরক্ষণের বিজ্ঞানসম্মত সুব্যবস্থা রয়েছে, তবু প্রয়োজনের তুলনায় তা খুবই নগণ্য। মানুষের দেহাভ্যন্তরে হৃৎপিণ্ড, ফুস্‌ফুস, যকৃৎ, মূত্রাশয় প্রভৃতিকে সক্রিয় রাখবার জন্যে 240 থেকে 300 আউন্স রক্তের প্রয়োজন। এই সব কারণে দীর্ঘদিন ধরে সারা বিশ্বের বৈজ্ঞানিকেরা কৃত্রিম রক্ত উদ্ভাবনের অর্থাৎ রক্তের সকল গুণসম্পন্ন একটি রাসায়নিক তরল পদার্থ সংশ্লেষণের জন্যে গবেষণা করে আসছেন।

বেশ কয়েক বছর আগে কার্বন এবং ফ্লোরিনের যৌগ ফ্লোরোকার্বনকে রক্তের পরিপূরক হিসাবে ব্যবহারের কথা ভাবা হয়েছিল। এই ফ্লোরোকার্বন যৌগটি রাসায়নিক ধর্মের বিচারে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় এবং দ্রবীভূত গ্যাস প্রচুর পরিমাণে শোষণ করতে সক্ষম। রক্তের হিমোগ্লোবিন অণুর মতই এগুলি দেহের বিভিন্ন টিস্যু বা তন্তুতে অক্সিজেন সরবরাহ করতে পারে।

সম্প্রতি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সিনসিনাটি মেডিক্যাল সেন্টারের খ্যাতনামা গবেষক অধ্যাপক লেল্যাণ্ড সি, ক্লার্ক ফ্লোরোকার্বন নিয়ে ব্যাপকতর গবেষণা করেছেন। অধ্যাপক ক্লার্ক একটি কুকুরকে নিয়ে এক অভূতপূর্ব পরীক্ষায় সাফল্য লাভে সক্ষম হয়েছেন। তিনি কুকুরটির দেহের পঞ্চাশ শতাংশ রক্ত নিষ্কাশন করে নিয়ে তাঁর গবেষণালব্ধ কৃত্রিম রক্ত তার দেহে প্রবিষ্ট করিয়ে দিয়ে প্রায় এক বছর কাল তাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। এই এক বছরের মধ্যে কৃত্রিম রক্তের প্রভাবে কুকুরটির দেহে কোনরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় নি। অধ্যাপক ক্লার্ক প্রথমে ফ্লোরোকার্বনের সঙ্গে বিশুদ্ধ লবণজল ও গ্লুকোজ নির্ধারিত পরিমাণে মিশিয়ে এক অসমসত্ব মিশ্রণ প্রস্তুত করেন। অতঃপর এই মিশ্রণটির সঙ্গে কোন পরিশোধক রাসায়নিক মিশ্রিত করে আলট্রাসনিক শব্দ-তরঙ্গের উপস্থিতিতে প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত করা হয়, যার ফলে তৈরি

হয় দুধের মত সাদা তৈলাক্ত একটি তরল পদার্থ। এই তরল পদার্থের মধ্যে ভেসে বেড়ায় লক্ষ লক্ষ ফ্লোরোকার্বন অণু। এই সব ফ্লোরোকার্বন অণুর এক-একটির আকার রক্তের লোহিত কণিকার (RBC) এক-দশমাংশ মাত্র।

এই কৃত্রিম রক্ত দেহের মধ্যে প্রবিষ্ট করাবার ঠিক পূর্বে মিশ্রণটির মধ্য দিয়ে বিশুদ্ধ অক্সিজেন গ্যাস চালনা করা হয়, যার ফলে ফ্লোরোকার্বন অণুগুলি প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন শোষণ করে নেয়। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো—ফ্লোরোকার্বন অণুগুলি সাধারণ রক্তকণিকা অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে অক্সিজেন শোষণ ও সরবরাহ করতে পারে।

কৃত্রিম রক্ত নিয়ে প্রথম দিকের গবেষণায় এই কৃত্রিম রক্ত প্রাণিদেহে মাত্র এক ঘণ্টাকাল অক্সিজেন সরবরাহ করতে পারতো। কিন্তু বর্তমান গবেষক-বিজ্ঞানীরা বলছেন, এই সময়কালকে অনেক বেশী দীর্ঘায়িত করা সম্ভব হয়েছে। রক্তস্রোত থেকে ফ্লোরোকার্বন অণু দু-দিনের মধ্যে অন্তর্হিত হয়—খুব সামান্য সংখ্যক অণু দেহের বিভিন্ন অংশে থেকে যায়, কিন্তু তারা কোন ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে না।

ফ্লোরোকার্বন নিয়ে গবেষণা এখনো শেষ হয় নি বরং বলা চলে পূর্ণাঙ্গ গবেষণা এবার সুরু হয়েছে। এই গবেষণার ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করছে রক্তের স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিস্থাপক কৃত্রিম কোন রাসায়নিক সত্যই একদিন পাওয়া যাবে কিনা। প্রকৃতপক্ষে যদি কোন দিন এই গবেষণায় পরিপূর্ণ সাফল্য আসে, তাহলে এই কৃত্রিম রক্ত ব্লাড-ব্যাঙ্কে সংরক্ষিত মানুষের দেহ থেকে নিষ্কাশিত রক্তের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করবে। এর প্রথম কারণ হলো—এই কৃত্রিম রক্তকণিকাগুলি আসল রক্ত কণিকার চেয়ে আয়তনে অনেক ছোট হওয়ায় কোন কারণে সঙ্কুচিত অতি সূক্ষ্ম কৈশিক রক্তবহা নালীর মধ্য দিয়ে এগুলি অনায়াসে যাতায়াত করতে সক্ষম হবে, যার ফলে রক্ত চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টির নিদারুণ জটিলতা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। দ্বিতীয়তঃ সংশ্লেষিত রক্ত উৎপাদনের ব্যয়ও অনেক কম হবে। বাস্তবিক পক্ষে মানুষের দেহ থেকে নিষ্কাশিত রক্ত বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে সংরক্ষণ ইত্যাদির ব্যয়ের এক-চতুর্থাংশ হবে কৃত্রিম রক্ত সংশ্লেষণের ব্যয়। সঙ্কটের মুহূর্তে অর্থাৎ যখন রোগীর দেহে বাইরে থেকে রক্ত সরবরাহের জরুরী প্রয়োজন, সে সময় রক্ত পাওয়া গেলেও তার সঠিক শ্রেণী-বিভাগ করা এবং সঠিক শ্রেণী বা গ্রুপের রক্ত পাওয়া এক সমস্যা। এই কৃত্রিম রক্তের ক্ষেত্রে কোনরূপ শ্রেণী-বিভাগের প্রয়োজন হবে না এবং গবেষক-বিজ্ঞানীরা আশা করছেন, এই কৃত্রিম রক্ত প্রস্তুতির পর সহজ পদ্ধতিতে দীর্ঘদিন অবিকৃত রাখা সম্ভব হবে।

শ্রীজ্যোতির্ময় দুই

উত্তর

(পারদর্শিতার পরীক্ষা)

1. (গ)

[পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব মোটামুটিভাবে 15 কোটি কিলোমিটার এবং শূন্য স্থানে আলোর গতিবেগ সেকেণ্ডে 3 লক্ষ কিলোমিটার। সুতরাং সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে $15 \times 10^7/3 \times 10^5 = 500$ সেকেণ্ড অর্থাৎ 8 মিনিট 20 সেকেণ্ড। মোটামুটি হিসাবে এটাকে 8 মিনিট বলে ধরা হয়।]

2. (ক)

[কোন মাধ্যমের প্রতিসরণাঙ্ক (Refractive index)

$$= \frac{\text{শূন্য স্থানে আলোর গতিবেগ}}{\text{মাধ্যমটিতে আলোর গতিবেগ}}$$

সুতরাং যে মাধ্যমের প্রতিসরণাঙ্ক কম, তাতে আলোর গতিবেগ বেশী। জল, কাচ ও হীরার প্রতিসরণাঙ্ক হচ্ছে যথাক্রমে 1.3, 1.5–2.0 ও 2·4। তিনটি মাধ্যমের মধ্যে জলের প্রতিসরণাঙ্ক সবচেয়ে কম হওয়ায় জলেই আলোর গতিবেগ সবচেয়ে বেশী।]

3. (ক)

[এক ঘন সেণ্টিমিটারের হিসাবে রূপা, তামা ও অ্যালুমিনিয়ামের বৈদ্যুতিক রোধ হচ্ছে যথাক্রমে 1.7×10^{-6} ওহ্‌ম্‌, 1.8×10^{-6} ওহ্‌ম্‌ ও 2.9×10^{-6} ওহ্‌ম্‌।]

4. (গ)

[বেতার তরঙ্গের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য কয়েক মিটার থেকে কয়েক শত মিটার পর্যন্ত হতে পারে। আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য হলো কয়েক হাজার অ্যাংস্ট্রম (এক অ্যাংস্ট্রম $= 10^{-8}$ সেণ্টিমিটার)। এক্‌স্‌-রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য এক অ্যাংস্ট্রমের ভগ্নাংশ থেকে কয়েক অ্যাংস্ট্রম পর্যন্ত হতে পারে।]

5. (ক)

[নিউট্রনের ভর $= 1.674 \times 10^{-24}$ গ্র্যাম ও প্রোটনের ভর $= 1·672 \times 10^{-24}$ গ্র্যাম। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, মুক্ত নিউট্রন স্থায়ী কণা নয়; কালক্রমে একটি নিউট্রন ভেঙে গিয়ে একটি প্রোটন, একটি ইলেকট্রন ও একটি অ্যাণ্টিনিউট্রিনোর সৃষ্টি হয়।]

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন 1. : উচ্চ কম্পনাঙ্কবিশিষ্ট শব্দ বা আলট্রাসাউণ্ড কিভাবে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে কাজে লাগে ?

কবিতা চৌধুরী, বহরমপুর,

প্রশ্ন 2. : শনিগ্রহের বলয় সম্পর্কে কিছু জানতে চাই।

শ্যামলকুমার দত্ত, ঢাকা,

প্রশ্ন 3. : ফল পাকবার সঙ্গে সঙ্গে ফলের স্বাদ ও রঙের পরিবর্তন এবং সুমিষ্ট গন্ধের উৎপত্তির কারণ কি ?

দীপঙ্কর দত্ত, কলিকাতা-12

উত্তর 1. : চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক্স-রে ও রেডিও আইসোটোপের ব্যবহার বর্তমানে সকলেরই সুপরিচিত। কিন্তু বর্তমানে এগুলি ছাড়াও বিজ্ঞানীরা চিকিৎসার ক্ষেত্রে উচ্চ কম্পনাঙ্কবিশিষ্ট শব্দ বা আলট্রাসাউণ্ড কাজে লাগাচ্ছেন। এই আলট্রাসনিক শব্দ-তরঙ্গকে শরীরের অভ্যন্তরে পাঠানো হয়। বিজ্ঞানীরা এমন সমস্ত যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন, যাদের সাহায্যে এই প্রেরিত শব্দ-তরঙ্গের প্রতিফলিত সঙ্কেতকে চিত্রাকার দেওয়া যায়। চিত্রাকার সঙ্কেতগুলি পর্যবেক্ষণ করে শরীরের অভ্যন্তরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অবস্থা নির্ণয় করা যায়। চিকিৎসকেরা অনেক সময় এক্স-রে অথবা রেডিও আইসোটোপ ব্যবহার নিরাপদ মনে করেন না। কারণ এক্স-রে অথবা রেডিও আইসোটোপের বিচ্ছুরণ কোনও কোনও ক্ষেত্রে ক্ষতিসাধন করে। গর্ভাবস্থায় ও শিশুদের ক্ষেত্রে এগুলি প্রযোজ্য নয়। এই সমস্ত ক্ষেত্রে চিকিৎসকেরা আলট্রাসাউণ্ড ব্যবহার করেন। হৃৎপিণ্ড সংক্রান্ত রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আলট্রাসনিকের ব্যবহার চলছে। রেডিও আইসোটোপ ব্যবহার করে শরীরের ক্যান্সারগ্রস্ত অংশের কোষগুলিকে ধ্বংস করা হয়ে থাকে। বর্তমানে আলট্রাসাউণ্ড প্রয়োগ করে চিকিৎসকেরা ক্যান্সারগ্রস্ত কোষ ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছেন। এছাড়া মূত্রাশয় ও পিত্তকোষে জমা হওয়া পাথর উচ্চ কম্পনাঙ্কবিশিষ্ট শব্দ প্রয়োগে গুঁড়া করা অনেক ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হয়েছে। মানসিক রোগের ক্ষেত্রেও এর প্রয়োগে মস্তিষ্কের বিশেষ কতকগুলি স্নায়ুকে নষ্ট করে উপকার পাওয়া গেছে।

উত্তর 2. : সৌরমণ্ডলে সমস্ত গ্রহ-উপগ্রহের মধ্য থেকে শনিগ্রহকে সহজেই আলাদা করে চেনা যায়, তার বলয়ের উপস্থিতির জন্যে। কারণ, শুধুমাত্র শনিগ্রহ ছাড়া অন্য কোন গ্রহ বা উপগ্রহের বলয় নেই। এই বলয় হচ্ছে শনিগ্রহের বিষুবতলের সমান্তরালে অবস্থিত তিনটি বলয়ের সমষ্টি, যেগুলি ঐ গ্রহের চারদিকে আবর্তিত হচ্ছে।

বলয়গুলির প্রস্থ এদের বেধের তুলনায় অনেক বড়। তিনটি বলয়ের প্রস্থের যোগফল প্রায় 42 হাজার মাইলের মত। এদের বেধ মোটামুটিভাবে 20 মাইলের কাছাকাছি।

বিজ্ঞানীমহলে এই বলয়গুলির গঠন-প্রকৃতি সম্বন্ধে দুটি ভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে। প্রথম মতবাদ অনুসারে বলয়গুলি হচ্ছে একটানা কঠিন পদার্থ দিয়ে তৈরি এবং দ্বিতীয় মতবাদ অনুযায়ী এগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু কণার ঘনিষ্ঠ সমাবেশ। বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও তত্ত্বের সাহায্যে জানা যায়, যদি বলয়গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু কণার সমাবেশে তৈরি হয়ে থাকে, তবে বলয়ের ভিতর দিকের কণাগুলির গতিবেগ বলয়ের বাইরের দিকের কণাগুলির গতিবেগের চেয়ে বেশী হবে। বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বর্ণালী-রেখার সরণ পরিমাপ করে পৃথিবী থেকেই শনির বলয়ের বাইরের ও ভিতরের অংশের গতিবেগ নির্ধারণ করা যায়। 1895 সালে বিজ্ঞানী কীলার ও পরে বিজ্ঞানী ডেস্‌লাণ্ডারস্ বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বলয়ের ভিতরের ও বাইরের অংশের বেগ নির্ণয় করে দেখান যে, ভিতরের অংশের বেগ বাইরের অংশের বেগের তুলনায় বেশী। অতএব কীলার ইত্যাদির পরীক্ষায় এই ধারণাই হয় যে, বলয়গুলি কণিকাসমষ্টির দ্বারা গঠিত।

অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন, বলয়গুলি হচ্ছে উপগ্রহ সৃষ্টির প্রথম অবস্থা, অর্থাৎ সৌরমণ্ডলের সমস্ত গ্রহ-উপগ্রহই প্রাথমিক অবস্থায় বলয় ছিল এবং পরে এই বলয়ের কণাগুলি একত্রিত হয়ে গ্রহ বা উপগ্রহে রূপান্তরিত হয়েছে। আবার অনেকের ধারণা অনুযায়ী এই বলয় হচ্ছে, অধিক আকর্ষণের প্রভাবে গুঁড়িয়ে যাওয়া শনির নিকটতম উপগ্রহের ধ্বংসাবশেষ। তবে বলয়গুলির উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন্ ধারণা ঠিক, তা এখনও সঠিকভাবে জানা যায় নি।

উত্তর 3. : কাঁচা থেকে পাকা অবস্থায় যাবার সঙ্গে সঙ্গে ফলের মধ্যে কতকগুলি রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে ও ফলের পরিপাকক্রিয়ার মাত্রা বৃদ্ধি পায়। রাসায়নিক পরিবর্তনই মূলতঃ কাঁচা ও পাকা ফলের স্বাদের তারতম্যের জন্যে দায়ী। আপেল, ন্যাসপাতি ইত্যাদি ফলের মিষ্টতা এদের ফ্রুক্টোজ শর্করার উপস্থিতিরই জন্যে। দেখা গেছে যে, আপেল, ন্যাসপাতি ইত্যাদি পাকবার সঙ্গে সঙ্গে এদের শর্করার পরিমাণ বাড়ে ও শ্বেতসারের পরিমাণ কমে। কাজেই ফলের মিষ্টতাও বৃদ্ধি পায়। পাকা কলাতেও গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ প্রভৃতি শর্করার পরিমাণ প্রচুর বৃদ্ধি পায়।

অধিকাংশ ফলের পাকবার সময় শ্বাসক্রিয়ার দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে। ফলের শ্বাসকার্যের জন্যে শর্করার ক্ষয় হয়। এই কারণে ফলের মিষ্টতাও কমে যায়। সেই জন্যে দেখা যায় বেশী পাকা কলা বা আমের মিষ্টতা অপেক্ষাকৃত কম। টক্‌জাতীয় ফলে অম্লের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় এগুলি পাকা হলেও টক্ লাগে। এই কারণে কাঁচা পাতিলেবুর চেয়ে পাকা পাতিলেবু বেশী টক্।

ফল পাকবার সময় কোনও কোনও ফলে ক্যারোটিনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়

আবার কোন কোনও ফলে ক্লোরোফিলের পরিমাণ কমে যায়। ক্লোরোফিল কমে যাবার ফলে কাঁচা ফলের সবুজ রং নষ্ট হতে থাকে এবং ক্যারোটিন বৃদ্ধি পাওয়ার দরুণ ফলের রং হলুদে ভাব ধারণ করে। তবে সব ফলের ক্ষেত্রেই যে ক্লোরোফিলের পরিমাণ কমবে বা ক্যারোটিনের পরিমাণ বাড়বে, তা নয়। এছাড়াও ফলের রঙের জন্যে নানা প্রকার ফেনোলিক যৌগ, জ্যান্থোফিল, ক্লোভোনয়েড, অ্যান্থোসায়ানিন ইত্যাদি পদার্থগুলি দায়ী। বিশেষ রঙের প্রভাব ফলের গায়ে আপতিত আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য, তীব্রতা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে।

পাকা ফলের সুমিষ্ট গন্ধের জন্যে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ দায়ী। বিভিন্ন ফলের যে গন্ধ আমরা পাই, তা বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের সংমিশ্রণে উদ্ভূত। এই রাসায়নিক পদার্থগুলির মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন রকমের অ্যালকোহল, অ্যালডিহাইড, কিটোন, এষ্টার, ইথিলিন, টারপিন ইত্যাদি।

শ্যামসুন্দর দে*

ইনস্টিটিউট অব রেডিও-ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-9

শোক-সংবাদ

পরলোকে বীরেন্দ্রনাথ মৈত্র

বাঙালী প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত খ্যাতনামা রাসায়নিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মৈত্র গত 31শে ডিসেম্বর 84 বছর বয়সে পরলোক-গমন করেছেন।

বীরেন্দ্রনাথ 1888 সালে 17ই সেপ্টেম্বর রাজশাহীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে এফ-এ পরীক্ষা পাশ করবার পর প্রেসিডেন্সি কলেজে বি. এস-সি ক্লাসে ভর্তি হন এবং ঐ কলেজ থেকেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবপ্রবর্তিত এম. এস-সি কোর্সের প্রথম ছাত্রদলের অন্যতম রূপে 1910 সালে রসায়নশাস্ত্রে ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি বি. এস-সি ক্লাসে আচার্য জগদীশচন্দ্র এবং এম. এস-সি ক্লাশে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ছাত্র ছিলেন। এম. এস-সি পরীক্ষা পাশ করবার পর তিনি শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে রসায়নশাস্ত্রের লেক্‌চারার হিসাবে কিছুকাল কাজ করেন।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের অনুপ্রেরণায় একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলবার উদ্দেশ্যে বীরেন্দ্রনাথ অপর দু-জন সহযোগী শ্রীখগেন্দ্রচন্দ্র দাশ ও অধ্যাপক রাজেন্দ্রনাথ সেনের সঙ্গে মিলে মাত্র 9000 টাকা মূলধন নিয়ে 1916 সালে ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানীর গোড়াপত্তন করেন। আজ তা এক বিরাট শিল্পপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে এই কোম্পানীর উৎপন্ন দ্রব্য-গুলির বিক্রয়ের মোট পরিমাণ প্রায় 4 কোটি টাকা। বীরেন্দ্রনাথের দুই সহযোগীর মধ্যে অধ্যাপক রাজেন্দ্রনাথ সেন পরলোকগমন করেন

1936 সালে এবং খগেন্দ্রচন্দ্র দাশ 1965 সালে। বীরেন্দ্রনাথ 1967 সাল পর্যন্ত ম্যানেজিং ডিরেক্টর-রূপে কোম্পানীর কার্য পরিচালনা করেছিলেন



বীরেন্দ্রনাথ মৈত্র

এবং তারপর কোম্পানীর উপদেষ্টারূপে কাজ করেন ও 1971 সালের জুলাই মাসে অবসর গ্রহণ করেন।

কোম্পানীর কাজে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করলেও বীরেন্দ্রনাথ বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতেন। তিনি জাপান ও দূরপ্রাচ্য ভ্রমণ করেন। অল ইণ্ডিয়া ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন, ইণ্ডিয়ান সোপ অ্যাণ্ড টয়লেটরিজ মেকার্স অ্যাসোসিয়েশন, এসেন্সিয়াল অয়েল অ্যাসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়া এবং ইনস্টিটিউশন অফ কেমিস্টস-এর তিনি সভাপতি ছিলেন। তিনি ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটির ফেলো, ইণ্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশনের কার্যকরী সমিতির সদস্য এবং রোটারী ক্লাবের একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। তা ছাড়া রাসায়নিক শিল্পসংক্রান্ত বহু সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের কর্মপ্রচেষ্টার প্রতি তাঁর বিশেষ সহানুভূতি ছিল এবং 1961 সালে পরিষদের ত্রয়োদশ প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকীতে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত থেকে তিনি গৃহ-নির্মাণ তহবিলে দেড় হাজার টাকা দান করেন।

র. ব.

বিবিধ

কলিকাতায় ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের 59তম অধিবেশন

কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে 20শে হইতে 23শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের 59তম অধিবেশন রবীন্দ্র সদন, বিজ্ঞান কলেজ এবং বসু বিজ্ঞান মন্দিরে অনুষ্ঠিত হইবে। এই সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী শ্রী সি. সুব্রাহ্মণ্যম।

কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে ভারতের বৈদেশিক যোগাযোগ ব্যবস্থা

পুণার কাছে আরভিতে প্রথম ভূকেন্দ্রটি স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বৈদেশিক যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। গত 26শে ফেব্রুয়ারী ভারত ও অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে এই নতুন যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু হয়েছে।

বিগত কয়েক মাসে 30টি চ্যানেল বসানো হয়েছে। হাই-ফ্রিকোয়েন্সি রেডিও সিষ্টেমের মাধ্যমে আগে যে সব তার, টেলিফোন ও টেলেক্স সার্ভিস চালু ছিল, তার মধ্যে অনেকগুলিই এখন কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে চলছে।

ভারতের সঙ্গে এখন অষ্ট্রেলিয়া, বাহেরিন, জাপান, কেনিয়া, কুয়ায়েত, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, সুইজারল্যাণ্ড, বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিম জার্মেনীর কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে টেলিফোন সংযোগ রয়েছে। টেলেক্স এবং টেলিগ্রাম ব্যবস্থা অষ্ট্রেলিয়া, জাপান, বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম জার্মেনী, ইটালী এবং অষ্ট্রিয়ার সম্প্রসারিত হয়েছে। এতদিন পর্যন্ত ওভারসীজ কমিউনিকেশন সার্ভিস হাই-ফ্রিকোয়েন্সি রেডিওর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক টেলি-যোগাযোগের ব্যবস্থা করতেন। কিন্তু আয়ন-মণ্ডলের গণ্ডগোলের দরুণ টেলিসংযোগে ব্যাঘাত ঘটতো। কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে টেলি-যোগাযোগের ক্ষেত্রে এই ত্রুটি দূর করবে এবং এদেশে দিবারাত্র সর্বাধুনিক উচ্চ মানের টেলি-যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলবে।

আরভির ভূকেন্দ্রটি স্থাপনের ব্যয় হয়েছে 8 কোটি টাকা। এর মধ্যে সাজসরঞ্জাম আমদানী বাবদ বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যয় হয়েছে প্রায় 3 কোটি টাকা। আরভি ভূকেন্দ্রটির সঙ্গে বোম্বাইয়ের বিদেশ সঞ্চার ভবনের আন্তর্জাতিক এক্সচেঞ্জের মাইক্রো-ওয়েভ সংযোগ রয়েছে। পশ্চিমঘাট পর্বতমালায় এই কেন্দ্রের তিনটি উপকেন্দ্র (রিপিটার ষ্টেশন) রয়েছে। এই সংযোগটি প্রায় 140 কিলোমিটার দূরত্ব পর্যন্ত বিস্তৃত।

বর্তমান বছরের প্রথম দিকে বিদেশ সঞ্চার ভবনের আধা-স্বয়ংক্রিয় আন্তর্জাতিক টেলিফোন এক্সচেঞ্জটি বসাবার কাজ শেষ হলে বোম্বাইয়ের একজন টেলিফোন অপারেটর বিদেশের অনেক দেশের সঙ্গে সরাসরি ডায়াল করে টেলিফোন সংযোগ স্থাপন করতে পারবে।

দ্বিতীয় ভূকেন্দ্রটি উত্তরাঞ্চলে স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে। 1974-75 সাল থেকে টেলি-সংযোগ বৃদ্ধির আনুমানিক হিসাবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই দ্বিতীয় ভূকেন্দ্রটি অতিরিক্ত আন্তর্জাতিক টেলিসংযোগের প্রয়োজন মেটাবে এবং প্রয়োজনমত আরভি ভূকেন্দ্রের পরিপূরক হিসাবে কাজ করবে। পারমাণবিক শক্তি দপ্তর মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থার কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবহার করে এই ভূকেন্দ্রের মাধ্যমে অপারেশনাল টেলিভিসন সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবে।

এই ব্যাপারে বিভাগীয় কারিগরী কমিটির সুপারিশক্রমে দেরাদুনের কাছে একটি জায়গা ঠিক করা হয়েছে। ওভারসীজ কমিউনিকেশন সার্ভিসের প্রকল্প রিপোর্ট অনুযায়ী এই ভূ-কেন্দ্রের প্রধান কেন্দ্রটি স্থাপিত হবে দেরাদুনের কাছে এবং টার্মিনাল ভবনটি গড়ে উঠবে নয়া দিল্লীতে। এই ভবনেই আন্তর্জাতিক টেলেক্স, টেলিফোন এবং মূলকেন্দ্র ও টার্মিনাল ভবনের সঙ্গে একটি মাইক্রোওয়েভ সংযোগ থাকবে। প্রকল্পটি বাবদ আনুমানিক ব্যয় হবে 6 কোটি 78 লক্ষ টাকা। 1947 সালের শেষ নাগাদ এই কেন্দ্রটি চালু হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

উপগ্রহের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থায় ভারতে এক স্থায়ী ও উচ্চ মানের আন্তর্জাতিক টেলিসংযোগ গড়ে উঠবে। পরবর্তী কালে এই ব্যবস্থার মাধ্যমে আধা-স্বয়ংক্রিয় ভিত্তিতে আন্ত-র্জাতিক ট্রাঙ্ক-ডায়ালিং-এর সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে।

বিজ্ঞানে কলিঙ্গ পুরস্কার

1971 সালের জন্যে বিজ্ঞানে কলিঙ্গ পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে বিশিষ্ট মার্কিন নৃ-বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান-লেখিকা ডক্টর মার্গারেট মীডকে। ভারতের শিল্পপতি শ্রীবিজু পট্টনায়েকের প্রদত্ত অর্থে রাষ্ট্রপুঞ্জের শিক্ষা বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা

প্রতি বছর একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞান-লেখক বা লেখিকাকে লোকরঞ্জক বিজ্ঞান-গ্রন্থ রচনায় কৃতিত্বের জন্যে এই পুরস্কার দিয়ে থাকেন।

ডক্টর মীড একাধিক লোকরঞ্জক বিজ্ঞান-গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার মধ্যে Coming of Age in Samoa' গ্রন্থটির 2 বছরের মধ্যে পাঁচটি সংস্করণ হয়েছে ও দু-বার তা পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে আছে 'Growing up in New Guinea', 'Sex and Temperament in Three Primitive Societies', 'And Keep your Powder Dry'। তিনি 1926 সাল থেকে নিউ ইয়র্কের মিউজিয়াম অব ন্যাচারাল হিস্ট্রির সঙ্গে যুক্ত আছেন এবং বহু নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষা ও অভিযানে অংশগ্রহণ করেছেন।

যোহানেস কেপ্‌লারের চার-শততম জন্মশতবার্ষিকী

ষষ্ঠ শতকে বরাহ-মিহিরের সমসাময়িক কাল থেকে প্রাচীন ভারতের জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোতিষীর মধ্যে যে অভূতপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছিল, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার প্রভাব অপরিসীম। সেদিনের মানুষ বিশ্বাস করতো, দূর নক্ষত্র অথবা গ্রহের স্থান এবং কাল, মানুষ এবং তার জগতের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে নিয়ন্ত্রিত করে। আজ থেকে চার-শ' বছর আগে যোহানেস কেপ্‌লারের জন্মমুহূর্তেও ওই একই সুর ইউরোপের জনমানসেও বিরাজ করতো। গত 17 জানুয়ারী কলকাতার বিড়লা প্ল্যানেটেরিয়ামে আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের জনক কেপ্‌লারের চার-শততম জন্মবার্ষিকী পালন উপলক্ষ্যে একথা বলেন ফেডারেল রিপাব্লিক অব জার্মেনীর কনসাল জেনারেল ডক্টর এইচ. এফ. লিনজ। উল্লেখ্য, যোহানেস কেপ্‌লারের জন্ম ভ্যুর্টেমবার্গের ভেইল-এ, 27শে ডিসেম্বর 1571। প্রধান অতিথির ভাষণে জাতীয় অধ্যাপক ডক্টর সত্যেন্দ্রনাথ বসু কেপ্‌লার এবং টাইকো ব্রাহীর কথা বলতে গিয়ে উল্লেখ করেন, এই সময়ে প্রচলিত অন্ধ বিশ্বাসকে অতিক্রম করে কেপ্‌লারই জ্যোতির্বিজ্ঞানে পদার্থবিজ্ঞানের অনুপ্রবেশ ঘটান। তাঁর গ্রহগতির তিনটি সূত্র আজও পথিকৃৎ-এর মত কাজ করছে। তিনিই দু-হাজার বছরের পুরনো বিশ্বাসকে দূর করে প্রমাণ করেন, গ্রহগুলি সূর্যকে কেন্দ্র করে উপবৃত্তীয় পথ পরিক্রমণ করে। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন শ্রীঅমলেন্দু বসু, শ্রীআর সুব্রহ্মনিয়াম এবং প্রখ্যাত ভারতীয় জ্যোতিঃ-পদার্থ-বিজ্ঞানী ডক্টর জি. স্বরূপ। ম্যাক্সমুলার ভবনের পরিচালক ডক্টর জে. ইউ. ওহলাউ উপস্থিত ব্যক্তিগণকে ধন্যবাদ জানান। মূল অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা বিড়লা প্ল্যানেটেরিয়াম, বিড়লা শিল্প এবং প্রযুক্তিবিষয়ক সংগ্রহশালা, ম্যাক্সমুলার ভবন এবং পশ্চিম জার্মেনীর সরকারের কনসাল জেনারেল।

প্রধান সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ 37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

রজত জয়ন্তী বর্ষ | মার্চ, 1972 | তৃতীয় সংখ্যা

নৃ-বিজ্ঞান ও লোকসংস্কৃতি

রেবতীমোহন সরকার*

সমাজ-বিজ্ঞানসমূহের (Social Sciences) মধ্যে নৃ-বিজ্ঞান আজ এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে বললে অত্যুক্তি হয় না। মানুষের জীবনের সার্বিক আলোচনার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এই বিজ্ঞান সুধীসমাজে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বর্তমানে আমাদের দেশের সাধারণ্যে এর প্রচার সীমিত হলেও বিদ্বজ্জনসমাজে নৃ-বিজ্ঞানের গুরুত্ব স্বীকৃত হতে চলেছে। পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব থেকে শুরু করে বিভিন্ন দেশের মানুষের আকৃতি, প্রকারভেদ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন-শৈলী, সংস্কৃতি, সমাজ, অর্থনীতি, ধর্ম, শিল্প, ভাষা ও সাহিত্য—এক কথায় সামগ্রিক জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনায় নৃ-বিজ্ঞান নিজেকে নিয়োজিত করেছে। নৃ-বিজ্ঞানের অনুসন্ধিৎসু আলোচনা পৃথিবীর মানুষকে প্রকৃতভাবে আবিষ্কার করেছে। কেবলমাত্র জ্ঞানের জন্যেই জ্ঞানার্জন করে নৃ-বিজ্ঞান ক্ষান্ত হয় নি, এর ব্যবহারিক দিকটিও প্রণিধানযোগ্য। মানব-সমাজের নানা সমস্যা সমাধানের দিকগুলির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশে নৃ-বিজ্ঞানের সবগুলি শাখাই যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জন করেছে। নৃ-বিজ্ঞান ক্ষেত্র-বিজ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত এবং এর অধিকাংশ তথ্য প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র গবেষণার

* নৃ-বিজ্ঞান বিভাগ, বঙ্গবাসী কলেজ, কলিকাতা-9

ভিত্তিতে সংগৃহীত হয়। অপর দিকে লোকসংস্কৃতি মানুষের ঐতিহ্য, রীতি-নীতি, ধ্যান-ধারণা, উৎসব-পার্বণ ও বিভিন্ন সামাজিক আচার-ব্যবহারের ছন্দোবদ্ধ রূপ উদ্ঘাটনে ব্যাপৃত। নৃ-বিজ্ঞানের মত লোকসংস্কৃতিও একটি ক্ষেত্র-বিজ্ঞান এবং বহু বিষয়ে এই দুটি শাখা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। বর্তমান প্রবন্ধে নৃ-বিজ্ঞানের অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে লোকসংস্কৃতির ব্যবহার-প্রণালীর মূল্যায়নের উপর আলোকসম্পাতের চেষ্টা করা হয়েছে।

লোকসংস্কৃতি নিঃসন্দেহে একটি ইতিহাসভিত্তিক বিজ্ঞান; কারণ মানুষের অতীত জীবনের গভীরে প্রবেশলাভে লোকসংস্কৃতি প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে। লোকসংস্কৃতির বিজ্ঞান পর্যায়ভুক্ত হবার বিশেষ যুক্তি হলো এই যে, এর লক্ষ্যে পৌঁছাবার মূলধন একমাত্র আরোহ সিদ্ধান্ত সম্বন্ধীয় পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল। নৃ-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে সাংস্কৃতিক নৃ-বিজ্ঞানের সঙ্গেই লোকসংস্কৃতির আত্মিক যোগসূত্র। সাংস্কৃতিক নৃ-বিজ্ঞানীর মানুষের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার এবং বিভিন্ন সামাজিক সংস্থার প্রতি আলোকসম্পাতের কালে সেগুলিকে অতি অবশ্যই ঐ জনগোষ্ঠীর লোককথা, কাহিনী, ধাঁধা, প্রবচন, ছড়া প্রভৃতির দ্বারা প্রভাবিত হতে হবে; তা না হলে সেই জন গোষ্ঠীর জীবনযাত্রার বিবরণী অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

নৃ-বিজ্ঞানীদের ধারণা অনুযায়ী লোকসংস্কৃতি কোন এক জনগোষ্ঠীর জীবনধারা ও সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ অংশবিশেষ। পৃথিবীর প্রতিটি জন-গোষ্ঠীর, তাদের জীবনযাত্রা প্রণালী যতই আদিম ও সরল হোক না কেন, নিজস্ব লোক-কথা ও কাহিনী বিদ্যমান। লোকসংস্কৃতির এই সব উপাদান আদিম ও সমসাময়িক কালের সমাজব্যবস্থার মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করেছে। নৃ-বিজ্ঞানের চত্বরে মানুষের জীবনধারার বিজ্ঞান-ভিত্তিক আলোচনায় লোকসংস্কৃতির ব্যবহার অপরিহার্য। বর্তমান কালে নৃ-বিজ্ঞানীদের মধ্যে এই বিষয়টির প্রতি প্রয়োজনীয় দৃষ্টিপাত করতে দেখা যায় না। সামাজিক নৃ-বিজ্ঞানীর নানাবিধ আলোচনায় লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানের বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণের অভাব পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে বর্তমান কালে ভারতীয় নৃ-বিজ্ঞানীদের গবেষণায় লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানের মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণের প্রতি যথাযোগ্য দৃষ্টি দেওয়া হয় না এবং খুব কম বিশ্ববিদ্যালয়ই লোকসংস্কৃতিকে নৃ-বিজ্ঞান শিক্ষার বিশেষ এক অংশ হিসেবে স্বীকৃতিদান করেছে।

একথা অনস্বীকার্য যে, লোকসংস্কৃতির চর্চার উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ না করলে নৃ-বিজ্ঞান, বিশেষ করে সামাজিক নৃ-বিজ্ঞান অঙ্গহীন হয়ে পড়বে। সংস্কৃতি (Culture) হলো নৃ-বিজ্ঞানের প্রাথমিক ভিত্তি। যদিও এই সংস্কৃতির সংজ্ঞা নানাভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, তবুও একথা সর্বজন-স্বীকৃত যে, সংস্কৃতি হলো সামাজিক উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত পরিবেশের মনুষ্যনির্মিত অংশবিশেষ। এর মধ্যে রয়েছে মানবজীবনের রীতি-নীতি, প্রথা, ঐতিহ্য, বিভিন্ন সংস্থা এবং তার সঙ্গে নানাধরণের উৎপাদন ও উৎপাদনের বিভিন্ন কলাকৌশল। কোন লোকগাথা অথবা প্রবচন তাই সংস্কৃতির একটি বিশেষ অঙ্গস্বরূপ।

কালচার অথবা সংস্কৃতি কথাটি বিখ্যাত নৃ-বিজ্ঞানী এডওয়ার্ড টাইলর (Edward Tylor) সর্বপ্রথম 1865 খৃষ্টাব্দে ব্যবহার করেছিলেন এবং এই কথাটি 1871 খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'Primitive culture' নামক পুস্তকে নৃ-বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গীতে আলোচিত হয়েছিল। টাইলরের মতানুযায়ী সংস্কৃতি হলো একটি জটিল বিষয়, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে জ্ঞান, বিশ্বাস, শিল্প, নীতিজ্ঞান, অনুশাসন এবং অন্যান্য কর্মদক্ষতা ও অভ্যাস—যেগুলি সামাজিক জীব হিসেবে মানুষ দৈনন্দিন জীবনে অর্জন করে থাকে। টাইলরের সংস্কৃতি সম্পর্কিত আলোচনার সূত্রপাত থেকের

(Klemon) বিখ্যাত ও বৃহদাকার রচনার মধ্যে অন্তর্নিহিত। সংস্কৃতির সংজ্ঞায় ক্লেম বলেছেন যে, এটি হলো রীতি-নীতি, সংবাদ এবং দক্ষতা, শান্তি এবং যুদ্ধকালীন গার্হস্থ্য ও প্রকাশ্য জীবন; ধর্ম, বিজ্ঞান ও শিল্পের এক সম্মিলিত প্রতিচ্ছবি। অপর দিকে উইলিয়াম জন টমস (William John Thoms) 1846 খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম Folklore কথাটি ব্যবহার করেছিলেন এবং এর স্থলে ব্যবহৃত Popular antiquities (জনপ্রিয় পুরাতনী) কথাটিকে বাতিল করেছিলেন। তাঁর মতে, ফোকলোর বা লোকসংস্কৃতি পুরাকালের আচার-ব্যবহার, রীতি-পদ্ধতি, অবলোকন, কু-সংস্কার, ছড়া, প্রবচন প্রভৃতির সুসমঞ্জস বিকাশ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, নৃ-বিজ্ঞানীদের আলোচিত সংস্কৃতি বা কালচারের সঙ্গে লোকসংস্কৃতি বা ফোকলোরের যথেষ্ট মিল রয়েছে। নৃ-বিজ্ঞানীদের নিকট লোকসংস্কৃতি, সংস্কৃতি বা কালচারের অংশবিশেষ। সে জন্তেই প্রখ্যাত নৃ-বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন সময়ে মানুষের সমাজ ব্যবস্থার নানাদিকে আলোকসম্পাতের সময় লোকসংস্কৃতির উপাদানের যথেচ্ছ ব্যবহার করেছেন। নৃ-বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে টাইলর এবং অ্যাণ্ড্র‍্যু ল্যাং (Andrew Lang) লোকসংস্কৃতির মূল্যায়নে প্রয়োজনীয় দৃষ্টিনিক্ষেপ করেছিলেন। স্যার জেমস্ ফ্রেজার (Sir James Frazer) পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের জনগোষ্ঠীর লোকাচার ও রীতিপদ্ধতি সংগ্রহ এবং সেগুলির নৃ-বিজ্ঞানভিত্তিক বিচারে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। তাঁর বিখ্যাত পুস্তক 'Golden Bough' পৃথিবীর পণ্ডিতমহলে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে এবং আজও সেই পুস্তক বিচার-বিশ্লেষণ ও যুক্তিতর্কের অবতারণায় অদ্বিতীয়। ফ্র্যানৎস বোয়া (Franz Boas) তাঁর নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপকরণের সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন। আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের লোককথা ও কাহিনীর মাধ্যমে তাদের উৎপত্তি, জীবনাদর্শ ও সামাজিক ধ্যান-ধারণার গতিপ্রকৃতির এক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করেছিলেন। এস্কিমো লোককথায় তিনি ঐ জাতির সঙ্গে পরিবেশ ও প্রাণিজগতের বিভিন্ন সম্পর্ক এবং এস্কিমো চিন্তাধারার মধ্যে অন্যান্য জাতি-উপজাতির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবের বিষয় আলোচনা করেছেন। তাঁর এই আলোচনায় লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপকরণ, যেমন—লোককথা, পৌরাণিক ঘটনা বিচিত্রা, রমন্যাস প্রভৃতির সাহায্যে উপজাতির জীবনযাত্রার নানা দিকের প্রতি নৃ-বিজ্ঞানভিত্তিক আলোকসম্পাত করা হয়েছিল। পৌরাণিকী কথাসংগ্রহ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে কোয়াকিউটল উপজাতির সংস্কৃতির স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছিলেন। হার্সকোভিট্‌স্ (Herskovits) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Man and his works'-এর মধ্যে অভিমত জ্ঞাপন করেছেন যে, লোককথা ও কাহিনীর আলোচনার মাধ্যমে কোন এক জনগোষ্ঠীর অন্তর্নিহিত রূপটি বিকশিত হয়। প্রখ্যাত নৃ-বিজ্ঞানী ম্যালিনস্কি (Malinowski) তাঁর রচনা 'Myth in primitive psychology'-তে সংস্কৃতির সঙ্গে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানের এক নিকটতম সম্পর্কের বিষয় প্রমাণিত করেছেন। ট্রবিয়াণ্ড দ্বীপবাসীদের মধ্যে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন যে, তাদের সংস্কৃতি নিম্নবর্ণিত তিনটি বিশেষ রকমের উপাদানে গঠিত।

1. রূপকথা—এগুলি কাল্পনিক এবং নাটকীয়ভাবে বর্ণনা করা হয়। সাধারণতঃ নভেম্বর মাসে শস্য সংগ্রহ এবং মৎস্য শিকারের মধ্যবর্তী সময়ে এগুলি আলোচিত হয়। এই রূপকথার আলোচনা ক্ষেতের শস্যের উপর হিতকারী প্রভাব-বিস্তার করে বলে একটা অস্পষ্ট ধারণা রয়েছে।

2. লৌকিক উপাখ্যান—এগুলি প্রকৃত অর্থপূর্ণ ও সত্য বলে বিশ্বাস করা হয়। জাতীয় সম্পত্তি-হিসেবে বিবেচিত এসব উপাদানসমূহ হকে যাঁরা অপরিবর্তিত অবস্থায় বর্ণিত হয়ে থাকে।

3. পৌরাণিক কথা—এগুলি যে কেবলমাত্র সত্য বলে বিবেচিত হয় তা নয়, পরম শ্রদ্ধাস্পদ এবং পবিত্র বলে স্বীকৃত হয়ে থাকে। বিভিন্ন উৎসব-পার্বণের সময় সংশ্লিষ্ট কথাগুলি আলোচিত হয়।

লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানের অসম্বদ্ধ সংগ্রহ কখনই তার প্রকৃত রূপের উন্মোচন করতে পারে না। লোকসংস্কৃতির প্রতিটি উপাদান সংশ্লিষ্ট জাতি-উপজাতির জীবনধারা ও সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করতে হবে। সুতরাং লোককথা, কাহিনী, ছড়া, প্রবচন প্রভৃতির প্রকৃত অর্থ বিশ্লেষণে সংশ্লিষ্ট জাতি-উপজাতির সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনের উপর আলোকসম্পাত অবশ্য কর্তব্য। সুতরাং লোকসংস্কৃতির সুসমঞ্জস গবেষণায় নৃ-বিজ্ঞানের প্রয়োজন অপরিহার্য। অপর দিকে মানুষের সংস্কৃতির সুচারু ব্যাখ্যার জন্যেও লোককথা, কাহিনী, ছড়া, প্রবচনের বিন্যাসভিত্তিক আলোচনা অত্যাবশ্যক। নৃ-বিজ্ঞান ও লোকসংস্কৃতি তাই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। একটিকে বাদ দিলে অপরটি অসম্পূর্ণ। বিভিন্ন নৃ-বিজ্ঞানী সে জন্যে বোধকরি লোকসংস্কৃতির উপাদানের উপর এত গুরুত্ব আরোপ করেছেন। লোকসংস্কৃতির বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনায় ফোকলোর সোসাইটি অব লণ্ডন এবং আমেরিকান ফোকলোর সোসাইটি-র অবদান অতুলনীয়। দেশ বিদেশের লোকজীবনের উপকরণ সংগ্রহ করে সেগুলির বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনার জন্যে এসব সংস্থা দিনের পর দিন যথেষ্ট অনুপ্রেরণা দান করে চলেছে।

নৃ-বিজ্ঞানীদের লোকসংস্কৃতি চর্চার ধারা কিন্তু অন্যান্য গবেষকদের আলোচনা থেকে ভিন্ন পর্যায়ের। লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানের উৎস অথবা এদের সঞ্চালন পদ্ধতির প্রতি নৃ-বিজ্ঞানীদের মনোযোগ খুবই সীমিত। জনজীবনের বিভিন্ন ধারায় লোকসংস্কৃতি কিভাবে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং মানুষের দৈনন্দিন জীবনে এদের প্রত্যক্ষ প্রভাব কত সুদূরপ্রসারী—নৃ-বিজ্ঞানীদের আলোচনায় সেগুলি প্রাধান্য লাভ করে। লোককথা, কাহিনী, ছড়া, প্রবচন কোন এক জাতির প্রকৃত শিক্ষা-দীক্ষার কাজ করে থাকে—জাতির নীতি ও আদর্শের বিভিন্ন দিক প্রতিফলিত হয় এসব ছড়া-প্রবচনের মাধ্যমে।* সে জন্যে বিশেষ লোককথা, প্রবচন অথবা ছড়ার মাধ্যমে বিভিন্ন জাতির সাংস্কৃতিক লেনদেন ও দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের কথা প্রতিফলিত হয়। বহু যুগ পূর্বের কোন জনগোষ্ঠীর বিস্মৃত ইতিহাসের পুনর্গঠনের সময় প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের দিক থেকে কোন প্রত্যক্ষ সাহায্যের অভাব ঘটলে লোকসংস্কৃতির আলোচনাই একমাত্র সহায়কের কাজ করতে পারে। লোকসংস্কৃতিকে সে জন্যেই বলা হয়েছে—A living fossil which refuses to die অর্থাৎ এক জীবন্ত ও অবিনশ্বর জীবাশ্ম।

ভারতীয় সমাজে মানুষের দৈনন্দিন জীবন বিভিন্ন লৌকিক আচার-ব্যবহার ও বিধি-নিষেধের প্রভাবে প্রভাবিত। নানা জাতি-উপজাতি অধ্যুষিত এই দেশে সামাজিক রূপরেখা বড়ই বিচিত্রধর্মী। মানুষের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ সংস্কারের জটাজালে আবদ্ধ। কোন জাতিগোষ্ঠীর জীবনে বিশ্বাস-অবিশ্বাস, ধর্মবিশ্বাস ও কুসংস্কার দেশের বৃহত্তর জীবনকে প্রভাবিত করে। এই সকল লোক-বিশ্বাসের প্রতিটি উপাদান সংশ্লিষ্ট জাতির সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের পশ্চাৎপটে বিশ্লেষিত হওয়া উচিত। অন্যথায় লোকসংস্কৃতির প্রকৃত পরিচয় লাভ ঘটবে না। লৌকিক দেবদেবীর প্রভাব ভারতবর্ষে, বিশেষ করে পশ্চিম বাংলার প্রতিটি গ্রামে পরিলক্ষিত হয়। এই সকল লৌকিক দেব-দেবীর বিস্তারিত বিবরণী, তাদের উৎপত্তির ইতিহাস এবং বৃহত্তর হিন্দুধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে এদের অবস্থান নির্ণয়ের বিষয় নানাভাবে দেওয়া হয়েছে বা এখনও হচ্ছে। কিন্তু এই সকল বিবরণ-

মূলক রচনা তখনই বৈশিষ্ট্য লাভ করবে, যখন জনমানসের জীবনধারার গতি-প্রকৃতির পটভূমিকায় এগুলির বিচার করা হবে। ভারতে সামাজিক নৃ-বিজ্ঞানের গবেষণায় জাতি-উপজাতির জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আলোকসম্পাতের সময় লোক-সংস্কৃতি উপাদানের বিশ্লেষণ এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক অখণ্ডতা, সমৃদ্ধীকরণ এবং পারস্পরিক ক্রিয়ার এক সম্পূর্ণ চিত্র অঙ্কনে দৃষ্টিপাত অতীব প্রয়োজনীয়। ভাষাতাত্ত্বিক নৃ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও লোককথা, কাহিনী, ছড়া, প্রবচনের এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। বিভিন্ন অঞ্চল ও পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে মানুষের মানসিকতার গতি-প্রকৃতির প্রতিফলনের স্বরূপ তার ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে প্রতিভাত হয়। এই লোকসাহিত্য ভারতের লোকজীবন জুড়ে ছড়িয়ে আছে। এ-গুলির সুষ্ঠু সংগ্রহ কিছু কিছু হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সামাজিক ধ্যানধারণার পটভূমিকায় এদের বিচার এখনও অসম্পূর্ণ। সামাজিক নৃ-বিজ্ঞানী লোক-সাহিত্যের এই অমূল্য সম্পদকে মানুষের সমাজ, ধর্ম, ভাষা, শিল্প ও নৈতিকতা বিষয়ে আলোচনা-কালে যথেষ্ট ব্যবহার করতে পারেন। কোন্ বিশেষ পরিবেশে এসব লোকসাহিত্যের সৃষ্টি এবং অঞ্চল ও জনগোষ্ঠীর প্রভেদ অনুযায়ী কিভাবে এগুলি পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত হয়েছে, সেগুলি অনুসন্ধানযোগ্য। এদের মধ্যে দেশ, কাল ও জনমানসের মনস্তত্ত্বের এক মূর্ত বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। নৃ-বিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে বিভিন্ন রকমের প্রয়োগকৌশল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানকে সমাজ-সংস্কৃতির গতি-প্রকৃতির উপর আলোক-পাতের একটি সুযোগ্য পদ্ধতি হিসেবে অবলীলা-ক্রমেই ব্যবহার করা যেতে পারে। আমেরিকান ফোকলোর সোসাইটি কর্তৃক আয়োজিত এবং রবার্ট রেডফিল্ড (R bert Redfield) ও মিলটন সিঙ্গার (Milton Singer) প্রমুখ প্রখ্যাত নৃ-বিজ্ঞানীদের দ্বারা পরিচালিত 'ভারতীয় ঐতিহ্যের রূপ ও তার পরিবর্তনের ধারা' শীর্ষক আলোচনার আসরে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানের প্রত্যক্ষ সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছিল। নৃ-বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা আসরে লোকসংস্কৃতির প্রকৃত ও সুষ্ঠু মূল্যায়নের এটি একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। রামলীলা উৎসব, ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্য, ভারতীয় বণিক, রাজপুত ও জাট জাতির ঐতিহ্য, টোডা উপজাতির বিশ্বাস ও ধ্যানধারণা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে বৃহত্তর ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার ধারা সন্ধানে এই আলোচনা এক নবদিগন্তের সন্ধান দিয়েছে। ভারতীয় নৃ-বিজ্ঞানীদের লোকসংস্কৃতির এই সকল অজস্র উপাদানের বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় সমাজের প্রকৃত অনুসন্ধানমূলক গবেষণায় প্রতি সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। তাই বর্তমান ভারতীয় নৃ-বিজ্ঞানের গবেষকদের টাইলর, ফ্রেজার, মেলিনস্কি প্রমুখ নৃ-বিজ্ঞানী প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে নৃ-বিজ্ঞানের চত্বরে লৌকিক সংস্কার ও আচার-ব্যবহারের সুপ্রচুর উপাদান বিশ্লেষণে দৃষ্টিপাত করা অবশ্য কর্তব্য। ভারতীয় ভিত্তিভূমিতে ভারতীয় চিন্তাধারার পটভূমিকায় ভারতীয় নৃ-বিজ্ঞানীর বিজ্ঞান-সাধনার ক্ষেত্রে লোকসংস্কৃতির সদ্ব্যবহার এক সুসম্বদ্ধ ও বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা প্রণালীর প্রত্যাশাপূর্ণ পথের নির্দেশ দান করবে এবং কালক্রমে ভারতীয় লোকসংস্কৃতির চর্চা বিজ্ঞানাশ্রয়ী হয়ে নৃ-বিজ্ঞান আলোচনার এক অপরিহার্য অঙ্গরূপে প্রতিভাত হবে।

সৌরজগতের নবম গ্রহ—প্লুটো

সমীরকুমার ঘোষ*

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সৌরজগতের অষ্টম গ্রহ নেপচুন আবিষ্কৃত হওয়ার পর থেকেই জ্যোতির্বিদ্মহলে এক চিন্তার উদয় হয়েছিল যে, নেপচুনের সীমা ছাড়িয়ে নতুন আর কোন গ্রহ থাকা সম্ভব কিনা। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যে সব অনুসন্ধানী বিজ্ঞানীরা এই কাজে উৎসাহিত বোধ করেন, তাঁদের মধ্যে উত্তর আমেরিকার ফ্ল্যাগষ্টাফ মানমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর পার্সিভ্যাল লাওয়েলের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 1906 খ্রীষ্টাব্দে ডক্টর লাওয়েল এই ব্যাপারে প্রথম কাজ সুরু করেন এই যুক্তি নিয়ে যে, সেই সময় পর্যন্ত আবিষ্কৃত সবগুলি গ্রহের আকর্ষণ হিসাব করেও সূর্যকে প্রদক্ষিণকালে সপ্তম গ্রহ ইউরেনাসের গতির যে অসামঞ্জস্য দেখা যায়, তা ঠিকমত ব্যাখ্যা করা যায় না। তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল যে, নেপচুনের বাইরে অন্য কোন গ্রহ থাকলে তবেই ইউরেনাসের গতির ঐ অসামঞ্জস্যের সমাধান হতে পারে। এই প্রসঙ্গে জ্যোতির্বিদ্ স্লিফার (Slipher) ও উইলিয়ামস (Williams)-এর নেওয়া প্রায় দুই শতাধিক ছবি পরীক্ষা করেও ডক্টর লাওয়েল নতুন গ্রহের অবস্থান সম্বন্ধে তখনো কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারলেন না। এর পর আরো দুই-একবার সামান্য প্রচেষ্টার পর ডক্টর লাওয়েল 1914 খ্রীষ্টাব্দে আবার পূর্ণোদ্যমে সম্ভাব্য কোন নতুন গ্রহের সন্ধানে আত্মনিয়োগ করলেন। কিন্তু 9 ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট এক দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে অজস্র ছবি তুলেও তিনি নতুন কোন গ্রহের সঠিক নিশানা স্থির করতে পারলেন না। এই ঘটনা ডক্টর লাওয়েলের মনে আনলো এক বিরাট হতাশা। লাওয়েলের এই ব্যর্থতার কারণ পরে অবশ্য জানা গিয়েছিল। 1914 থেকে 1916 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যে সময়ে লাওয়েল তাঁর অনুসন্ধান-কার্য চালিয়েছিলেন, সেই সময়ে সম্ভাব্য ঐ নতুন গ্রহ তার কক্ষপথে পৃথিবী থেকে দূরতম প্রান্তে অত্যন্ত ধীর গতিতে অগ্রসর হচ্ছিল—যার ফলে পৃথিবী থেকে তার প্রভা প্রকৃত প্রভার প্রায় অর্ধেক বলে মনে হয়েছিল। এজন্যেই ঐ গ্রহের পক্ষে ডক্টর লাওয়েলের মত অনুসন্ধানীর দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল।

কিন্তু 1916 খ্রীষ্টাব্দে ঘটলো এক বিপর্যয়। সম্ভাব্য নতুন কোন গ্রহের অস্তিত্ব বাস্তব কিনা, এই পর্যবেক্ষণ-কার্য শেষ হবার আগেই পার্সিভ্যাল লাওয়েল ঐ বছর 16ই নভেম্বর ইহলোক ত্যাগ করেন। অবশ্য মৃত্যুর ঠিক আগে 1915 খ্রীষ্টাব্দে দীর্ঘ একশত পঁচিশ পৃষ্ঠাব্যাপী এক গবেষণা-পত্রে ডক্টর লাওয়েল 'Planet X' নামক এক অজানা গ্রহের অবস্থান যে এক বাস্তব ঘটনা, সে সম্বন্ধে দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে আলোচনা করেন। সেই গবেষণা-পত্রে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, ঐ অজানা গ্রহের ভর হবে, পৃথিবীর ভরের প্রায় সাত-দশমাংশ এবং সূর্য থেকে এর দূরত্ব হবে প্রায় 360 কোটি মাইল। লাওয়েলের মৃত্যুর পর 1919 খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী পিকারিংও ঐরূপ একটি গ্রহের অবস্থান সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। তিনিও এই অজানা গ্রহটির ঔজ্জ্বল্য, ওজন এবং দূরত্ব সম্বন্ধে তথ্য সরবরাহ করেন।

* পদার্থবিদ্যা বিভাগ, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন

পার্সিভ্যালের আরদ্ধ কিন্তু অসম্পূর্ণ এই কাজ তাঁর মৃত্যুর পর বেশ কিছুদিন আর অগ্রসর হতে পারে নি। শেষে 1925 খ্রীষ্টাব্দে স্বর্গতঃ লাওয়েলের ভ্রাতা ডক্টর লরেন্স লাওয়েলের আর্থিক আনুকূল্যে লাওয়েল মানমন্দিরে 13 ইঞ্চি ব্যাসের একটি নতুন দূরবীক্ষণ যন্ত্র স্থাপিত হলো। নবপ্রতিষ্ঠিত এই দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে 1929 সালে লাওয়েল মানমন্দিরে আবার পূর্ণোদ্যমে সুরু হলো নূতন গ্রহের অস্তিত্ব প্রমাণের কাজ। এই কাজের প্রধান দায়িত্ব অর্পিত হয় সেই মানমন্দিরেরই C. W. Tombaugh নামক এক তরুণ গবেষকের উপর। সুরু হলো আকাশে এই নতুন গ্রহের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্যে পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ। 1929 সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে একনাগাড়ে আকাশের বিভিন্ন অঞ্চলের ছবি তুলে টমবাউ বিচক্ষণতা সহকারে অনুসন্ধান কার্য চালিয়েও লাওয়েলের ভবিষ্যদ্বাণী-করা গ্রহের কোন সন্ধানই পেলেন না। অবশেষে 1930 সালের 21, 23 ও 29শে জানুয়ারী, টমবাউ মহাকাশে অসংখ্য তারকা ও নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে এমন একটি বিশেষ ধরণের জিনিষের ছবি পেলেন, যার উপর তাঁর দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হলো। 18ই ফেব্রুয়ারী ঐ জিনিষটির ছবি আরো স্পষ্ট, আরো উজ্জ্বল ও নিশ্চিত হয়ে দেখা দিল। 20শে ফেব্রুয়ারী রাতে এই উজ্জ্বল বস্তুটিকে টমবাউ বেশ পরিষ্কার-ভাবে ছবির মধ্যে পৃথক করতে সক্ষম হলেন। এর ফলে পার্সিভ্যালের ভবিষ্যদ্বাণী-করা গ্রহের বাস্তব অস্তিত্বের সম্ভাবনা তাঁর মনে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। টমবাউ-এর এই সাফল্যের সম্ভাবনা আরো দৃঢ়ভাবে সমর্থিত হলো, যখন ঐ একই সময়ে ডক্টর ল্যাম্পল্যাণ্ড নামে এক বিজ্ঞানীও ঐ মানমন্দিরে স্বাধীনভাবে 42 ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ঠিক ঐ একই রকম উজ্জ্বল এক বস্তুর ছবি পেলেন। ঐ বস্তুটির গতিবেগ ও অন্যান্য ধর্ম লক্ষ্য করে ডক্টর ল্যাম্পল্যাণ্ড এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, ঐ বস্তুটি নেপচুনের সীমা ছাড়িয়ে নূতন এক গ্রহ ব্যতীত আর কিছুই হতে পারে না। টমবাউ এই গ্রহের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আরো নিশ্চিন্ত হয়ে ঐ বছরে (1930) 13ই মার্চ সকালে হার্ভার্ড কলেজ মানমন্দিরে টেলিগ্রাম করে এই নতুন গ্রহের অস্তিত্ব সরকারীভাবে ঘোষণা করলেন এবং সেই মানমন্দির থেকেই সারা বিশ্বে এই আনন্দ সংবাদ প্রচারিত হলো।

আবিষ্কৃত এই গ্রহটির নামকরণ সম্বন্ধে নানা মতবাদ প্রচলিত আছে। কারো কারো মতে, যেহেতু এই গ্রহটি সৌরজগতের শেষ সীমায় গভীর তমসাবৃত অঞ্চলে প্রদক্ষিণ করে, সেহেতু প্রাচীন গ্রীক পুরাণে আলোচিত পাতালপুরীর দেবতা প্লুটোর নামানুসারেই এই গ্রহটির নামকরণ করা হয়েছে। আবার অন্য এক মতে, জ্যোতির্বিদ্ পার্সিভ্যাল লাওয়েলের প্রচেষ্টাতেই এই গ্রহের অস্তিত্ব প্রমাণের কাজ প্রথম সুরু হয়, কিন্তু তাঁর অবর্তমানে এই গ্রহ আবিষ্কারের কাজ সম্পূর্ণ হয় বলে এই বিজ্ঞানীকে চিরস্মরণীয় করে রাখবার জন্যে তাঁর নামের আদ্যাক্ষরদ্বয় (P ও L) প্রথমে দিয়েই এই গ্রহের নামকরণ হয়েছে PLUTO। শেষের এই যুক্তিকে সমর্থন করলে এই গ্রহটির নামকরণ যে যথার্থ ও সার্থক হয়েছে, তা মনে করা যেতে পারে।

প্লুটো সম্বন্ধে অনেক তথ্যই এখন আমাদের জানা। সূর্য থেকে এর নিকটতম অবস্থায় দূরত্ব 275 কোটি মাইল এবং নিজ কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে প্লুটো যখন দূরতম স্থানে চলে যায়, তখন সূর্য থেকে এর দূরত্ব দাঁড়ায় প্রায় 460 কোটি মাইল। সুতরাং সূর্য থেকে এর গড়-দূরত্ব হলো প্রায় 367 কোটি মাইল (সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব 9 কোটি 30 লক্ষ মাইল)। এই গ্রহটির আয়তন খুবই ছোট, কারণ এর ব্যাস আমাদের

পৃথিবীর ব্যাসের অর্ধেকেরও কম (3600 মাইল)। এর প্রভা জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাবে পঞ্চদশ শ্রেণীর এবং সে জন্যে প্লুটোকে আকাশে উজ্জ্বল গ্রহের আকারের পরিবর্তে ছোট্ট এক ম্লান আলোকবিন্দুর মত দেখায়। প্লুটোর কক্ষপথ উপবৃত্তীয় (Elliptic) ধরণের। যার উৎকেন্দ্রতা (Eccentricity) 0·25 এবং সূর্যকে একবার পূর্ণ প্রদক্ষিণ করে আসতে এর সময় লাগে প্রায় 248 বছর। নিজ কক্ষপথে প্লুটো আবর্তন করতে সময় নেয় প্রায় সাড়ে ছয় দিন। সূর্যকে প্রতিবার পরিক্রমণকালে প্লুটো একবার করে নেপচুনের অপেক্ষাও সূর্যের নিকটবর্তী হয়ে পড়ে, কারণ সূর্য থেকে নেপচুনের দূরত্ব প্রায় 280 কোটি মাইল। সুতরাং প্লুটো আবিষ্কৃত হবার পরেই জ্যোতির্বিদ্‌দের মনে এক আশঙ্কা হয়েছিল যে, নেপচুনের এত নিকটে আসবার ফলে তাদের মধ্যে হয়তো সংঘর্ষ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু পরে হিসাব করে দেখা গেছে যে, সেরূপ কোন আশঙ্কার কারণ নেই—যেহেতু প্লুটোর কক্ষতল নেপচুনের কক্ষতলের সঙ্গে প্রায় 17 ডিগ্রীর মত কোণ সৃষ্টি করে রয়েছে। সুতরাং তাদের মধ্যে কোন অবস্থাতেই সংঘর্ষ হবার সম্ভাবনা নেই। প্লুটোর কক্ষপথ পর্যালোচনা করে বিজ্ঞানীদের চোখে যে বৈশিষ্ট্যটি ধরা পড়েছে, তা হলো এই যে, এই কক্ষপথের সঙ্গে অন্যান্য গ্রহগুলির কক্ষপথের কোন সামঞ্জস্য নেই। কক্ষপথের এই ধরণের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করে অনেক বিজ্ঞানীরও এই ধারণা হয়েছিল যে, প্লুটো হয়তো কোন এক সময়ে তার নিকটতম গ্রহ নেপচুনেরই এক উপগ্রহ হিসাবে ছিল। অজানা কোন এক কারণে হয়তো সেই উপগ্রহ তার কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে এক স্বাধীন গ্রহের আকারে নিজস্ব এক বিচিত্র কক্ষপথ তৈরি করে মহাকাশে বিচরণ করছে।

দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে প্লুটোকে যেটুকু পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়েছে, তা থেকে দেখা যায় যে, প্লুটোর গাত্রদেশ অত্যন্ত অমসৃণ, যার ফলে তার গাত্র থেকে সূর্যালোক বেশী প্রতিফলিত হতে পারে না। অবশ্য কম প্রতিফলিত সূর্যালোকের আরো একটি কারণ হয়তো সূর্য থেকে গ্রহটির বিরাট দূরত্ব। যাহোক, প্লুটোর চারদিকে কোন আবহমণ্ডল আছে বলে মনে হয় না। সূর্য থেকে বিরাট দূরত্ব ও অন্যান্য কারণে প্লুটোর পৃষ্ঠদেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা মাত্র —210°C। আমাদের পরিচিত যে কোন জিনিষই এই তাপমাত্রায় জমে বরফের মত হয়ে যাবে। সে জন্যে প্লুটোতে কোন গ্যাসীয় বা তরল বস্তুর অবস্থান যে অসম্ভব, সে কথা সহজেই বুঝা যায়। প্লুটোকে এখনো পর্যন্ত যেটুকু জানা গেছে, তা সবই এই পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে, পৃথিবী থেকে এই বিরাট দূরত্বের (প্রায় 350 কোটি মাইল) কোন গ্রহকে সঠিকভাবে পর্যালোচনা করা সত্যই এক দুরূহ ব্যাপার। সে জন্যে প্লুটোর আয়তন, ওজন, ঘনত্ব ইত্যাদি সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে বলা খুবই কঠিন। তবুও 1950 সালে বিজ্ঞানী কুইপার যেসব পরীক্ষা করেছিলেন, তার ভিত্তিতে জানা যায় যে, প্লুটোর আয়তন পৃথিবীর আয়তনের প্রায় এক-দশমাংশ এবং ওজন প্রায় আট-দশমাংশ—যা লাওয়েলের ভবিষ্যদ্বাণীর খুবই নিকটে। সুতরাং পৃথিবীর মত প্লুটোও তার আয়তনের তুলনায় বেশ ভারী। আর এর একমাত্র যুক্তি হতে পারে এই যে, হয়তো পৃথিবীর মতই প্লুটোর আভ্যন্তরীণ ভাগও যথেষ্ট লৌহ-জাতীয় জিনিষের দ্বারা গঠিত। তবে একটা প্রশ্ন এই যে, পৃথিবীর পরে বেশ কয়েকটি হাল্কা ধরণের গ্রহের অবস্থানের পর, আবার পৃথিবীর মত ভারী একটা গ্রহের অস্তিত্ব কিভাবে সম্ভব হলো? এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে বিজ্ঞানীরা যদিও এখনো সক্ষম হন নি, তথাপি তাঁদের অনেকেরই এই ধারণা যে, হয়তো প্লুটো সম্বন্ধে

আমরা আজ পর্যন্ত যে সব তথ্য পেয়েছি, তা সঠিক এবং সম্পূর্ণ নয়। প্লুটোর অস্তিত্ব ধরা পড়েছে মাত্র 1930 সালে। সেই হিসাবে তার বয়স মাত্র 40/42 বছর। কোন গ্রহ সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য পেতে গেলে তার এই বয়স যে অত্যন্ত নগণ্য, তাতে সন্দেহ নেই। সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় প্লুটো সম্বন্ধে হয়তো আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও চমকপ্রদ তথ্য পাওয়া যেতে পারে। সেই সম্ভাবনার কথা মেনে নিয়ে আমরা আজ স্বীকার করে নিতে পারি না কি যে, প্লুটোর উৎপত্তি, অবস্থান ও গতিপথ আজও গভীর রহস্যে ঘেরা ?

অঙ্কের ম্যাজিক

অমিতোষ ভট্টাচার্য*

তাসের প্যাকেটে যিনিই হাত দেন, দু-একটি ম্যাজিক হয়তো তিনি নিঃসন্দেহে দেখাতে পারেন। কিন্তু তাঁরা হয়তো কেউই পি. সি. সরকার হতে পারবেন না। কিন্তু পি. সি. সরকার না হয়েও যেমন কয়েকটা চমৎকার ম্যাজিক অনেকেই দেখাতে পারেন, তেমনি খুব তুচ্ছ অঙ্কের জ্ঞান নিয়েও কয়েকটি প্রায় অবাক-করা অঙ্কের খেলা দেখানো সম্ভব। এই সব খেলা আয়ত্ত করতে হলে অঙ্কশাস্ত্রের উপর গভীর জ্ঞানের দরকার নেই; যা চাই—তা হলো অভ্যাস, ধৈর্য আর চেষ্টা।

যাদুকর তিন অঙ্কের একটি সংখ্যা দর্শকদের কাছ থেকে চেয়ে নিলেন। ধরা যাক, সংখ্যাটি 785। সংখ্যাটি বোর্ডে বা কাগজের উপর যাদুকর দু-বার লিখলেন।

786 786

এবার দ্বিতীয় একটি তিন অঙ্কের সংখ্যার অনুরোধ এলো। হয়তো এবারের সংখ্যাটি হলো 827। 827-কে বাঁ-দিকের 786-এর নীচে লিখে ডান দিকের 786-এর নীচে যাদুকর নিজে একটি সংখ্যা লিখলেন। যাদুকরের সংখ্যাটি হলো 172। তাহলে অঙ্ক দুটি দাঁড়ালো—

786	786
827	172

যাদুকর ঘোষণা করলেন এক সঙ্গে দুটি গুণ অঙ্ক করে গুণফল দুটির যোগফলটি তিনি লিখে দেবেন এবং বলেই খুব সাবলীল ভঙ্গীতে তিনি লিখলেন 785214! এই দুটি অঙ্ক লিখতে যতটুকু সময় লাগে, তার চেয়ে এক মুহূর্ত বেশী সময় তিনি নিলেন না।

এবার লক্ষ্য করুন, যাদুকর নিজে একটি সংখ্যা লিখেছেন। এই সংখ্যাটিই হলো এই ম্যাজিকের মোক্ষম অস্ত্র। এই সংখ্যাটি এমন হওয়া চাই, যা দর্শকের কাছ থেকে পাওয়া দ্বিতীয় সংখ্যাটির সঙ্গে যোগ করলে যোগফল হবে 999। এই সংখ্যাটি যাদুকর নিজে না লিখে দর্শক-সেজে-বসা কোন বন্ধু বা সহকারীর কাছ থেকে নিতে পারেন। এর পরের ধাপটি অত্যন্ত সহজ। প্রথম সংখ্যার 786 থেকে 1 বাদ দিন, পেলেন 785। এবার অঙ্ক তিনটির 9-এর পরিপূরক (Compliment of 9) যথাক্রমে 2, 1, 4 785-এর পর লিখুন। আপনার উত্তরটি হলো 785214। কিন্তু শুধু গুণফল দুটি যোগ করে উত্তরটি লিখলে প্রথম সংখ্যা 786-এর সঙ্গে

---

* ডিফেন্স ইলেকট্রনিক্স রিসার্চ লেবরেটরী, চন্দ্রায়ন গুট্টা লাইন্স, হায়দরাবাদ-5

উত্তরটির প্রথম তিনটি অঙ্কের সাদৃশ্য কোন কোন বুদ্ধিমান দর্শক লক্ষ্য করতে পারেন। এই সম্ভাবনাকে একটা কৌশলে এড়িয়ে চলা যায়। একটা কাজ করতে পারেন, ম্যাজিকটিকে কঠিন করবার জন্যে যোগফলকে দ্বিগুণ করে উত্তরটি লিখবেন। তাহলে আপনার উত্তর হবে 1570428। যোগফলটিকে 2 দিয়ে গুণ করতে গেলে 785214-এর পর 0 বসিয়ে 5 দিয়ে ভাগ দিয়ে বাঁ-দিক থেকে উত্তরটি লিখে দিন—আর সমস্ত হিসেবটি আপনাকে মনে মনে করতে হবে। এই মানসাঙ্ক নিতান্তই সহজ। যদিও মাত্র তিন অঙ্কের সংখ্যা দিয়ে ম্যাজিকটি বলা হলো, একই কায়দায় ম্যাজিকটিকে যে কোন অঙ্কের সংখ্যা পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া যাবে। তবে ছোটখাটো সংখ্যা হলে তৎক্ষণাৎ সাধারণ গুণের সাহায্যে উত্তরটির নির্ভুলতা যাচাই করা চলে, কিন্তু সংখ্যাগুলি বড় হলে যন্ত্রের সাহায্যে উত্তরের নির্ভুলতা বিচার করতে হবে। স্বচ্ছন্দে বলা যাবে আপনার উত্তর আর যন্ত্রের হিসাব একই হবে।

গণিত-জগতে কিছু সংখ্যা আছে, যাদের চেহারায় তেমন কোন বৈশিষ্ট্য নেই—কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে দাপট প্রচণ্ড। এই ধরণের একটি সংখ্যা হলো 142857143। এই 9 অঙ্কের সংখ্যাটি দিয়ে অন্য যে কোন 9 অঙ্কের সংখ্যার গুণফল প্রায় অবিশ্বাস্য দ্রুততার সঙ্গে করা সম্ভব। 1904 সালে আমেরিকায় আর্থার গ্রিফিথ নামে একজন অঙ্কের যাদুকর ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছে একবার ম্যাজিক দেখান। তিনি বোর্ডের উপর 142856143 লিখে একজন অধ্যাপককে আর একটি 9 অঙ্কের সংখ্যা লিখতে অনুরোধ করলেন। অধ্যাপক যখন বাঁ-দিক থেকে সংখ্যাটি লিখতে শুরু করলেন, তখন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গ্রিফিথ বাঁ-দিক থেকে গুণফলটি লিখতে আরম্ভ করলেন। সমবেত ছাত্রেরা একেবারে অবাক বিস্ময়ে ব্যাপারটি লক্ষ্য করেছিল। 1911 সালে মাত্র 31 বছর বয়সে গ্রিফিথ মারা যান এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি Marvelous Griffith নামে পরিচিত ছিলেন।

এই বিরাট আকারের গুণ মাত্র 30 সেকেণ্ডে কি করে যে কেউ করতে পারেন, তা ব্যাখ্যা করবার আগে আমি একটি নিতান্ত সহজ গুণ অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করবো। অঙ্কটি হলো—

1,00 000,000,1 × ABC, DEF, GHI,

আমি ABC, DEF, GHI দিয়ে একটি 9-অঙ্কের সংখ্যা বোঝাতে চাইছি। গুণ অঙ্কের অ-আ-ক-খ বিদ্যা নিয়ে যে কেউ যে উত্তরটি পাবেন, তা হলো—

ABC, DEF, GHI, ABC, DEF, GHI।

এবার চেহারায় নিতান্ত সাদাসিধা 142857143-কে যদি 7 দিয়ে গুণ করা যায়, তাহলে আমরা 1,00,000,000,1 পাব। তাহলে 142857143-কে সমান আকারের অন্য যে কোন সংখ্যা দিয়ে গুণ আসলে দ্বিতীয় সংখ্যাটিকে পাশাপাশি দু-বার লিখে 7 দিয়ে ভাগ করবার মত সহজ একটি প্রক্রিয়ায় এসে দাঁড়ালো; অর্থাৎ দ্বিতীয় সংখ্যাটি যদি 478,523,878 হয়, তাহলে পুরা অঙ্কটা দাঁড়াবে—

142857143 × 478,523,878

এবং এই সংখ্যা দুটির গুণফলকে যদি আমরা X দিয়ে চিহ্নিত করি, তাহলে X হবে—

478,523,878,478,523,878 ÷ 7-এর সমান। সোজা বাংলায় দ্বিতীয় সংখ্যাটি মনে মনে দু-বার পাশাপাশি রেখে 7 দিয়ে ভাগ দিন। ভাগশেষ কিছুই থাকবে না। যদি ভাগশেষ থাকে, তাহলে বুঝতে হবে ভাগ করতে কোথাও ভুল হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যাদুকর নিজে থেকে 142857143 লেখেন না—দর্শক-সেজে-বসা কোন সহকারী এই সংখ্যাটি দিয়ে যাদুকরকে সাহায্য করে থাকেন।

কিন্তু এই 142857143 দিয়ে ম্যাজিক দেখা-

বার একটা অসুবিধা আছে। যদি দ্বিতীয় সংখ্যাটি ঘটনার যোগাযোগে 7-দ্বারা বিভাজ্য হয়, কিংবা সংখ্যাটিতে যদি শুধু 7,14,21,42 ইত্যাদি সংখ্যার ক্রমাগত পুনরাবৃত্তি ঘটে, তাহলে গুণফলে একই অঙ্ক পর পর আসবে। তাছাড়া বাঁ-দিক থেকে গুণফল লিখতে আরম্ভ করলেই যে কোন বুদ্ধিমান দর্শক নিশ্চয়ই আন্দাজ করে নেবেন যে, আপনি গুণ করছেন না, ভাগ করছেন। সেই ক্ষেত্রে তাঁর পক্ষে একটু চেষ্টার দ্বারা ভাজকটি খুঁজে বের করতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হবে না। তাই ওয়ালেস লী নামক একজন অঙ্কের যাদুকর আর একটি সংখ্যা বের করেছেন, যা দিয়ে এই অসুবিধা এড়ানো যায়। ওয়ালেস লীর সংখ্যাটি হলো 2857143। আসলে প্রথম দুটি অঙ্ক বাদ দিলে আগের সংখ্যাটি থেকেই ওয়ালেস লীর সংখ্যাটি পাওয়া যাবে। এবার যে কোন 7-অঙ্কের একটি সংখ্যা চেয়ে নিন এবং অনুরোধ করুন গুণফল নির্ণয়ের সমস্যাটিকে জটিল করবার জন্যে 7-অঙ্কের সংখ্যাটির প্রত্যেকটি অঙ্ক যেন 4-এর চেয়ে বড় হয়। পরবর্তী আলোচনায় দেখাবো এই প্রক্রিয়ায় 4-এর বড় অঙ্কবিশিষ্ট সংখ্যা থাকলে সমস্যাটি তো কঠিন হয়ই না, বরং আরও অনেক সোজা হয়ে আসে।

সংখ্যা দুটির গুণ করবার পদ্ধতি অনেকটা আগের মতই, তবে 7 দিয়ে ভাগ করবার আগে দ্বিতীয় সংখ্যাটিকে 2 দিয়ে গুণ করে নিতে হবে। কারণ 2857143-কে 7 দিয়ে গুণ করলে পাওয়া যায় 20,000,001। কাজেই 20,000,001-কে ABC,DEF,G দিয়ে গুণ করলে গুণফল হবে—

2A2B2C2D2E2F2G ABC DEFG।

যদি দ্বিতীয় গুণকের প্রত্যেকটি অঙ্ক 4-এর বড় হয়, তাহলে নীচের পদ্ধতিতে দ্বিগুণ করে সঙ্গে সঙ্গে অতি সহজে উত্তরটি লেখা সম্ভব হবে।

ধরা যাক, দ্বিতীয় গুণকটি 6769869; অর্থাৎ পুরা অঙ্কটি হলো—

2857143 × 6769869

এর গুণফল নির্ণয় করতে হলে প্রথম অঙ্ক 6-কে দ্বিগুণ করে 1 যোগ দিন। হলো 13। 13-কে 7 দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল পেলেন 1 আর ভাগশেষ 6। গুণফলের প্রথম অঙ্ক বাঁ-দিক থেকে লিখুন 1। দ্বিতীয় অঙ্ক 7-কে দ্বিগুণ করে 1 যোগ দিয়ে পাবেন 15 এবং 1-এর জায়গায় আগের ভাগশেষ 6 বসিয়ে পেলেন 65। 65-তে 7 গেল 9 বার, ভাগশেষ রইলো 2। উত্তরের দ্বিতীয় অঙ্ক লিখুন 9। গুণকের তৃতীয় অঙ্ক 6-কে 2 দিয়ে গুণ করে 1 যোগ করলে পাবেন 13 এবং আগের নিয়মে 1-এর জায়গায় আগের ভাগশেষ বসালে 23 হবে। 7 দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল 3, ভাগশেষ 2। উত্তরের তৃতীয় অঙ্ক হবে তাহলে 3। এইভাবে 6769869-কে শেষ অঙ্ক পর্যন্ত একই কায়দায় গুণ করে 7 দিয়ে ভাগ করে যান এবং শেষ অঙ্ক 9-কে দ্বিগুণ করবার পর আর 1 যোগ দেবেন না। সর্বশেষ ভাগশেষ 2-কে নিয়ে আসুন সামনে এবং 26769869-কে 7 দিয়ে সাধারণভাবে ভাগ দিয়ে উত্তরটি লিখুন : 19342483824267। আপাতদৃষ্টিতে এই পদ্ধতিটি একটু গোলমেলে মনে হতে পারে; কিন্তু একটু ধৈর্য ধরে অভ্যাস করলেই নিয়মটি সহজে আয়ত্ত হয়ে যাবে। উপরের কায়দায় গুণ করবার পদ্ধতিটি যদি একটু মনোযোগ দিয়ে বিশ্লেষণ করা যায়, তাহলেই বুঝতে পারবেন দ্বিতীয় গুণকের প্রত্যেকটি অঙ্ক 4-এর চেয়ে বড় হওয়ার ব্যাপারটি কত সহজ হয়ে গেছে।

অঙ্কের যাদুকরেরা ঘনমূল (Cube root) এবং পঞ্চমমূল (Fifth root) অসামান্য দ্রুততার সঙ্গে করতে পারেন। বাস্তবিক পক্ষে এই খেলাও খুব সহজ এবং বর্তমান প্রবন্ধে শুধু ঘনমূল নির্ণয়ের কৌশলটি নিয়ে আলোচনা করবো। এই খেলাটি দেখাতে গেলে 1 থেকে 10-এর ঘন সংখ্যাগুলিকে (Cubes) মনে রাখতে হবে। মিনিট কয়েকের

চেষ্টায় নীচের টেবিলটি যে কেউ মনে রাখতে পারবেন।

অঙ্ক (x)	অঙ্কের 3য় ঘাত (x^3)
1	1
2	8
3	27
4	64
5	125
6	216
7	343
8	512
9	729
10	1000

এই টেবিলটি মন দিয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, 4,5,6 এবং 9-এর তৃতীয় ঘাতে মূল অঙ্কটি এসে হাজির হয়েছে; অর্থাৎ 64-এর শেষে 4 দেখলেই বলা যাবে 64-এর ঘন মূল হবে 4; অনুরূপ কারণে 125-এর 5, 729-এর 9 ইত্যাদি। তাহলে 4,5,6 এবং 9-এর তৃতীয় ঘাতের শেষ অঙ্কে যথাক্রমে 4,5,6 এবং 9 থাকবে এবং বাকী অঙ্কগুলির তৃতীয় ঘাতে এই অঙ্কগুলির কোন পুনরাবৃত্তি নেই বলে মনে রাখবার জন্যে কোনও রকম অসুবিধা দেখা দেবে না। বাকী 2,3,7 এবং 8-এর তৃতীয় ঘাতের মান দেখেও ঘনমূলটি বলে দেওয়া সহজ। কারণ 2-এর ঘনমান 8; এখন 10 থেকে এই ঘনমান 8 বাদ দিলে ঘনমূল 2 পাওয়া যাবে। 7-এর ঘনমান 343। 343-এর শেষ অঙ্ক 3 এবং 10 থেকে 3 বাদ দিলে ঘনমূল 7 পাওয়া যায়। অনুরূপে 512-এর ঘনমূল 8; কারণ 10−2=8।

এবার কেউ যদি আপনাকে 912673-এর ঘনমূল নির্ণয় করতে বলে, তাহলে শেষের তিনটি অঙ্ক 673 বাদ দিয়ে 912 নিয়ে চিন্তা করুন। টেবিল থেকে দেখা যাচ্ছে 912 হলো 9-এর ঘনমান 729-এর বড় এবং 10-এর ঘনমান 1000-এর ছোট! তাহলে 912-এর ঘনমূল 9-এর বড় এবং 10-এর ছোট। আপনি ছোট অঙ্কটি বেছে নিন; অর্থাৎ উত্তরের প্রথম অঙ্ক হবে 9। এর পরে দেখুন 673-এর শেষ অঙ্কটিতে রয়েছে 3। কাজেই উত্তরের দ্বিতীয় অঙ্ক হলো 10−3=7; অর্থাৎ 912673-এর ঘনমূল হবে 97। দ্বিতীয় একটি উদাহরণ নিন। 91125-এর ঘনমূল কত? শেষ তিনটি অঙ্ক 125 বাদ দিলে থাকে 91 এবং 91 হলো 4 আর 5 এর ঘনমানের মধ্যবর্তী কোন একটি সংখ্যা। তাহলে উত্তরের প্রথম অঙ্ক হবে 4 এবং যেহেতু 115-এর শেষে রয়েছে 5, তাই উত্তরের দ্বিতীয় অঙ্ক হবে 5; অর্থাৎ 91125-এর ঘনমূল হলো 45।

1968 সালের 12-ই জুন কি বার—প্রশ্ন করতেই যাদুকর জবাব দিলেন বুধবার। এই সাল-তারিখের খেলা অঙ্কের যাদুকরদের আর একটি অত্যন্ত প্রিয় প্রোগ্রাম। এই খেলাটি দেখিয়ে দর্শকদের প্রায় অবাক করে দেওয়া যায়। এই ম্যাজিকটি দেখাতে হলে আপনাকে আর একটি সূত্রের টেবিল মনে রাখতে হবে। সাধারণভাবে প্রত্যেকটি মাসের জন্যে একটি করে সাঙ্কেতিক অঙ্ক আছে। বছরের বারোটি মাসের জন্যে এই সাঙ্কেতিক অঙ্কগুলি হলো যথাক্রমে 144, 025, 036, 146। এই সাঙ্কেতিক অঙ্কগুলি মনে রাখবার জন্যে ওয়ালেস লীর সূত্রটি নীচে দেওয়া হলো:

মাস	সাংকেতিক অঙ্ক	সূত্র
জানুয়ারী	1	A FIRST MONTH
ফেব্রুয়ারী	4	A COLD (চার অক্ষর) MONTH
মার্চ	4	THE KITE (চার অক্ষর) MONTH
এপ্রিল	0	ON APRIL FOOL'S DAY 1 FOOLED NO BODY
মে	2	MAY DAY IS TWO WORDS.
জুন	5	THE BRIDE (পাঁচ অক্ষর) MONTH
জুলাই	0	ON JULY 4 I FIRE NO FIRE CRACKERS.
অগাষ্ট	3	A HOT (তিন অক্ষর) MONTH
সেপ্টেম্বর	6	START OF AUTUMN (ছয় অক্ষর)
অক্টোবর	1	A WITCH RIDES ONE BROOM
নভেম্বর	4	A COOL (চার অক্ষর) MONTH
ডিসেম্বর	6	BIRTH OF CHIRST (ছয় অক্ষর)

এই টেবিলটিকে সম্বল করে সাল-তারিখ-বারের খেলাটি দু-একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যাক। প্রশ্ন—1947 সালের 15ই অগাষ্ট কি বার ছিল? প্রদত্ত সালের শেষ অঙ্ক দুটি 47-কে 12 দিয়ে ভাগ দিন। ভাগফল 3, ভাগশেষ 11; অবশিষ্ট 11-কে 4 দিয়ে ভাগ দিন। ভাগফল হলো 2। এখন প্রথম ভাগফল 3, প্রথম ভাগশেষ 11 আর দ্বিতীয় ভাগফল 2 যোগ দিন। যোগফল 16-কে 7 দিয়ে ভাগ দিয়ে শুধু ভাগশেষ 2 মনে রাখুন। এবার 2-এর সঙ্গে মাসের তারিখ আর প্রদত্ত মাসের সাংকেতিক যোগ দিন। তাহলে 2+15+3=20 পাবেন। 20 কে 7 দিয়ে ভাগ দিন। ভাগশেষ রইলো 6। এখন শনিবারকে 0 (শূন্য) ধরে পর পর ছ-টা দিন গুণে আসুন। তাহলে 1947 সালের 15ই অগাষ্ট ছিল শুক্রবার। আরেকটা উদাহরণ নিন—1937 সালের 14ই মার্চ। 37-কে 12 দিয়ে ভাগ করুন। ভাগফল 3, ভাগশেষ 1; 1-কে 4 দিয়ে ভাগ যায় না; তাই আপনি মনে মনে হিসাব করুন 3+1+0=4। 4-কে 7 দিয়ে ভাগ যায় না; তাই 4-এর সঙ্গে মাসের তারিখ আর সাংকেতিক অঙ্ক যোগ দিয়ে পেলেন 4+14+4=22। 7 দিয়ে ভাগ দিন। ভাগশেষ রইলো 1; তাহলে দিনটি ছিল রবিবার। একটু অভ্যাস হয়ে গেলে 7 দিয়ে ভাগ দেবার ব্যাপারটিকে আরও সহজ করে ফেলা যায়। যেমন—তারিখটি যদি 24 কিংবা 9 বা অন্য কিছু হয়, তাহলে মাসের সাংকেতিক অঙ্কের সঙ্গে মাসের তারিখ যোগ না করে আপনি 3 (24−21=3) বা 2 (9−7) যোগ দিতে পারেন। যাহোক, অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে হিসেব করবার ক্ষমতাটি বেশ বেড়ে যায়। এভাবে 7 বাদ দিয়ে অঙ্ক করবার পদ্ধতি-কে অঙ্কশাস্ত্রবিদেরা বলে থাকেন Modulo-7!

আর বছরটা যদি লিপ ইয়ার হয়, আর মাসটা যদি জানুয়ারী কিংবা ফেব্রুয়ারী হয়, তাহলে অবিকল একইভাবে অঙ্ক করে গিয়ে একদিন বাদ দিয়ে বারটা হিসেব করুন। লিপ

ইয়ারের অন্যান্য মাসের জন্যে আর কোন পরিবর্তনের দরকার নেই। গ্রেগরিয়ান কালপঞ্জী অনুযায়ী শতাব্দীসূচক সালগুলিকে তখনই লিপ ইয়ার বলে ধরা হবে, যখন সালটি 400 দিয়ে বিভাজ্য হবে। এই হিসেবে 1900 লিপ ইয়ার নয়, কিন্তু 2000 লিপ ইয়ার।

প্রসঙ্গতঃ বলে রাখা দরকার যে, বর্তমান পদ্ধতিটি দিয়ে শুধু এই শতকের বার নির্ণয় করা যাবে। অন্যান্য শতাব্দীর বার নির্ণয় করতে গেলে আবার কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন। যেমন উনিশ শতকের জন্যে আপনাকে দু-দিন এগোতে হবে এবং একবিংশ শতাব্দীর জন্যে একদিন পেছিয়ে আসতে হবে। তবে উনিশ শতক ছাড়িয়ে আর পেছনে না যাওয়াই ভাল, কারণ 1752 খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় গ্রেগরিয়ান কালপঞ্জীর ব্যবহার আরম্ভ হয়। সেপ্টেম্বরের 4 তারিখের পর 11 দিন বাদ দিয়ে পরের দিনটিকে 15 তারিখ বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। ইউরোপের অন্যান্য দেশে এই কালপঞ্জীর সংস্কার করা হয়েছিল 1582 সালে। তাই হিসেবে যথেষ্ট সংশয়ের অবকাশ থাকতে পারে বলে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ম্যাজিকটিকে টেনে না যাওয়াই ভাল।

ভারতের শকুন্তলা দেবীর বার নির্ণয়ের পদ্ধতিটি উল্লিখিত নিয়মের চেয়ে একটু আলাদা। শকুন্তলা দেবীও বছরের বারোটি মাসের জন্যে একই সাঙ্কেতিক অঙ্ক 144, 025, 036, 146 ব্যবহার করে থাকেন। তবে তাঁর অঙ্ক কষবার নিয়মটি একটু অন্য রকম। 1967 সালের 28শে জানুয়ারী কি বার ছিল—শকুন্তলা দেবীর নিয়মে নির্ণয় করা যাক। প্রদত্ত সালের শেষ দুটি অঙ্ক 67 নিন। তার সঙ্গে 67-এর চার ভাগের এক ভাগ 16, মাসের তারিখ 28 আর সেই মাসের সাঙ্কেতিক অঙ্ক 1 যোগ দিন। যোগফল 112-কে 7 দিয়ে ভাগ দিন। ভাগশেষ রইলো 0। তাহলে দিনটি ছিল শনিবার।

উনবিংশ শতকে নানা লোকে বার নির্ণয়ের বিভিন্ন পদ্ধতি উদ্ভাবন করলেও খুব সম্ভব লুই ক্যারলই সর্বপ্রথম এই বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন (Nature, Vol 35, March 31, 1887, P. 517)। ক্যারলের পদ্ধতিতে অনেকাংশে বর্তমান পদ্ধতির মতই এবং তাঁর ধারণা, যে কেউ চেষ্টা করলেই 20 থেকে 30 সেকেণ্ডের মধ্যে এই খেলাটি দেখাতে পারেন; তবে শকুন্তলা দেবী সেকেণ্ড কয়েকের বেশী সময় নেন না।

বিপরীত-কণা

অরবিন্দ দাশ*

বিপরীত-কণা (Anti-particle) বলতে আমরা স্বাভাবিক যে কোনও কণার সম্পূর্ণ অনুরূপ বিপরীত কণা (Counter part of a particle) বুঝি। বিপরীত-কণার আবিষ্কার পরমাণু-জগতে আলোড়ন এনেছে। অনেক জটিল তত্ত্বের সমাধান সম্ভব হয়েছে। অনেক তত্ত্ব জটিল হয়েছে। আজ প্রশ্নও উঠছে, বিপরীত-কণা মানুষের বন্ধু, না শত্রু?

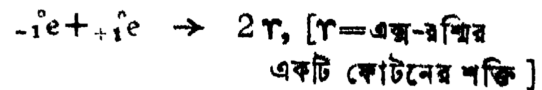
পরমাণুতে যে ইলেকট্রন (ঋণাত্মক তড়িৎযুক্ত কণা), প্রোটন (ধনাত্মক তড়িৎযুক্ত কণা) ও নিউট্রন (তড়িৎ-বিহীন একক ভরবিশিষ্ট কণা) রয়েছে, একথা আজ আর নূতন নয়। পরমাণুর এই উপাদান কণাগুলি নিয়ে নানাপ্রকার গবেষণা হয়েছে। ইলেকট্রন নিয়ে গবেষণাকালে (1928) পি. এ. এম. ডিরাাক আপেক্ষিক তরঙ্গবাদে তত্ত্বীয়ভাবে এক গুরুতর তথ্য পরিবেশন করেন। আইনষ্টাইনের ভর-শক্তি সমীকরণ, $E=mc^2$ অনুসারে আলোচ্য ক্ষেত্রে ডিরাাক দেখলেন মোট-শক্তি, E_t-র জন্যে নিম্নলিখিত দু-প্রকার সমাধান সম্ভব :

$$E_t \geq +mc^2 \text{ অথবা } \leq -mc^2,$$

যেখানে $m=$ ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রনের ভর, $c=$ আলোর গতিবেগ। সুতরাং আঙ্কিক দিক থেকে ধনাত্মক ইলেকট্রন কণার (ইলেকট্রনের ভরযুক্ত কিন্তু বিপরীতভাবে আহিত) অস্তিত্ব সম্ভব।

1932 সালের কথা। কার্ল অ্যাণ্ডারসন তখন মিলিকানের সঙ্গে মহাজাগতিক রশ্মির (Cosmic rays) ধর্ম অনুশীলন করছিলেন। এই প্রকার রশ্মিকে উইলসনের মেঘ-কক্ষে (Wilson's cloud chamber) শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে এমন কিছু কুয়াশা-মার্গ (Fog tracks) পাওয়া গেল। তাদের বক্রতা পরিমাপ করে দেখা গেল যে প্রকার কণা এই কুয়াশা-মার্গ গঠন করেছে, তাদের ভর ইলেকট্রনের ভরের সমান, কিন্তু আধান ইলেকট্রনের বিপরীত। সত্যই ডিরাক-বর্ণিত কণার সন্ধান পাওয়া গেল! এই সকল কণাকে বিপরীত-ইলেকট্রন বা পজিট্রন ($^{0}_{+1}e$) বলা হয়েছে। গ্যাসীয় অণুর সঙ্গে মহাজাগতিক রশ্মির ধাক্কায় এই জাতীয় কণার সৃষ্টি হয়। বিপরীত কণার কথা যিনি প্রথম বলেছিলেন ও যিনি গবেষণাগারে এর অস্তিত্ব প্রমাণ করলেন—সেই ডিরাক ও অ্যাণ্ডারসন—উভয়েই পৃথিবীর সেরা বিজ্ঞানীদের প্রাপ্য শ্রেষ্ঠ সম্মান নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

ইলেকট্রন ও পজিট্রন—এই কণাযুগলের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো—কাছাকাছি হলেই নিজেদের পারস্পরিক অপমৃত্যু; অর্থাৎ কণা তার বিপরীত কণার সংস্পর্শে এলেই বিলীন (Annihilation) হয়ে যায় এবং পরিবর্তে তুল্যাঙ্ক (Equivalent) পরিমাণ শক্তি পাওয়া যায়। প্রমাণিত হয়েছে, প্রায় 10^{-10} সেকেণ্ড সময়ের মধ্যেই একটি পজিট্রন একটি ইলেকট্রনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এক্স-রশ্মির দুটি ফোটনে রূপান্তরিত হতে পারে।



$$^{0}_{-1}e + ^{0}_{+1}e \rightarrow 2\gamma,$$ [$\gamma=$ এক্স-রশ্মির একটি ফোটনের শক্তি]

উল্লিখিত ঘটনার বিপরীত ঘটনাও মহাজাগতিক রশ্মির পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করা গেছে; অর্থাৎ উপযুক্ত পরিমাণ শক্তি (প্রায়

---

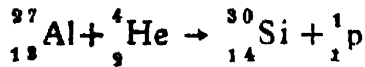
* রসায়ন বিভাগ—রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক মহাবিদ্যালয়; নরেন্দ্রপুর, 24 পরগণা।

1 Mev [1]) থেকে একজোড়া ইলেকট্রন ও পজিট্রন সৃষ্ট হওয়া সম্ভব। কাজেই যে কোনও কণা-বিপরীত-কণা যুগলের জন্যে আমরা লিখতে পারি—

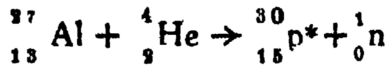
কণা + বিপরীত-কণা → শক্তি;

বিপরীত ক্রমে, শক্তি → কণা + বিপরীত-কণা।

কেবলমাত্র মহাজাগতিক রশ্মির দ্বারাই পজিট্রনের সৃষ্টি হয় না; মৌলের কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষাকালে আইরিন কুরী জোলিও ও ফ্রেডারিক জোলিও (1934) নিম্নলিখিত কেন্দ্রীন বিক্রিয়ার দ্বারা পজিট্রন নির্গমন দেখিয়েছেন। অ্যালুমিনিয়ামের $\left(^{27}_{13}Al\right)$ উপর আলফা রশ্মির দ্বারা আঘাত করলে প্রোটন ও নিউট্রন উৎপন্ন হয়—



$$^{27}_{13}Al + ^{4}_{2}He \rightarrow ^{30}_{14}Si + ^{1}_{1}p$$



$$^{27}_{13}Al + ^{4}_{2}He \rightarrow ^{30}_{15}P^{*} + ^{1}_{0}n$$

স্পষ্টতঃই আলফা রশ্মির উৎস সরালে প্রোটন ও নিউট্রন নির্গমন বন্ধ হবে; কিন্তু জোলিও দম্পতি দেখলেন, এই অবস্থায় অ্যাণ্ডারসন-বর্ণিত পজিট্রন কণার নির্গমন বেশ কিছুক্ষণ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এই ঘটনা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাঁরা বলেন, আবিষ্ট তেজস্ক্রিয় প্রক্রিয়ায় আল্ফা-কণারূপে অ্যালুমিনিয়ামকে আহত (Irradiate) করলে প্রথমে তা অস্থায়ী মৌল সমস্থানিক তেজস্ক্রিয় ফস্ফরাসে $\left(^{30}_{15}P^{*}\right)$ পরিণত হয়। পরে তা পজিট্রন নিঃসরণ (Emission) করে ও সিলিকনের স্থায়ী সমস্থানিকে পরিবর্তিত হয়—



$$^{30}_{15}P^{*} \rightarrow ^{30}_{14}Si + ^{0}_{+1}e$$

এইভাবে বিপরীত-ইলেকট্রন সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহ রইলো না।

ডিরাকের মোট শক্তির সমীকরণ সকল মুক্ত-কণার (Free particles) ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যাদের ঘূর্ণনমাত্রা (Spin value)

$=\frac{1}{2}, \frac{h}{2\pi}$, h = প্লাঙ্ক ধ্রুবক। এরূপ কণার প্রত্যেকেরই তাই বিপরীত-কণা থাকবে। বিপরীত-প্রোটন (Anti-proton)-এর কথা ধরা যাক। আমরা দেখেছি, ইলেকট্রন-পজিট্রন কণা যুগলের সৃষ্টির জন্যে প্রায় 1 Mev শক্তির প্রয়োজন; অতএব, প্রোটন ও বিপরীত-প্রোটন—এই কণাদ্বয় সৃষ্টির জন্যে প্রায় 1836 Mev পরিমাণ শক্তি লাগবে। [একটি প্রোটন একটি ইলেকট্রন অপেক্ষা প্রায় 1836 গুণ ভারী।] প্রোটন-প্রোটন সংঘর্ষের (Collision) দ্বারা একটি বিপরীত-প্রোটন উৎপন্ন হবার সমীকরণ নিম্নলিখিতভাবে লেখা হয়—

$$p^{+} + p^{+} \rightarrow (p^{+} + p^{+}) + (p^{+} + \bar{p}),$$

এক্ষেত্রে p^{+} = স্বাভাবিক প্রোটন, $\bar{p}$ = বিপরীত-প্রোটন। বিপরীত-প্রোটনের আধান প্রোটনের আধানের সমান, কিন্তু বিপরীত মানের ভর অবশ্য উভয় কণার একই। 1955 সালে ক্যালিফোর্নিয়ার গবেষণাগারে বিভাট্রন (Bevatron) নামক যন্ত্র থেকে প্রায় 6 Gev[2] যান্ত্রিক শক্তিবিশিষ্ট ত্বরিত প্রোটন-কণা ধাতুর উপর আঘাতের দ্বারা যে সকল কণা উৎপন্ন হয়, তাদের বিশ্লেষণ করে বিপরীত-প্রোটনের অস্তিত্ব প্রমাণ করা গেছে। কণার ধাতুকে লক্ষ্যবস্তু (Target) হিসাবে ব্যবহার করে $p^{+} : \bar{p}$—এই কণাযুগলের সৃষ্টি ও তাদের পারস্পরিক অপমৃত্যু উভয়ই পরীক্ষা করা হয়েছে। এই আবিষ্কারের কৃতিত্ব যাঁদের, তাঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হলেন নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানীদ্বয়—সেগ্রে ও চেম্বারলেন।

---

1. 1 Mev = 1 মিলিয়ান ইলেকট্রন ভোল্ট = $1{\cdot}6 \times 10^{-6}$ আর্গ

* অস্থায়ী সমস্থানিককে এই চিহ্ন দ্বারা দেখানো হয়েছে।

2. 1 Gev = 1 giga electron volt = $1{\cdot}6 \times 10^{-3}$ আর্গ।

বিপরীত-প্রোটন নিয়ে নানা প্রকার পরীক্ষা চালানো হয়েছে। এই জাতীয় কণা তরল হাইড্রোজেনে প্রবেশ করালে প্রায় 0.3% সংঘর্ষের দ্বারা নিম্নলিখিত বিক্রিয়া ঘটে :



$$\bar{p}+p^{+} \rightarrow n^{0}+\bar{n},$$

এই সমীকরণে n^0 = স্বাভাবিক নিউট্রন, $\bar{n}$ = বিপরীত-নিউট্রন (Anti-neutron)। বিপরীত-নিউট্রন, নিউট্রনের সঙ্গে বিলীন হয়ে যে শক্তি উৎপন্ন করে, তার স্ফুরণ গণক যন্ত্রে (Scintillation counter) পরীক্ষার দ্বারা জানা গেছে। বস্তুতঃ 1955 সালে বিপরীত-প্রোটন বিশ্লেষণকালে নিউট্রনকে বিলীন করতে সক্ষম—এরূপ কণা উৎপন্ন করা গিয়েছিল। পরের বছর বুদ্বুদ-কক্ষে (Bubble chamber) পরীক্ষাকালে এই কণা সম্বন্ধে নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেল।

উল্লিখিত বিপরীত-কণা ছাড়াও বিপরীত-মেসন (Anti-meson), বিপরীত-নিউট্রিনো (Anti-neutrino), বিপরীত-হাইপারন (Anti-hyperons) প্রভৃতি সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া গেছে। এক জাতীয় বিপরীত-কণা অন্য জাতীয় বিপরীত-কণাকে বিলীন করতে পারে না; তাই বিপরীত-নিউক্লিয়নের (Anti-nucleon) কথা বিজ্ঞানীরা চিন্তা করেছেন। বিপরীত-নিউক্লিয়ন হলো ঋণাত্মক তড়িদাহিত বিপরীত-পরমাণুর (Anti-atom) কেন্দ্রক, যেখানে বিপরীত-পরমাণুর মোট বিপরীত-নিউট্রন সংখ্যা ও বিপরীত-প্রোটন সংখ্যা পুঞ্জীভূত আছে। বস্তুতঃ বিপরীত-ডয়টেরন (ডয়টেরন হলো Deuterium বা ভারী হাইড্রোজেনের কেন্দ্রক) গবেষণাগারে প্রস্তুত করা হয়েছে। 1965 সালে প্রথম বিপরীত-নিউক্লিয়ন সৃষ্টি করে যিনি ঐতিহাসিক সাফল্য অর্জন করেছেন, তিনি হলেন—কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক লেডারম্যান (Prof. Lederman)। ব্রুকহেভেন জাতীয় গবেষণাগারে পরমাণুপেষক কসমোট্রন (Atom-smasher cosmotron) নামক যন্ত্র থেকে প্রায় 30 Gev শক্তি প্রয়োগে এরূপ নিউক্লিয়ন গঠন করা সম্ভব হয়েছে। এই বিপরীত-নিউক্লিয়নটিতে আছে একটি বিপরীত-প্রোটন ও একটি বিপরীত-নিউট্রন।

এই ধারণাকে একটু বাড়িয়ে নিলে আমরা যে কোনও পরমাণুর জন্যে বিপরীত-পরমাণুর কথা চিন্তা করতে পারবো। পরমাণুর গঠন সম্বন্ধে এখন আমাদের যে ধারণা আছে, তাথেকে বলতে পারা যায়—প্রোটন ও নিউট্রন কণাসমূহ কেন্দ্রক গঠন করে, আর এই কেন্দ্রকের বাইরে ঘুরতে থাকে প্রোটনের সংখ্যার সমান সংখ্যক ইলেকট্রন; অর্থাৎ বিপরীত-পরমাণুর বেলায় তার কেন্দ্রে থাকবে বিপরীত-প্রোটন, ও বিপরীত-নিউট্রন আর এই কেন্দ্রকের বাইরের খোলে থাকবে ঘূর্ণায়মান পজিট্রনসমূহ। উদাহরণস্বরূপ, অক্সিজেন পরমাণুর ($^{16}_{8}O$) কথা ধরা যাক। আমরা জানি, এই মৌলের কেন্দ্রে আছে আটটি করে প্রোটন ও নিউট্রন এবং তার চারধারে আছে আটটি ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রন। তাহলে বিপরীত-অক্সিজেন (Anti-oxygen) পরমাণুর কেন্দ্রে থাকবে আটটি করে বিপরীত-প্রোটন ও বিপরীত-নিউট্রন (কেন্দ্রক হবে ঋণাত্মক তড়িতাধান যুক্ত) এবং এই কেন্দ্রকের বাইরে ঘুরতে থাকবে আটটি পজিট্রন। এই বিপরীত-অক্সিজেন পরমাণু যদি কোনও ক্রমে সাধারণ অক্সিজেন পরমাণুর সংস্পর্শে আসে, তবে তারা উভয়েই বিলীন হবে আর উদ্ভব হবে দুটি পরমাণুর ভরের তুল্যাঙ্ক পরিমাণ শক্তির। এভাবে পর্যায়সারণীর প্রত্যেক মৌল-পরমাণুর জন্যে বিপরীত-পরমাণুর কথা বলা যেতে পারে। বিপরীত-পরমাণু সম্ভব হলে বিপরীত-অণুর কথাও কল্পনা করা যেতে পারে। বৃহৎ থেকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে তবে আমরা বিপরীত-বিশ্বের (Anti-world) কথা বলতে পারি। সেই বিশ্বের যে

কোনও একজন বাসিন্দা মিঃ এক্সের কল্পনা করাও ভুল হবে না। আমাদের বিশ্বের মি. এক্সের সম্পূর্ণ অনুরূপ হবেন, তবে ইনি যদি বিপরীত-মি. এক্সের (Anti-Mr. X) সঙ্গে করমর্দন করতে যান, তবেই বিপদ। তাঁদের দু-জনার পরিবর্তে পাওয়া যাবে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ-সহ শক্তির ঝলক।

বিশ্বে যত কণা আছে তত বিপরীত-কণাও আছে, আর যদি তাদের পরস্পর মিলন হয়, তবে বেরিয়ে আসবে পর্যাপ্ত শক্তি—ডিরাকের তত্ত্বের এই যে ধারণা. এর সম্বন্ধে বেশ কিছু আভাস বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যেই পেয়েছেন। মহাকাশের কিছু কিছু ছায়াপথ, নীহারিকা ইত্যাদির বিস্ফোরণসহ অবলুপ্তি তাদের বিপরীত-বস্তুর (Anti-matter) সংঘর্ষের দ্বারাই ঘটা সম্ভব, জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। 1908 সালে জুনের শেষে সাইপ্রাসে যে অস্বাভাবিক বিস্ফোরণ হয়েছিল, তার তদন্ত করতে গিয়ে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত আমেরিকার বিজ্ঞানী লিবি (Libby) প্রমাণ করেছেন—এই বিস্ফোরণ বিপরীত-উল্কাপিণ্ডের (Antirock meteorite) দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। বিজ্ঞানীমহলে বিপরীত-কণার ব্যবহার সম্বন্ধে বিভিন্ন জল্পনা-কল্পনা চলছে। আমেরিকান পদার্থবিদ্ এডওয়ার্ড ম্যাকমিলান ও অন্যান্যেরা বিপরীত-কণার দ্বারা চালিত মহা-জাগতিক রকেটের (Cosmic rocket) কথা উল্লেখ করেছেন। এই রকেটের ইঞ্জিনে কণা ও বিপরীত-কণার সংঘর্ষে প্রভূত শক্তি উৎপন্ন হবে এবং সেই শক্তি নিয়ন্ত্রিত করে দিলে রকেটটি মহাকাশে আলোর সমান গতিবেগে চলবে। তার ফলে মহাকাশের যে কোনও গ্রহ বা নক্ষত্রে খুব সহজেই যাওয়া যাবে এবং আজকের মহাকাশ অভিযানের সার্থক রূপায়ণ সেদিনই হবে। আজ আমরা চাঁদে যাচ্ছি—সেদিন আমরা 1,500,000 আলোকবর্ষ দূরে অ্যাণ্ড্রোমিডা (Andromeda) ছায়াপথে বেড়িয়ে আসতে হয়তো বা যাব—এরূপ সম্ভাবনার কথাও উল্লেখ করেছেন বিজ্ঞানী ম্যাকমিলান। এই সংবাদ শুনে নিশ্চয়ই আমাদের শিহরণ ও পুলক জাগে। কণা ও বিপরীত-কণা মিলিত হলেই বিস্ফোরণ হয়—এই ধারণা নিয়েই মহাজাগতিক বোমার (Cosmic bomb) কথাও ভেবেছেন কেউ কেউ। এই বোমার ভিতরে পৃথক পৃথকভাবে কণা ও বিপরীত-কণার উৎস থাকবে এবং এমন ব্যবস্থা করা হবে, যাতে ঠিক বিস্ফোরণের আগে তারা মিলিত হয়। এই জাতীয় বিস্ফোরণের প্রতিক্রিয়া যে অকল্পনীয় ভয়াবহ হবে, তাতে আর সন্দেহ কি। এই জাতীয় বোমায় যে পরিমাণ কণা ও বিপরীত-কণা থাকবে, তার 100%-ই শক্তিতে রূপান্তরিত হবে, তাই কয়েক টন বিপরীত-কণা হলেই এক নিমেষে পৃথিবীকে নিশ্চিহ্ন করা যেতে পারে। এভাবে বিপরীত-কণার আবিষ্কার মহাজাগতিক রকেটের সম্ভাবনার দ্বারা অজানাকে জানবার যেটুকু সুযোগ এনে দেয়, মহাজাগতিক বোমার ধ্বংসাত্মক রূপ আমাদেরকে আবার বহুগুণ স্তিমিত করে দেয়। তাহলে আমরা আবার সেই একই প্রশ্নের সম্মুখীন—বিপরীত-কণা আবিষ্কার মানুষের পক্ষে কল্যাণকর, না অভিশপ্ত?

আলোক-গতির বেশী

সৌম্যেন্দ্রনাথ গুহ

মহাশূন্যে পৃথিবীর গতিবেগ কত? এই প্রশ্নটির উত্তর দিতে গিয়ে বৈজ্ঞানিকেরা মৌলিক কয়েকটি পরীক্ষার অবতারণা করেন। যুক্তরাষ্ট্রের A. Michelson ও E. Morley দুটি আলোক-কিরণ নিয়ে পরীক্ষা সুরু করেন। তাঁরা পৃথিবীর গতির দিকে একটি কিরণ এবং অপরটি বিপরীত দিকে ব্যবহার করেন। সাধারণ আপেক্ষিক গতিবেগ থেকে আমরা জানি যে, যদি কোন গতিশীল স্থানের গতিবেগ x হয় এবং ঐ স্থান থেকে যদি কোন বস্তু একই দিকে y গতিবেগে নিক্ষিপ্ত হয়, তবে বস্তুটির সংহত গতিবেগ $Z = x + y$ হয়। কিন্তু Morley এবং Michelson বিস্মিত হয়ে দেখলেন যে, একই দিকের এবং বিপরীত দিকের আলোক-কিরণ দুটির সংহত গতিবেগ একই রয়ে গেল! ঘটনাটা খুব সাধারণ নয়। কারণ আলোকের গতিবেগের এই অদ্ভুত ব্যবহার সোজাসুজি গ্যালিলিও ও নিউটনের বলবিজ্ঞার এতদিনকার তত্ত্বকেই চরম আঘাত করে বসলো। আলোক-কিরণের এই আশ্চর্য ব্যবহারের কারণ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত শোনা গেল। কিন্তু অ্যালবার্ট আইনস্টাইন 1905 সালে তাঁর আপেক্ষিকতা তত্ত্বের মাধ্যমে পুরনো ধ্যানধারণা আর সুপ্রচলিত গণিতশাস্ত্রের সমস্ত চিন্তাকে পাল্টে দিলেন। স্থান-কালের পুরনো ধারণায় আলোড়ন এনে তিনি বললেন—আলোক-তরঙ্গের চেয়ে অধিকতর গতিবেগসম্পন্ন বস্তুকণার অস্তিত্ব সম্ভব নয়, নচেৎ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের মূল নিয়মগুলি অগ্রাহ্য করা হয়। তিনি সিদ্ধান্তে এলেন যে, আলোকের গতিবেগ একটি ধ্রুবক এবং সম্ভাব্য সর্বোচ্চ গতিবেগ। সুবিখ্যাত Lorentz-এর নিয়ম দেখায় যে, কোনও বস্তু-স্থিত ভর যদি m_o হয় এবং তার গতিবেগ ও গতি-ভর যদি যথাক্রমে v ও m_v হয়, তবে—

$$m_v = \frac{m_o}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

যেখানে c হলো আলোকের গতিবেগ। কোনও বস্তুকণার v যত বাড়বে m_v তত বাড়বে। কিন্তু যখন $v = c$ হবে, তখন $m_v = \infty$ হয়ে যাবে, যা অসম্ভব। আবার v যদি c-এর চেয়ে বেশী হয়, তখন ডানদিকের হর কাল্পনিক সংখ্যায় পরিণত হয়। কাজেই আপেক্ষিতা তত্ত্বানুযায়ী আলোকের গতিবেগ শুধু ধ্রুবক নয়, গতিবেগের উচ্চতম সীমা—যাকে পেরিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে একটি লিমেরিক তৈরিও হয়ে গেল—

স্বাতী নামে একটি মেয়ে মামাবাড়ী যেতে
'আইনস্টাইন এক্সপ্রেসে' চড়ে রওনা হলো পথে;
আলোর চেয়েও বেশী জোরে
আজ সকালে গাড়ী চড়ে
আনন্দেতে পৌঁছলো সে গতকাল রাতে!

কার্যক্ষেত্রেও সত্যই দেখা গেল, পারমাণবিক বস্তুকণার গতিবেগ আলোকের গতিবেগের কাছাকাছি গেলেও তা পেরিয়ে যেতে পারছে না। কিন্তু সাধারণ নিয়মানুযায়ী বস্তুর গতিশক্তি বৃদ্ধি করে তার গতি বৃদ্ধি করা সম্ভব। এই সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালালেও আইনস্টাইনের নিয়মকেই গ্রহণযোগ্য বলে ধরলেন। আলোকের ক্ষেত্রে গ্যালিলিও স্থানাঙ্ক পরিবর্তনের নিয়মও (Galilean law of transformation of co-ordinates) খাটলো

না। গতিবেগের বেড়া হিসাবে আলোক-গতি $c=3\times10^8$ মিটার/সেকেণ্ড থেকে গেল।

কিন্তু তবুও একটি প্রশ্ন থেকেই গেল। Limit-এর সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী

$$\underset{v\to c}{Lt}\ \frac{m_o}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

বললে কিছুই বোঝায় না। কারণ v, c-এর কাছাকাছি ঠিক কথা। কিন্তু v কম থেকে বেশী হয়ে c-এর সমান চলেছে, না বেশী থেকে কম হয়ে c-এর সমান হতে চলেছে, সেটা দেখতে হবে; অর্থাৎ v এবং m_o রেখচিত্র continuous বা discontinuous হোক, তার বাঁ-দিক ও ডানদিক চরিত্র থাকবেই। ব্যাপারটা গাণিতিক যুক্তি (Mathematical logic), কঠিন মনে হলেও অর্থাৎ c-এর সমান না হতে, পারলেও c-এর চেয়ে কম গতিবেগসম্পন্ন বস্তুকণা থাকলে c-এর চেয়ে বেশী গতিবেগ-সম্পন্ন বস্তুকণা থাকা সম্ভব; অর্থাৎ এই সম্বন্ধে আইনস্টাইনকে চরম বলে বৈজ্ঞানিকেরা ধরে নিলেন না। প্রথম দৃষ্টিতে ব্যাপারটাকে অসম্ভব বলে মনে হলেও এর সম্ভাব্যতা দূর হলো না।

নিউ ইয়র্কের ভারতীয় নবীন বিজ্ঞানী ই. সি. জি. সুদর্শন এই বিষয়ে কিছু আলোকপাত করেছেন। তিনি কিছু বস্তুকণার অস্তিত্বের কথা বলেছেন, যার গতিবেগ আলোক-গতির চেয়েও বেশী। যদিও সুদর্শন এর চরিত্র ও ব্যবহার সম্বন্ধে যথেষ্ট নিশ্চিত নন, তবে আইনস্টাইনের তত্ত্বের পরবর্তী অধ্যায়ে এই বস্তুকণাগুলি বহু গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে পারে। এগুলিকে বলা হয় ট্যাকিয়ন (Tachyon)। আমরা সমগ্র বস্তুজগৎকে গতিবেগের বিশেষত্বে তাহলে তিন ভাগে ভাগ করতে পারি।

(1) সাধারণ বস্তুকণা, যার গতিবেগ আলোক-গতির কম; অর্থাৎ $v<c$;

(2) যে বস্তুকণার গতিবেগ আলোক-গতির সমান; অর্থাৎ $v=c$। এদের ত্বরান্বিত বা মন্দীভূত করা যায় না।

(3) ট্যাকিয়ন, যার গতিবেগ আলোক-গতির বেশী; অর্থাৎ $v>c$।

আমরা যদি H. A. Lorentz-এর পূর্ব-ব্যবহৃত সমীকরণটি আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের অনুযায়ী লিখি, তাহলে দাঁড়ায়—

$$E=\frac{m}{\sqrt{1-q^2}}\text{, যেখানে } q=\frac{v}{c}$$

(43-তম সমীকরণ)

E-কে যদি q^2-এর ঘাতে উন্নীত করা যায়, তবে

$$E=m+\frac{m}{2}q^2+\frac{3}{8}mq^4+\cdots$$

স্পষ্টতঃই $q=o$ হলে, অর্থাৎ বস্তুকণাটি যখন থেমে আছে, তখন $E=m$ হয়। আইনস্টাইন সিদ্ধান্তে এলেন, 'ভর ও শক্তি অতএব নিশ্চিতই এক'। কিন্তু প্রশ্ন হলো, q যখন 1 থেকে বেশী ($q>1$), তখন হরটি কাল্পনিক হয়ে যায়। ট্যাকিয়নের ক্ষেত্রে এই অসম্ভব ব্যাপারটি সম্ভব হয় কতকগুলি ধারণার উপর। প্রথমতঃ স্থিত-ভর m_o-ই তো ট্যাকিয়নের ক্ষেত্রে কাল্পনিক। কাজেই শক্তির হর যদি কাল্পনিক সংখ্যা ($\sqrt{-1}$) সমেত হয়, তবে কাল্পনিক m_o-ই শক্তি E-কে বাস্তব সংখ্যা করে তোলে। ট্যাকিয়ন কিন্তু কখনই থামতে পারে না। কারণ তাহলে তাকে আলোক-গতির বেড়া অতিক্রম করতে হয়। সব সময়েই ট্যাকিয়নের গতিবেগ আলোক-গতির বেশী, কখনই সমান হয় না। ধরা যাক, একটি বস্তুকণা i বিন্দু থেকে বিকিরিত হলো এবং j বিন্দুতে শোষিত হলো। যদি একটি সরলরেখা i এবং j বিন্দু দিয়ে টানা যায়, তবে তা হবে i ও j-এর স্থান-অক্ষরেখা। যদি স্থান ও সময় অক্ষকে x এবং t বলি, তবে ঘটনা দুটিকে (x_i,t_i) এবং (x_j,t_j) বলা যেতে পারে। স্পষ্টতঃই

$t_j > t_i$। প্রথম দর্শকের আপেক্ষিক অপর কোন একজন দর্শকের যদি ঐ একই ঘটনার স্থানাঙ্কদ্বয় (x'_i, t'_i) ও (x'_j, t'_j) হয়, তবে ট্যাকিয়নের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় দর্শকের গতিবেগের উপর নির্ভর করে সময়ের অবস্থা উল্টে যেতে পারে; অর্থাৎ $t'_i > t'_j$, বলাই বাহুল্য দ্বিতীয় গতিশীল দর্শক শোষণ আগে দেখবে পরে বিকিরণ দেখবে। আপাতদৃষ্টিতে অবাস্তব মনে হলেও আপেক্ষিকতা তত্ত্ব দিয়ে ব্যাপারটা বোঝা যেতে পারে। শক্তি E ও ভরবেগ P-এর পরিবর্তনের সমীকরণ দুটি হলো—

$$E' (E - v.p) \Big/ \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \text{ এবং}$$

$$P' = \left(p - \frac{V.E}{c^2} \right) \Big/ \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

যেহেতু ট্যাকিয়নের $v > c$, সেহেতু গতিশীল দর্শকের কাছে পরিবর্তিত শক্তিকে বিপরীত চিহ্নের মনে হবে। কাজেই যদি দর্শক j-কে বিকিরণ এবং i-কে শোষন হিসাবে নথীভুক্ত (Record) করে তবেই ট্যাকিয়নের ধনাত্মক শক্তি লক্ষ্য করা যাবে; অর্থাৎ আমাদের কাছে ট্যাকিয়নের বিকিরণ ও শোষণ পরস্পর পরিবর্তনশীল।

বিশ্বজগতের বহু ধারণাই হয়তো ট্যাকিয়ন পাল্টে দেবে। কোয়াসার (Quasi Stellar Radio Sources) সম্বন্ধে যে সমস্যা উঠেছে বা বিশ্বের প্রসারণের সমস্যা, এই সবের উত্তরই হয়তো ট্যাকিয়ন দিতে পারবে। আমাদের আকাশগঙ্গা ছায়াপথের তারাগুলি বিপুল বেগে পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। মহাবিশ্ব তো শেষ হবে না! আবার শক্তি থেকে ভর আসবে, ভর থেকে শক্তি হবে। কাজেই এক দর্শকের কাছে যেটা শোষণ, অপর দর্শকের কাছে সেটা বিকিরণের মত—হয়তো এক মহাবিশ্বের ধ্বংস অপর এক মহাবিশ্বের জন্মের ট্যাকিয়নীয় সিদ্ধান্ত। এটা ঠিক, আপেক্ষিকতা তত্ত্বের পর ট্যাকিয়ন হলো গাণিতিক পদার্থবিদ্যার এক আলোড়নকারী পদক্ষেপ।

মহাবিশ্বে প্রাণ

অলকরঞ্জন বসুচৌধুরী

আদি অন্তহীন মহাবিশ্বের কোন এক ছায়াপথের কোন এক সৌরজগতে পৃথিবী নামে যে গ্রহটি আছে, তারই একজন কবি একদিন গেয়েছিলেন, "মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল মাঝে/আমি মানব একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে···"। কিন্তু আজ সেই গ্রহের অধিবাসী মানুষের মনে প্রশ্ন জেগেছে যে, এই বিশাল মহাবিশ্বে সে কি সত্যই একাকী। নিঃসীম অন্তরস্পর্শী এই ব্রহ্মাণ্ডের আর কোথাও কি প্রাণের বীজ অঙ্কুরিত হয় নি ?

এই প্রশ্নের জবাব কয়েক দশক আগেও যেভাবে দেওয়া যেত, এখন আর সেভাবে দেওয়া যায় না। কিছুদিন আগেও এটা ছিল উপন্যাসের ক্ষেত্রে, গল্প-গুজবের আসরে। কিন্তু কয়েক বছর ধরে আকস্মিকভাবে প্রশ্নটা বিজ্ঞানের আঙিনায় এসে উপস্থিত হয়েছে।

মানুষের বিজ্ঞানের জয়যাত্রার ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, মানব-মনীষা এমন বহু জিনিষ আবিষ্কার করেছে, যা ছিল পূর্ব পরিকল্পিত, মানুষের কল্পনার পথ ধরেই এসেছে

বাস্তব বিমানপোত, মারণাস্ত্র বা মহাকাশযান। মহাশূন্যে প্রাণের ব্যাপারটাও অনেকটা সেরকম। মহাবিশ্বে পৃথিবী ছাড়া আর কোথাও উন্নত সভ্যতা আছে কিনা, বিজ্ঞান যখন এ নিয়ে মাথা ঘামানো সুরু করে নি, তখন থেকেই মানুষ কল্পনা করতে ভালবাসে মহাশূন্যে কোথাও তারই মত কোন সভ্য জীব রয়েছে। তাই গ্রহান্তরের আগন্তুকের পৃথিবী ভ্রমণ নিয়ে বহু গল্পও রচিত হয়েছে। এইচ. জি. ওয়েলস্-এর "War of the worlds" এমনই একটি গল্প। এটিকে নিয়ে একবার একটি মজার কাণ্ড হয়। অভিনেতা অর্সন ওয়েলস ঐ উপন্যাসটির বেতারভাষ্য তৈরি করে একবার নিউইয়র্ক বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচার করেছিলেন। তখন সভ্যতাভিমানী আমেরিকার বহু নাগরিক তা শুনে অন্য কোন গ্রহের জীব সত্যই এসে পৃথিবী আক্রমণ করেছে ভেবে শহর ছেড়ে পালাতে লাগলো। পালাবার দাপটে কত লোক হাত-পা ভাঙলো, কত সম্পত্তির ক্ষয়-ক্ষতি হলো! ব্যাপারটা যখন অনুষ্ঠান শেষে বোঝা গেল, তখন সুরু হলো হাসাহাসি। বেচারী অর্সন ওয়েলসকে এর জন্যে ক্ষমাও চাইতে হয়েছিল। এই ঘটনা থেকে এই কথাই প্রমাণ হয় যে, মানুষ এসব কল্পনা করতে ভালবাসে। ভালবাসে বলেই সে গ্রহান্তরে সভ্যতার কল্পনা করে, আকাশে 'উড়ন্ত চাকি' দেখে।

কিন্তু ঘটনাপ্রবাহ আজ এমন স্তরে পৌঁচেছে যে, উড়ন্ত চাকিকে আর অলস মস্তিষ্কের কল্পনাবিলাস বলে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। উদ্দেশ্য-প্রণোদিত রটনা এখন বাস্তবসম্মত ঘটনায় পরিণত হতে চলেছে। এই উড়ন্ত চাকি ছাড়াও আরও এমন কতকগুলি ব্যবহারিক এবং তাত্ত্বিক প্রমাণ মিলেছে, যার ফলে বিশ্বের অনেক খ্যাতনামা বিজ্ঞানীই গ্রহান্তরে জীবনের অস্তিত্ব নিয়ে মাথা ঘামাতে সুরু করেছেন। তাঁরা যে এ নিয়ে শুধু অনুসন্ধান করছেন তাই নয়, তাঁদের অনেকে এতে বিশ্বাসও করেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন এমন কিছু প্রথিতযশা মনীষী, যাঁদের মতামতকে লঘু করে দেখা সমীচীন নয়!

ধারণা এবং অনুমান

মহাবিশ্বে আর কোথাও প্রাণ আছে কিনা, এই অনুসন্ধান সুরু হওয়া উচিত আমাদের সৌর-জগতেরই ভিতর থেকে। চাঁদই হচ্ছে মহাকাশে আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী, কিন্তু প্রাণের দিক দিয়ে সে আমাদের নিরাশ করেছে। তারপর মঙ্গল—যেখানে উন্নত সভ্যতার অস্তিত্ব নিয়ে কিছুদিন আগেও মানুষের ঔৎসুক্যের অন্ত ছিল না। কিন্তু আধুনিকতম মহাকাশযানের পর্যবেক্ষণও সেখানে জীবনের কোন সন্ধান দিতে পারে নি। তারপর মেঘের ঘোমটাটানা শুক্র—মানুষের মহাকাশযান যার বুকে অনুসন্ধান চালিয়েছে। কিন্তু মেঘাবরণের অন্তরালে কোন প্রাণকণিকার সন্ধান এখন পর্যন্ত মেলে নি। এই প্রসঙ্গে মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। তবে পৃথিবীতে বসে বিজ্ঞানীরা যা পরীক্ষা করেছেন, তা থেকে আমাদের সৌর-জগতে জীবনের দ্বিতীয় কোন লীলাভূমি সম্পর্কে নিরাশ হতে হয়। আর যদি তর্কের খাতিরে স্বীকার করা যায় আমাদের সৌরজগতে অন্য কোথাও প্রাণ আছে, তবে তা অতি নিম্নস্তরের না হয়ে যায় না।

এখন আমাদের দৃষ্টি আরও দূরে প্রসারিত করা যাক। অন্ততঃ বিজ্ঞানীরা তাই করেছেন। যে অসংখ্য তারা নিয়ে মহাশূন্যে বিশাল ছায়াপথের সৃষ্টি, আমাদের সূর্যের মত ঐসব তারারও কি কোন প্রাণময় গ্রহ থাকতে পারে না? সূর্যকে বাদ দিলে আমাদের নিকটতম তারা হচ্ছে আলফা সেন্টরাই—এর কোন প্রাণময় গ্রহ থাকবার সম্ভাবনা নেই। যে সব তারার

এই সম্ভাবনা আছে, তার মধ্যে আমাদের নিকটতম হচ্ছে টাউ সেটি এবং এপসিলোন এরিডানি (সূর্য থেকে দূরত্ব যথাক্রমে 11·2 এবং 10·7 আলোকবর্ষ)। আমেরিকার গ্রীনব্যাঙ্ক মানমন্দিরের বিজ্ঞানীরা এর দিকে অনবরত লক্ষ্য রাখছেন। জ্যোতির্বিদ্ ফ্র্যাঙ্ক ড্রেক 1960 সালে আমেরিকার পশ্চিম ভার্জিনিয়া প্রদেশের এক রেডিও মানমন্দির থেকে ঐ দুটি তারার উপর পর্যবেক্ষণ চালান। এই প্রকল্পের নাম দেওয়া হয় 'আজমা'। প্রথম চেষ্টাতেই প্রথম তারাটি থেকে তিনি একটি নিয়মিত শব্দ ধরতে সক্ষম হন, কিন্তু দশ মিনিট পরে বুঝতে পারেন যে ওটা পৃথিবীর আবহমণ্ডলেরই উচ্চ স্তরের কোন উৎসজাত। এভাবে 'আজমা' প্রকল্প বিফল হয়।

এবার দেখা যাক, অন্যান্য বিজ্ঞানীরা কি বলেন। 1953 সালে মার্কিন জ্যোতির্বিদ্ হার্লো শাপ্‌লি বলেছেন, মহাবিশ্বে প্রায় দশ কোটি তারার প্রাণময় গ্রহ থাকবার সম্ভাবনা আছে। গত 1966 সালেও তিনি বলেছেন যে, ব্রহ্মাণ্ডের কোটি কোটি গ্রহ জুড়ে জীবনের অপরূপ খেলা চলছে। তিনি বলেছেন, বর্তমান গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, আমাদের সূর্য যেমন লক্ষ কোটি তারায় তারায় খচিত ছায়াপথের অন্তর্গত, ব্রহ্মাণ্ডে তেমন ছায়াপথ অন্ততঃ কয়েক শত কোটি রয়েছে। একটি ছোট-খাটো ছায়াপথেই আমাদের সূর্যের মত দশ হাজার কোটি নক্ষত্র আছে। সুতরাং বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় আমাদের পৃথিবী কতটুকুই বা! আর এই পৃথিবীর মানুষ আমরা বিপুল এই ব্রহ্মাণ্ডের কতটুকু জানি? ডক্টর শাপ্‌লি আরও বলেছেন, আমাদের গ্রহ থেকে শতকোটি আলোকবর্ষ দূরে অন্ততঃ এমন দশ কোটি গ্রহ আছে, যেখানে পৃথিবীরই মত সজীব প্রাণী, অর্থাৎ তরুলতা, তৃণভূমি বা মানুষ জাতীয় জীব রয়েছে, আমরা তাদের খোঁজ না পেতে পারি, কিন্তু তাদের অস্বীকারও করতে পারি না। ডক্টর শাপ্‌লির এই মত সমর্থন করেছেন আরও তিনজন মার্কিন বিজ্ঞানী।

সমসাময়িক আরও বহু বিজ্ঞানী নিজেদের যে সব মতামত ইদানীং কালে প্রকাশ করেছেন, তাতে প্রকারান্তরে ঐ ধারণারই সমর্থন মেলে। মার্কিন বিজ্ঞানী কার্ল সেগান ও সোভিয়েট বিজ্ঞানী যোসেফ স্কলভ্‌স্কি যুগ্ম প্রচেষ্টায় পত্র-মারফৎ মত বিনিময় করে একটি বই লিখেছেন, যার প্রতিপাদ্য বিষয় হলো, মহাবিশ্বে আমাদের ছায়াপথেই অন্ততঃ দশ লক্ষ গ্রহে উন্নত সভ্যতা আছে। যে রাসায়নিক ঘটনা-বৈচিত্র্যে মানুষের সৃষ্টি, সেই একই কারণে অন্য গ্রহেও মানুষের মত জীব সৃষ্ট হয়ে থাকতে পারে এবং তারা হয়তো পৃথিবীতে সফরও করে গেছে। যদিও তাঁরা স্বীকার করেছেন যে, পৃথিবীর বুকে এর কোন নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় নি, তবু পৃথিবীর বাইরের প্রমাণ অর্থাৎ নীহারিকা, তার গ্রহাণুপুঞ্জ, প্রাণের সম্ভাবনাময় গ্রহ ইত্যাদির উপর নিরীক্ষা করে তাঁরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে, গ্রহান্তরের সভ্য অধিবাসীরা এর পূর্বে অন্ততঃ দশ হাজার বার পৃথিবীতে পদার্পণ করেছে। যাই হোক, পাশ্চাত্যের বুদ্ধিজীবী মহলের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এখন এই মতের পৃষ্ঠপোষক।

সোভিয়েট জ্যোতির্বিজ্ঞানী ডক্টর ফিওদোরভও বলেছেন সেই কথাই। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি আরও আশ্চর্য এক কাহিনী শুনিয়েছেন। ডক্টর ফিওদোরভ বলেছেন, পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবেরও আগে গ্রহান্তরের সুসভ্য প্রাণীরা পৃথিবীতে এসেছিল। তখন এই নবীন গ্রহে তাদের অভ্যর্থনা করতে কেউ ছিল না। তাই সেই সব আগন্তুক এই পরিবর্তনশীল পৃথিবী ত্যাগ করে যাবার সময় শনি ও সূর্যের মাঝামাঝি দুটি অজানা গ্রহের গায়ে তাদের অভিযান কাহিনী লিপিবদ্ধ করে

গেছে এই আশায় যে, ভাবীকালের পৃথিবীর বাসিন্দারা মহাকাশচারণাবিদ্যা আয়ত্ত করে তাদের এই পৃথিবী আবিষ্কারের কাহিনী জানতে পারবে। কিন্তু বিজ্ঞানী মহাকাশে না গিয়েই কি করে তা জানতে পারলেন, সে কথা তিনি আর জানান নি।

পূর্বোল্লিখিত রুশ বিজ্ঞানী স্কলভ্স্কি বলেছেন যে, গ্রহান্তর থেকে আগত বেতার-বার্তা ধরবার জন্যে একটি বিরাট রেডিও টেলিস্কোপ যদি সর্বক্ষণ মহাকাশে ঘুরে বেড়ায়, তবে, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, পনেরো-কুড়ি বছরের মধ্যেই আমরা গ্রহান্তরের বার্তা ধরতে সক্ষম হবো। এই সম্ভাবনার জন্যে পৃথিবীকে প্রস্তুত থাকতে হবে। কৃত্রিম উপগ্রহ মারফৎ এই চেষ্টা করবার প্রস্তুতি রাশিয়ায় চলছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, কতকটা একই উদ্দেশ্যে, অর্থাৎ পৃথিবীর আবহমণ্ডলের বাইরে থেকে মহাশূন্যে ভেসে আসা আলোক ও বেতার-তরঙ্গকে অবিকৃতভাবে ধরবার জন্যে 1966 সালের মার্চ মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কৃত্রিম উপগ্রহের আকারে পুরা একটি বেতার মানমন্দির মহাকাশে পাঠিয়েছে। এরকম প্রচেষ্টা এর পরেও বিজ্ঞানীরা করেছেন।

বছর ছয়েক আগে আটজন রুশ বিজ্ঞানী সম্মিলিতভাবে একটি সাময়িক পত্রিকায় এই মত প্রকাশ করেন যে, মহাকাশ থেকে আমাদের উদ্দেশ্যে অনবরত গ্রহান্তরের কোন সুসভ্য জীব বার্তা পাঠাচ্ছে, কিন্তু আমরা তাতে সাড়া দিতে না পারায় তা ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাচ্ছে।

বৃটেনের জোড্রেল ব্যাঙ্ক মানমন্দিরের অধ্যক্ষ বিখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার বার্নার্ড লোভেল একাধিক স্থানে বলেছেন, বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের একাধিক গ্রহ-উপগ্রহে প্রাণের অস্তিত্বের খুবই সম্ভাবনা আছে। তিনি বলেন, নীহারিকার মেঘপুঞ্জের মধ্যে প্রাণ সৃষ্টির প্রয়োজনীয় পদার্থ নিশ্চয়ই রয়েছে। স্যার লোভেল আরও বলেছেন যে, অন্য গ্রহের বাসিন্দাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হলে পৃথিবীর সমস্ত সামরিক বেতারযন্ত্র ও বিশেষজ্ঞদের কাজে লাগাতে হবে।

ঘটনা ও রটনা

এই তো গেল বৈজ্ঞানিকদের ধারণা ও অনুমানের কথা। এখন দেখা যাক, মহাবিশ্বে প্রাণ আছে, এমন অনুমান করবার সপক্ষে কি কি প্রমাণ পাওয়া গেছে এবং সেগুলি কতটা সত্য। প্রথমে বেতার-তরঙ্গের কথাই ধরা যাক। বিজ্ঞানীরা একাধিকবার মহাকাশ থেকে ভেসে আসা বেতার-তরঙ্গ ধরে সবিস্ময়ে দেখেছেন, এর উৎস বহু আলোকবর্ষ দূরের কোন জ্যোতিষ্ক এবং এই বেতার-তরঙ্গের ধ্বনি বিরতির সূক্ষ্ম সামঞ্জস্য দেখে অনুমান করেছেন, কোন সুসভ্য প্রাণীই এর প্রেরক।

1932 সালে জ্যোতির্বেত্তা জানস্কি তাঁর গবেষণাগারে 100 আলোকবর্ষ দূরের এরকম এক বার্তা শুনতে পান এবং তাঁর কথা শুনে আরও বহু বিজ্ঞানী তা ধরতে সক্ষম হন। 1965-এর এপ্রিল মাসে সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা "এস-টি-এ-102" নামে কোটি মাইল দূর থেকে ভেসে আসা এক বেতার-তরঙ্গ ধরতে সক্ষম হন। 1967 সালের নভেম্বরে বৃটেনের মুলারড মানমন্দিরের বিজ্ঞানীরা মহাকাশের "কোন বুদ্ধিদীপ্ত প্রাণসত্তার আহ্বান" শুনে চমকে ওঠেন। অতি সূক্ষ্ম রেকর্ডিং যন্ত্রে প্রতি 1·337 সেকেণ্ড অন্তর 'বিক্' 'বিক্' ধ্বনি ধরা পড়ে। বিজ্ঞানীদের হিসেব অনুযায়ী প্রায় 200 আলোকবর্ষ দূরের কোন উৎস থেকে এই সঙ্কেত আসছে। এত সমান সময় অন্তর এই রকম সবিরাম ধ্বনিপ্রবাহ এর আগে আর কখনও আসে নি। তাই বিজ্ঞানীরা অনুমান করলেন, কোন বুদ্ধিবৃত্তিশীল জীবই এই সঙ্কেত পাঠাচ্ছে। বৃটিশ বিজ্ঞানীরা উৎসটির নাম দিলেন "সবুজ মানুষের দেশ"। এই দেশকে মহাকাশের

অন্তহীন বিস্তৃতির মধ্যে খুঁজে বেড়াচ্ছেন পাঁচজন বিজ্ঞানী। এঁদের নেতা অধ্যাপক স্যার মার্টিন রাইল বলেছেন, এই ঘটনার একটি অন্য রকম সিদ্ধান্তও সমান জোরদার। এই অভূতপূর্ব বেতার-সঙ্কেত কোন নিউট্রন তারকার ধ্বংস সঙ্কেতও হতে পারে। দুগ্ধপথ নীহারিকার বাসিন্দা বহু দূরের এই নক্ষত্রগুলি ক্রমশঃ ছোট হতে হতে মিলিয়ে যায়। এর ধ্বংসপ্রাপ্ত দেহবস্তু বেতার-তরঙ্গ হয়ে মহাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। অবশ্য মহাশূন্যে বুদ্ধিদীপ্ত প্রাণীর মত নিউট্রন তারকার অস্তিত্বও এখন পর্যন্ত তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত মাত্র। তাই এই বেতার-সঙ্কেতকে মহাবিশ্ব সভ্যতার নিশ্চিত প্রমাণ বলে ধরা না গেলেও অন্যতম অনিশ্চিত প্রমাণ বলে মনে করা যেতে পারে।

এরপর উড়ন্ত চাকির কথায় আসা যাক। বিজ্ঞানীমহলে এগুলিকে বলা হয় অচেনা উড়ন্ত বস্তু বা unidentified flying object, কিংবা এগুলির আদ্যাক্ষর নিয়ে সংক্ষেপে UFO বা উফো। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই কম-বেশী উফো দেখা গেছে—এমন কি, এই মুনি-ঋষির দেশ সনাতন ভারতবর্ষও বাদ যায় নি। বিভিন্ন ব্যক্তি এর বিভিন্ন রকম বর্ণনা দিয়েছেন—অপরূপ বৈচিত্র্যময় সব বর্ণনা! কত রকম এর আকার, আয়তন, গতিবিধি, আলো, বেগ এবং শব্দ! এই উফোর যত প্রত্যক্ষদর্শী আছেন, তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করে বিভিন্ন সমীক্ষা এবং তদন্ত চালানো হয়েছে। এর ফলে দেখা গেছে যে, কেউ কেউ হয়তো উফো দেখেছে বলে দাবী করে ভাওতা দেবার জন্যে, কেউ কেউ ভুল দেখে, কিন্তু কেউ কেউ আবার সত্যই উফো দেখেছেন। এই শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে আছেন বহু সভ্রান্ত বিজ্ঞানী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তি—যাঁদের কথা অবিশ্বাস করা যায় না।

অনুসন্ধানের ফলে দেখা গেছে, উফোর যুগ সুরু হয়েছে মানুষের মহাকাশচারণার যুগ সুরু হবার বহু পূর্বে। বাইবেল ইত্যাদির পৌরাণিক কাহিনীর কথা বাদ দিলেও ইতিহাসে এমন বর্ণনা পাওয়া যায়, যা আরব্য উপন্যাসের মতই রোমাঞ্চকর। রোমান ইতিহাসবিদ্ লিভি লিখেছেন, খৃঃ পূঃ 218 অব্দে ঝাঁকে ঝাঁকে উফো এসেছিল। মধ্যযুগে ইউরোপীয় চাষীরা আকাশ থেকে উজ্জ্বল গোলকে চেপে দেবদূতদের নামতে দেখেছে। 1561 সালে জার্মেনীর নুরেনবার্গ শহরের আকাশে নল আর গোলক দেখা গিয়েছিল। এই শতাব্দীর আগেও উফোর এই রকম অসংখ্য ঘটনা আছে।

উফোর প্রাদুর্ভাব বেড়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে। বিমানের পাশে পাশে ছুটন্ত আলোকপিণ্ড, সুইডেনে 1946 সালে হাজার হাজার উফো, চ্যাপ্টা গোলাকার উফোর মধ্যে রূপালী পোষাকপরা প্রাণী, তাদের সঙ্কেত, অবতরণ, মোটরগাড়ী ধাওয়া করা—ইত্যাদি বহু ঘটনার সাক্ষ্য মিলেছে। বিভিন্ন সাক্ষ্য থেকে দেখা গেছে, বিভিন্ন আকারের এই উফোগুলির কোনটি পিরিচের মত চ্যাপ্টা, কোনটি বেলনাকার, অর্থাৎ সিগারের মত, কোনটি ডিম্বাকার, কোনটি বা থালার মত, কোনটি আবার শনিগ্রহের মত, অর্থাৎ বলয়ের ভিতর গোলক। কোন কোনটিতে আবার জানলা থাকে, তার আরোহীরা কখনও বা মানুষের মত, কখনও বা নয়। কেউ বা নিঃশব্দে যায়, কেউ আবার এত তীব্র শব্দ করে যে, পশুপাখীরা ভয়ে ছুটে পালায়। কেউ বেতার-তরঙ্গে ছেদ ঘটায়, কেউ বা রেডার-যন্ত্রে ছায়া ফেলে। বিভিন্ন রং এবং তীব্রতার আলোক বিচ্ছুরিত করবার বিবরণও পাওয়া গেছে। কোনটির গতি দ্রুত, কোনটির বা মন্থর। এক বিদেশী দম্পতিকে উফোর আগন্তুকেরা তাদের মহাকাশযানের ভিতরে ডেকে নিয়ে তাদের স্মৃতিভ্রংশ ঘটিয়েছে—এরকম একটা সংবাদও পাওয়া গেছে। অনুসন্ধানের পর যে সব ঘটনাকে

সত্য বলে ধরা হয়েছে, সেগুলি থেকে উফোর যে প্রকৃতি জানা যায়, তাতে এর অপার্থিবতাকে আর অস্বীকার করা যাচ্ছে না।

পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই উফো দেখা গেছে—সাতটি দেশে ঝাঁকে ঝাঁকে। শুধু 1954 সালেই পৃথিবীতে ছই সহস্রাধিক উফো দেখা গেছে। গত সাতষট্টি সালের অক্টোবরে আমাদের দেশে শিলঙেও একটি উড়ন্ত এবং ঘূরন্ত চাকি নদীতে নেমে পড়ে, বাতাসকে গরম করে দেয়, জল মন্থন করে, বাতাসে বহু জিনিষ উড়িয়ে দিয়ে বনভূমির গাছে গাছে চিহ্ন রেখে যায়। এর ঠিক ছ-দিন আগে কানাডাতেও অনুরূপ চাকি দেখা গিয়েছিল।

সমীক্ষার ফলে দেখা গেছে, পঞ্চাশ লক্ষাধিক মানুষ উফো দেখেছে বলে দাবী করে। বিভিন্ন দেশের বিমান বাহিনী এই নিয়ে গবেষণা করেছে। মার্কিন বায়ুসেনার পরামর্শদাতা জ্যোতির্বিদ্ হাইনেক বলেছেন, অধিকাংশ ঘটনার পিছনেই যদিও ধাপ্পা থাকে, তবু আজ এমন দিন এসেছে যে, একে আর হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না—হতেও পারে এরা গ্রহান্তরের দূত। মার্কিন বায়ুসেনার উফোসংক্রান্ত সরকারী তদন্ত কমিটির প্রধান পদার্থবিদ্ কণ্ডন বলেছেন, 1947 সালের পর থেকে এগারো হাজারেরও বেশী উফোর খবর নথিভুক্ত হয়েছে, যার শতকরা ছয়টির কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় নি। এই এগারো হাজারের মধ্যে সবগুলিই অবশ্য ঘটনা নয়, অনেক রয়েছে রটনা এবং কিছু ভুল। বেলুন, পাখী, ঘুড়ি, জ্যোতিষ্ক, মেঘ, বিদ্যুৎ, পৃথিবীর মহাকাশযান ইত্যাদি এই ভুলের উৎস। কেউ কেউ আবার উফোর ফটোও তুলেছেন, যার অনেকগুলির পিছনেই রয়েছে নানা জাল-জুয়াচুরি।

উফোসংক্রান্ত এই ঘটনাগুলি থেকে একটি সঠিক এবং সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসা এখনই সম্ভব নয়। এর বিবরণে যেমন বৈচিত্র্য রয়েছে, এর ব্যাখ্যাতে তেমন রয়েছে। কোন কোন বিজ্ঞানী মনে করেন, উফো হয়তো পৃথিবীর আবহের বা কাছাকাছি আকাশেরই কোন প্রাকৃতিক ঘটনা, যা আমরা এখনও আবিষ্কার করতে পারি নি। আবার এই ব্রহ্মাণ্ডে 'মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান'—এই জাতীয় ধারণাকেও বিজ্ঞান সমর্থন করতে পারে না। তাই কোন কোন বিজ্ঞানী বলেন, উফোকে গ্রহান্তরের আগন্তুকরূপে দেখলেই এই সমস্যার সমাধান সহজে হবে।

মঙ্গলগ্রহ যখন পৃথিবীর কাছে আসে, তখনই উফোর প্রকোপ বাড়ে, সেই কারণে এরা মঙ্গলেরই দূত বলে কোন কোন বিজ্ঞানী যে মত প্রকাশ করেছেন, তাও ধোপে টেঁকে না; কারণ মঙ্গলে বুদ্ধিমান প্রাণীর অস্তিত্ব আজ আর কেউ স্বীকার করেন না। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই উফো নির্জন স্থানে নেমেছে কেন—এই প্রশ্নের উত্তরে কোন কোন বিজ্ঞানী বলেন সুসভ্য উফো-আরোহীরা হয়তো তাদের তুলনায় অসভ্য পৃথিবীবাসীর কাছে নামবার প্রয়োজন বোধ করে নি। আবার পূর্বোক্ত মার্কিন ও রুশ বিজ্ঞানীদ্বয় প্রণীত গ্রন্থে বলা হচ্ছে, ছায়াপথের ঐ দশ লক্ষ গ্রহ থেকে প্রতি বছরে যদি একটি করেও মহাকাশযান ছাড়া হয়, তবে পৃথিবীর আকাশে তার আবির্ভাব ঘটবে বহু বছর পর পর, উফোর মত ঘন ঘন নয়।

কেউ কেউ আবার দার্শনিকভাবেও এর ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করছেন। কোন কোন মনোবিজ্ঞানীর মতে, এর কারণ আন্তর্জাতিক অশান্তিজনিত মানুষের আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষার অবক্ষয় ইত্যাদি। কিন্তু এই দার্শনিক ব্যাখ্যায় যে সমস্যা মিটবে না, তাতে সন্দেহ নেই। গত 1967 সালের নভেম্বরে উফোবিষয়ক সপ্তম বিশেষজ্ঞ কংগ্রেসে জনৈক রকেট-বিশেষজ্ঞ বলেছেন যে, সুদূর গ্রহ থেকে উন্নততর জীবেরা

যেসব মহাকাশযান পাঠায়, তাই উর্কোরূপে দেখা যায়। ঐ জীবেরা হয়তো জীবনকে দীর্ঘায়িত করতেও শিখেছে। সত্য হোক বা মিথ্যা হোক, আমাদের কল্পনা করতে দোষ কি!

জল্পনা-কল্পনা

বিজ্ঞানের কল্পনা অনেক সময় উপন্যাসকেও হার মানায়। মহাশূন্যের অন্য কোথাও যদি সুসভ্য জীব থাকে, তবে তাদের চেহারা কেমন হতে পারে, সে সম্পর্কে জীব-বিজ্ঞানীরা গুরুত্বের সঙ্গে চিন্তা করেছেন, এঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন বহু নৃতত্ত্ববিদ্। এঁরা এত বিস্তারিত জল্পনা-কল্পনা করেছেন যে, এই নিয়েই একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লেখা যায়। শুধু গ্রহান্তরের প্রাণীর আকার, আচরণ ও দেহবস্তুই নয়, তাদের জীব-লোকের রসায়ন সম্পর্কেও বৈপ্লবিক কল্পনা করা হয়েছে। পৃথিবীতে প্রাণ সৃষ্টির কাজে জল ও কার্বন অপরিহার্য। পার্থিব প্রাণের ভিত্তি যে প্রোটোপ্লাজম, তা বিভিন্ন কার্বন পরমাণুর বিভিন্ন ধরণের সংযোজনে সৃষ্টি হয়। বিজ্ঞানী রেনল্ডস দেখিয়েছেন, কার্বন ছাড়া সিলিকনও এই কাজ করতে পারে এবং এই জাতীয় প্রোটোপ্লাজম হবে বেশী তাপসহ। বিজ্ঞানী হলডেন বলেছিলেন, অ্যামোনিয়াকে ভিত্তি করেও জৈব রসায়ন গড়ে উঠতে পারে। বিজ্ঞানীদের এসব প্রকল্প থেকে এই কথাই বোঝা যায় যে, পৃথিবীর মত পরিবেশ না হলেই যে প্রাণের বিকাশ হতে পারবে না, এমন কোন কথা নেই।

মহাকাশের অন্য কোন জগতে যদি বুদ্ধি-বৃত্তিশীল প্রাণী থেকে থাকে, তবে কিভাবে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়, এই নিয়েও বর্তমান যুগের বিজ্ঞানীরা প্রচুর গবেষণা করেছেন।

যোগাযোগ করবার প্রথম অসুবিধা ভাষা। অনেক বিজ্ঞানীর মতে, যোগাযোগের সবচেয়ে সহজ উপায় বিশুদ্ধ গণিত; কারণ যে কোন বুদ্ধিবৃত্তিশীল প্রাণী গণিত জানবেই। পৃথিবীর বুকে বিরাট জ্যামিতিক চিত্রের আকারে আগুন জ্বালিয়ে গ্রহান্তরের প্রাণীদের ডাক দেওয়া হোক, এরকম একটি প্রস্তাবও এসেছিল, যদিও শেষ পর্যন্ত তা আর কার্যকর হয় নি। বেতার-তরঙ্গ, লেসার-রশ্মি প্রভৃতি অনেক রকম যোগাযোগের মাধ্যমের কথাই বিভিন্ন বিজ্ঞানী বলেছেন। বিজ্ঞানীদের আর একটি অভিনব পরিকল্পনা হচ্ছে, ছবির ভাষার বার্তা প্রেরণ। টেলিগ্রাফ-পদ্ধতিতে সঙ্কেত পাঠানো হবে বিন্দু ও রেখার সাহায্যে একটি উজ্জ্বল ও একটি অনুজ্জ্বল অংশের জন্যে। সব মিলিয়ে সাদায়-কালোয় এক ছবি গড়ে উঠবে। এমন একটা পরীক্ষা আমেরিকায় সফলও হয়েছে। 266টি বিন্দু এবং 1005টি শূন্যস্থান দিয়ে একটি কাল্পনিক গ্রহান্তর বার্তা বিভিন্ন বিজ্ঞানীর কাছে পাঠানো হয়েছিল। তাঁদের অনেকেই খুব সহজে বুঝতে পেরেছিলেন এর অর্থ—'এক তারার চতুর্থ গ্রহে এক দ্বিপদ প্রাণী বাস করে, তাদের দুই লিঙ্গ, তারা মহাকাশ বিচরণবিদ্যা আয়ত্ত করেছে, প্রতিবেশী এক গ্রহে গিয়ে মাছের মত প্রাণী আবিষ্কার করেছে। এই মানুষদের দৈর্ঘ্য সাত ফুট, হাতে ছয় আঙুল ইত্যাদি; অর্থাৎ মাত্র 256টি বিন্দু দিয়েই এত কথা বলা সম্ভব'। এই থেকে আর একটা কথা বোঝা যায় যে, গ্রহান্তরের সম্ভাব্য প্রাণীদের সঙ্গে যোগাযোগ করবার কথা বিজ্ঞানীরাও গুরুত্বের সঙ্গে ভাবছেন।

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, প্রথমতঃ তত্ত্বগতভাবে বহু বিজ্ঞানীই আজ স্বীকার করেন—বহিঃপৃথিবীতে বুদ্ধিমান প্রাণীর অস্তিত্বের সম্ভাবনা এবং দ্বিতীয়তঃ পৃথিবীর বুকে বেতার-তরঙ্গ ও অচেনা উড়ন্ত বস্তুর যে সব ঘটনা ঘটেছে, তা থেকে সেই অস্তিত্বের সম্ভাবনা যেমন নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয় না, তেমনই সেই সম্ভাবনা নাকচও করা যায় না। এই সম্ভাবনা সত্য হোক বা মিথ্যা হোক,

আমরা আশা করতে পারি—সেই সম্ভাবনাকে যাচাই করবার সুযোগ বিজ্ঞান একদিন আমাদের দেবে, সেদিন হয়তো মানুষের বিজ্ঞান অসাধ্যসাধন করবে—তারায় তারায় মহামিলনের সেতু রচনা করবে—দূরকে করবে নিকট, আর পরকে করবে আপন!

সঞ্চয়ন

হলুদ-বামনের রহস্য

সম্প্রতি একটি নিবন্ধে স্তানিস্লাভ খাবারোভ লিখেছেন—আমাদের কাছে সূর্যই জীবনের উৎস। কিন্তু বহির্বিশ্বে সূর্য একটি সাধারণ নক্ষত্র মাত্র। সবচেয়ে উত্তপ্ত নীল নক্ষত্র এবং শীতলতম লাল নক্ষত্রগুলির মাঝামাঝি তার স্থান। সূর্য হলো তথাকথিত হলুদ বামনদের অন্যতম। পৃথিবী খুব কাছে বলেই পৃথিবীর উপর সূর্যের প্রভাব এত বেশী।

যদিও সূর্যকে নিয়েই আমাদের সবচেয়ে বেশী পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে, তবু বলা যায়, এই নক্ষত্র সম্পর্কে আমাদের ধারণা এখনও অনুমান মাত্র। যেমন—আমাদের এরকম একটা ধারণা আছে যে, সূর্যের কেন্দ্রস্থলে গ্যাসের অস্তিত্ব আছে। অবশ্য এই গ্যাস অসাধারণ রকমের। এর ঘনত্ব সীসার ঘনত্বের চেয়েও অনেক গুণ বেশী। কিন্তু বস্তুটা তো গ্যাসই! এর পরমাণুগুলি হলো চলমান বিক্ষুব্ধ বস্তুকণার পুঞ্জ। পারস্পরিক সংঘর্ষের ফলে তাদের বিদ্যুৎ পরমাণুর বহির্ভাগ থেকে তাড়িত হয়। অণু পরমাণুর সংঘর্ষে একটা শক্তিশালী রঞ্জেন রশ্মির প্রবাহের সৃষ্টি হয়। কিন্তু সূর্যের উদর থেকে বেরিয়ে আসা খুব কঠিন। কেন্দ্র থেকে জমিতে পৌঁছুতে তার সময় লাগে গড়ে কুড়ি হাজার বছর। গ্যাস যখন সূর্যের স্বচ্ছ উজ্জ্বল স্তর থেকে নির্গত হয়, তখন তার আলোকময় বহিরাবরণ, বিচ্ছুরিত বস্তু অতিবেগুনী রশ্মিতে এবং দৃশ্য আলোকে রূপান্তরিত হয়। আট মিনিটে এই আলোকবর্ষণ পৃথিবীতে পৌঁছায়।

দু-দশক আগে পর্যন্ত গ্রহ-নক্ষত্র সম্পর্কে গবেষণা এবং সৌরজগৎ বহির্ভূত নক্ষত্রলোকের গবেষণা দৃশ্য আলোকরশ্মির উপর নির্ভর করতো। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সর্বদা একটা জানালার স্বপ্ন দেখেছেন, যে জানালাটা বিশ্বজগতের দিকে উন্মুক্ত হবে এবং বায়ুমণ্ডলের অন্ধকার দূর করবে। বিশ্বজগতের অধিকাংশ তথ্যই বায়ুমণ্ডলে অভেদ্য বাধার সম্মুখীন হয়। অধিকাংশ অতিবেগুনী রশ্মিবিকিরণ, রঞ্জেন এবং গামা রশ্মি আমাদের গ্রহ থেকে দৃষ্টিগোচর হয় না।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল একটা অদ্ভুত সৃষ্টি। প্রথম দিকে পৃথিবীর যে সব উপগ্রহ মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল, তা থেকে জানা যায় যে, পৃথিবীর ভূমি থেকে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ কিলোমিটার দূরত্বে ও পৃথিবীর আবরণকে এক বিরাট শূন্যতা-রূপে গ্রহণ করা যাবে না। যদিও সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 30 কিলোমিটার উচ্চতা ছাড়িয়ে যে স্তর রয়েছে, সেই স্তরে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মাত্র এক শতাংশ উপাদান থাকে, তবুও বায়ুমণ্ডলের এই শীর্ষ অঞ্চল-গুলি বিকিরণ থেকে রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তাদের বিশেষ অবস্থাই পৃথিবীর আবহাওয়া ও জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ করে।

এগারো বছর আগে একটি অস্বাভাবিক ও

শিক্ষণীয় ঘটনা ঘটে। হঠাৎ বেতার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। বিমান এবং সমুদ্রগামী জাহাজ বেতার-চালকহীন হয়ে পড়ে। যন্ত্রের চৌম্বক বাহগুলি এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে পাগলের মত লাফিয়ে ওঠে এবং পৃথিবীতে লোহিত বিদ্যুৎ-চমক হতে থাকে। সূর্য সম্পর্কে বিশেষজ্ঞেরা এই ভয়াবহ ও বিভ্রান্তিকর ঘটনাটি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেন।

জানা গেল যে, সূর্যের ভূমিতেই বিস্ফোরণ ঘটেছিল। সূর্যের একটা বড় রকমের ঝলক মানে হলো—এক অকল্পনীয় বিস্ফোরণ, যা রঞ্জেন রশ্মি, অতিবেগুনী রশ্মি, অবলোহিত এবং তেজস্ক্রিয় রশ্মির বিকিরণ ঘটায়। এরকম বিস্ফোরণে রঞ্জেন-রশ্মির 'কাঠিন্য' হাজার গুণ বেড়ে যায় এবং সূর্য অতি দ্রুত হাইড্রোজেনের ঘনীভূত অংশ, প্রোটন এবং পরমাণুর ভারী অংশ নির্গত করে।

এই চমকগুলি সূর্য-বায়ুতে সংঘর্ষজনিত তরঙ্গের সৃষ্টি করে। চান্দ্র আগ্নেয়গিরির মুখের নীচে সূর্যের অপেক্ষাকৃত অন্ধকার অংশের অনুরূপ যে অঞ্চল পাওয়া গেছে, তারও কারণ হলো সূর্যের প্রচণ্ড ঝলক। যখন সৌর হাইড্রোজেনের মেঘ পৃথিবীকে আঘাত করে, তখন সবচেয়ে ধ্বংসকারী ঝড়ের চেয়েও বায়ুমণ্ডলে অধিকতর শক্তির সূত্রপাত ঘটে। বায়ুমণ্ডলে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়—সৌরমণ্ডলের কর্মকাণ্ডে যখন ভাঁটার টান, তখন সঙ্কুচিত করে এবং যখন জোয়ারের টান, তখন প্রসারিত করে।

পৃথিবীর জলবায়ু নির্ধারিত হয় সূর্যের তেজ এবং পৃথিবীর রশ্মি বিচ্ছুরণের ভারসাম্যের দ্বারা। যে তেজ বিকিরিত হয়, তা বহির্বায়ুমণ্ডলের রাসায়নিক মিশ্রণ এবং সৌরবিকিরণের হ্রস্ব-তরঙ্গের উপর নির্ভরশীল। পৃথিবীর আবহাওয়া সম্পর্কে জানতে হলে সূর্যের আবহাওয়া সম্পর্কে জানতে হবে। অনেক দিন আগে থেকে আমরা যদি সূর্যের আচরণ সম্পর্কে জানতে পারি, তা হলে পৃথিবীর আবহাওয়া সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণীও আমরা করতে পারবো।

কারিগরি-শিল্পে শব্দের ব্যবহার

বিগত কয়েক দশকে বিজ্ঞান ও কারিগরি-শিল্পের ক্ষেত্রে অতিশব্দের ব্যবহার বিশেষভাবে চালু হয়েছে। বর্তমানশিল্পের বিভিন্ন শাখায় শ্রবণযোগ্য শব্দ ব্যবহৃত হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আজকাল মাটির তলায় তৈলাধার নির্মাণের জন্যে শব্দ ব্যবহৃত হচ্ছে। এই পদ্ধতি বেশী নির্ভরযোগ্য এবং ধাতুনির্মিত তৈলাধারের চেয়ে এতে 30-40 শতাংশ খরচ কম হয়।

মাটির তলায় এই তৈলাধারগুলি নির্মিত হয় ভূ কারিগরি পদ্ধতিতে; অর্থাৎ মানুষের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ছাড়াই। পাথুরে নুনের স্তরে একটি কূপ খনন করে তাকে পাইপ বসানো হয়। কেন্দ্রীয় পাইপের ভিতর দিয়ে জল ঢেলে দেওয়া হয়। এই পাইপটাই সবচেয়ে দীর্ঘ। জলে নুন গলে যায় এবং সেই দ্রবীভূত নুন পাম্প করে নির্গত করা হয়। পাহাড়ের প্রবল চাপ যাতে সহ্য করতে পারে, সে জন্যে তৈলাধারটিকে গোলাকার করতে হবে। এর গোলাকার ছাঁচ নির্মাণই সবচেয়ে জটিল কাজ।

মস্কো খনি ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা এই সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হয়েছেন। আসলে তাঁরা একই সঙ্গে দুটি সমস্যার সমাধান করেছেন। গোলাকার ছাঁচ নির্মিত হয়েছে এবং অভিস্রাবণের ব্যবস্থাও হয়েছে। এখন এসবই শব্দের সাহায্যে করা হচ্ছে।

একটি শব্দ-বিজ্ঞান সম্পর্কিত উৎপাদক-যন্ত্র শব্দ-তরঙ্গ সৃষ্টি করে আর তা লবণ-সম্পৃক্ত জলের স্তরে তার প্রভাব বিস্তার করে। তার ফলে এর মধ্যে সূক্ষ্ম জলঘূর্ণির সৃষ্টি হয়। জল ফুটতে সুরু করে এবং শব্দ-তরঙ্গের ফলে লবণের অণুগুলি গহ্বরের চতুর্দিকে ছিটকে পড়ে। এই লবণ বিশেষভাবে গহ্বরের তলার দিকে উৎপাদক-যন্ত্রের কাছে সে দ্রুত গলে যায়। সেখানে সূক্ষ্ম জলঘূর্ণি সবচেয়ে বেশী। এর ফলে গহ্বরটি গোল আকৃতি ধারণ করে।

পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে এটা দেখা গেছে যে, শব্দ এই পদ্ধতিকে 2·5 গুণ দ্রুততর করে। অন্যভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে, শব্দ-বিজ্ঞান সম্পর্কিত উৎপাদক-যন্ত্র ছাড়া অভিস্রাবণ-ব্যবস্থায় একটি বিশেষ আয়তনের তৈলাধার তৈরি করতে যদি তিন বছর লাগে, তাহলে শব্দ-বিজ্ঞান সম্পর্কিত উৎপাদক-যন্ত্রের সাহায্যে তা করতে লাগবে দু-বছর।

শ্রবণযোগ্য শব্দ দূরদুরান্তে প্রবল শক্তি সঞ্চার করতে পারে। সে জন্যে একে বিভিন্ন কাজে প্রয়োগ করা যায়। মস্কো খনি ইন্‌স্টিটিউটে পরিকল্পিত শব্দ-বিজ্ঞান সম্পর্কিত উৎপাদক-যন্ত্রের প্রথম ব্যবহার হয়েছিল মস্কোর নিকটে খাত থেকে তোলা পাথর, নুড়ি পরিষ্কার করবার কাজে। খাত থেকে পাথর, নুড়ি তোলা হলে তার গায়ে যে কাদা লেগে থাকে, তা শব্দ-তরঙ্গের সাহায্যে মুছে ফেলা যায়। শব্দ-তরঙ্গে যে প্রচণ্ড স্পন্দন সৃষ্টি করে, সেই স্পন্দনের ফলে ধূলিকণাগুলি তৎক্ষণাৎ ঝরে যায়। এভাবেই পাথর, নুড়িগুলি পরিচ্ছন্ন হয়ে ব্যবহারের উপযোগী হয়। ধূলিমুক্ত হবার জন্যে তাদের আর কোন শিল্প সংস্থায় দীর্ঘ পদ্ধতির ভিতর দিয়ে যেতে হয় না।

এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, ধাতুকে কেন্দ্রীভূত করবার কাজে শক্তিশালী শব্দ-তরঙ্গ খুবই কার্যকর। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চালুনির ভিতর দিয়ে ধাতু গলানো হয়। কিন্তু এই কাজে মাঝে মাঝেই বাধা পড়ে, কারণ ধাতুর টুক্‌রায় চালুনির ছিদ্রমুখগুলি বন্ধ হয়ে যায়। প্রচণ্ড শব্দ-তরঙ্গে আলোড়িত চূর্ণধাতু স্পন্দিত হয়ে ওঠে এবং তা মুখ বন্ধ না করে চালুনির ভিতর দিয়ে গলে যায়।

মস্কোতে শব্দ-বিজ্ঞানের সাহায্যে টিন খাত সম্পর্কে গবেষণা চালাবার যে সংস্থা আছে, সেখানে নতুন পদ্ধতি প্রয়োগ করে দেখা গেছে যে, তাতে নতুন সংমিশ্রণ ও তাপ বিনিময়ের উন্নততর পদ্ধতিতে জ্যাম প্রস্তুত করা যায়। বলা হয়েছে যে, তাতে জ্যামের স্বাদও উন্নত হবে। চমৎকার সংমিশ্রক হিসাবে রাসায়নিক শিল্পে শব্দ-তরঙ্গকে ব্যবহার করা যায়।

শক্তিশালী শব্দ-তরঙ্গ ধ্বংসকারী তরঙ্গের সৃষ্টি করে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই শব্দ-তরঙ্গকে ব্যবহার করা যায়। গভীর এবং অতিগভীর কূপ খননের জন্যে, কয়লা এবং ধাতু নিষ্কাশনের জন্যে, মাটির তলায় আকরিক সালফারকে গলাবার জন্যে এবং কয়লাকে গ্যাসে পরিণত করবার জন্যে শব্দ-তরঙ্গকে ব্যবহার করা যায়।

কাজাক বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির রাসায়নিক বিভাগ নানারকম লতা-গুল্ম-বল্কলের মণ্ড নিয়ে শব্দের সাহায্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে। এই বস্তুটি প্লাস্টিক ও কৃত্রিম কাপড় তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়। আঠার মত এই জিনিষটা ভুট্টার গোড়', বাদামের খোলা এবং অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যের বর্জিত অংশ থেকে পাওয়া যায়। অবশ্য সেগুলির উপর সালফিউরিক অ্যাসিডের সাহায্যে এক প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ তত্ত্বগতভাবে লতা-গুল্ম-বল্কলের মণ্ডের যে পরিমাণ দেখানো হয়, বাস্তবে তার পঞ্চাশ শতাংশের বেশী উৎপন্ন হয় না এবং অর্ধেক কাঁচামালই নষ্ট হয়ে যায়। তবে শব্দ-তরঙ্গের সাহায্যে কাঁচামালকে মণ্ডে পরিণত করবার পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে উৎপাদন 60 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

করোনারী হৃদ্‌রোগে ভোজ্য তেল ও চর্বির ভূমিকা

নরসিংহ নারায়ণ গোডবোলে

করোনারী হৃদ্‌রোগের (Coronary thrombosis) কারণ সম্পর্কে অনেক জল্পনা-কল্পনা-আলোচনা অধুনা হয়েছে। আহার্যের ভূমিকা, বিশেষ করে তাতে ব্যবহৃত চর্বির ধরণ, পরিমাণ ও শ্রেণীবিষয়ক ত্রুটির প্রতি যথেষ্ট দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। সকলেরই জানা আছে যে, মানুষের আহার্যের তিনটি প্রধান খাদ্যসামগ্রী রয়েছে—কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন এবং ভোজ্য তেল ও চর্বি।

তেল ও চর্বির ভিতরে যে উপাদান unsaponifiable (অর্থাৎ যেটুকু সাবানে পরিণত হতে চায় না বা হবার অযোগ্য) নামে জ্ঞাত, তারাই এখানে (অর্থাৎ মনুষ্যের বিপাকক্রিয়ায়) উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। যা দিয়ে এই unsaponifible অংশটুকু গঠিত, তা হলো—lipoids, lipo-proteins, sterols এবং হাইড্রোকার্বনসমূহ। চর্বির অণুর সঙ্গে এরা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। যদিও এদের মাত্রা স্বল্প, এরাই কিন্তু তথাকথিত থ্রম্বাসের (Thrombus) গঠন ও জমাট্রক্তের জন্যে দায়ী। এদের মধ্যে কয়েকটিই তরল এবং অসম্পৃক্ত (Unsaturated), তাদের আয়োডিন অঙ্ক (Iodine value) অত্যন্ত বেশী। এরাই আবার হাইড্রোজেনপরিশীলিত (Hydrogenated) হলে এমন সব নানাধার কঠিন পদার্থের উদ্ভব করে, যাদের গলনবিন্দু বেশী। হৃদ্‌যন্ত্রে তারাই সম্ভবতঃ চর্বির আস্তরণ ও থ্রম্বাসসমূহ সৃষ্টিতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে।

এখন তেল-চর্বি মানেই হলো মিশ্র-গ্লিসিরাইড (বা গ্লিসারিনের সঙ্গে মেদজ অম্ল বা ফ্যাটি অ্যাসিডগুলির এস্টার)। আর যে সমস্ত তেলের ভিতর নিম্ন গলনবিন্দুর মিশ্র গ্লিসিরাইডের ভার বেশী, তারা ব্যবহৃত হলে কঠিন আস্তরণ ও জমাটবাঁধা (Solid increasation and clots) স্বাভাবিকভাবেই ব্যাহত হয়।

E.F.A ও তার প্রভাব

অসম্পৃক্ত অ্যাসিডগুলির গ্লিসিরাইডসমূহ, বিশেষ করে লিনোলেইক গ্লিসিরাইডগুলি মুখ্য মেদজ অ্যাসিড (Essential Fatty Acid বা সংক্ষেপে E.F.A.) নামে পরিচিত। মানুষের দৈহিক তাপে যে সব অ্যাসিড তরল অবস্থায় থাকে, তারা হলো—

ওলিইক্ $CH_3.(CH_2)_7.CH=CH.(CH_2)_7$ $COOH$ (অর্থাৎ $C_{18}H_{34}O_2$)

লিনোলিকি $CH_3(CH_2)_4.CH=CH.CH_2$ $CH=CH.(CH_2)_7.COOH$ অর্থাৎ $C_{18}H_{32}O_2$)

লিনোলেনিক্ $CH_3.CH_2CH=CH.CH_2.$ $CH=CH.CH_2CH=CH(CH_2)_7.$ $COOH$ (অর্থাৎ $C_{18}H_{30}O_2$)

লক্ষণীয় বিষয় এই যে, দ্বিত্ব বন্ধনের (Double bond) অবস্থিতি প্রথমোক্তটিতে একটি, দ্বিতীয় অ্যাসিডে দুটি এবং তৃতীয়তে তিনটি। আর এই দ্বিত্ব বন্ধনে নির্দিষ্ট ব্যবস্থাধীনে হাইড্রোজেন পরমাণু যুক্ত হওয়ার অবাধ ও অনায়াসে সুযোগ দেয়। উপরের তিনটি ফ্যাটি অ্যাসিডই অসম্পৃক্ত পর্যায়ভুক্ত।

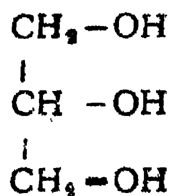
এখন দেখা গেছে যে, পূর্বোক্ত ওলিইক গ্লিসিরাইড সব তেল বা চর্বিতে মেলে।

লিনোলেইক গ্লিসিরাইডগুলি কতক তেলে পাওয়া যায় (কিন্তু ওলিইকের মত তত ব্যাপক ভাবে নয়)। আর কাঠে পেন্ট বা রঞ্জন কাজে ব্যবহৃত তেলে (যথা তিসির তেল) লিনোলেনিক গ্লিসিরাইডের মাত্রাধিক্য। মাছের তেলের গ্লিসিরাইডে যে সবচেয়ে বেশী, তাহলো ক্লুপানোডোনিক অ্যাসিড ($C_{22}H_{34}O_2$)। লিনোলেইক অ্যাসিডই E.F.A. রূপে সমাদর লাভ করছে। অবশ্য অ্যারাকাইডোনিক অ্যাসিডও লিনোলিইকের মতই প্রয়োজনীয়।

নিম্নে বিভিন্ন তেলে E.F.A-এর গড়পড়তা শতকরা হার দেওয়া হলো :

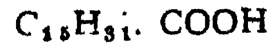
সূর্যমুখীর তেল	60%
ভুট্টার তেল	50%
বাদাম তেল	8-25%
তুলাবীজের তেল	43%
শূকরের চর্বি	10%
তিল তেল	38%

পূর্বোক্ত তিন শ্রেণীর আহার্যের ভিতর (যথা—কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও ভোজ্য তেল-চর্বি) তেল এবং চর্বির মধ্যে নিগূঢ়ভাবে দেখলে কোন পার্থক্য নেই, তারা নির্দ্বিধায় সমতুল (তাদের রাসায়নিক গঠনভঙ্গীমা বা সংবৃতি যাই থাক না কেন)। তবে সাধারণ দৃষ্টিতে তেল স্বাভাবিক অবস্থায় তরল, পক্ষান্তরে চর্বি কঠিন। আগেই বলা হয়েছে যে, তেল ও চর্বি হলো মিশ্র ফ্যাটি অ্যাসিডের গ্লিসিরাইডের একত্র সমাহার। এখন গ্লিসারিন (বা রসায়নসম্মত আখ্যা গ্লিসিরল) হলো

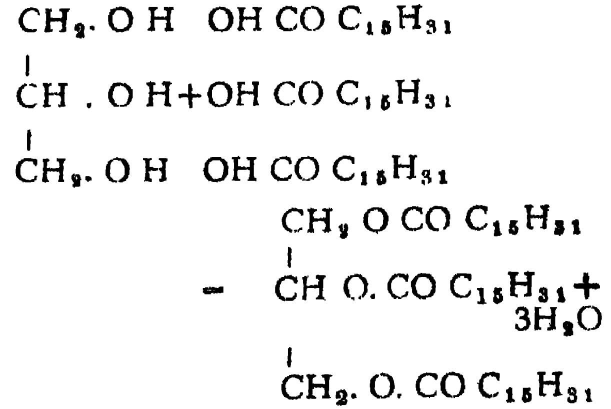


ধরা যাক পামিটিক অ্যাসিডের (Palmitic acid) কথা।

রসায়ন মতে পামিটিক অ্যাসিড হলো—



সুতরাং গ্লিসারিনের সঙ্গে পামিটিক অ্যাসিডের যে গ্লিসারাইড পাওয়া যায়, তা নিম্নোক্তরূপে সম্ভব :



ট্রাই-পামিটিন

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, এক-একটি গ্লিসারিন অণুর জন্যে প্রয়োজন তিনটি পামিটিক অ্যাসিডের অণু (যার ফলে তেল-চর্বির উদ্ভব হয়)। অনুরূপভাবে দেখা যায় যে, তিনটি পামিটিক অ্যাসিডের পরিবর্তে দুটি বা একটি পামিটিক অ্যাসিড হয়তো অংশগ্রহণ করেছে, আর ঐ সঙ্গে হয়তো একটি স্টিয়ারিক অ্যাসিড এবং একটি লরিক অ্যাসিড। এটা তো অসম্ভব ব্যাপার কিছু নয়! কোন তেল বা চর্বির ভিতর একদিকে যেমন খাঁটি গ্লিসিরাইড থাকে, সঙ্গে সঙ্গে মিশ্র গ্লিসিরাইডও থাকতে দেখা যায়।

মানবদেহের তাপমাত্রা 35-37° সেন্টি.। ট্রাই-গ্লিসিরাইডগুলি ও তার ভিতরের অ্যাসিডগুলির স্বরূপ ও প্রকৃতি এবং (মানবদেহের তাপমাত্রার তুলনায়) তাদের গলনবিন্দু কত, সে দিকে লক্ষ্য রাখা বিশেষ দরকার। এখন অসম্পৃক্ত অ্যাসিডগুলি ও তাদের গ্লিসিরাইডগুলি সচরাচর কম গলনবিন্দু যুক্ত হয়; তবে এইগুলিতে কার্বন পরমাণুর সংখ্যা বেশ কিছু বেশী (সচরাচর C_{16} থেকে C_{18})। অসম্পৃক্ত ছাড়া সম্পৃক্ত (Saturated) অ্যাসিডও রয়েছে; যেমন—

বিউটাইরিক (C_4), ক্যাপরইক (C_6), ক্যাপরাইলিক (C_8), ক্যাপরিক (C_{10}), লরিক (C_{12}), মাইরিস্টিক (C_{14}), পামিটিক (C_{16}), স্টিয়ারিক (C_{18}), অ্যারাকাইডিক (C_{20}), বিহিনিক্ (C_{22}), লিগনোশিরক (C_{24}) ইত্যাদি। তবে এখানে বলে রাখা দরকার যে, সম্পৃক্ত পর্যায়ের এই তালিকার ক্যাপরিক অ্যাসিড পর্যন্ত যতগুলি অ্যাসিড রয়েছে, সেগুলির গলনবিন্দু কম (অবশ্য দৈহিক তাপের অনুপাতে)।

আর লরিক (C_{12}) থেকে অগ্রবর্তী অ্যাসিডগুলি ও তাদের গ্লিসিরাইডগুলির গলনবিন্দু উচ্চ অর্থাৎ 44° সেন্টিগ্রেডের বেশী। বিষয়টির দ্বিরুক্তি করলে সরল কথায় এই তাৎপর্য দাঁড়ায় যে, ফ্যাটি অ্যাসিডের অসম্পৃক্ত গ্লিশিরাইডগুলি এবং C_{10} পর্যন্ত সম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের গ্লিসিরাইডগুলি নিম্ন গলনবিন্দুসমন্বিত (মানবদেহের তাপক্রমের তুলনায়)। সুতরাং এই হিসাবে সম্পৃক্ত এবং অসম্পৃক্ত উভয় বর্গের ঐ গ্লিশিরাইডগুলিকে একই পর্যায়ভুক্ত করা যেতে পারে নিশ্চিন্তে।

চিকিৎসা-জগতে তেল এবং চর্বির শোষণের (Resorption) বিষয়ে যে তুলনামূলক পরীক্ষণ করা হয়, তাতে মোট সম্পৃক্ত অ্যাসিড ও তাদের গ্লিশিরাইডগুলি ও মোট অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডগুলি ও তাদের গ্লিশিরাইডগুলির অনুপাত গণনা করা হয়। এক্ষেত্রে যেন মনে করা হয় যে, (কার্বন পরমাণুর সংখ্যা নির্বিশেষে) সকল সম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডগুলি অনুরূপ ভৌত ও রাসায়নিক গুণসমন্বিত। কিন্তু ব্যাপারটি আপাতদৃষ্টিতে ঠিক মনে হলেও আসলে অযৌক্তিক এবং এর সংশোধন হওয়া উচিত।

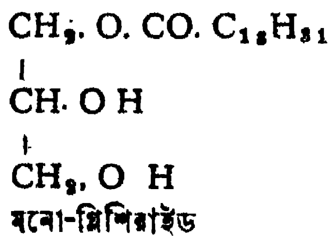
ভোজ্য তেল-চর্বির ব্যাপারে এটাই দেখা যায় যে, নিম্ন আণবিক ওজনের সম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডগুলির গ্লিশিরাইডের অনেকগুলি গলনবিন্দু দৈহিক তাপমাত্রার নিচে এবং তার দরুন সহজে আত্মীকরণযোগ্য (Assimilable) ; যেমন ঘি। সুতরাং চিকিৎসা-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে লরিক (ফ্যাটি অ্যাসিড) পর্যন্ত গ্লিশিরাইডগুলি অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডগুলির গ্লিশিরাইডের একই শ্রেণীতে ধরা উচিত। কারণ এরা সকলেই নিম্ন গলনবিন্দুযুক্ত।

উপরন্তু আরো কয়েকটি বিষয় ধর্তব্যের মধ্যে আসবে ; শুধু সম্পৃক্ত এবং অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডগুলির অনুপাত গণনা করেই ক্ষান্ত থাকা উচিত নয়। তেল ও চর্বির গ্লিশিরাইডগুলির এক-একটি অণুর স্বরূপও নিতান্তই প্রয়োজনীয় বিষয়, যেহেতু অণুর চরম গলনবিন্দু নির্ভর করে তিনটি আলাদা আলাদা মূলকের (Radical) সম্মিলিত গলনবিন্দুর উপর। এই মূলক দিয়েই গ্লিশিরাইড হয়। এখানেই ঘিয়ের প্রাপ্ত বিমিশ্র (Heterogenous) গ্লিশিরাইডের ভূমিকা এসে পড়ে। মিশ্র গ্লিশিরাইডের অণুসমূহের (যেমন ঘিয়ে) অধিকাংশ দৈহিক তাপমাত্রার নিচে গলনবিন্দুযুক্ত হবে—যদিও চরম বিশ্লেষণে দেখা যেতে পারে যে, উচ্চ গলনবিন্দুর অ্যাসিডগুলি বেশ অনুভবযোগ্য শতকরা হারে রয়েছে। এই জন্যেই পিত্তশূলীর বা ঐ রকম ব্যাধিতে ঘিয়ের উপকারিতার কারণ আরোপ করা যায়। তাইতো অধিকাংশ ব্যারামে মাখন ও ঘিয়ের কোন পরিবর্ত (Substitute) জিনিষ নেই—এটাই হলো চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কথা।

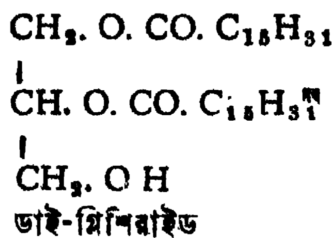
গবাদি পশুর চর্বি, শূকরের চর্বি এবং কোকো-চর্বি (নারকেল তেল নয়) যদিও রাসায়নিক উপাদান হিসাবে অনুরূপ সংযুক্তিসম্পন্ন, তথাপি কোকো-চর্বির (গলনবিন্দু 32-36° সেন্টি.) গ্লিসারিন অংশকে (মূলকে) অণুগুলির বিন্যাস এমনি ধরণের যে, তা গবাদি পশুর চর্বি ও শূকরের চর্বির (যাদের গলনবিন্দু 42-50°C) চেয়ে যথেষ্ট উৎকৃষ্ট।

প্রাণ-রসায়নের মতবাদ এবং গলনবিন্দুর নিয়মানুসারে তেল-চর্বি শোষণ

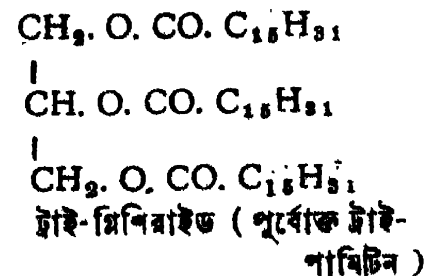
প্রাণ-রসায়নের মতে, মানুষের দেহতন্ত্রে তেল-চর্বি তখনই আত্তীকরণ সম্ভব, যখন নাকি তারা চলমান অবস্থায় গৃহীত হয়, অর্থাৎ তরল বা বায়বীয় আকারে। অবস্থাটি হলো অবদ্রবীভূত (Emulsified) তরল পদার্থেরই নামান্তর মাত্র। অগ্ন্যাশয়ের (Pancreas) পচন-যোগ্য জিনিষের সংস্পর্শে গ্লিসারিন ও ফ্যাটি অ্যাসিডগুলিতে বিভক্ত হবার আগে এই অবদ্রবীভূত তরল পদার্থই কার্যকর হবে। স্পষ্টতঃ তরল অবদ্রবীভূত অথবা তরল অবস্থান্তরে প্রতিটি গ্লিশিরাইড অণুও পচনের (Ferment) সংস্পর্শে বিক্রিয়ার ফলে বিষয়টি কি দাঁড়ায়, তা দেখা যাক। উচ্চ গলনবিন্দুর অণু থাকলে তার বিভাজনের সম্ভাবনা নিতান্তই নগণ্য। এমন এক সময় ছিল, যখন মনে করা হতো যে, গ্লিশিরাইড অণু বিভক্ত হয়—গ্লিশারিন ও তিনটি অ্যাসিড মূলকে (Radical)। আর এই মূলকগুলি যে একই রকমের অর্থাৎ অনুরূপ হবে, এমন কোন কথা নয়—বিষমও (Dissimilar) হতে পারবে। বিভাজনের ফলে ফ্যাটি অ্যাসিডগুলি একদিকে যেমন (ক) তাপশক্তি যুগিয়ে থাকে এবং (খ) অপরদিকে তেমনি সংশ্লেষণের ফলে নতুন নতুন চর্বির উদ্ভব হয়ে যায়—তারাই আবার ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়ে থাকে। আধুনিক গবেষণামতে বিভাজন বিক্রিয়া একক (Mono) এবং দ্বৈত (Di) গ্লিশিরাইড পর্যন্ত হয়েই থেমে যায়। কারণ এরা হলো উত্তম অবদ্রবীভবনের নিয়ন্তা (Emulsifying agents)। আর তারা চর্বির পশ্চাৎবর্তী বিভাজন, আত্তীকরণ ও পরিবহনে সহায়ক হয়ে থাকে। সুতরাং এটা পরিস্ফুট হয়ে যাচ্ছে যে, অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডগুলির গ্লিশিরাইড এবং নিম্ন আণবিক ওজনের সম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডগুলির গ্লিশিরাইডের ক্ষেত্রে তেল-চর্বির শোষণকার্য স্বভাবতঃই হয়ে থাকে বেশী। বিপরীতভাবে উচ্চ গলনবিন্দুর গ্লিশিরাইড এবং উচ্চ আণবিক ওজনের সম্পৃক্ত অ্যাসিডগুলি শোষণক্রিয়ার বিঘ্নের সৃষ্টি করে।



মনো-গ্লিশিরাইড



ডাই-গ্লিশিরাইড



ট্রাই-গ্লিশিরাইড (পূর্বোক্ত ট্রাই-পামিটিন)

তালিকা	উচ্চ গলনবিন্দুর Saturated অম্লসমূহ	ভোজ্য তেল-চর্বির গঠনপ্রণালী ওলেইক	লিনোলেইক
পরবর্তী তালিকায় সাঙ্কেতিক→	(ক)→	(গ)→	(ঘ)
প্রথম শ্রেণী : (জান্তব চর্বি) :			
(ক) ভেড়ার চর্বি	57%	40%	3%
(খ) শূকরের চর্বি	36%	54%	10%

তালিকা	উচ্চ গলনবিন্দুর Saturated অম্লসমূহ	ভোজ্য তেল ও চর্বির গঠনপ্রণালী ওলেইক	লিনোলেইক
দ্বিতীয় শ্রেণী : (উদ্ভিজ্জ তেল) :	[অধিকাংশই ভারতে ব্যবহৃত]		
(ক) সয়াবীন তেল	12%	34%	54%
(খ) তিল তেল	14%	48%	38%
(গ) সরিষার তেল	4%	50+26% ↓ ইউরিসিক অ্যাসিড	20%
(ঘ) বাদাম তেল	18%→	62%	20%
(ঙ) অলপাইয়ের তেল	12%	80%	8%
(চ) তুলাবীজের তেল	23%	33%	44%
তৃতীয় শ্রেণী :			
(ক) নারকেল তেল	26%	2%	74% ↓ নিম্ন গলনবিন্দুর সম্পৃক্ত অ্যাসিডসমূহ

ঘি হলো স্বশ্রেণীতে একক। কারণ এতে রয়েছে মিশ্র গ্লিসিরাইডগুলির অত্যন্ত জটিলতা (যা অন্য কোন চর্বিতে পাওয়া যায় না)। এই জন্যেই এর প্রতিটি অণু বিভাজন ও আত্তীকরণ-যোগ্য (প্রায় 92%)। এক কথায় ঘিয়ের প্রতি 100টি অণুর মধ্যে 92টি অণু নিম্ন গলনবিন্দু সমন্বিত এবং সহজে পাচনযোগ্য। এর পাচন-যোগ্যতা মান সর্বাধিক অর্থাৎ 21। অতি আধুনিক গবেষণা অনুযায়ী ঘিয়ে প্রায় 26টি সম্পৃক্ত অ্যাসিড রয়েছে। অন্য কোন তেল বা চর্বির এই রকমের নিম্ন আণবিক ওজনের সংযুক্তিসম্পন্ন হতে দেখা যায় না। আর সংযুক্তি হিসেবে (গব্য বা ভয়সা) ঘৃতই সর্বাগ্রগণ্য, তার পরেই নারকেল তেলের স্থান।

Athero-sclerosis* রোগে প্রধান বিষয় হলো যে, ক্ষতের গভীরতম আবরণ থাকে চর্বি (Natural-fat), ফস্‌ফোলিপিড, বিশেষ করে কোলেস্টেরল ও তার এস্টারসমূহ। এটা ধরে নেওয়া হয় যে, মেদজ ব্যাধি জমায়েতের জন্যে atheroma-র (আঁশের মত গঠন) সূত্রপাত হয়। রক্তবাহী নালীগুলিতে যে ছিদ্র থাকে (lumen), তাতে ধাক্কা দেয় এই জমাটবাঁধা অংশগুলি (জলবাহী নলে আস্তরণ পড়লে যেমন জলের নলগুলিতে সক্রিয় ব্যাসের হ্রাস ঘটে থাকে) সেই রকম রক্ত সঞ্চালনের ব্যাসের সঙ্কোচন হয় এবং ক্রমে ক্রমে রক্ত চলাচল কমে আসে। প্রক্রিয়াটি যখন অগ্রসর হতে থাকে, তখন রক্ত জমাটবাঁধার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায় এবং রোগদুষ্ট হয়ে যায়। অথবা বিকল্পরূপে ক্ষত ছিদ্রান্বিত (lapillarised) হয়ে রক্তক্ষরণের উদ্ভব করে। সুতরাং গড়ে উঠবে মেদজ ছিট্ ছিট্ বিক্ষিপ্ত অংশ ও সুতার মত আস্তরণ। এরাই উদ্ভব করতে পারে সেই সমস্ত উপাদানসমূহের, যাদের মধ্যে থাকে উচ্চ গলনের হাইড্রোকার্বনসমূহ, মোম-

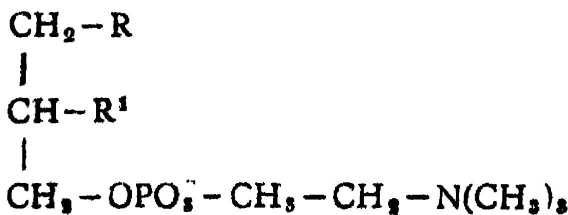
* ধমনীগুলি শক্ত হয়ে যাওয়ার অ্যাথিরো-স্ক্লেরোসিসের উদ্ভব। এতে রক্তবাহী নালীর গায়ের ভিতরের আবরণে পেশীর মত স্থিতিস্থাপক অথবা সুতার মত তন্তুরাজি গজিয়ে ওঠে।

সমূহ, লিপোয়েড, স্টেরল ও তাদের এস্টার সমূহ এবং ক্যালসিয়াম ফসফেট, পামিটেট এবং স্টিয়ারেটসমূহের (যারা এক কথায় Unsaponifiable রূপে জ্ঞাত) ক্যালসিফিকেশন সঞ্চয় বা আস্তরণ।

লিপোয়েডগুলি* প্রকৃতিজাত তেল-চর্বিতে বিদ্যমান থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রোটিন ও চর্বি থেকে মানবদেহে সংশ্লেষিত হয়ে থাকে—যে সমস্ত চর্বি ও প্রোটিন নিছক প্রয়োজনবশতঃই উদরসাৎ করা হয়।

করোনারী হৃদ্‌রোগে (Coronary thrombosis) একটা প্রয়োজনীয় বিষয় হলো আস্তরণ ফলক (Plaque) গঠন। এই আস্তরণ ফলকগুলি মুখ্যতঃ লিপোয়েডের দ্বারাই গঠিত মনে করা হয়।

লিপোয়েডগুলির আণবিক গঠনপ্রণালী—



গোদুগ্ধে লিপোয়েডের পরিমাণ 0·4 থেকে 0·8%। মাখনে ফস্ফো-লিপোয়েডের মাত্রা অল্প।

এখন স্নায়ু, পেশী, মস্তিষ্ক ইত্যাদির গঠনের জন্যে প্রয়োজন নাইট্রোজেন ও ফস্‌ফরাসের। প্রয়োজনীয় বিষয় হলো ফ্যাটি অ্যাসিডের (উপর্যুক্ত, R, R[1]) স্বরূপ এবং তাদের গলনবিন্দু। পালাক্রমে গলনবিন্দু অ্যাসিডের স্বরূপের উপর নির্ভরশীল; যথা—সম্পৃক্ত অথবা অসম্পৃক্ত এবং কার্বন শৃঙ্খলের দৈর্ঘ্য। একথা আগেই বলা হয়েছে যে, উদ্ভিজ্জ তেলের অধিকাংশ অসম্পৃক্ত অ্যাসিডগুলি (E.F.A.) নিম্ন গলনবিন্দুসমন্বিত, তাদের কার্বন শৃঙ্খলের দৈর্ঘ্য সত্ত্বেও অসম্পৃক্ত হবার ফলে (অর্থাৎ দ্বিত্ববন্ধন থাকার দরুণ) ঐ অংশে (অক্সিডেশন হবার ফলে) ভাঙন ধরে এবং আত্তীকরণ ও সংশ্লেষণের নতুন পথ এরূপে উন্মুক্ত হয়ে যায়। আর C_{10} (ক্যাপরিক) পর্যন্ত সম্পৃক্ত অ্যাসিডগুলিও নিম্ন গলনবিন্দুর; সুতরাং তরল এবং আত্তীকরণযোগ্য।

অসুবিধার সৃষ্টি হয় C_{10}-এর উর্ধ্ব সংখ্যক সম্পৃক্ত (এবং উচ্চ গলনবিন্দু সমন্বিত) অ্যাসিডগুলির ক্ষেত্রে, কারণ তখন লিপোয়েড অণুগুলি আত্তীকরণের ব্যাপারে প্রতিবন্ধক। এই প্রয়োজনীয় বিষয়টি বনস্পতি বা হাইড্রোজেনেটেড উদ্ভিজ্জ বা মাছের তেলের আত্তীকরণে বিশেষরূপে পরিগণিত হওয়া উচিত। তাদের লিপোইয়েডগুলির ক্ষেত্রেও এই কথা প্রযোজ্য। এই বিষয়টি লক্ষণীয় ও প্রণিধানযোগ্য। খাদ্যরূপে গৃহীত এই সমস্ত চর্বি সৃষ্টি করে আস্তরণ ফলকগুলির সঞ্চয়ন এবং সেই সঙ্গে অপরাপর দানা বাঁধা পদার্থরাজি। হাইড্রোজেনেটেড মাছের তেলের বেলায় অসুবিধা আরো বেড়ে যায়—কারণ তাতে উচ্চ আণবিক ওজনের উচ্চ গলনের সম্পৃক্ত পর্যায়ের হাইড্রোকার্বন এবং মোম থাকে আর ঐ একই সঙ্গে থাকে ক্লুপানোডোনিক অ্যাসিডজাত উচ্চ গলনবিন্দুর সম্পৃক্ত গ্লিসিরাইডসমূহ।

স্টেরলবর্গ* ও তাদের সংযুক্তি

কোলেস্টেরল (Cholesterols) হলো উচ্চ

* লিপিড ও লিপোয়েড (Lipid and Lipoid)—চর্বির সঙ্গে নিকট সম্পর্কযুক্ত একশ্রেণীর পদার্থরাজি রয়েছে, যারা ফস্‌ফেটাইড (ফস্‌ফোলিপিন, ফস্‌ফোলিপিড) নামে জ্ঞাত। স্নেহজ ধরণের জিনিষ এগুলি এবং সকল জান্তব ও উদ্ভিজ্জ কোষের মুখ্য উপাদান। এগুলি ট্রাইগ্লিসিরাইড। এতে রয়েছে দুটি দীর্ঘ-শৃঙ্খল ফ্যাটি অ্যাসিড, যেমন স্টিয়ারিক অথবা ওলিইক অ্যাসিড এবং একটা ফস্‌ফোরিক অ্যাসিড উদ্বৃত্তা এই শেষোক্তটির সঙ্গে কোলিনের (Choline) মত ক্ষারক (Base) সংযুক্ত থাকে] অনুবাদক

* সব স্টেরলই পড়ে মিশ্র অ্যালকোহল বর্গের পর্যায়ে। অংশতঃ মুক্ত এবং অংশতঃ

গলনের অসম্পৃক্ত সেকেণ্ডারী অ্যালকোহল। প্রত্যেক তেল বা চর্বিতে শতকরা কিছু পরিমাণ স্টেরল আছে। উদ্ভিজ্জ তেল বা চর্বিতে থাকে ফাইটোস্টেরল (গলনবিন্দু 132-144° সেন্টি; রশ্মিক দানা)। আর জান্তব তেল চর্বির অন্যতম উপাদান কোলেস্টেরল (গলনবিন্দু 148·5°-150·8° সেন্টি, সূঁচের আকারের দানাবিশিষ্ট)। এরা পরস্পর হলো isomer এবং এদের উভয়েরই আণবিক গঠন $C_{27}H_{45}OH$, কিন্তু উভয়ের গলনবিন্দুতে পার্থক্য রয়েছে।

সুতরাং ভারতে যাঁরা নিরামিষাশী, তাঁদের আহার্য তেলের (ঘি ছাড়া) ভিতর রয়েছে ফাইটোস্টেরল ও তার এষ্টার ইত্যাদি। এখন যে প্রশ্ন অমীমাংসিত রয়ে যাচ্ছে, তা হলো—ফাইটোস্টেরলের কি পরিণতি ঘটে? এটা কি অব্যবহৃত থেকে বেরিয়ে যায় অথবা এটা পরিবর্তিত হয় অথবা এর isomer-এ রূপান্তরিত হয়?

উদ্ভিজ্জ স্টেরল বিষয়ক গবেষণাকার্য নিতান্তই স্বল্প হয়েছে। জনৈক বিশেষজ্ঞের মতে, জীবদেহে অন্ত্র বা তন্তুরাজির ভিতর ফাইটোস্টেরল রূপান্তরিত হচ্ছে কোলেস্টেরলে। ফাইটোস্টেরলযুক্ত উদ্ভিজ্জ বীজ আহারান্তে গবাদিপশুর সঞ্চিত চর্বিতে কোলেস্টেরলের উপস্থিতি ঘটে এই হেতু।

পশ্চিম জার্মেনীর অধ্যাপক Dr. H. P. Kaufmann-এর মতবাদ নিম্নোক্তরূপ: মানবদেহে রক্ত, যন্ত্রাদি (Organ) এবং তন্তুরাজির মধ্যস্থ মোট কোলেস্টেরলের 10% বেশী মুক্ত

এস্টারের ছদ্মবেশে বহু প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ তেল-চর্বিতে এদের পাওয়া যায়। কোলেস্টেরল আর আরগোস্টেরল (Ergosterol)-এর মধ্যে কোলেস্টেরল একমাত্র প্রাণী-জগতে পাওয়া যায়; আরগোস্টেরল প্রাণী ও উদ্ভিদ উভয়ের মধ্যেই পাওয়া সম্ভব। ফাইটোস্টেরল এবং স্টিগমাস্টেরল ইত্যাদি উদ্ভিজ্জেই সুলভ। শেষোক্তগুলি সমষ্টিগতভাবে ফাইটোস্টেরল নামে প্রচলিত। অনুবাদক

কোলেস্টেরল (Exo-cholesterol) থাকে না। এই পরিমাণটাও প্রাণী-জগতের সেই খাদ্যাংশ থেকে উদ্ভূত হয়; যেমন—মাংস, গোচর্বি অথবা শূকরের চর্বি। অধুনা তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সাহায্যে এটা দেখানো সম্ভব হয়েছে যে, যদিও (Gastro-intestine অংশ থেকে) ফাইটোস্টেরল শোষণ কোলেস্টেরলের চেয়ে কম, এই ফাইটোস্টেরলগুলির কিয়দংশ নিশ্চিতরূপে রক্তে শোষিত হয়েছিল। এটাও দেখা গেছে যে, সাইটো-ভেজিটো স্টেরলসমূহ কোলেস্টেরলের তুলনায় দ্রুততর হারে বের হয়।

এতদিন মনে করা হতো যে, জান্তব (সুতরাং সম্পৃক্ত) এবং উদ্ভিজ্জ (সেই কারণে অসম্পৃক্ত) চর্বি অপরিবর্তনীয়, অন্ততঃ সিরাম-কোলেস্টেরলের উপর তাদের প্রভাব সম্পর্কে। মাংসাহারীদের সঙ্গে নিরামিষাশীদের পৌষ্টিক অনুসন্ধানের তুলনায় জানা যায় যে, উচ্চ গলনবিন্দুর সম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড খাবার সঙ্গে বেশী মাত্রায় প্লাজ্‌মা-কোলেস্টেরলের সীমার সম্বন্ধ রয়েছে; অর্থাৎ এসব ক্ষেত্রে হয়ে থাকে অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডগুলির (যাদের গলনবিন্দু কম) অভাব। ইউরোপীয় আখ্যায় নিরামিষভোজীরা দুধ ও ডিম গ্রহণ করে। সম্পূর্ণ নিরামিষাশীদের (যাঁরা অবাধে উদ্ভিজ্জ তেল খান) প্লাজ্‌মা-কোলেস্টেরল ইউরোপীয় নিরামিষাশীদের চেয়ে কম।

আরো লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, উভয়-শ্রেণীর নিরামিষাশীদের কোলেস্টেরল সীমা (আমিষভোজী বর্গের চেয়ে) নিম্নতর। এটাও দেখানো হয়েছে যে, আহার্য কোলেস্টেরল হ্রাস পেলে প্লাজ্‌মা-কোলেস্টেরল হ্রাসের ব্যাপার নিতান্ত নগণ্য। কতকগুলি তথ্যের উপর ভিত্তি করে বলা হয়েছে যে, কতক কতক উদ্ভিজ্জ স্টেরল শোষিত হয়ে কোলিক (Cholic) অ্যাসিডে (কোলেস্টেরলের মত) রূপান্তরিত হয়। উদ্ভিজ্জ (Ergo) স্টেরলের শোষণ করেক বহুর

পূর্বেই প্রমাণিত হয়েছে [Men-Schick এবং Page দ্বারা (1932)]। প্রাণীদেহে তন্তুগুলিতেও আর্গো-স্টেরল (কাইটো) রয়েছে। বিবর্তনের নিম্নতর পর্যায়ে (যেমন—Yeast) উভয় স্টেরলই এক সঙ্গে দৃষ্ট হয়।

কোলেস্টেরল সীমা

শেষ পর্যন্ত মনে রাখতে হবে যে, কোলেস্টেরল নিতান্তই প্রয়োজন এবং একে পরিহার করবার চিন্তা হলো অন্যায়, কারণ এছাড়া কোন Bile-acid বা হর্মোন হবে না। প্রশ্ন হচ্ছে কতটা? তেল বা চর্বি (যথা ঘি) শুধুমাত্র কোলেস্টেরলের অস্তিত্বের দরুণই বর্জিত হওয়া ঠিক নয়। এই বিষয়টি চিকিৎসাবিদ্যায় প্রমাণিত হয়েছে, বিশেষ করে ঘিয়ের ব্যাপারে।

প্রয়োজনীয় ভোজ্য তেল-চর্বির কোলেস্টেরলের পরিমাণ নিম্নোক্তরূপ (প্রতি 100 গ্র্যামে) ডিমের কুসুম 2000 মিলিগ্র্যাম; টাট্‌কা ডিম (সম্পূর্ণ) 462 মিলিগ্র্যাম; মেষশাবক মাংস 610 মিলিগ্র্যাম : শূকরের মাংস 420 মিলিগ্র্যাম, ঘি 280 মিলিগ্র্যাম, এরা এস্টার হিসাবে থাকে। এই কোলেস্টেরলের পরিমাণই কোলেস্টেরল-সীমা নির্ধারণে প্রয়োজনীয় ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে।

কোলেস্টেরলের এস্টারসমূহ

কোলেস্টেরলের সীমা আলোচনা কালে তাদের এস্টারগুলিরও বিশেষরূপে পর্যালোচিত হবার যোগ্য। ফ্যাটি অ্যাসিডসমূহের স্বরূপ ও তাদের আণবিক ওজনের উপর এস্টারের গলনবিন্দু নির্ভরশীল। যথা—স্টিগ্‌মা স্টেরল (এক প্রকারের উদ্ভিজ্জ স্টেরল) (গলনাঙ্ক 168-170° সেন্টিগ্রেড) থেকে পাওয়া যায়—স্টিগ্‌মা স্টিয়ারেট, গলনবিন্দু 101° সেন্টিগ্রেড, স্টিগ্‌মা ওলিয়েট, গলনবিন্দু 88° সেন্টিগ্রেড, অ্যাসিডগুলির অসম্পৃক্তির মাত্রা যত বেশী এস্টারের গলনবিন্দু ততই নিম্নগামী, কিছুটা সীমা পর্যন্ত। সম্পৃক্ত অ্যাসিডগুলির চেয়ে অসম্পৃক্ত অ্যাসিডগুলির (E. F. A) কার্বন শৃঙ্খলের দৈর্ঘ্য এস্টারের গলনবিন্দুর উপর একই হারে প্রভাব বিস্তার করে না। কোলেস্টেরলের ক্ষেত্রে এর ওলিয়েটের গলনবিন্দু 44·5° সেন্টিগ্রেড এবং একটি লিনোলিয়েট প্রায় 420° সেন্টিগ্রেড। (অসম্পৃক্ত অ্যাসিডগুলির) এই ধরণের এস্টারগুলি মনুষ্যদেহে (অক্সিডেশনের দরুণ) সহজে বিভাজিত হয়ে আত্তীকরণের যোগ্য হয়। তারা তুলনা-মূলকভাবে নিম্ন গলন পদার্থেরও উদ্ভব করে।

শীলের (Seal) তেলে পর্যাপ্ত মাত্রায় রয়েছে কোলেস্টেরল। এস্কিমোরা যথেষ্ট মাত্রায় তা খেয়ে থাকে, তবুও তাদের হৃদ্‌রোগ বা থ্রম্বোসিস হয় না এবং এই রোগে তারা অত্যন্ত কম ভুগে থাকে। এর কারণ শীলের তেলে রয়েছে (কোলেস্টেরলের এস্টার হিসাবে) অসম্পৃক্ত শ্রেণীর ফ্যাটি অ্যাসিড (E. F. A.)

মার্জারিন, তার উৎপাদন ও গঠনপ্রণালী

ইউরোপের দেশসমূহে ভোজ্য চর্বির ক্ষেত্রে মার্জারিনের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে এবং মাখনের বিকল্প হিসাবেও। এর কোন সুনির্দিষ্ট মান বা standard নেই। আগেকার দিনে বিশোধিত গো-চর্বি এবং গাঁজানো (Fermented) দুধ থেকে মার্জারিন তৈরি হতো, যাতে নাকি মাখনের মত অবয়ব পাওয়া যেত। এর ভিতর থাকতো প্রায় 16% যুক্ত (Combined) জল। চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিশোধিত গো-চর্বির স্থলে ব্যবহৃত হতে লাগলো মুখ্যতঃ হাইড্রোজেনেটেড বাদাম তেল (ভারতে) এবং মাছের তেল (ইউরোপ ও আমেরিকায়)। উদ্ভিজ্জ তেলের তুলনায় স্বল্প মূল্যের হবার দরুণ হাইড্রোজেনেটেড মৎস্য-তৈলের উৎপাদন ও বিক্রয় জাপান, আমেরিকা

ও ইউরোপে বৃদ্ধি পাচ্ছে দ্রুতহারে। এখনকার দিনে এর ভিতর থাকছে হাইড্রোজেনেটেড মৎস্য বা বাদাম তেল, তিল তেল, নারকেল তেল অন্যান্য ভোজ্য তেল এবং দুগ্ধ সিরাম। এর গড়পড়তা গঠনপ্রণালী—প্রায় 32-35% হাইড্রোজেনেটেড তেল, 15-20% অন্যান্য উদ্ভিজ্জ তেল, প্রায় 40-50% নারকেল তেল এবং 16% জল (আইনের দ্বারা এই শেষোক্ত বিষয়টি বিধিবদ্ধ)। উপাদানসমূহের ইতরবিশেষ হয়ে থাকে কাঁচামালের দাম অনুযায়ী এবং তাদের অর্থনৈতিক মূল্যমানের উপর। এখন এটা জানা যাচ্ছে যে, এরকমের মার্জারিন বর্ধিত হারে ব্যবহারের ফলে করোনারি থ্রম্বোসিসের মাত্রা সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাচ্ছে (সেই সঙ্গে মাথার টাক ?)।

উপরের বিবৃতিতে কোন রকমেই এটা বলা হচ্ছে না যে, ভোজ্য তেল-চর্বি বা মার্জারিনের অংশগ্রহণের ফলে থ্রম্বাসের আবির্ভাব হয় (করোনারি থ্রম্বোসিসে), কিন্তু মুখ্যরূপে পরিগণিত কারণগুলির মধ্যে এটি অন্যতম। এটাও সুবিদিত যে, মাংসভোজীদের আহার্যতালিকায় (তেল এবং চর্বি ছাড়া) যথেষ্ট পরিমাণে গো-চর্বি, গোমাংস, শূকরের চর্বি ইত্যাদি, সবুজ পাতাযুক্ত উদ্ভিজ্জের সীমিত মাত্রা, অতিমাত্রায় প্রোটিনসমন্বিত (যাতে যুক্ত কোলেস্টেরল 3·4% রয়েছে) ডিমের যথেচ্ছ ব্যবহার ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে আছে। এসবের সঙ্গে যথেষ্ট শারীরিক ব্যায়ামের অভাব, আবহাওয়ার চরম অবস্থা, বংশপরম্পরা, মানসিক উদ্বেগ ইত্যাদি উপরের ব্যাধিতে রসদ জোগায়।

মৎস্য-তৈল

মাছের তেলে রয়েছে squalene-এর মত হাইড্রোকার্বন, সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের গ্লিসিরাইডবর্গ এবং মোমসমূহ। আর এই মাছের তেলের ভিতরের উপাদান (ক্লুপানোডোনিক অ্যাসিড) বিষয়ে আগেই কিছু বলা হয়েছে। মাছের তেল যখন হাইড্রোজেনেট করা হয়, তখন (Squalene-এর মত) অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন থেকে উচ্চ গলনের সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনের উদ্ভব হয়। এছাড়া উচ্চ গলনের মোমরাজি, ক্লুপানোডোনিক অ্যাসিডের মত সম্পৃক্ত এবং উচ্চ আণবিক ওজনের পদার্থরাজি (Derivatives) এবং সংশ্লিষ্ট স্টেরলবর্গ যথেষ্ট মাত্রায় প্রভাবশালী। এই উচ্চ গলনের অণুগুলি (Hydrolysis অথবা lipase ও অন্যান্য অগ্ন্যাশয়ের জারক দ্রব্যের দ্বারা) বিভাজিত হয় না। যদি মলত্যাগের সময় না বার হয়, তবে অবশেষে এই কঠিন দানাবাঁধা কণাগুলি থ্রম্বাসের সৃষ্টি করতে পারে অথবা ধমনী ও হৃৎপিণ্ডে রক্ত জমাট বাঁধাতে পারে এবং এইভাবে ধমনীতে রক্ত সঞ্চালন বিঘ্নিত হয়।

হাইড্রোজেনেটেড মৎস্য বা উদ্ভিজ্জ তেলের ফ্যাটি অ্যাসিডগুলি গ্লিসিরাইডসমূহে C_{16} থেকে C_{26} কার্বন পরমাণু থাকে। দৈহিক তাপমাত্রা অপেক্ষা গ্লিসিরাইডের এই অণুগুলি অনেক উচ্চ গলনবিন্দু সমন্বিত। মার্গারিন তৈরি করা হয় গড়ে 36-37° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা বজায় রেখে—বাদাম তেল, তিল অথবা নারকেল তেল যুক্ত করে গলনবিন্দু নামানো যায় এবং নামানোও হয়ে থাকে; অর্থাৎ 40-50° সেন্টিগ্রেড গলনবিন্দুর উদ্ভিজ্জ হাইড্রোজেনেটেড তেল বাদাম অথবা তিল শ্রেণীর পরিশোধিত তেল মিশ্রিত করে গলনবিন্দু 36-37° সেন্টিগ্রেডে নামিয়ে ফেলা বিচিত্র নয়। এরকমের লোক ঠকানো পদ্ধতি কোন কোন কারখানায় অনুসৃত হয় বলে প্রকাশ এবং সে কারণে এখানে সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে। এরকমের মিশ্রণের আচরণ ভিন্ন প্রকারের হবে, এটা মনে রাখা দরকার। ঘিয়ের গলনবিন্দু 36-37° সেন্টিগ্রেডের বেশী নয়। মূল পার্থক্য হলো এই যে, ঘি নিম্ন গলনের মিশ্র গ্লিসিরাইডের

একক অণুগুলির দ্বারা গঠিত, পক্ষান্তরে 36-37° সেন্টিগ্রেড গলনবিন্দুর হাইড্রোজেনেটেড চর্বির একক অণুগুলির গলনবিন্দু তা নয়। এরকমের অণুগুলি ভাঙনযোগ্য নয় এবং আত্তীকরণের সম্ভাবনা কম থাকে।

ভারতে বনস্পতি উৎপাদন

ভারতে বনস্পতি উৎপাদনের একটা শর্ত হলো এই যে, তার গলনবিন্দু 36-37° সেন্টিগ্রেডের বেশী যেন না হয় (36-37° সেন্টিগ্রেড বাস্তব ক্ষেত্রে গড়ে দৈহিক তাপমাত্রা), যাতে দেহমধ্যে প্রবেশের সময় বনস্পতি গলে যায়। শিল্পক্ষেত্রে যা করা হয় তা, নিম্নোক্তরূপ: (এখনকার দিনে) তুলাবীজের তেল, বাদাম তেল, ঐ জাতীয় বিশোধিত তেল নিকেলজাতীয় অনুঘটকের (Catalyst) উপস্থিতিতে ক্রমশঃ হাইড্রোজেনেট করা হয়, যতক্ষণ না গলনবিন্দু 36°-37° সেন্টি. পর্যন্ত পৌঁছায়। এই প্রক্রিয়ায় ওলেইক ও লিনোলেইক অ্যাসিডগুলি স্টিয়ারিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত হয় হয়। দেহাভ্যন্তরে এরকমের চর্বি (বনস্পতি) গলে যাওয়া উচিত।

এর ফলে যে বনস্পতি পাওয়া গেল, তার চরম উপাদানগুলির ভিতর থাকছে—পামিটিক, স্টিয়ারিক ও শেরোটিক পর্যন্ত অ্যাসিডের গ্লিসিরাইড কিছু ওলেইক ও আইসো-ওলেইক গ্লিসিরাইড এবং কদাচিৎ লিনোলেইক (E.F.A.) গ্লিসিরাইড। রঙীন বিক্রিয়ার জন্যে 5-10% তিল তেল মিশিয়ে দেওয়া বাধ্যতামূলক।

কোন কোন কারখানায় একটা চাতুর্যপূর্ণ এবং প্রবঞ্চনাকর পদ্ধতি অনুসৃত হয়। নিবন্ধকারের দৃষ্টি এতে আকর্ষণ করা হয়েছে। এরকমের উৎপাদনের ফলে যে চর্বি পাওয়া যায়, তা হজম করা শক্ত। এই রকমের পদ্ধতি হলো: তেল বা তেলের মিশ্রণটি অনেক বেশী গলনবিন্দুর (ধরুন 45° সেন্টিগ্রেড) চর্বিতে পরিণত করা হয়। অতঃপর তাতে মিশিয়ে দেওয়া হয় যথেষ্ট পরিমাণে বিশোধিত বাদাম তেল। ফলে আইনানুসারে যে 36-37° সেন্টিগ্রেড গলনবিন্দু চাওয়া হয়। তাই পাওয়া যায় এই রকমের হাইড্রোজেনেটেড তেলে। এর কুফল সহজেই অনুমেয়। 45° সেন্টিগ্রেড গলনবিন্দুর চর্বি (বনস্পতি) উপকার করা দূরে থাকুক, অপকার করে অনেকখানি। এরকমের উৎপাদন পরিহার করা উচিত। আইসো-ওলেইক অ্যাসিড কতকটা আছে এবং unsaponifiable-এর মাত্রা নিরূপণ করে উপরের চাতুরিটি ধরা যায়।

বনস্পতির উন্নতিবিধানার্থে কয়েকটি প্রস্তাব

যদিও আইন অনুযায়ী (21শে অক্টোবর 1950) বনস্পতির গলনবিন্দু 36° সেন্টিগ্রেড থেকে 37° সেন্টিগ্রেডে রাখা বাধ্যতামূলক (এবং কতিপয় শীতপ্রধান স্থানের জন্যে 31° সেন্টিগ্রেড), বাস্তবক্ষেত্রে উৎপন্ন বনস্পতির অধিকাংশই (পরিবহনের সুবিধার জন্যে) 36-37° সেন্টিগ্রেড (বা তার বেশী) তাপমাত্রা রাখা হয়। বিস্কুট মচ্‌মচে রাখবার জন্যে বিস্কুট উৎপাদনকারীদের 41° সেন্টিগ্রেড গলনবিন্দুর বনস্পতি ব্যবহার করতে দেওয়া হয়।

বনস্পতির উন্নতি বিধানার্থে দুটি নূতন সংস্কারের প্রস্তাব উত্থাপিত করা হচ্ছে—প্রথমটি হলো গলনবিন্দুর নিম্নমাত্রাটি 31° সেন্টিগ্রেড (যেমন শীতপ্রধান জায়গাগুলিতে অনুমতি দেওয়া হয়) রাখা, তাতে বনস্পতির খাদ্যমূল্য বর্ধিত হবে এবং সেই সঙ্গে বিশোষণ (Absorbtion) অক্ষত (অর্থাৎ 31° সেন্টিগ্রেডের বেশী হাইড্রোজেনেশন বন্ধ করে দেওয়া উচিত)। দ্বিতীয় প্রস্তাব হলো—বিশোধিত তিল বা সূর্যমুখীর তেল অধিক মাত্রায় যুক্তকরণ (পরীক্ষামূলকভাবে আরো 10%), যাতে E.F.A. অংক বৃদ্ধি পাবে এবং বনস্পতির পৌষ্টিক মূল্য বর্ধিত হবে। এরকম করলে (অর্থাৎ

36-37° সেন্টিগ্রেড গলনবিন্দু থেকে নামিয়ে 31° সেন্টিগ্রেড করলে) পরোক্ষভাবে আইসো-ওলেইক অ্যাসিড উৎপাদন (যার হাত এড়িয়ে যাওয়া যায় না) যথেষ্ট মাত্রায় হ্রাস পাবে। 45° সেন্টিগ্রেড গলনবিন্দুসমন্বিত আইসো-ওলেইক অ্যাসিড এবং এর অবক্রবীভবনের গুণ রহিত হওয়ায় বনস্পতির উপকারিতা কমে আসে।

অনুবাদক ঃ শ্রীপ্রভাসচন্দ্র কর

বিজ্ঞান-সংবাদ

পরিত্যক্ত মোটর টায়ারের অভিনব ব্যবহার

মোটর গাড়ীর পরিত্যক্ত অংশ টায়ার ইত্যাদি নতুনভাবে জনকল্যাণকর কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে কি না—সেই বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নানা রকম পরীক্ষা চলছে। আমেরিকার গুডইয়ার টায়ার অ্যাণ্ড রবার কোম্পানীর ওহিয়োর আকরনস্থিত গবেষণা বিভাগের ডিরেক্টর ডক্টর জেমস্ ডি. ডিইয়ারিয় নির্দেশে একদল বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ার পুরনো টায়ারের ব্যবহার নিয়ে গবেষণা করছেন। প্রায় এক বছর ধরে নানাবিধ পরীক্ষার পর দেখা গেছে যে, ঐ সকল টায়ার দিয়ে ঘাসের মত একপ্রকার কৃত্রিম উপকরণ তৈরি করা যেতে পারে। রাজপথের পার্শ্বে, খেলার মাঠে অথবা যে সকল স্থানে বহু লোকের চলাচলের ফলে ঘাস জন্মাতে পারে না, সে সকল স্থানে ঐ সকল কৃত্রিম ঘাস লাগানো যেতে পারে। এই কৃত্রিম ঘাস শক্ত ও নরম দু-রকম জাতেরই হতে পারে এবং সুনির্দিষ্ট কাজের উপযোগী করে প্রয়োজনানুযায়ী তৈরি করা যেতে পারে।

এই অভিনব কৃত্রিম ঘাস এভাবে তৈরি করা হয়—প্রথমতঃ টায়ার থেকে ইস্পাতের সূক্ষ্ম তার ছাড়িয়ে নেওয়া হয়। তারপর এদের খুব ছোট ছোট টুক্‌রা করে কাটা হয় এবং প্রত্যেকটি টুক্‌রার দৈর্ঘ্য হয়ে থাকে 2.5 সেন্টিমিটার। ঐ সকল টায়ারের টুক্‌রা একটি কংক্রিট মিক্সার যন্ত্রে রেখে আঠালো রবারের সঙ্গে মেশানো হয়। ঐ মিশ্রিত উপাদান রাস্তায় বা পাকা রাস্তার পাশে ঢালা হয় এবং কংক্রিটের মতই বারো ঘন্টার মধ্যেই জমে শক্ত হয়ে যায়।

কংক্রিট মিক্সার যন্ত্রে মেশাবার পূর্বে বা পরে ইচ্ছানুযায়ী ঐ টুক্‌রা টায়ার ও রবারকে রং করা যেতে পারে। সবুজ রং করবার পর এই সব দেখতে হয় ঠিক ঘাসের মত। এই জিনিষটি ছিদ্রযুক্ত বলে এর মধ্য দিয়ে বৃষ্টির জল প্রবেশ করতে পারে। হোস পাইপ দিয়েও এই কৃত্রিম ঘাস ধোওয়া যায়। এই অভিনব উপকরণের শব্দ আত্মসাৎ করবার ক্ষমতা আছে বলে এই বস্তুটি ঘরের দেয়াল বা গৃহসজ্জায় ব্যবহার করা যেতে পারে।

মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে নতুন তথ্য

মঙ্গলগ্রহে আড়াই মাইল গভীর একটি গিরিখাত এবং এক মাইলেরও বেশী গভীর, 1200 মাইল দীর্ঘ একটি গহ্বরের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই সকল গহ্বর উল্কার সংঘাতে অথবা আগ্নেয়-গিরির অগ্নিউদ্গীরণের ফলে সৃষ্ট হয়েছিল। গত 47 বছরের মধ্যে এই প্রথম 1971 সালের জুলাই থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যে মঙ্গলগ্রহ পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে এসেছিল। তখন পৃথিবী ও মঙ্গলের মধ্যে ব্যবধান ছিল 3 কোটি 50 লক্ষ মাইলের।

ম্যাসাচুসেট্সের ওয়েষ্টফোর্ডস্থিত হেষ্ট্যাক মান-মন্দিরের 120 ফুট রেডিও রেডার অ্যান্টেনার

সাহায্যে ম্যাসাচুসেট্‌স্ ইনস্টিটিউট অব টেক্‌নোলোজীর বিজ্ঞানীরা এই সব তথ্য সংগ্রহ করেন। ঐ কয় মাসের মধ্যে প্রতি সপ্তাহে তিনবার বিজ্ঞানীরা রেডার রশ্মি মঙ্গলগ্রহাভিমুখে প্রেরণ করেছেন।

এই সকল রশ্মির কতক কতক মঙ্গলপৃষ্ঠে প্রতিহত হয়ে পৃথিবীতে ফিরে এসেছে এবং ঐ সকল প্রতিফলিত রশ্মি ঐ মানমন্দিরের অ্যান্টেনায় ধরা পড়েছে। ঐ গ্রহের উচ্চভূমি ও গিরিচূড়ায় প্রতিহত হয়ে যে সকল রশ্মি পৃথিবীতে ফিরে এসেছে, সেগুলির তুলনায় মঙ্গলগ্রহের গহ্বরের তলদেশে প্রতিহত হয়ে যে সকল রশ্মি এসেছে, সেগুলিকে অনেক বেশী পথ পরিক্রমা করতে হয়েছে। তার জন্যে সময়ও লেগেছে কিছুটা বেশী। সময়ের এই ব্যবধান ও অন্যান্য বিষয় বিচার-বিবেচনা করে বিজ্ঞানীরা মঙ্গলের বিভিন্ন অঞ্চলের উচ্চতার অনুমান করতে পারছেন। ইতিমধ্যে রেডার যন্ত্র ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য যন্ত্রপাতির খুবই উন্নতি হয়েছে। তারই জন্যে আজ এই যন্ত্রের সাহায্যে বিজ্ঞানীরা দশ হাজার মাইল দূরে থেকেও একটি ছোট পাথরের গড়ন ও তার সঠিক আকার বলে দিতে পারেন।

কৃত্রিম উপগ্রহের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির সাহায্যে খুব কাছে থেকে মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের যে চেষ্টা হচ্ছে ও তথ্য সংগৃহীত হচ্ছে, সেই সকল তথ্যের সঙ্গে পৃথিবী থেকে বেতারের সাহায্যে সংগৃহীত তথ্যসমূহ মেলানো হবে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এই তুলনামূলক আলোচনার ফলে মঙ্গল ও অন্যান্য গ্রহ সম্পর্কে বেতারের সাহায্যে সংগৃহীত তথ্যের যাথার্থ্য নিরূপণ করা সম্ভব হবে এবং বিচার-বিবেচনা করে দেখাও সম্ভব হবে। ঐ মানমন্দিরের বিজ্ঞানীরা বলেন যে, তাঁরা রেডারের সাহায্যে মঙ্গলের পাহাড়-পর্বত, উপত্যকা ও গহ্বরের প্রায় সঠিক আকৃতি নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়েছেন। আমেরিকার জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ কার্যসূচীর উদ্যোগেই এই পরিকল্পনা রূপায়িত হচ্ছে।

মঙ্গলগ্রহের বিষুবরেখার 16 ডিগ্রী দক্ষিণে—উত্তর থেকে দক্ষিণ অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত প্রায় 100 মাইল এলাকার তথ্যাদি বিজ্ঞানীরা সংগ্রহ করেছেন।

পৃথিবীর তুলনায় মঙ্গলগ্রহ নিজের কক্ষে কিছুটা ধীরে আবর্তন করে। ফলে মঙ্গলের একটি দিনের দৈর্ঘ্য পৃথিবীর একটি দিনের তুলনায় 37 মিনিট বেশী হয়ে থাকে। 35 দিনের মধ্যে বিজ্ঞানীরা মঙ্গলগ্রহের প্রায় পুরা চিত্রটি দেখতে পেয়েছেন এবং বিভিন্ন স্থানের উচ্চতা ও গভীরতা সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন।

এই সকল তথ্য থেকে জানা যায় যে, সর্বনিম্ন উপত্যকা ও সর্বোচ্চ পাহাড়ের চূড়ার মধ্যে উচ্চতার ব্যবধান দশ মাইলেরও কম। সমুদ্রের একেবারে তলদেশ ধরে বিচার করলে পৃথিবীতেও সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন স্থানের মধ্যে এই রকম ব্যবধানই দেখতে পাওয়া যায়।

আধুনিক অপরাধ-বিজ্ঞানের দু-চার কথা

লোকেশ ভট্টাচার্য

বিশ বছর আগেও অপরাধী নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সাক্ষীসাবুদ, প্রত্যক্ষদর্শীর জবানবন্দী এবং গোয়েন্দাদের ব্যক্তিগত বিশ্লেষণের উপর জোর দেওয়া হতো। কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই এই সকল জবানবন্দী ও বিশ্লেষণের মধ্যে ভুল থাকা বিচিত্র ছিল না বা চতুর অপরাধীর পক্ষে এই সকল বিশ্লেষণকে নস্যাৎ করে দেওয়াও অসম্ভব ছিল না। কিন্তু আজকের দিনে অপরাধ-বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি ঘটেছে। সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বস্তুনিষ্ঠ গবেষণার মাধ্যমে আধুনিক কালে অপরাধী নির্ণয় করা হয়ে থাকে। মাইক্রোস্কোপ; স্পেক-ট্রোমিটার প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি এবং নানা ধরণের রাসায়নিক পদার্থ সাক্ষীসাবুদ বা ব্যক্তিগত বিশ্লেষণের স্থান গ্রহণ করেছে। এর ফলে অপরাধী নির্ণয়ের কাজ ক্রমশঃ আধুনিক বিজ্ঞান-নির্ভর ও নির্ভুল হয়ে উঠেছে।

অপরাধ-বিজ্ঞানের সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে মনে রাখতে হবে যে, অপরাধ সর্বদা দুটি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট। প্রথমতঃ, বস্তু অর্থাৎ যা অপরাধের মাধ্যম বা যার সাহায্যে অপরাধ করা হয়েছে বা যে সমস্ত বস্তু অপরাধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তি অর্থাৎ যে ব্যক্তি অপরাধ করেছে ও যার উপর অপরাধ করা হয়েছে। প্রত্যেক অপরাধের ক্ষেত্রে এই বস্তু অপরাধের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এবং নীরব ভাষায় অপ-রাধের সমস্ত তথ্য জানিয়ে দেয়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অপরাধী অনুসন্ধানের মূল কথা হলো, বস্তুনিষ্ঠ অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে সেই নীরব ভাষায় বলা কথার অর্থ উদ্ধার করা। পরবর্তী আলোচনায় বোঝা যাবে, এই বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণে এমন নির্ভুল প্রমাণ পাওয়া সম্ভব হয় যে, তাকে নস্যাৎ করা কোনও অপরাধীর পক্ষে, তা সে যতই চতুর হোক না কেন, সম্ভব হয় না।

বিজ্ঞানভিত্তিক অনুসন্ধানের প্রথম ও প্রধান বিষয় হলো—অপরাধসংক্রান্ত সমস্ত বস্তুতে হাত, পা বা দেহের অন্য কোন বিশেষ অংশের ছাপ (যেমন—ঠোঁট বা গালের), অকুস্থলে পাওয়া অপরাধীর পোষাক বা তার কোন অংশ। অপরাধী-বাহিত খানিকটা ধুলা বা ধুলামাখা জুতার ছাপ, অপরাধীর এককোঁটা রক্ত, যা অপরাধকালে কোনভাবে ক্ষরিত হয়েছে, ফেলে-যাওয়া সিগারেট কেস বা একগাছা চুল অথবা লোম সংগ্রহ করা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে তাকে উপযুক্তভাবে বিশ্লেষণ করা। এই বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে সাধারণতঃ পুলিশ গবেষণাগারে। গোয়েন্দারা অকুস্থল থেকে যে সব সূত্র সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন, তা বিশ্লেষণ করে এসব গবেষণাগারের বিজ্ঞানীরা—কিভাবে অপরাধ সংঘটিত হয়েছিল, সন্দেহভাজন ব্যক্তির সঙ্গে অপরাধের সম্পর্ক কি, অপরাধের উদ্দেশ্য কি ছিল—ইত্যাদি বিষয় নির্ণয় করেন। এই উদ্দেশ্যে মনোবিজ্ঞানের সহায়তাও গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এই সব বিজ্ঞানীরা গবেষণাগারে বসে থেকেই অপ-রাধী নির্ণয় ও তাকে সনাক্ত করে থাকেন। তাছাড়া প্রাপ্ত সূত্রের ভিত্তিতে অপরাধ মানসিকতা বিশ্লেষণ করাও পুলিশ গবেষণাগারের অন্যতম কাজ। তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, আধুনিক অপরাধ-বিজ্ঞানের জন্ম বেশী দিন হয় নি। তাই পুলিশ গবেষণাগারের পক্ষে এখনও সর্বাত্মক সাফল্য লাভ করা সম্ভব হয় নি। কিন্তু তাই

বলে এর অবদান মোটেই নগণ্য নয়। এমন বহু অপরাধের নিষ্পত্তি করা সম্ভব হচ্ছে, যা অন্যভাবে করা যেত না বা করতে গেলে বহু সময়, শ্রম ও অর্থের অপচয় ঘটতো।

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পদ্ধতি যে সব বস্তুর উপর নির্ভরশীল, তাদের মধ্যে অন্যতম হলো হাত, পা বা শরীরের অন্য কোন অংশের ছাপ বা জুতার ছাপ। সব অবস্থাতেই মানুষ কিছু না কিছু ঘামে, বিশেষ করে অপরাধ করবার সময় স্নায়বিক উত্তেজনার ফলে ঘাম বেশী পরিমাণে হয়ে থাকে। ঘামের পরিমাণ অপরাধীর স্নায়বিক স্থৈর্য, অপরাধপ্রবণতা ইত্যাদি বিষয়ের উপর নির্ভর করে কম-বেশী হতে পারে. কিন্তু কিছু না কিছু ঘাম প্রত্যেক অপরাধীরই হয়ে থাকে। ঘামের সঙ্গে অ্যালবুমিনয়েড, ফ্যাটি অ্যাসিড, সালফেট, ফস্‌ফেট, ল্যাক্‌টেট, সোডিয়াম ও পটাশিয়াম ক্লোরাইড জলীয় দ্রবণে শরীরের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে। ঘামের সঙ্গে এসব পদার্থ অপরাধের মাধ্যম, যেমন—ছোরা ইত্যাদির গায়ে লেগে যায়। ঘামের জলীয় অংশ বাষ্পীভূত হয়ে গেলেও এই সব পদার্থ অটুট থাকে এবং এদের সাহায্য নিয়েই সাধারণতঃ অপরাধীকে সনাক্ত করা সম্ভব হয়।

সাধারণতঃ তিন রকম পদ্ধতিতে হাতের ছাপ পরিস্ফুট করা হয়ে থাকে। প্রথম পদ্ধতিতে হাতের ছাপ পাবার সম্ভাব্য জায়গাগুলিতে গ্যাসীয় আয়োডিন ছড়ানো হয়। এসব সম্ভাব্য জায়গাগুলি হলো ছোরা, পিস্তল ইত্যাদি, চেয়ার টেবিল, দরজা বা জানালার পাল্লা, জানালার শিক দেরাজ বা যার উপর অপরাধ করা হয়েছে. তার শরীর বা পোষাক। অবশ্য অপরাধের প্রকৃতির উপর এসব সম্ভাব্য জায়গা নির্ভর করে। আয়োডিনের বাষ্প ছড়ালে যে সব জৈব পদার্থ ঘামের সঙ্গে বের হয়ে আসে, সেগুলি আয়োডিন শোষণ করে এবং হাতের ছাপ লাল রঙের রেখায় রেখায় ফুটে ওঠে। কিন্তু এই পদ্ধতির অসুবিধা হতো এই—লাল রং ক্ষণস্থায়ী। তাই রংকে স্থায়ী করবার জন্যে প্যালাডিয়াম ক্লোরাইড, ট্যানিক অ্যাসিড, অ্যালাম ও লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের মিশ্রণ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে অস্‌মিক অ্যাসিড বা অস্‌মিয়াম টেট্রাক্সাইডের জারণ-পদ্ধতির সাহায্যে হাতের ছাপ পরিস্ফুট করা হয়ে থাকে। কিন্তু বহুল প্রচলিত পদ্ধতি হলো 5% সিলভার নাইট্রেটের দ্রবণ সম্ভাব্য জায়গাগুলিতে স্প্রে করা। সিলভার নাইট্রেটের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ক্লোরাইড, সালফেট, ফস্‌ফেট, ল্যাক্‌টেট ও ফ্যাটি অ্যাসিডের সিলভার লবণের অধঃক্ষেপ পড়ে। এই অধঃক্ষেপকে বিশেষ এক বিজারকের (যাতে থাকে ফরম্যাল-ডিহাইড, পাইরোগ্যালিক অ্যাসিড, পিরিডিন, হাইড্রোকুইনোন ও সোডিয়াম ল্যাক্‌টেটের জলীয় দ্রবণ) দ্বারা বা ফটো-কেমিক্যাল বিজারণ-পদ্ধতিতে বিজারিত করা হয়ে থাকে। তার ফলে কালো রেখায় হাতের ছাপ ফুটে ওঠে। সেই ছাপের ছবি অপরাধী সনাক্তকরণের জন্যে তুলে রাখা হয়। অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে হাতের ছাপ বহু পুরনো হলে বা গলিত, পোড়া বা শুকিয়ে যাওয়া মৃতদেহ থেকে হাতের ছাপ তুলতে গেলে কখনও কখনও এক্স রশ্মির সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে।

অপরাধ সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে হাতের ছাপ নিশ্চিত প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তার কারণ প্রত্যেকটি মানুষের হাতের ছাপ অপরের হাতের ছাপ থেকে স্বতন্ত্র। দৈহিক দিক থেকে এক রকমের দেখতে হলেও—এমন কি, যমজ হলেও তাদের হাতের ছাপের মধ্যে বৈসাদৃশ্য দেখা যায়। শুধু তাই নয়, কোন একজন মানুষের হাতের ছাপ আমৃত্যু অপরিবর্তিত থাকে। হাতের ছাপের প্রকৃতি বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে শুধু মাত্র অপরাধী

সনাক্তকরণই নয়, অপরাধীর মানসিকতা, তার রুচি, কর্মক্ষেত্র, জীবনযাত্রার মান ইত্যাদি সম্বন্ধে বহু তথ্য পাওয়া যায়। ঘামের সঙ্গে যে সমস্ত পদার্থ বেরিয়ে আসে, তার পরিমাণ ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে এসব তথ্য পাওয়া যায়। এই সব কারণে হাতের ছাপ অপরাধ-বিজ্ঞানে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে।

হাতের ছাপের মত শরীরের অন্যান্য অংশের ছাপ, যেমন—পা বা ঠোঁটের ছাপ, কানের নক্সা ইত্যাদি অপরাধী সনাক্তকরণে বিশেষ কার্যকর। এসব ছাপ এক ব্যক্তি থেকে অপর ব্যক্তির মধ্যে সর্বদাই স্বতন্ত্র এবং যে কোন একজন মানুষের পক্ষে তা আজীবন অপরিবর্তনীয়। সাধারণতঃ ভিজা বা নরম মাটিতে বা কাদা লাগা পা নিয়ে অপরাধী ঘরে ঢুকলে ঘরের মেঝেতে পায়ের ছাপ পাওয়া যায়। পায়ের ছাপ প্লাষ্টার অব প্যারিসের ছাঁচে তুলে রাখা হয়। শুধুমাত্র অপরাধী সনাক্তকরণের জন্যেই নয়, পায়ের ছাপের আকৃতি ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে এবং দুটি সন্নিকটস্থ পায়ের ছাপের দূরত্ব মেপে অপরাধীর দৈর্ঘ্য, দৈহিক গড়ন, চলবার ধরণ, শারীরিক কোন খুঁৎ আছে কিনা—ইত্যাদি বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা করা যায়, যা অপরাধীর অন্বেষণে যথেষ্ট সাহায্য করে।

দু-জন জাপানী বৈজ্ঞানিক ডক্টর কাজুও সুজুকী ও ডক্টর ইয়াসুৎ সুচিহাসি সম্প্রতি ঠোঁটের ছাপ নিয়ে গবেষণা করেছেন। তাঁরা 1971 সালের জানুয়ারী মাসে একটি সচিত্র পত্রিকার উপর রেখে যাওয়া ঠোঁটের ছাপের সাহায্যে এক রাহাজানীর আসামীকে খুঁজে বের করতে সক্ষম হন। অবশ্য এই বিষয়টি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। তাই ব্যাপকভাবে ব্যবহার করবার আগে আরও গবেষণা হওয়া প্রয়োজন। আজকাল সংখ্যার ব্যাপকতার জন্যে হাত, পা, বা ঠোঁটের ছাপ বা কানের নক্সা সংরক্ষণ, বাছাই, শ্রেণী বিভাগ প্রভৃতির জন্যে কম্পিউটারের সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে।

এবার এমন একটা জিনিষের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করবো, যেটা আপাতদৃষ্টিতে খুবই নগণ্য বলে আমাদের ধারণা। কিন্তু অপরাধ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে এই বস্তুটির অবদান অপরিসীম। এই বস্তুটি হচ্ছে ধুলা। অপরাধী অনুসন্ধানের জন্যে বিশ্লেষণীয় ধুলা সাধারণতঃ সংগ্রহ করা হয় অকুস্থল থেকে। অপরাধীর ফেলে-যাওয়া কোট, রুমাল, জুতা অথবা জুতার ছাপ থেকে বা আক্রান্ত ব্যক্তির চুল ও ভ্রূ থেকে। এই ধুলা নিয়ে বিজ্ঞানীরা গবেষণাগারে রাসায়নিক বিশ্লেষণ করেন। সেই বিশ্লেষণের ভিত্তিতে অপরাধীর প্রকৃতি, কর্মক্ষেত্র, রুচি, বাসস্থানের প্রকৃতি ইত্যাদি বিষয়ে সুনিশ্চিত ধারণা করা যায়, যা অপরাধী অনুসন্ধানে যথেষ্ট সহায়তা করে।

1960 সালে এডলফ কুর নামক এক ব্যক্তিকে অপহরণ করে হত্যা করা হয়। বিভিন্ন সূত্র থেকে সন্ধান পেয়ে পুলিশ জোসেফ করবেট নামে এক ব্যক্তিকে সন্দেহ করে। অকুস্থল থেকে 2900 কিলোমিটার দূরে জোসেফকে গাড়ীসহ আটক করা হয়। অন্য কোন উপায় না পাওয়ায় অপরাধ-বিজ্ঞানীরা গাড়ীর টায়ার খুঁড়ে ধুলা সংগ্রহ করেন এবং সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, 421 রকম ধুলা সেই টায়ারে রয়েছে, যার মধ্যে একটি অকুস্থলের ধুলার অনুরূপ। এই থেকে পুলিশ জোসেফের অপরাধ সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়।

এবার আলোচনা করা যাক রক্ত পরীক্ষার কথা। সাধারণতঃ ব্যক্তি-পরিচয় নির্ধারণের জন্যেই রক্ত পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। তবে রক্ত পরীক্ষার ফলাফল থেকে ইতিবাচকের চেয়ে নেতিবাচক প্রমাণের ক্ষেত্রে অধিকতর নিশ্চিত হওয়া যায়। সাধারণতঃ অকুস্থলে যে রক্ত পাওয়া যায়, তা বিশ্লেষণ করে প্রাপ্ত রক্তের গ্রূপ নির্ণয় করা হয়ে থাকে। মানুষের রক্তকে চারটি গ্রূপে ভাগ করা হয়েছে—এ, বি, এবি এবং ও (Gr. A,B,

AB, O)। যদি দেখা যায় যে, প্রাপ্ত রক্তের গ্রুপ এ, তবে সারা পৃথিবীর এ গ্রুপের রক্ত আছে, এমন যে কোন মানুষ অপরাধী হতে পারে। সুতরাং তাথেকে অপরাধী সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায় না। কিন্তু যদি দেখা যায় যে, সন্দেহভাজন ব্যক্তির রক্তের গ্রুপ এ নয়, তবে নিঃসন্দেহে সেই ব্যক্তিকে অব্যাহতি দেওয়া যেতে পারে। এই জন্যে নেতিবাচক প্রমাণ হিসেবে রক্ত পরীক্ষার গুরুত্ব অনেক, কিন্তু ইতিবাচক দিক থেকে এই পরীক্ষার তেমন গুরুত্ব নেই। কিন্তু অপরাধী সনাক্তকরণের চেয়ে পিতৃত্ব নির্ণয়ের ক্ষেত্রে রক্ত পরীক্ষার গুরুত্ব অনেক বেশী। সন্তানের রক্তের গ্রুপ পিতা বা মাতা কারোর একজনের রক্তের গ্রুপের সঙ্গে অভিন্ন হবেই; অর্থাৎ মাতার ও সন্তানের রক্তের গ্রুপ যদি একই হয়, তবে পিতার রক্তের গ্রুপ যে কোনও হতে পারে। কিন্তু যদি সন্তানের রক্তের গ্রুপ এ হয় এবং মাতার রক্তের গ্রুপ এ ছাড়া অন্য কিছু হয়, তবে পিতার রক্তের গ্রুপ এ হবেই। কিন্তু এক্ষেত্রেও রক্ত পরীক্ষার ফলাফল ইতিবাচক অপেক্ষা নেতিবাচক হিসাবেই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন—কোনও দম্পতি যদি কোনও শিশুকে নিজেদের বলে দাবী করেন এবং যদি শিশুটির রক্তের গ্রুপের সঙ্গে সেই দম্পতির কারোরই রক্তের গ্রুপে মিল না থাকে, তবে তাঁদের সেই দাবী খারিজ করে দেওয়া যায়। কিন্তু যদি শিশুটির রক্তের গ্রুপের সঙ্গে তাঁদের কোনও একজনের রক্তের গ্রুপের মিল থাকে, তাহলে কিন্তু শিশুটি যে তাঁদেরই—একথা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে সর্বাধুনিক জৈব রাসায়নিক পদ্ধতিতে রক্তের গঠন, উপাদান নির্ণয় ও বংশধারার মধ্যে তার বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা নিয়ে গবেষণা চলছে, যার ফলে হয়তো রক্ত পরীক্ষাকেও ইতিবাচক প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

রক্তের মত বিভিন্ন জৈব নির্যাস অপরাধী সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। সাধারণতঃ অপরাধী বা যার প্রতি অপরাধ করা হয়েছে—তার পোষাকে এসব জৈব নির্যাসের দাগ দেখা যায়। জৈব নির্যাসের প্রকৃতি পরীক্ষার জন্যে পোষাকে শুকানো এবং ভ্যাকুয়াম ক্লিনারে পরিষ্কার করে আলট্রাভায়োলেট আলোয় মেলে ধরলে কাপড়ের যে সমস্ত জায়গায় জৈব নির্যাস লেগে রয়েছে, সে সমস্ত জায়গায় প্রতিপ্রভা বা ফ্লুরেসেন্স দেখা যায়। প্রতিপ্রভ অংশগুলিকে দাগ দিয়ে চিহ্নিত করা হয় ও পরে বিশেষভাবে পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। নানা ধরণের জৈব নির্যাসের দাগ পোষাকে লেগে থাকতে পারে, কিন্তু অপরাধ-বিজ্ঞানে এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হলো seminal fluid। সাধারণতঃ যৌন উত্তেজনার সময় এই seminal fluid-এর ক্ষরণ হয়। সুতরাং যৌন অপরাধে লিপ্ত কোন ব্যক্তির অন্তর্বাসে seminal fluid লেগে যাবে। কিন্তু যৌন অপরাধ ছাড়াও সাধারণ যৌন মিলনের সময়ও এই নির্যাসের ক্ষরণ হতে পারে। তাই সন্দেহভাজন ব্যক্তির অন্তর্বাসে নির্যাসের চিহ্ন পাওয়া গেলেই তার অপরাধ সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায় না। তবে সে রকম কোন চিহ্ন না পাওয়া গেলে নিঃসন্দেহে তাকে অব্যাহতি দেওয়া চলে। অতএব যেমন রক্ত পরীক্ষার বেলায় তেমনি জৈব নির্যাসের পরীক্ষার ক্ষেত্রেও ইতি-বাচকের চেয়ে নেতিবাচক দিকটাই অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ।

অপরাধী অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে রঙের গুরুত্বও অনস্বীকার্য। সাধারণতঃ আকস্মিকভাবে ঘটা অপরাধ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে (যেমন—মোটর গাড়ী দুর্ঘটনা ইত্যাদি) অনেক সময় রঙের সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে। 1965 সালে ক্রড নামে একটি পনেরো বছর বয়সের বালক গাড়ী চাপা পড়েছিল। দুর্ঘটনার পর গাড়ীটা পালিয়ে যায়। পুলিশ মৃত বালকটির গায়ে নীলাভ সবুজ রঙের

সামান্য একটু দাগ পায় এবং একমাত্র এই রঙের উপর নির্ভর করেই পুলিশ গাড়ীর চালককে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়। সাধারণতঃ অকুস্থলে পাওয়া রঙের সঙ্গে গাড়ীর রঙের তুলনা করে দেখা হয়। কিন্তু এই তুলনার জন্যে বিজ্ঞানীরা নিজেদের চোখের উপর পুরাপুরি নির্ভর করেন না। তাঁরা প্রাপ্ত রংকে জ্বালিয়ে স্পেকট্রোমিটার যন্ত্রের সাহায্যে প্রাপ্ত আলোকসমূহের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য নির্ধারণ করেন। যদি দুটি রং থেকে প্রাপ্ত আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অনুরূপ হয়, তবেই তাদের অভিন্ন বলা হয়ে থাকে। এই পদ্ধতির সুবিধা হলো, যদি অপরাধের পর গাড়ীকে নতুন করে রং করা হয়ে থাকেও তবু পুরনো রং ধরা পড়তে বাধ্য। ক্যালিফোর্নিয়ায় একটি ডাকাতির সঙ্গে জড়িত গাড়ীকে সাতবার নতুন করে রং করা সত্ত্বেও গাড়ীটি ধরা পড়ে এবং অপরাধ-বিজ্ঞানীরা বিশ্লেষণ করে তা থেকে পুরনো রঙের হদিস করতে সক্ষম হন।

এখন প্রশ্ন হলো যে, দুটি রঙের অভিন্নতার সাহায্যে গাড়ীকে সনাক্ত করা কিভাবে হয়ে থাকে? একই কোম্পানীর বিশেষ একটি রঙের উপাদান সর্বদাই এক এবং একই কালে তা একাধিক গাড়ীতে দেওয়া হয়ে থাকে। বিজ্ঞানীরা এই সমস্যার সমাধান করেছেন এক অদ্ভুত উপায়ে। তাঁদের মতে, বিভিন্ন গাড়ীতে একই রঙের উপাদান অভিন্ন হলেও রঙের অবিশুদ্ধতা বা impurity বিভিন্ন ধরণের হবে। এই অবিশুদ্ধতা রং লাগাবার সময় বা গাড়ী ব্যবহার করবার ফলে আসতে পারে। বিভিন্ন রং বিশ্লেষণ করে এই অবিশুদ্ধতার পরিমাণ নির্ণয় করা হয়ে থাকে এবং অবিশুদ্ধতার পরিমাণ থেকেই বলা যায়, দুটি রং অভিন্ন কিনা।

বিভিন্ন ধরণের দলিলপত্র ইত্যাদির জালিয়াতি ধরবার জন্যে বহুদিন আগে থেকেই হস্তলিপি বিচারের পদ্ধতি চলে আসছে। আধুনিক কালে এই বিষয়ে প্রভূত উন্নতি হয়েছে। হস্তলিপির তুলনামূলক বিচারের ক্ষেত্রে বর্তমানে জ্যামিতিক মাপজোখের সাহায্য নেওয়া হয়। এছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় লিখতে গেলে হস্তলিপির কি ধরণের পরিবর্তন হয়, তা নিয়ে গবেষণা করে সব ভাষার পক্ষে গ্রহণযোগ্য একটি নিয়ম বা মাপজোখের চেষ্টা চলছে। তাছাড়া বয়োবৃদ্ধি, রোগ, মানসিক উদ্বেগ বা বিকৃতির ফলে হস্তলিপির কি ধরণের পরিবর্তন হয়, তা নিয়ে গবেষণা চলছে। ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃত হস্তলিপি থেকে মূল হস্তলিপি উদ্ধার করা বর্তমানে সম্ভব হয়েছে।

নানা ধরণের দলিল ও কাগজপত্রের জালিয়াতি ধরবার জন্যে (প্রধানতঃ যেগুলি হাতে লেখা নয়) আজকাল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কাগজ ও কালি পরীক্ষা করা হয়। কালি অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ বিভিন্ন ধরণের কালির উপাদান বিভিন্ন। তাছাড়া প্রাকৃতিক কারণে ধীরে ধীরে সময়ের সঙ্গে কালির উপাদান পরিবর্তিত হয়। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সাহায্যে কালির উপাদান নির্ণয় করে ও তার পরিবর্তন পরীক্ষা করে জালিয়াতি ধরতে পারা যায়। এই উদ্দেশ্যে যে রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয়ে থাকে, তাতে থাকে অক্সালিক অ্যাসিড, সাইট্রিক অ্যাসিড, হাইড্রোক্লোরিক এসিড, সাল-ফিউরিক অ্যাসিড, নাইট্রিক অ্যাসিড, সালফিউরাস অ্যাসিড, হাইপো, ক্লোরিন ওয়াটার ও অ্যামো-নিয়ার একটি মিশ্রণ। এর সংস্পর্শে এসে কালির কি ধরণের পরিবর্তন হয়, তা লক্ষ্য করে তার উপাদান ও উপাদানের পরিবর্তন সম্বন্ধে জানা যায়। আধুনিক পদ্ধতিতে অবশ্য এই পরিবর্তন বোঝবার জন্যে আল্ট্রাভায়োলেট আলোর সাহায্য উন্নত রাষ্ট্রগুলিতে কোথাও কোথাও গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

কিছুদিন আগে একটা দলিলে দাবী করা

হয় যে, 1940 সালে এক বৃদ্ধার সম্পত্তি জার্মানরা দখল করে নিয়েছিল এবং যুদ্ধের পর তাঁকে আর তা ফিরিয়ে দেওয়া হয় নি। কিন্তু বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে দেখা গেল—দলিল লেখা হয়েছে যে কালিতে, তা তৈরি হয়েছে 1950 সালের পর, সই করা হয়েছে যে কলমে, তা 1943 সালের আগে তৈরিই হয় নি আর দলিলের কাগজ তৈরি হয়েছে 1958 সালের পর। সুতরাং সমস্ত দাবীটাই ভুয়া।

আজকাল সনাক্তকরণের জন্যে বহু ক্ষেত্রে দাঁত ও দাঁতের গঠনের সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে। বিভিন্ন মানুষের দাঁতের গঠন বিভিন্ন। তাই সন্দেহভাজন ব্যক্তির দাঁতের আলোকচিত্রের সাহায্যে তাকে সনাক্ত করা সম্ভব হয়। সম্প্রতি যুক্তরাজ্যে একটি খুনের মামলায় নিহত ব্যক্তির দেহে দাঁতের দাগই ছিল পুলিশের প্রধান অবলম্বন। অবশ্য বিস্তারিতভাবে প্রয়োগ করবার আগে এই বিষয় নিয়ে এখনও প্রকৃত গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

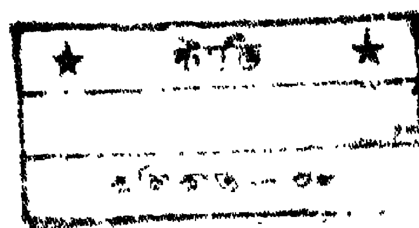
অস্থিবিদ্যার উন্নতির ফলে দুর্ঘটনায় বা ইচ্ছাকৃতভাবে নিহত মানুষের পরিচয় নিখুঁৎভাবে নির্ণয় করা বর্তমানে সম্ভব হয়েছে। সাধারণ হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রে বয়স নির্ধারণের জন্যে করোটির অংশবিশেষ পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। কিন্তু দুর্ঘটনায় নিহত মানুষের ক্ষেত্রে যেখানে ব্যাপকভাবে হাড় ভেঙে গেছে, সে ক্ষেত্রে দেহের ফিমার (Femur) হাড়ের মজ্জা পরীক্ষা করে বয়স নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। তাছাড়া অন্যান্য পরিচয় বা নিহত ব্যক্তির সনাক্তকরণের জন্যে মস্তিষ্কের করোটির এক্স-রশ্মির সাহায্যে ছবি তুলে জীবিতাবস্থায় তোলা কোন ছবির সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে।

প্রবন্ধ শেষ করবার আগে উন্নত দেশগুলিতে অপরাধী নির্ণয়, জালিয়াতি ইত্যাদি ধরবার জন্যে যে সমস্ত অত্যাধুনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে, সে সম্বন্ধে উদাহরণ দেব। এক ভদ্রমহিলা তাঁর স্বামীকে আর্সেনিক দিয়ে হত্যা করে মৃতদেহ ছ-মাস একটা ট্রাঙ্কের ভিতর লুকিয়ে রেখেছিলেন। তারপর সেই দেহ গোপনে পুড়িয়ে ফেলেন। অপরাধ ঘটিত হবার প্রায় তিন মাস বাদে ঘটনাচক্রে পুলিশ সামান্য একটু ছাই পায়। কিন্তু সেই ছাইয়ের পরিমাণ এতই কম ছিল যে, তাকে রাসায়নিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা সম্ভব ছিল না। শেষ পর্যন্ত ছাইকে তেজস্ক্রিয় করে নিয়ে নির্গত রশ্মির প্রকৃতি গাইগার কাউন্টারের সাহায্যে বিশ্লেষণ করে পুলিশ ছাইয়ে আর্সেনিকের সন্ধান পায়। পরে বিভিন্ন কারণে পুলিশ হত্যাকারী বলে ওই ভদ্রমহিলাকে সন্দেহ করে এবং নিউট্রন অ্যাক্টিভেশনের সাহায্যে তাঁর হাতে আর্সেনিকের সন্ধান পায় ও তাঁকে গ্রেপ্তার করে।

কয়েক বছর আগে এক ব্যক্তি এমন একটি প্রাগৈতিহাসিক যুগের কঙ্কাল পেয়েছে বলে দাবী করে, যার গঠন ডারউইনের তত্ত্বের বিরোধী। কিন্তু তেজস্ক্রিয় কার্বনের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখা গেল যে, মাথার খুলিটা প্রাগৈতিহাসিক যুগের হলেও ধড়টা আধুনিক কালের; অর্থাৎ সমস্ত ব্যাপারটাই একটা বৈজ্ঞানিক ধাপ্পা।

গত বিশ বছরে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অপরাধ নির্ণয়-বিদ্যার প্রভূত উন্নতি হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানের প্রয়োগ ক্রমশঃ সার্থক হয়ে উঠছে। তবে এখনও গবেষণা চলছে এবং বহু তথ্য উদ্‌ঘাটিত হবার আশায় দিন গুণছে। তাই মনে হয়—সেদিন বোধ হয় আর খুব দূরে নয়, যেদিন অকুস্থলে না গিয়েও প্রাপ্তসূত্রের ভিত্তিতে বিজ্ঞানীরা গবেষণাগারে বসেই তাঁদের যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে পরীক্ষা করে অপরাধীকে নিশ্চিতই ধরিয়ে দিতে পারবেন।

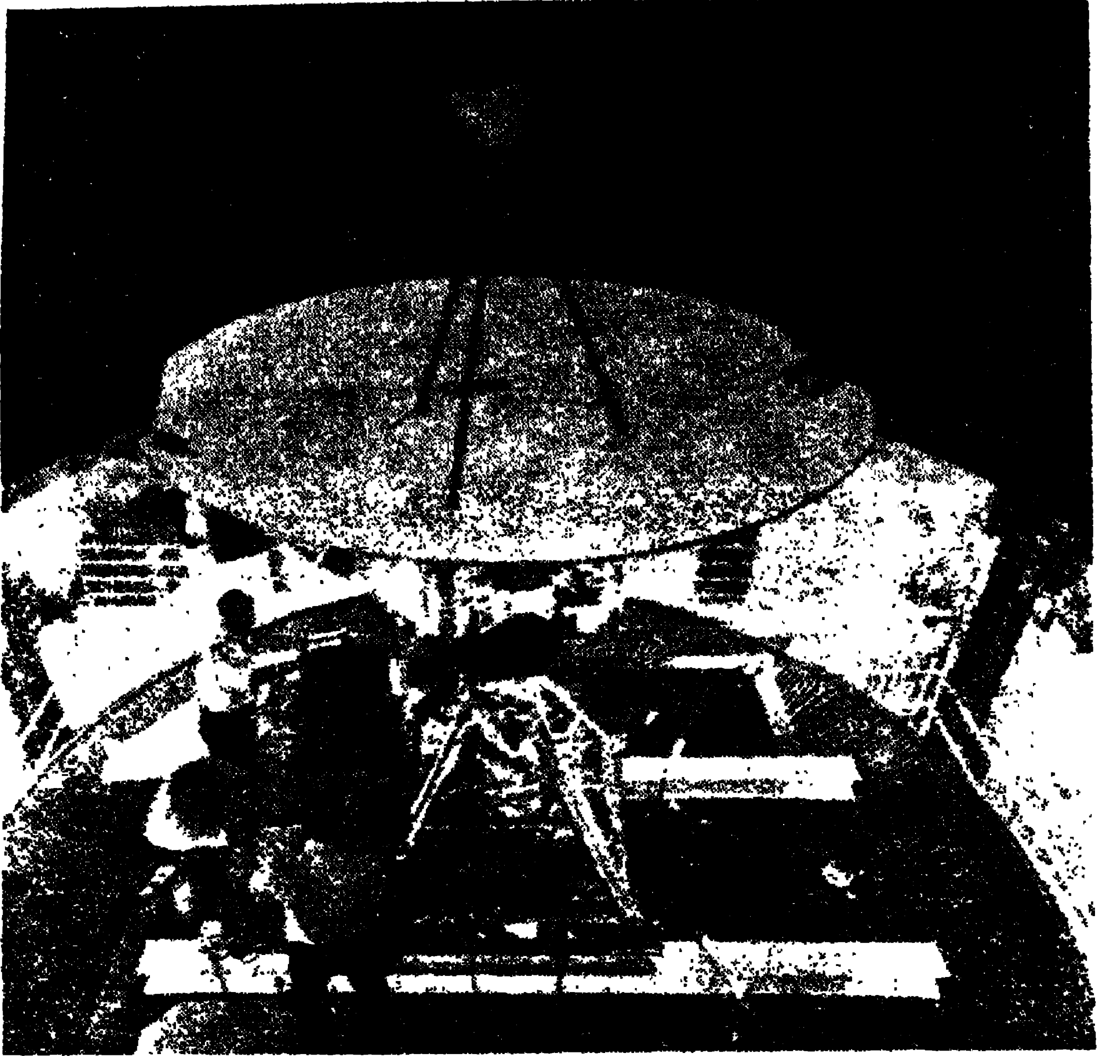
কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর



জ্ঞান ও বিজ্ঞান

মার্চ — 1972

রজত জয়ন্তী বর্ষ : তৃতীয় সংখ্যা



গ্রহরাজ বৃহস্পতি এবং তাকে ছাড়িয়েও মহাকাশের দূরবর্তী অঞ্চলে অভিযান চালাবার সময় মহাকাশযানকে কিরূপ তাপ, শৈত্য, শূন্যতা ও বিকিরণের সম্মুখীন হতে হবে, সে বিষয়ে অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে ক্যালিফোর্নিয়ায় কৃত্রিম স্পেস চেম্বারে পাইওনিয়ার-11 স্পেসক্র্যাফ্‌টের পরীক্ষার প্রস্তুতি। এতে 11টি বৈজ্ঞানিক যন্ত্র সন্নিবিষ্ট আছে। আগামী 1973 সালে পাইওনিয়ার-12 নামে অনুরূপ মহাকাশযান বৃহস্পতিগ্রহের দিকে উৎক্ষিপ্ত হবে।

পৃথিবী, সূর্য এবং চাঁদের ওজন

পৃথিবী, সূর্য এবং চাঁদের ওজনের কথা বলবার আগে প্রথমেই জানিয়ে রাখা ভাল, 'ওজন' কথাটা আমরা অনেক সময় কিছুটা ভুল অর্থে ব্যবহার করি। মনে করা যাক, এক টুক্‌রা লোহা নিয়ে স্প্রিং তুলায় ওজন করা গেল—ছয় কিলোগ্র্যাম। ঐ লোহার টুক্‌রা সমেত স্প্রিং তুলাটি যদি চাঁদে নিয়ে যাওয়া যায়, তবে দেখা যাবে সেখানে বস্তুটির ওজন এক কিলোগ্র্যাম হয়ে গেছে। ঐ লোহার টুক্‌রার বস্তু-পরিমাণ হ্রাস না হওয়া সত্ত্বেও ওর ওজন কমে গেল কেন—এই প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে জাগতে পারে। এর উত্তর হলো—লোহার টুক্‌রাটা যখন পৃথিবীর উপর ছিল তখন তার উপর পৃথিবীর যে টানটা পড়ছিল, চাঁদে নিয়ে যাওয়ায় তার টানটা প্রায় ছয় গুণ কমে গেছে। এই কারণেই ছয় কিলোগ্র্যামের বস্তুটা চাঁদে গিয়ে এক কিলোগ্র্যাম হয়ে গেছে। এবার মনে করা যাক, ঐ লোহার টুক্‌রাটা দাঁড়িপাল্লার একদিকে রেখে অপর পাল্লায় বাটখারা চাপিয়ে দেখা গেল, বস্তুটির ওজন ছয় কিলোগ্র্যাম। এবার ঐ দাঁড়িপাল্লায় বস্তু এবং বাটখারাসমেত যদি চাঁদে গিয়ে ওজন করা যায়, তবে দেখা যাবে—এক্ষেত্রে বস্তুটির ওজন ছয় কিলোগ্র্যামই আছে। এক্ষেত্রেও আবার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে—এখন কি তবে চাঁদের টান কম হয় নি? এই প্রশ্নের জবাব হলো—এক্ষেত্রেও চাঁদের টান কমেছে, তবে বস্তু এবং বাটখারার উভয় দিকেই টান কমেছে বলে পাল্লাটি সাম্য অবস্থায় রয়ে গেছে। কাজেই বোঝা যাচ্ছে, স্প্রিং তুলায় কোন বস্তু ঝুলিয়ে দিলে যে টান পড়ে, সেটাই হলো বস্তুর 'ওজন'। কিন্তু দাঁড়িপাল্লায় বাটখারার সঙ্গে তুলনামূলকভাবে যে বস্তু-পরিমাণ মাপা হয়, তা হলো বস্তুর 'ভর'। বস্তুর ভরকেই আমরা ভুল অর্থে অনেক সময় ওজন বলি। পৃথিবীর ওজন, সূর্যের ওজন বা চাঁদের ওজন—এই কথাগুলি এই একই কারণে সঠিক নয়—নির্ভুলভাবে বলা উচিত পৃথিবীর ভর, সূর্যের ভর এবং চাঁদের ভর। এখন এই তিনটি ভর কি ভাবে পরিমাপ করা যায়, তা আলোচনা করা যেতে পারে।

প্রথমেই ধরা যাক, পৃথিবীর ভর পরিমাপের কথা। একটা লোহার টুক্‌রার ভর আমরা দাঁড়িপাল্লার সাহায্যে নির্ণয় করতে পারি; কিন্তু পৃথিবীকে তো আর কোন দাঁড়িপাল্লায় চাপানো সম্ভব নয়। সুতরাং পৃথিবীর ভর মাপতে হলে একটু অন্য পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। নিউটন তাঁর মহাকর্ষ-তত্ত্বে বলেছেন—এই বিশ্বজগতে প্রতিটি বস্তু পরস্পরকে একটি বলের দ্বারা আকর্ষণ করে। এই বল বস্তু দুটির ভরের গুণফলের সমানুপাতিক এবং ওদের দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক; অর্থাৎ m_1 এবং m_2 ভরের দুটি বস্তু যদি পরস্পর r দূরত্বে থাকে, তবে তাদের মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ বল $F = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$ হবে, যেখানে G

হলো মহাকর্ষীয় ধ্রুবক। ক্যাভেণ্ডিস, বয়েস, পয়েনটিং প্রমুখ বিজ্ঞানীরা পরীক্ষার সাহায্যে এই ধ্রুবকের মান নির্ণয় করে দেখেছেন, $G=6{\cdot}67\times10^{-8}$ সি. জি. এস. একক।

এখন মনে করা যাক, একটা আপেল পৃথিবীর উপরিস্থিত একটি গাছে ঝুলছে। এই অবস্থায় পৃথিবী এবং আপেলের মধ্যে পারস্পরিক এক আকর্ষণ-বল ক্রিয়া করবে। যদি পৃথিবীর ভর হয় Me এবং আপেলের ভর হয় m, তবে ওদের আকর্ষণ-বলের পরিমাণ হবে

$$F=G\frac{Me\ m}{R^2}\cdots\cdots(1)$$

যেখানে R হলো পৃথিবার কেন্দ্র থেকে আপেলের কেন্দ্রের দূরত্ব, অর্থাৎ পৃথিবীর ব্যাসার্ধ।

এখন যদি আপেলটির বোঁটা ছিঁড়ে যায়, তবে ঐ আকর্ষণ-বলের জন্যে আপেলটি সজোরে মাটির দিকে ছুটে যাবে। ছুটে যাবার সময় আপেলটির উপর ত্বরণ সৃষ্টি হবে। ত্বরণ হলো বস্তুর বেগ পরিবর্তনের হার। পৃথিবীর আকর্ষণজনিত বলের প্রভাবে বস্তুর উপর যে ত্বরণ সৃষ্টি হয়, তাকে বলা হয় অভিকর্ষজ ত্বরণ। এই অভিকর্ষজ ত্বরণকে g দিয়ে সূচিত করা হয় এবং এই g-এর মান একটি সরল দোলকের সাহায্যে অনায়াসে নির্ণয় করা যায়। যদি কোন সরল দোলকের দোলনকাল হয় T এবং কার্যকরী দৈর্ঘ্য হয় l, তবে $g=\frac{4\pi^2 l}{T^2}$ এই সমীকরণের সাহায্যে g-এর মান নির্ণয় করা হয়। এই পদ্ধতিতে পরিমাপ করে ভূপৃষ্ঠে g-এর মান পাওয়া যায় 980 সে. মি./সে.^{2}।

যেহেতু ঐ আপেলের উপর g-অভিকর্ষজ ত্বরণ ক্রিয়া করছে, সুতরাং m ভরের ঐ আপেলের উপর পৃথিবীর আকর্ষণজনিত বল হবে—

$$F=mg\cdots\cdots\cdots\cdots(2)$$

সমীকরণ (1) এবং (2) থেকে লেখা যায়—

$$\frac{G\ Me\ m}{R^2}=mg \text{ বা } Me=\frac{gR^2}{G}$$

এখন পৃথিবীর ব্যাসার্ধ $R=4000$ মাইল $=6{\cdot}4\times10^8$ সে. মি., অভিকর্ষজ ত্বরণ $g=980$ সে. মি./সে.^{2} এবং $G=6{\cdot}66\times10^{-8}$ সি. জি. এস. একক

অতএব, পৃথিবীর ভর $Me=6{\cdot}1\times10^{27}$ গ্র্যাম বা $6{\cdot}1\times10^{21}$ টন।

এই গেল পৃথিবীর ভর নিরূপণের উপায়। কিন্তু এই পদ্ধতিতে সূর্যের ভর পরিমাপ করা সম্ভব নয়। কারণ সূর্য-পৃষ্ঠে একটা সরল দোলকের সাহায্যে সূর্যের মহাকর্ষীয় ত্বরণ নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তবে সূর্যের ভর নির্ণয় করবার জন্যে রয়েছে তার গ্রহগুলি। যেহেতু পৃথিবী হলো সূর্যের একটি গ্রহ, সেহেতু সূর্যের চারপাশে পৃথিবীর আবর্তন গতি থেকে সূর্যের ভর নির্ণয় করা যায়। যখন পৃথিবী এক বৃত্তাকার পথে সূর্য পরিক্রমা করে, তখন পৃথিবীর উপর এক অভিকেন্দ্রিক বল (Centripetal force) ক্রিয়া করে সূর্যের

অভিমুখে আর ঐ বলের বিপরীত দিকে ক্রিয়া করে অপকেন্দ্রিক বল (Centrifugal force)। এই উভয় বলের মান সমান।

এখন যদি পৃথিবীর ভর হয় Me এবং পৃথিবী যে বৃত্তাকার পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে, তার কোন একটি বিন্দুতে পৃথিবীর সরলরৈখিক বেগ হয় V, তবে ঐ অভিকেন্দ্রিক বা অপকেন্দ্রিক বলের মান হবে $\frac{MeV^2}{Ds}$, যেখানে Ds হলো সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব।

আর যদি সূর্যের ভর হয় Ms, তবে নিউটনের মহাকর্ষ-তত্ত্ব অনুসারে বলা যায়, সূর্য ও পৃথিবীর পারস্পরিক আকর্ষণ বলের মান হবে $G\frac{MsMe}{Ds^2}$, যেখানে G হলো মহাকর্ষীয় ধ্রুবক।

এখন যেহেতু পৃথিবী সূর্যের টানে তার দিকে ছুটে চলে যাচ্ছে না বা সূর্যের টান কাটিয়ে বেরিয়েও যেতে পারছে না, তখন বলা যেতে পারে উপরিউক্ত দুটি বলের মান সমান: অর্থাৎ

$$\frac{G\,MsMe}{Ds^2}=\frac{MeV^2}{Ds}$$

$$\therefore \quad \text{সূর্যের ভর } Ms=\frac{DsV}{G}$$

এখন সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব $Ds=1{\cdot}5\times10^{13}$ সে. মি., বৃত্তাকার কক্ষপথে পৃথিবীর রৈখিক বেগ $V=30$ কি. মি./সে $=3\times10^{6}$ সে. মি./সে. এবং মহাকর্ষীয় ধ্রুবক $G=6{\cdot}67\times10^{-8}$ সি. জি. এস. একক,

সুতরাং সূর্যের ভর $Ms=2\times10^{33}$ গ্র্যাম $=2\times10^{27}$ টন।

অর্থাৎ সূর্য পৃথিবীর চেয়ে তিন লক্ষ তেত্রিশ হাজার গুণ ভারী।

এবার আসা যাক চাঁদের ভর মাপবার পদ্ধতিতে। চাঁদের ভর পরিমাপের কাজটা কিন্তু সূর্য বা পৃথিবীর ভর পরিমাপের চেয়ে বেশ কঠিন। এমন কি, দূরের নেপচুন গ্রহের ভর পরিমাপের কাজটা চাঁদের ভর নির্ণয়ের চেয়ে সহজ কাজ। কারণ এই যে, নেপচুনের উপগ্রহ আছে। যে সব গ্রহ বা উপগ্রহের কোন উপগ্রহ নেই, তাদের ভর পরিমাপের কাজটা বেশ কঠিন। যেহেতু আমাদের চাঁদের কোন উপগ্রহ নেই। এই কারণে চাঁদের ভর নির্ণয় করা হয় পৃথিবী-পৃষ্ঠের উপর মহাসমুদ্রের জলের জোয়ার-ভাঁটা লক্ষ্য করে। সূর্য এবং চাঁদের আকর্ষণে পৃথিবীর উপর মহাসমুদ্রের জল যখন স্ফীত হয়ে ওঠে, তখন তাকে জোয়ার বলা হয়। জোয়ার সাধারণতঃ দু-রকমের হয়ে থাকে—ভরা কোটাল (Spring tide) এবং মরা কোটাল (Neap tide)। অমাবস্যা বা পূর্ণিমায় যে জোয়ার হয়, তাকে বলা হয় ভরা কোটাল এবং শুক্লাষ্টমী বা কৃষ্ণাষ্টমীতে যে জোয়ার হয়, তাকে বলা হয় মরা কোটাল। ভরা কোটালে সূর্য, চন্দ্র এবং পৃথিবী এক সরলরেখায় অবস্থান করে; অর্থাৎ

তখন সমুদ্রজলের উপর সৌরশক্তি এবং চান্দ্রশক্তি যুগ্মভাবে ক্রিয়া করে। অন্যভাবে বলা যায়—এটা হলো সৌর জোয়ার এবং চান্দ্র জোয়ারের যুগ্ম ফল। আর মরা কোটালে সূর্য ও পৃথিবী সংযোগকারী রেখা পৃথিবী ও চাঁদ সংযোগকারী রেখার সঙ্গে লম্বভাবে অবস্থান করে; অর্থাৎ তখন সমুদ্রজলে চান্দ্র জোয়ার এবং সৌর জোয়ার ঘটাবার শক্তির অন্তর ফল ক্রিয়া করে। পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে, মরা কোটালে জোয়ারের উচ্চতা ভরা কোটালে জোয়ারের উচ্চতার 0·42 ভাগ। এখন চাঁদের জোয়ার ঘটাবার শক্তিকে যদি Em এবং সূর্যের জোয়ার ঘটাবার শক্তিকে যদি Es দিয়ে নির্দেশ করা যায়, তবে—

$$\frac{Em+Es}{Em-Es}=\frac{100}{42}$$

$$\text{বা} \quad \frac{Em}{Es}=\frac{71}{29} \quad \ldots \quad (3)$$

এখন চাঁদের আকর্ষণের প্রভাবে পৃথিবীর উপরিতলের এক গ্র্যাম বস্তু যে বলে আকর্ষিত হয়, পৃথিবীর কেন্দ্রস্থিত এক গ্র্যাম বস্তু তার চেয়ে কিছুটা কম বলে আকর্ষিত হয়। যদি চাঁদের ভর হয় Mm এবং চাঁদ থেকে পৃথিবীর দূরত্ব হয় Dm এবং পৃথিবীর ব্যাসার্ধ হয় R, তবে এই আকর্ষণ-বলের পার্থক্য হবে—

$$\frac{GMm.1}{(Dm-R)^2}-\frac{GMm.1}{D^2m}$$

$$=\frac{2\,GMmR}{D^3m}$$

অনুরূপভাবে যদি সূর্যের ভর হয় Ms এবং সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব হয় Ds, তবে প্রমাণ করা যাবে, সূর্যের আকর্ষণের প্রভাবে পৃথিবীর উপরিতলের এক গ্র্যাম বস্তু পৃথিবীর কেন্দ্রস্থিত এক গ্র্যাম বস্তুর চেয়ে $\frac{2\,GMsR}{D^3s}$ অধিক বলে আকর্ষিত হবে।

সুতরাং চাঁদ আর সূর্যের জোয়ার ঘটাবার অনুপাত হবে—

$$\frac{2\,GMmR}{D^3m}:\frac{2\,GMsR}{D^3s}=\frac{Mm}{Ms}\left(\frac{Ds}{Dm}\right)^3 \ldots\ldots\ldots (4)$$

এখন সমীকরণ (3) এবং (4) থেকে আমরা পাই —

$$\frac{Mm}{Ms}\left(\frac{Ds}{Dm}\right)^3=\frac{71}{29}$$

যেহেতু সূর্য থেকে চাঁদের দূরত্ব Ds = 150000000 কি. মি. এবং পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব Dm = 380000 কি. মি. অর্থাৎ $\frac{Ds}{Dm}=400$ (প্রায়)।

$$\text{সুতরাং} \quad \frac{Mm}{Ms}.\,(400)^3=\frac{71}{29}$$

এখন সূর্যের ভর $Ms - 2 \times 10^{33}$ গ্র্যাম

অতএব চাঁদের ভর $Mm = 7{\cdot}6 \times 10^{25}$ গ্র্যাম বা $7{\cdot}6 \times 10^{19}$ টন

চাঁদের ভর পৃথিবীর ভরের প্রায় আশী ভাগের এক ভাগ; অর্থাৎ আশীটা চাঁদের বাটখারা চাপিয়ে আমাদের পৃথিবীটাকে ওজন করা যাবে। তবে সঠিকভাবে বলতে গেলে চাঁদের ভর হলো পৃথিবীর ভরের 0.0123 অংশ।

গিরিজাচরণ ঘোষ*

* পদার্থবিদ্যা বিভাগ, বিদ্যাসাগর কলেজ, কলিকাতা-6

পারদর্শিতার পরীক্ষা

জীববিদ্যায় তুমি কেমন পারদর্শী, তা বোঝবার জন্যে নীচে 4টি প্রশ্ন দেওয়া হলো। 1 ও 2নং প্রশ্নের প্রতিটিতে 20 নম্বর আছে এবং 3 ও 4নং প্রশ্নের প্রতিটিতে 30 নম্বর; শেষোক্ত দুটি প্রশ্নের (ক), (খ) ও (গ)-এর প্রত্যেকটিতে 10 নম্বর করে আছে। উত্তর দেবার জন্যে মোট সময় 3 মিনিট। এই সময়ের মধ্যে 80 বা আরো বেশী নম্বর পেলে জীববিদ্যায় তোমার পারদর্শিতা খুব বেশী বুঝতে হবে। 60 বা 70 পেলে পারদর্শিতা বেশী, 40 বা 50 পেলে পারদর্শিতা চলনসই, 20 বা 30 পেলে পারদর্শিতা কম এবং 20-এর কম পেলে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

1. ক্লোরোফিলের মধ্যে কোন্ উপাদানটি বর্তমান থাকে?

(ক) লোহা

(খ) তামা

(গ) ম্যাগ্নেসিয়াম

(ঘ) সিলিকন

2. কোন্‌টি ঠিক বল—

মাইয়োসিস প্রক্রিয়ায় কোষ-বিভাজনে মূল কোষের তুলনায় প্রতিটি নতুন কোষে

(ক) ক্রোমোজোম সংখ্যা অর্ধেক হয়

(খ) ক্রোমোজোম সংখ্যা দ্বিগুণ হয়

(গ) ক্রোমোজোম সংখ্যা একই থাকে

(ঘ) ক্রোমোজোম সংখ্যা অনির্দিষ্ট

3. নীচের বাঁ-দিকের (ক), (খ) ও (গ)-এর এক-একটিকে ডান দিকের এক-একটি হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। কোন্‌টিকে কি হিসাবে চিহ্নিত করবে ?

(ক) পেপসিন	ভিটামিন
(খ) ইনসুলিন	হর্মোন
(গ) থায়ামিন	এনজাইম

4. নীচের বাঁ-দিকে তিনটি প্রাণীর এবং ডান দিকে তিনটি গোষ্ঠীর নাম দেওয়া আছে। কোন্ প্রাণীটি কোন্ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ?

(ক) অ্যামিবা	প্ল্যাটিহেলমিনথিস (Platyhelminthes)
(খ) ফিতা কৃমি	প্রোটোজোয়া (Protozoa)
(গ) স্পঞ্জ	পরিফেরা (Porifera)

(উত্তরের জন্য 185নং পৃষ্ঠা দেখ)

ব্রহ্মানন্দ দাশগুপ্ত ও জয়ন্ত বসু*

* সাহা ইনষ্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-9

ফসিল

ফসিল বা জীবাশ্ম নামটার সঙ্গে তোমাদের অনেকেরই নিশ্চয় পরিচয় আছে। ল্যাটিন ভাষায় ফসিল কথাটির অর্থ—খুঁজে পাওয়া জিনিষ। তাই ফসিল বলতে আমরা বুঝি প্রস্তরীভূত প্রাণিদেহ, যা মাটির নীচ থেকে খনন করে বের করা হয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ভূপৃষ্ঠের উপর অনেক সময় বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে। তার ফলে সে যুগের বহু প্রাণী ও উদ্ভিদ চাপা পড়েছে মাটি বা শিলাস্তরের নীচে। পরবর্তী যুগে এগুলির উপর একটার পর একটা স্তর জমে উঠেছে। বর্তমানে পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলে মাটি খুঁড়তে গিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নেহাৎ আকস্মিকভাবেই লক্ষ লক্ষ—এমন কি, কোটি কোটি বছর আগেকার এই সকল প্রাণী ও উদ্ভিদের প্রস্তরীভূত দেহ পাওয়া গেছে। এগুলিই আমাদের কাছে ফসিল বা জীবাশ্ম নামে পরিচিত।

জীবজন্তু এবং গাছপালার প্রস্তরীভূত দেহকেই সাধারণতঃ আমরা ফসিল বা জীবাশ্ম বলি। বৈজ্ঞানিকেরা কিন্তু আরো একটু ব্যাপক অর্থে কথাটি ব্যবহার করে থাকেন। তাঁদের

মতে, অবস্থা অনুসারে ফসিলকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা চলে—(1) কোন প্রাণী বা উদ্ভিদের অবিকৃত আসল দেহাংশ, (2) সম্পূর্ণভাবে শিলীভূত বা পাথর হয়ে যাওয়া ফসিল, (3) শিলীভূত দেহ বা দেহাংশের ছাঁচ ও চিহ্ন।

প্রথম শ্রেণীর ফসিলে প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহের কিছু অংশ, কোন কোন ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ দেহটাই উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। অনেক বছর আগে সাইবেরিয়ার বরফস্তূপের মধ্যে বিরাট আকৃতির এক ম্যামথের ফসিল আবিষ্কৃত হয়েছে। এটির দেহের প্রত্যেকটি অংশ—এমন কি চামড়ার উপরের লোমগুলি পর্যন্ত এখনো অবিকৃত রয়েছে। অথচ তোমরা শুনলে অবাক হবে, আজ থেকে অন্ততঃ ছয় কোটি বছর আগেই এই ধরণের দৈত্যাকার ম্যামথ বিলুপ্ত হয়ে গেছে পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে। এছাড়া অ্যাম্বারজাতীয় রজনের স্তরে প্রাগৈতিহাসিক যুগের নানা রকম কীট-পতঙ্গের সম্পূর্ণ দেহ, অ্যাসফাল্ট হ্রদের গর্ভে অতিকায় জলচর জীবের বিরাট দাঁত ইত্যাদিও পাওয়া গেছে অক্ষত অবস্থায়। সুতরাং এগুলিকে ফসিল না বলে বরং প্রকৃতির তৈরি মামি বলাই ভাল। সহজেই বুঝতে পার, বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে এগুলির দাম অপরিসীম।

দ্বিতীয় শ্রেণীর ফসিলে জৈবাংশের পরিবর্তে পাথর বা অন্যান্য ধাতব পদার্থ বেশী থাকে। অবশ্য এসব ক্ষেত্রেও প্রস্তরীভবন এমন নিখুঁতভাবে ঘটে যে, ফসিলের সূক্ষ্ম অংশগুলি পরীক্ষা করতে অসুবিধা হয় না। লৌহ পাইরাইটিজ, চুনাপাথর, কোয়ার্ট্‌জ্‌ প্রভৃতির তীব্র বিক্রিয়ার ফলেই কালক্রমে প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহাবশেষ পাথরে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

তৃতীয় শ্রেণীর ফসিলে কোন প্রাণী বা উদ্ভিদের সরাসরি দেহাংশের পরিবর্তে পাওয়া যায় ছুটি নরম মাটি বা অন্য কোন ধাতব স্তরের মধ্যে সেটির দেহের অবিকৃত ছাপ। 50 কোটি বছর আগে পৃথিবীর বুকে ঘুরে বেড়াতো এমন কয়েকটি নরম মাংসবিশিষ্ট অমেরুদণ্ডী প্রাণীর দেহের ছাপ বিভিন্ন মৃত্তিকার স্তরে পাওয়া গেছে। এগুলি এখনো এমন অবিকৃত আছে যে, জন্তুগুলির আভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরীক্ষা করতে বিজ্ঞানীদের কোন অসুবিধা হয় নি।

সকল শ্রেণীর মাটিতে ফসিল পাওয়া যায় না। যে শিলাস্তরে বালি, নরম মাটি, কাদা অথবা চুনের ভাগ অধিক, সেই ধরণের শিলাতেই ফসিল পাওয়া গেছে সবচেয়ে বেশী। গ্র্যানিট প্রভৃতি আগ্নেয়প্রস্তর কিংবা খনিতে প্রাপ্ত কঠিন ধাতুতে ফসিলের সন্ধান মেলে না। কারণ সৃষ্টির প্রথম যুগে এসব প্রস্তর প্রচণ্ড গরম ছিল, ফলে এগুলির মধ্যে কোন জীবজন্তুর দেহাবশেষ রক্ষিত হতে পারে নি। ঠিক এই কারণেই আগ্নেয়গিরির লাভাস্তরেও তেমন কোন ফসিল পাওয়া যায় নি, তবে সামান্য কয়েকটি আগ্নেয়গিরির কাছে ফসিল দেখা গেছে। এসব ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা একটা

মজার ব্যাপার লক্ষ্য করেছেন। তাঁরা দেখেছেন এসব লাভাস্রোতের মধ্যে গণ্ডার, মহিষ, হাতী প্রভৃতি বিরাটকায় জন্তুদের পাশেই রয়েছে অনেক হিংস্র মাংসাশী প্রাণীর শিলীভূত দেহ। এর কারণ ব্যাখ্যা করে বিজ্ঞানীরা বলেন, লাভাস্রোতের সঙ্গে ভেসে আসা পিচ্‌জাতীয় জিনিষের মধ্যে বড় বড় জন্তুগুলি হয়তো মারা পড়েছে এবং সেগুলিকে শিকার মনে করে কোন কোন মাংসাশী জন্তু তার উপর লাফিয়ে পড়ে এই একই ভাবে প্রাণ হারিয়েছে সেই মরণ ফাঁদে। তাই লাভাপিণ্ডের মধ্যে শিকার ও শিকারী উভয়েরই ফসিল দেখা যায়।

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে পাওয়া ফসিলগুলি পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা মানব এবং অন্যান্য জীবগোষ্ঠীর ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস রচনা করেছেন। এক-একটি বিশেষ সময়ের ভূস্তর এবং তখনকার জীবজন্তু পরীক্ষা করে তাঁরা প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীকে কয়েকটি যুগে বিভক্ত করেছেন। এই সকল জীবগোষ্ঠীর কাল ঠিক করা হয়েছে ভূস্তরের সময় অনুযায়ী। নৃতাত্ত্বিকেরা দেখেছেন, এক-একটি যুগে এক-একটি জীবগোষ্ঠীর প্রাধান্য ঘটেছে পৃথিবীপৃষ্ঠে; যেমন—ছয় কোটি বছর পূর্বেকার কেনোজোয়িক যুগের প্রথম দিকে স্তন্যপায়ী প্রাণীর প্রাধান্য ঘটেছিল। এর পরবর্তী চার কোটি বছর আগেকার অলিগোসিন যুগের ভূস্তরে প্রোপ্লিওপিথেকাস নামক একশ্রেণীর বানরের ফসিল পাওয়া গেছে। জন্তুগুলির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এদের লেজ নেই। বিজ্ঞানীদের মতে, অলিগোসিন যুগের এই লেজহীন বানরই বোধ হয় বর্তমান মানব ও মানবসদৃশ বানরের আদিমতম সংস্করণ। এর ঠিক পরেই 3 কোটি বছর আগেকার মধ্য মায়োসিন যুগের স্তরে অনেকগুলি বানরের ফসিল পাওয়া গেছে, যেগুলির সঙ্গে বর্তমান মানবগোষ্ঠীর সাদৃশ্য চোখে পড়ে। নৃতাত্ত্বিকেরা তাই বলেন, অলিগোসিন ও মধ্য মায়োসিন যুগের মধ্যবর্তী সময়ে জীবজগতে একটা বিরাট পরিবর্তন এসেছিল। এরই ফলে মানুষের আকৃতি-বিশিষ্ট বিরাট আকারের বানরের আবির্ভাব ঘটে। তবে 5 লক্ষ বছরের পুরনো পিথেক্যানথ্রোপাস নামে যে নর-বানরের ফসিল পাওয়া গেছে, তাতেই মানুষের দৈহিক বৈশিষ্ট্য-গুলির আভাস প্রথম লক্ষ্য করা যায়। পরে আরো দীর্ঘ ও ব্যাপক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই মানবের শারীরিক বৈশিষ্ট্যগুলি চূড়ান্তভাবে আধুনিক মানবের দিকে পরিবর্তিত হয়েছে।

বিভিন্ন ফসিল পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেছেন, পৃথিবীতে প্রথম মানুষের আবির্ভাব ঘটেছিল মধ্য এশিয়ায়। কারণ বিশ্বের প্রাচীনতম ফসিলের সন্ধান পাওয়া গেছে এই অঞ্চলেই, তাছাড়া আমাদের পরিচিত প্রায় সমস্ত গবাদি-পশুর জন্ম যে মধ্য-এশিয়াতেই, তারও প্রমাণ রয়েছে। ভৌগোলিক অবস্থিতির দিক থেকে বিচার করলেও দেখা যায়, পৃথিবীর প্রায় মধ্যস্থলে অবস্থিত বলে মধ্য এশিয়া থেকে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে আদি মানবের সুবিধা হয়েছিল।

মিনতি সেন

উত্তর

(পারদর্শিতার পরীক্ষা)

1. (গ) ম্যাগ্‌নেসিয়াম

2 (ক) ক্রোমোজোম-সংখ্যা অর্ধেক হয়

3. (ক) পেপসিন—এনজাইম

(খ) ইনসুলিন—হর্মোন

(গ) থায়ামিন—ভিটামিন

4. (ক) অ্যামিবা—প্রোটোজোয়া

[Protozoa শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে গ্রীক শব্দ Protos ও Zoön থেকে। Protos-এর অর্থ : প্রথম এবং Zoön-এর অর্থ : প্রাণী।]

(খ) ফিতা কৃমি—প্ল্যাটিহেলমিনথিস

[Platyhelminthes শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে গ্রীক শব্দ Platy ও Helminthes থেকে। Platy-এর অর্থ : চ্যাপ্টা এবং Helminthes-এর অর্থ : পোকা।]

(গ) স্পঞ্জ—পরিফেরা

[Porifera শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে ল্যাটিন শব্দ Porus ও Ferre থেকে। Porus-এর অর্থ : ছিদ্র এবং Ferre-এর অর্থ : ধারণ করা।]

লৌহ ও ইস্পাতের ইতিহাস

আমাদের বর্তমান সভ্যতাকে বিরাট কোন যানের সঙ্গে তুলনা করলে লোহাকে নিঃসন্দেহে তার চলমান চাকা বলা যায়। যুগ যুগ ধরে সে মানুষের সঙ্গে কি ভাবে চলেছে, তা এক ইতিহাস।

লোহার ইংরেজী প্রতিশব্দ Iron, খুব সম্ভব স্ক্যান্ডিনেভিয়ান কথা Iarn থেকে এসেছে। লোহার ব্যবহার মানুষ এত প্রাচীনকাল থেকেই জানে যে, মনে হয় প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষও এর ব্যবহার জানতো। মিশরের পিরামিড, যার বয়স প্রায় পাঁচ হাজার বছর—সেখানেও অভিযান চালিয়ে লোহার সন্ধান পাওয়া গেছে। বৈদিক যুগে আমাদের পূর্বপুরুষেরা এই অমূল্য ও সম্ভাবনাপূর্ণ ধাতুটির ব্যবহার করে গেছেন—শুধু ব্যবহারই করেন নি, ব্যবহারের বিভিন্ন নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। লোহার তৈরি খোঁচ,

বল্লম, বর্শা, তীর ইত্যাদির ব্যবহার যে সে যুগের লোক জানতো, বেদে তার উল্লেখ আছে। বশিষ্ঠের ধনুর্বেদে সম্পূর্ণ লোহার তৈরি এক প্রকার বিশেষ ধনুকের উল্লেখও পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে ভারতে যে ইস্পাতের ব্যবহার ছিল, তারও বহু নিদর্শন আছে। দামাস্কাসের বিখ্যাত তরবারির ফলা ভারতীয় ইস্পাতেই তৈরি হতো।

ইউরোপীয়েরা তখনই এই ধাতুর সঙ্গে পরিচিত হয়, যখন আর্যেরা দেশ ঘুরতে ঘুরতে তাদের জ্ঞান ও কৃষ্টি নিয়ে ইউরোপে হাজির হয়। সম্ভবতঃ এট্রাস্কানরা (Etruscan), যারা কিনা আর্য বংশোদ্ভূত, ইউরোপীয়দের মধ্যে তারাই প্রথম এই ধাতুর ব্যবহার শেখে।

প্রাচীন হিন্দুদের মধ্যে এই ধাতু ব্যবহারের বেশ দক্ষতা ছিল। তারা এই ধাতু নিষ্কাশনের পদ্ধতি সম্বন্ধে বেশ পরিচিত ছিল। আধুনিক স্মেলটিং পদ্ধতিও তাদের জানা ছিল। পুরী, ভুবনেশ্বর ও কোণারকের মন্দিরের লোহার কড়ি এবং আবু পর্বতের মন্দির-শীর্ষের বৃহৎ ত্রিশূল এবং সিংহলের বৃহৎ লৌহ শিকল সে যুগের লোকের ব্যাপক লৌহ ব্যবহারের কথারই প্রমাণ দেয়। চীনারা যে সুপ্রাচীন 2500 খৃঃ পূর্বাব্দেও লোহার ব্যবহার জানতো, তা তাদের পুরাতত্ত্ববিদ্‌দের আবিষ্কারের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

প্রথম ধাতুবিদ্‌ বলতে গেলে মিশরীয় ও অ্যাসিরীয়দেরই বোঝায়। ইজিপ্টে রট আয়রনের ব্যবহারের নমুনা চার হাজার বছর পূর্বেও ছিল এবং তা সম্ভবতঃ হিটিটিসদের (Hittites) আমদানী করা ছিল। এগুলি হিমাটাইট আকর থেকে নিষ্কাশিত হতো। কিন্তু কিভাবে ও কখন মানুষ কয়লা ও চুনাপাথর সহযোগে ধাতব লৌহের নিষ্কাশন করতে শিখলো, তার সঠিক হদিশ মেলে না। বোধ হয় তখন সভ্যতার প্রত্যুষকাল। সেই আধা আলো আধা অন্ধকারে কি ঘটেছিল, তা পরিষ্কার জানা যায় নি। জানি না, পৃথিবীর সেই আদিম কালে ভূ-পদার্থবিষয়ক অবস্থা সামান্য কিছু লোহাকে বিশুদ্ধ অবস্থায় রেখে ছিল কিনা!

অতি সাধারণ লোহার আকরে বালি ও পাথুরে জিনিষের সঙ্গে অম্লজানযুক্ত লোহা মিশে থাকে। অম্লজান ছাড়া অন্য জিনিষগুলিকে অপেক্ষাকৃত সহজ উপায়ে লোহা থেকে আলাদা করা যায়। অম্লজানমিশ্রিত লোহাকে কয়লা ও চুনাপাথর মিশিয়ে মারুৎ-চুল্লীতে উত্তপ্ত করলে লোহা পাওয়া যায়। এই লোহাকে বলা হয় পিগ-আয়রন, কারণ ঐ গলা লোহাকে ঠাণ্ডা করলে যে আকার নেয়, তা দেখলে মনে হয় যেন একপাল শূকরের বাচ্চা। এই পিগ-আয়রনে প্রায় চার শতাংশ অঙ্গার, কিছু শতাংশ ফস্‌ফরাস, সালফার, ম্যাঙ্গানিজ ও সিলিকন থাকে।

অনেকে মনে করেন যে, কৃষ্ণ-সাগরের তীরে যে উপজাতি বাস করতো, তারাই প্রথম ইস্পাতের ব্যবহার জানতো। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর আরম্ভের আগে পর্যন্ত মারুৎ-

চুল্লী থেকে পাওয়া প্রায় লোহাই রট-আয়রন হিসাবে ব্যবহার করা হতো। রট-আয়রন প্রায় বিশুদ্ধ লোহা। কারণ এতে অঙ্গারের পরিমাণ প্রায় 0·1%।

আধুনিক পদ্ধতিতে ইস্পাত তৈরির কাজে যার অবদান সর্বপ্রথম, তিনি হচ্ছেন উইলিয়াম কেলী। এরকম একজন লোককে নিয়ে সে যুগের লোক উপহাস করতে কসুর করে নি। কেলীই প্রথম চিন্তা করেন যে, সাধারণ পিগ-আয়রনকে গলিয়ে তার মধ্যে বাতাস প্রবেশ করালে লোহার মধ্যস্থিত দূষিত পদার্থগুলি পুড়ে যায় এবং প্রচুর বিশুদ্ধ লোহা পাওয়া যায়। তাঁর সমসাময়িক অনেকেই তাঁর এই কথাকে আমল দিতে চায় নি। আর সবচেয়ে মজার কথা হলো, তাঁর শ্বশুর মশায় তো জামাতার মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত হয়ে ডাক্তারের পরামর্শ নেন। কিন্তু কেলী তাঁর সিদ্ধান্তে এমন অটল ছিলেন যে, তিনি একটি বিরাট ন্যাসপাতির আকারের পাত্র তৈরি করেন এবং প্রচুর গলিত লোহা তাতে রেখে অনেক ঠাণ্ডা বাতাস তার মধ্য দিয়ে চালিত করেন। গুরু গুরু শব্দের সঙ্গে একটি রঙীন শিখা পাত্রের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসতে থাকে। সেই শিখা নিবে যাবার পর লোহাকে ঠাণ্ডা করে যা পাওয়া গেল, তা হলো ইস্পাত। সমগ্র দেশ কেলীর কাণ্ড দেখে তো হতবাক।

উইলিয়াম কেলী যখন তাঁর আবিষ্কারকে আরো কার্যোপযোগী করতে ব্যস্ত, তখন ইংল্যাণ্ডের হেনরী বেসিমারও প্রায় একই জিনিষ আবিষ্কার করে ফেলেন। বেসিমারের পদ্ধতি কেলীর উদ্ভাবিত পদ্ধতি থেকে উন্নত। এই উল্লেখযোগ্য কাজের সম্মানার্থে তিপ্পান্ন বছর বয়সে তাঁর দেশের সরকার তাঁকে নাইট উপাধিতে ভূষিত করেন।

যদিও বেসিমার পদ্ধতিতে পাওয়া ইস্পাত আমাদের অনেকখানি চাহিদাই মিটিয়ে দেয়, তবুও এর বেশ কিছু অসুবিধাও থেকে যায়। লোহায় খুব বেশী ফস্‌ফরাস থাকলে এতে কাজ করবার অসুবিধা হয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরাও পিছিয়ে থাকবার পাত্র নন। কার্ল উইলহেলম্‌ সিমেন্স নামে জার্মেনীর (পরে ইংল্যাণ্ডের নাগরিক) এক বৈজ্ঞানিক তাঁর বিখ্যাত ওপেন হার্থ পদ্ধতি নিয়ে এগিয়ে আসেন।

যদিও সারা বিশ্বে যথেষ্ট পরিমাণে লোহা ও ইস্পাত তৈরি হচ্ছে, তথাপি এই সভ্যতার প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। অপর পক্ষে যতই দিন যাচ্ছে, আমাদের বড় বড় খনিগুলির আকর যোগাবার ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। তবে কি এর অভাবে আমাদের সভ্যতার চাকা স্থির হয়ে যাবে? জানি না, টাইটানিয়াম কিংবা কোন বিশেষ ধরণের প্লাসটিককে লোহা তার উত্তরাধিকারী করে যাবে কিনা!

শ্যামসুন্দর পাল

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন 1. : মুক্তা কিভাবে সৃষ্টি হয় ?

শেফালি রায়, কলিকাতা-14

প্রশ্ন 2. : গুদামজাত খাদ্যশস্যে যে সমস্ত কীট ও মথের আক্রমণ হয়, তাদের কয়েকটির নাম কি ?

প্রমথনাথ চক্রবর্তী, কলিকাতা-24

উত্তর 1. : সমুদ্রের মেলিয়াগ্রিনা নামক একজাতীয় ঝিনুকের মধ্যে মুক্তার সৃষ্টি হয়। আহার্য সংগ্রহের সময় ঝিনুক তার দেহের দু-পাশের শক্ত খোলক দুটি অল্প প্রসারিত করে। এই সময় কখনো কখনো খোলকের ভিতরে (প্রাণীর দেহে) শক্ত কণা ঢুকে যায়—যা এই প্রাণীদের নরম দেহের পক্ষে অসহনীয় হয়ে উঠে। এই অবস্থায় ঝিনুক তার দেহ থেকে একপ্রকার রস নিঃসৃত করে শক্ত কণার চারদিকে প্রলেপের সৃষ্টি করে কণাটিকে সহনীয় করে তোলে। এভাবে আস্তে আস্তে কণাটি বড় হতে থাকে। কালক্রমে ঝিনুকটি মারা গেলে শক্ত খোলক আপনা থেকেই খুলে যায় যায় এবং ভিতরের নরম পদার্থ নষ্ট হয়ে গেলে কণাটি সমুদ্রের তলায় পড়ে থাকে, যাকে আমরা মুক্তা বলি। তবে সাধারণতঃ ডুবুরীর সাহায্যে সমুদ্রের তলা থেকে জীবন্ত ঝিনুক তুলে এনে মুক্তা সংগ্রহ করা হয়। মুক্তার উপর আলো পড়লে বিভিন্ন রঙে উদ্ভাসিত হতে থাকে।

উত্তর 2. : সাধারণতঃ গুদামজাত খাদ্যশস্যের মধ্যে রিজোপারথা ডোমিনিকা, সিটোফিলাস ওরিজা, ওরিজাফিলাস সারিনামেনসিস, ক্রুচাস, ট্রাইবোলিয়াম ক্যাস্টেনিয়াম প্রভৃতি পোকা এবং এফেসটিয়া কটেলা, করসিরা সেফালোনিকা প্রভৃতি মথের আক্রমণ দেখা যায়। উপযুক্ত পরিবেশে এদের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হয়, ফলে এদের আক্রমণে অল্প সময়েই গুদামজাত চাল, গম, আটা, ময়দা, রবিশস্য প্রভৃতি খাদ্যশস্য নষ্ট হয়ে যায়।

শ্যামসুন্দর দে*

---

* ইনষ্টিটিউট অব রেডিও-ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-9

বিবিধ

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের 59তম অধিবেশন

গত 20শে—23শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা কলেজ-প্রাঙ্গণে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের 59তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার মন্ত্রী শ্রী সি. সুব্রহ্মণ্যম এবং সভাপতিত্ব করেন সাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিশিষ্ট ভূতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক ডাব্লিউ. ডি. ওয়েস্ট। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য পশ্চিম বঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীএ এল. ডায়াস এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর সত্যেন্দ্রনাথ সেন সমবেত প্রতিনিধিদের স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন। বিজ্ঞান কংগ্রেস উপলক্ষে আয়োজিত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তকের প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন কলকাতার মেয়র শ্রীশ্যামসুন্দর গুপ্ত। চারদিনব্যাপী এই অধিবেশনে ভারতের নানা প্রান্ত থেকে প্রায় দু-হাজার প্রতিনিধি এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে 20 জন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী যোগদান করেন। এবারের অধিবেশনে জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও অধ্যাপক টি. আর, শেষাদ্রিকে বিজ্ঞান কংগ্রেসের সম্মানীয় সদস্যপদ প্রদান করা হয়। অধিবেশনের বিভিন্ন দিনে 13টি শাখায় আলোচনা-চক্র ও বিশেষ বক্তৃতা ছাড়া কয়েকটি লোকরঞ্জক বক্তৃতারও আয়োজন করা হয়। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চা ও প্রচার এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানী যোহানেস কেপ্‌লারের চতুঃশতবার্ষিকী উপলক্ষে দুটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। এছাড়া বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তক ও পরিষদের হাতে-কলমে বিভাগের ছাত্রদের তৈরি মডেলের প্রদর্শনীও করা হয়। (বিজ্ঞান কংগ্রেসের এবারকার অধিবেশন সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ পরে প্রকাশিত হবে)।

কলকাতায় আর্থার সি. ক্লার্ক

কলিঙ্গ পুরস্কার বিজয়ী বিশিষ্ট বিজ্ঞান কাহিনীকার ও লোকরঞ্জক বিজ্ঞান-লেখক আর্থার সি. ক্লার্ক সম্প্রতি তিন দিনের সফরে কলকাতায় এসেছিলেন। 4ঠা ফেব্রুয়ারী বসু বিজ্ঞান মন্দিরে আয়োজিত এক বিজ্ঞানী-সভায় তিনি 'একবিংশ শতাব্দীর পৃথিবী' সম্পর্কে চিত্তাকর্ষক আলোচনা করেন। তিনি বলেন—সেই ভাবীকালে সমগ্র পৃথিবী ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে প্রায় একটি বিন্দুতে এসে পৌঁছুবে। পৃথিবীর যে কোন স্থানে যে কোন মানুষকে ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে দেখতে পাওয়া যাবে, তাঁর সঙ্গে কথা বলতেও কয়েক সেকেণ্ড মাত্র সময় লাগবে, আর সে জন্যে খরচ পড়বে অতি সামান্য। সেই পৃথিবীতে আজকালকার মত এমন অসংখ্য শহর থাকবে না বরং সমগ্র পৃথিবীই একটি অখণ্ড শহরে পরিণত হবে—কি বার্তা বিনিময় ব্যবস্থা, কি পরিবহন ব্যবস্থা, শিক্ষা বা স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থা—সব কিছুই তখন নিয়ন্ত্রিত হবে মহাকাশ যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে। তখন জীবন হবে অনেক স্বচ্ছন্দ, কর্মহীন। অফুরন্ত সময়ই হবে ভাবীকালের মানুষের প্রধান সমস্যা। এই বিশ্রামকে সে কি ভাবে ব্যবহার করবে, সেটাই হয়তো সে দিন তার প্রধান ভাবনার বিষয় হবে।

ভাবীকালে গড়ে উঠবে ছোট ছোট শহর। তবে শহর বলতে আমরা এখন যা বুঝি, তেমনটি নয়। ইস্পাতের মত শক্ত কাগজের হাল্কা পদার্থ

দিয়ে তৈরি হবে ছোট ছোট বাড়ী। বাড়ীগুলি এমনভাবে তৈরি হবে যে, গরমের দিনে সেগুলি বাতাসে ভর করে ভেসে যাবে শীতলতর স্থানে, আবার শীত ঋতুতে সেগুলি ভেসে আসবে উষ্ণতর স্থানে। আজকের মত হাওয়া-বদলের প্রয়োজন হবে না তখন।

উপসংহারে ক্লার্ক বলেন, আমাদের সমগ্র ধ্যান-ধারণাকে উল্টে দিতে হবে, মনকে নমনীয় করে তুলতে হবে। যে বিপুল জ্ঞানসম্পদ মানুষের হাতে আসছে, তাকে কাজে লাগাবার ক্ষমতা অর্জন করতে হবে আমাদেরই।

5ই ফেব্রুয়ারী মার্কিন বিশ্ববিজ্ঞালয় কেন্দ্রে ক্লার্ক বিজ্ঞান-শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের এক সভায় 'মহাকাশের প্রতিশ্রুতি' সম্পর্কে আর একটি আলোচনা করেন। তাছাড়া কলকাতার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার বিজ্ঞান প্রতিনিধিদের সঙ্গে তিনি এক সাক্ষাৎকারে মিলিত হন।

লুনা-20 পৃথিবীতে ফিরে এসেছে

সোভিয়েট চান্দ্রযান লুনা-20 25শে ফেব্রুয়ারী নিরাপদে ভূপৃষ্ঠে এসে পৌঁচেছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের নির্দিষ্ট স্থানেই চান্দ্রযানটি ভূমি স্পর্শ করে।

মনুষ্যবিহীন এই চান্দ্রযান এক দিনের কিছু বেশী সময় অবস্থানকালে চাঁদ থেকে কিছু নমুনা সংগ্রহ করে এনেছে। গত 14ই ফেব্রুয়ারী লুনা-20-কে উৎক্ষেপণ করা হয়।

বিজ্ঞান-প্রদর্শনী

গত 23শে জানুয়ারী থেকে 26শে জানুয়ারী পর্যন্ত নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ে এক সুন্দর প্রদর্শনী হয়ে গেল। এই প্রদর্শনীতে বিদ্যালয়ের অন্যান্য শাখার ছাত্রদের সঙ্গে বিজ্ঞান শাখার ছাত্রেরা এক অভিনব বিজ্ঞান-প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল। পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, গণিতবিদ্যা ও পারমাণবিক শক্তির ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্পর্কিত কয়েকটি মডেল বিদ্যালয়ের কিশোর বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞান-অনুসন্ধিৎসার এক চমৎকার নিদর্শন বহন করে। এদের মধ্যে একটি স্বয়ংক্রিয় রেলওয়ে লেভেল ক্রসিং, হৃদয়নোগ্রাফ, বিভিন্ন মাধ্যমে একই শক্তির পরিচালন প্রভৃতি কয়েকটি প্রকল্প বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রদর্শনীর সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় বস্তু ছিল ছাত্রদের তৈরি একটি তারকামণ্ডল বা প্ল্যানেটেরিয়াম (Planetarium)। ছোট ছোট ছাত্রেরা এখানে এত সুন্দরভাবে সত্যকারের প্ল্যানেটেরিয়ামের পরিবেশ সৃষ্টি করতে পেরেছিল, যা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

এই প্রদর্শনী সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে গিয়ে দেখা গেল, বিদ্যালয়ে উৎসাহী ছাত্রদের জন্যে বিভিন্ন শাখার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এক-একটি হবি ক্লাব আছে। সারা বছর ধরে ছাত্রেরা এই হবি ক্লাবগুলিতে অবসর সময়ে কাজ করে এবং নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর নতুন নতুন মডেল ও যন্ত্রপাতি তৈরি করে। সেগুলি বার্ষিকী প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়। আলোচ্য প্রদর্শনীটি তারই ফল।

শোক-সংবাদ

পরলোকে দেবেন্দ্রনাথ মিত্র

প্রখ্যাত কৃষিবিশেষজ্ঞ দেবেন্দ্রনাথ মিত্র গত 14ই জানুয়ারী 1972 পরলোকগমন করিয়াছেন। 1889 সালের 29শে অক্টোবর হুগলী জেলার আঁটপুর গ্রামের বিখ্যাত মিত্র পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। গ্রামস্থ বিদ্যালয়ে



দেবেন্দ্রনাথ মিত্র

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করিয়া তিনি হিন্দু স্কুল এবং সেন্ট জেভিয়াস' কলেজে সাধারণ শিক্ষান্তে সাবোর কৃষি কলেজে ভর্তি হন। উক্ত কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া তিনি অবিভক্ত বাংলার কৃষি বিভাগে যোগদান করিয়া ত্রিশ বৎসর-ব্যাপী বহুবিধ দায়িত্বপূর্ণ পদ অলংকৃত করিয়া 1945 সালে সহকারী উন্নয়ন কমিশনাররূপে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। কৃষির প্রসার ও উন্নতিই ছিল তাঁহার একান্ত লক্ষ্য। শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়কে কৃষির প্রতি আকৃষ্ট করিবার জন্য তিনি বহু কার্যকর পরিকল্পনা রচনা করেন। গ্রামে কৃষি আন্দোলনকে পরিচিত করিবার জন্য কৃষিমেলা প্রদর্শনীর আয়োজনে তিনি সংগঠনের পরিচয় দিয়াছিলেন। সরকারী কর্মচারীরূপে ফরিদপুরে (বাংলা দেশ) তিনি যে প্রদর্শনীর আয়োজন করিতেন, সেখানে মহাত্মা গান্ধী, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সুভাষচন্দ্র বসু প্রভৃতি যোগদান করেন। পরবর্তীকালে স্বগ্রাম আঁটপুরে তিনি কৃষিমেলার প্রবর্তন করেন এবং রাজ্যপালসহ বিভিন্ন সময়ে বহু বিশিষ্ট সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তি উক্ত অনুষ্ঠানসমূহে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ মিত্র কৃষিসম্বন্ধীয় পাক্ষিক পত্রিকা 'খাদ্য উৎপাদন'-এর সম্পাদক ছিলেন। ইহা ব্যতীত কৃষিবিষয়ক কয়েকখানি ইংরেজী ও বাংলা পুস্তকের তিনি রচয়িতা। ছাত্রাবস্থা হইতেই তিনি প্রবাসী প্রভৃতি পত্রিকায় কৃষি ও তাহার সমস্যা লইয়া প্রবন্ধ রচনা করিতে আরম্ভ করেন। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান', 'শিক্ষা' এবং অন্যান্য ইংরেজী ও বাংলা পত্রিকায় তাঁহার অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি বহু কৃষি ও শিক্ষাবিষয়ক প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি ফ্যাকাল্টির এবং পুরাতন মধ্য শিক্ষা পর্ষদের সদস্য ছিলেন।

বিজ্ঞপ্তি

1956 সালের সংবাদপত্র রেজিষ্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) রুলের 8নং ফরম অনুযায়ী বিবৃতি :—

1. যে স্থান হইতে প্রকাশিত হয়, তাহার ঠিকানা—বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি-23 রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6

2. প্রকাশনের কাল—মাসিক

3. মুদ্রাকরের নাম, জাতি ও ঠিকানা—শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য, ভারতীয়, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6

4. প্রকাশকের নাম জাতি ও ঠিকানা—শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য, ভারতীয়, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6

5. সম্পাদকের নাম :— জাতি ও ঠিকানা :—

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য (প্রধান সম্পাদক)	ভারতীয়, পি-23, রাজারাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6
শ্রীপরিমলকান্তি ঘোষ	ভারতীয়, পি-23, রাজারাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6
শ্রীমৃণালকুমার দাশগুপ্ত	ভারতীয় পি-23, রাজারাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6
শ্রীসূর্যেন্দুবিকাশ কর	ভারতীয়, পি-23, রাজারাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা 6
শ্রীজয়ন্ত বসু	ভারতীয়, পি-23, রাজারাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6
শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায়	ভারতীয়, পি-23, রাজারাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6

6. স্বত্বাধিকারীর নাম ও ঠিকানা—বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ (বাংলাভাষায় বিজ্ঞান-বিষয়ক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান), পি-23, রাজারাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6

আমি, শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য ঘোষণা করিতেছি, উপরিউক্ত বিবরণসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

স্বাক্ষর—শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য

তারিখ—4.3

প্রকাশক—'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'
মাসিক পত্রিকা

প্রধান সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ 37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের 59তম অধিবেশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান



(বাঁ-দিক থেকে)—ডক্টর কুদরত-ই খুদা, জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মূল সভাপতি—ডক্টর ডাব্লিউ ডি. ওয়েষ্ট. পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রী এ. এল. ডায়াস. উদ্বোধক—কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাবিষয়ক মন্ত্রী শ্রী সি সুব্রহ্মণ্যম। (এই বিষয়ে বিবরণ 240 পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)।

(ব্লক 'অমৃত' পত্রিকার সৌজন্যে)

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

রজত জয়ন্তী বর্ষ | এপ্রিল, 1972 | চতুর্থ সংখ্যা

বিজ্ঞান ও সমাজ

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস সংস্থা ও বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের যৌথ উদ্যোগে গত 23শে ফেব্রুয়ারী 'ভারতের আঞ্চলিক ভাষাগুলির মাধ্যমে বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ ও বিজ্ঞান শিক্ষা' বিষয়ে যে আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়, তাতে অংশগ্রহণ করে ভারত ও বাংলাদেশের কয়েকজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্ব পর্যায়ে বিজ্ঞান-চর্চার অনুকূলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। এই অভিমতের মূল কারণ হলো—

(1) মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষা না হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের সঙ্গে শিক্ষার্থীর আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না এবং শিক্ষার্থীর স্বাধীনভাবে চিন্তা করবার ক্ষমতাও ব্যাহত হয়। (ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে আমাদের শিক্ষা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা যদি-বা আমরা পাই, উচ্চ অঙ্গের চিন্তা আমরা করি না। কারণ চিন্তার স্বাভাবিক বাহন আমাদের ভাষা।')

(2) মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিখতে হলে শিক্ষার্থীর সীমিত সময় ও শক্তির অনেকখানি অংশ ভাষার বেড়া-জাল অতিক্রম করতেই ব্যয়িত হয়ে যায়। (বাঙালী শিক্ষার্থীর বিজ্ঞান শিক্ষা সম্পর্কে রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলেছিলেন, 'পদার্থবিদ্যার অরণ্যলার বিকট মূর্তি ছাত্রদিগের মনে কিরূপ আতঙ্ক সঞ্চার করে, তাহা ভুক্তভোগী

ছাত্রমাত্রেই অবগত আছেন। আমি কিন্তু দেখিয়াছি সহজ বাংলায় সেই আঁচড়গুলার তাৎপর্য বুঝাইয়া দিলে ছাত্রদের হৃৎকম্প তৎক্ষণাৎ নিবৃত্ত হইয়া যায়; এমন কি তাহাদের মনের ভিতর যে একটা আনন্দের সঞ্চার হয় তাহারও প্রমাণ পাইয়াছি।')

(3) সমাজকে বিজ্ঞান-সচেতন ও বিজ্ঞানমুখী করে গড়ে তোলা এবং এইভাবে বিজ্ঞানচর্চা ও বিজ্ঞানের সুষ্ঠু প্রয়োগের উপযোগী একটি সর্বাঙ্গীণ পরিবেশ সৃষ্টি করবার একান্ত প্রয়োজনীয় কাজটি একমাত্র মাতৃভাষার মাধ মেই সম্ভব।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, অন্যান্য দেশের বিজ্ঞান চর্চার সঙ্গে পরিচিত থাকবার জন্যে আমাদের দেশে উচ্চ পর্যায়ের বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের অবশ্যই ইংরেজি, রুশ, জার্মান, ফরাসী বা অন্য বিদেশী ভাষা শিখবার প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে। কিন্তু সে জন্যে মাতৃভাষার পরিবর্তে অন্য কোন ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করবার প্রস্তাব একান্তই অযৌক্তিক, কারণ সেটা নিঃসন্দেহে হবে 'গোড়া কেটে আগায় জল দেওয়ার' সামিল।

যা হোক, আমরা এখন উপরিউক্ত 3নং বিষয়টি সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করবো।

আধুনিক যুগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানজাত কারিগরী বিদ্যার অভাবনীয় উন্নতি ও ব্যাপ্তি। এই উন্নতির প্রতীক হিসাবে মানুষের কল্পলোক চন্দ্রে মহাকাশচারীদের সশরীরে উপস্থিতির কথা বলা যেতে পারে। অন্যদিকে আগেকার যুগের মত বিজ্ঞান আর কয়েকজন মুষ্টিমেয় জ্ঞানী-গুণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই—হাজার হাজার লোক এখন বিজ্ঞানের কাজে নিযুক্ত রয়েছেন, সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের জন্যে বিজ্ঞানের প্রয়োগ ঘটানোর চেষ্টা হচ্ছে, সমাজের চিন্তা-ভাবনা কতকাংশে বিজ্ঞানের গতি-প্রকৃতিকে প্রভাবান্বিত করছে। ফলে ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে বিজ্ঞান ক্রমেই সমাজতান্ত্রিক রূপ গ্রহণ করছে। সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর উন্মেষের ফলে যুগ যুগ সঞ্চিত কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের মূলে পর্যন্ত টান পড়ছে। তবে প্রশ্ন হচ্ছে, বিজ্ঞান যে হারে এগিয়ে চলেছে এবং সার্বিক কল্যাণ সাধনে এর যে সম্ভাবনা রয়েছে, আমাদের সমাজব্যবস্থা বা আমাদের চিন্তাধারা ও মানসিকতা কি তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এগুতে পারছে? দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশ তো বটেই, অধিকাংশ দেশের ক্ষেত্রেই উত্তরটি এখনো নেতিবাচক। বিজ্ঞান ও আমাদের সমাজের মধ্যে এখনো যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে, তাকে অপসারিত করতে হলে সমাজের সর্বস্তরে বিজ্ঞান সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করবার প্রয়োজন, প্রয়োজন সারা দেশ জুড়ে একটি বৈজ্ঞানিক পরিবেশ গড়ে তোলবার।

যে বিজ্ঞান চর্চাকে এককালে কয়েকজনের নেশা হিসাবে গণ্য করা যেত, এখন তা সমাজে একটি অন্যতম পেশারূপে চিহ্নিত। বিজ্ঞান-কর্মীর সংখ্যা কি পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে, তা বোঝা যায় এই তথ্য থেকে যে, পৃথিবীতে এ পর্যন্ত যত বিজ্ঞানী কাজ করেছেন, তাঁদের মধ্যে শতকরা প্রায় নব্বই ভাগ বিজ্ঞানী বর্তমানে জীবিত রয়েছেন। বিজ্ঞান এখন এত ব্যাপক যে, আমাদের মত দরিদ্র দেশে—যেখানে মাথাপিছু দৈনিক আয় এক টাকারও কম, সেখানেও বৈজ্ঞানিক গবেষণা খাতে বাৎসরিক ব্যয়ের পরিমাণ এক-শো থেকে দু-শো কোটি টাকা। এটা আশা করা নিশ্চয়ই সঙ্গত যে, এই অর্থের প্রতিদানে বৈজ্ঞানিক গবেষণার একটা বড় অংশ সরাসরি-ভাবে সমাজের কল্যাণের কাজে নিয়োজিত থাকবে। কিন্তু আমাদের দেশে ঐ গবেষণা এখনো অনেকটা ঘর সাজাবার কাগজের ফুলের মত—কেবলমাত্র শোভা বৃদ্ধি করাই যেন এর উদ্দেশ্য। এর মধ্যে সজীবতা আনতে হলে এবং দেশের সত্যিকারের কল্যাণের কাজে একে নিয়োগ

করতে হলে সামগ্রিকভাবে আমাদের বিজ্ঞানকে সমাজ-সচেতন হতে হবে এবং আমাদের সমাজকে হতে হবে বিজ্ঞান-সচেতন।

আমাদের সমাজের অধিকাংশ মানুষ কৃষি, শিল্প বা কারিগরী কাজে লিপ্ত আছেন। এঁদের পরিশ্রমকে অধিকতর সার্থক ও ফলপ্রসূ করে তুলতে হলে এঁদের নিজ নিজ ক্ষেত্রের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। এঁদের অনেকের মধ্যে জিজ্ঞাসাও আজ প্রবল। বলা বাহুল্য, কেবলমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমেই এই জিজ্ঞাসা চরিতার্থ করা সম্ভব। এজন্যে বহুকাল আগেই বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, 'যতদিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালিরা বাঙ্গলা ভাষায় আপন উক্তিসকল বিন্যস্ত করিবেন ততদিন বাঙ্গালির উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই।' এটাও উল্লেখ করতে হয় যে, বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে কোন সমাজের দ্রুত উন্নতি করতে হলে বিজ্ঞানের সঙ্গে ঐ সমাজের সাধারণ মানুষের একটু ভাল রকম পরিচয় থাকা দরকার, যাতে কেবল বিজ্ঞানের মূলনীতি, দৃষ্টিভঙ্গী বা যন্ত্রপাতি সম্পর্কেই নয়, বিজ্ঞানের সম্ভাব্য ব্যবহার ও ফলাফল সম্পর্কেও তাঁদের অন্ততঃ একটা মোটামুটি ধারণা থাকে। এই ধারণা সঠিকভাবে গড়ে তুলতে হলে উচ্চতম পর্যায় অবধি বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষা ব্যবহারের আবশ্যকতা রয়েছে; কারণ তখনই কেবল বিজ্ঞানের নতুন নতুন ভাবধারাগুলি উচ্চতম পর্যায় থেকে সহজ ও স্বাভাবিকভাবে সমাজের সর্বস্তরে অনুপ্রবেশ করতে পারবে এবং এইভাবে বিজ্ঞান ও সমাজের মধ্যে একটা একাত্মতা গড়ে উঠবে।

জয়ন্ত বসু

কালবৈশাখী

সৌম্যানন্দ চট্টোপাধ্যায়*

শীতকালে ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইরাক, ইরাণ ইত্যাদি অঞ্চলে বায়ুর চাপ বেড়ে গিয়ে উচ্চচাপের সৃষ্টি হয়। তার কারণ, এই অংশে তখন অত্যন্ত ঠাণ্ডা। এই সময়ে যদি ভারতের দক্ষিণাংশ, সিংহল, মালয় উপদ্বীপ, ইন্দোনেশিয়া এবং বিষুব রেখার নিকটবর্তী সমুদ্রের অঞ্চলগুলির বায়ুর চাপ নেওয়া হয় তবে দেখা যাবে, সেখানে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়েছে। বায়ুর ধর্ম সব সময় উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হওয়া। তাই দাক্ষিণাত্যের উত্তরার্ধে এবং উত্তরের গাঙ্গেয় সমভূমিতে শীতকাল ধরে বাতাস বইতে থাকে। পৃথিবীর নিজের অক্ষের উপর ঘোরবার জন্যেই এই বায়ুর গতি কিছুটা বেঁকে উত্তরের বদলে উত্তর-পশ্চিমমুখী হয়ে বইতে থাকে। এই বাতাস ঠাণ্ডা ও শুকনো। রাত্রিবেলায় সমুদ্রের দিক থেকে উপকূলের দিকে বয়ে যায় সমুদ্রের হাওয়া। উত্তরের ঠাণ্ডা হাওয়া ও সমুদ্রের হাওয়ার সংঘর্ষে সৃষ্টি হয় কুয়াশার। কিন্তু কালবৈশাখীর জন্যে যতটা উত্তাপের প্রয়োজন, তা এই সমুদ্রের হাওয়ায় না থাকায় শীতকালে কালবৈশাখী দেখা যায় না। দাক্ষিণাত্যেও গরম ও ঠাণ্ডা হাওয়ার তাপমাত্রার তফাৎ কম থাকায় সেখানে বজ্রঝটিকার সংখ্যাও কম।

ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের মত বায়ুর চাপ বলয়গুলির স্থানের পরিবর্তন ঘটে।

* ভূগোল বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-19

ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশের উচ্চচাপ কেন্দ্র কিছুটা দক্ষিণে সরে যায়। দক্ষিণ অংশের নিম্নচাপ কেন্দ্র কিছুটা উত্তরে উঠে যায়। এই ওঠা-নামা চলে প্রায় ছয় মাস। শেষকালে উচ্চচাপ স্থায়ী হয় আরব সাগরে আর নিম্নচাপ স্থায়ী হয় ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশে। ফলে দক্ষিণের সমুদ্র থেকে উত্তরের স্থলভাগে বাতাস প্রবাহিত হয়। পৃথিবীর আবর্তনের ফলেই দক্ষিণের হাওয়া কিছুটা বেঁকে দাক্ষিণাত্যে দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ু এবং গাঙ্গেয় সমভূমিতে দক্ষিণ-পূর্ব বায়ুরূপে প্রবাহিত হয়। এই পরিবর্তন আরম্ভ হয় ফাল্গুন মাসে, সমাপ্তি ঘটে বর্ষার আগমনে। বর্ষা ও শীতকালে বায়ুপ্রবাহের একটি নির্দিষ্ট গতি থাকে, কিন্তু অন্যান্য ঋতুগুলি হলো বায়ুচাপ বলয়গুলির স্থান পরিবর্তনের যুগ। ফলে বায়ুর গতি এবং জলীয় বাষ্পের সরবরাহ অনির্দিষ্ট ও দেশের এক এক অংশে তা এক এক রকম।

ভারতের সমস্ত অঞ্চলের মধ্যে বাংলাদেশেই সর্বাগ্রে দক্ষিণের হাওয়া প্রবাহিত হয় এবং তা গরম ও শুকনো বলে সমুদ্রের উপর দিয়ে আসবার সময় সঙ্গে করে আনে প্রচুর জলীয় বাষ্প। এই জলীয় বাষ্পই হচ্ছে কালবৈশাখী তৈরির দরকারী মালমশলা। এখন প্রশ্ন হতে পারে—কালবৈশাখী তাহলে রোজ কেন হয় না? কালবৈশাখী হলো এক ধরণের বজ্রঝটিকা। বজ্রঝটিকার উৎপত্তি হয় বৃহদাকার উল্লম্ব কিউমুলোনিম্বাস মেঘ থেকে। এই মেঘ অস্থির (Unstable) বায়ুতেই শুধু সৃষ্টি হয়। ল্যাপ্‌স্‌ রেট (Lapse rate) বা উচ্চতার সঙ্গে তাপমাত্রা হ্রাসের হার প্রতি 280 মিটারে 15 বা 16° সে. বেশী হলে অস্থির বায়ুর সৃষ্টি হয়। এই উচ্চ ল্যাপ্‌স্‌ রেটযুক্ত বায়ু অন্ত ঋতু তো বটেই, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসেও কম দেখা যায়। অথচ পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, কলকাতার উপর ঐ সময়ে পঞ্চাশের বেশী কালবৈশাখীর আগমন ঘটে। এটা হয় এই কারণে যে, বায়ুস্তরে ল্যাপ্‌স্‌ রেট কম থাকলেও বায়ুর ঊর্ধ্বস্তরে বেশ কিছুটা সুপ্ত অস্থিরতা থেকেই যায়। এটা আবার বায়ুর স্তরে জলীয় বাষ্পের বণ্টনের উপর নির্ভরশীল।

ভূমির উপর তাপমাত্রা 31° সে. এবং শিশিরাঙ্ক (Dew Point) 21° সে. হলে ভূমিসংলগ্ন বায়ুর পরম আর্দ্রতা প্রায় 52% হয়।

এখন বায়ুর মধ্যেকার যে কোন একটি ক্ষুদ্র অংশকে আলাদা করে পরীক্ষা করা হলে দেখা যাবে যে, বায়ুর ক্ষুদ্র অংশ উপরে ওঠবার সময় এর উপরের বায়ুমণ্ডলের চাপ ক্রমশঃ হ্রাস পায়। ফলে এর আয়তন বাড়ে ও তাপমাত্রা কমে। এই ক্ষুদ্র বায়ুর অংশ অ্যাডিয়াবেটিক বা তাপাবরোধক নিয়ম অনুসরণ করে উপরে উঠবে। শিশিরাঙ্কের কাছাকাছি পৌঁছুবামাত্র এই বায়ুর অংশ সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে এবং তখন এটা ড্রাই অ্যাডিয়াবেটিকের পরিবর্তে ময়েস্ট অ্যাডিয়াবেটিক রেখা অনুসরণ করে বলে এর ঊর্ধ্বগতির যাত্রাপথের পরিবর্তন ঘটে। যতক্ষণ এর উত্তাপ পারিপার্শ্বিকের তুলনায় কম থাকে, ততক্ষণ তা ভারী থাকে ও উপরের দিকে ওঠে না। কিন্তু উত্তাপ বৃদ্ধি পেতে থাকলেই বায়ুমণ্ডলের অবস্থা অস্থির হয়ে পড়ে। একে আবহবিজ্ঞানের ভাষায় বাতাসের সুপ্ত অস্থিরতা বা 'লেটেন্ট ইনষ্ট্যাবিলিটি অফ এয়ার' বলে।

ধনাত্মক এলাকা ঋণাত্মক এলাকার তুলনায় বেশী থাকে বলে এক্ষেত্রে ল্যাপ্‌স্‌ রেট 5·6-এর কম থাকলেও বজ্রঝটিকার সৃষ্টি হয়। কারণ কোনক্রমে উল্লম্ব মেঘ একবার ধনাত্মক এলাকায় পৌঁছুলে এর ঊর্ধ্বগতি অপ্রতিরোধ্য থাকে। যদি ধনাত্মক এলাকার পরিমাণ কমে যায়, তখন উল্লম্ব মেঘের ঊর্ধ্বগতি বন্ধ হয়ে যায়। আবার নীচেকার ঋণাত্মক এলাকার পরিমাণ বেশী হলে প্রাথমিক বাধার জন্যে মেঘ ধনাত্মক এলাকাতে যেতেই পারবে না। অতএব কালবৈশাখীর সৃষ্টির জন্যে প্রয়োজন সুবৃহৎ ধনাত্মক এলাকা এবং তার নিম্নে অতি

ক্ষুদ্র ঋণাত্মক এলাকা। এছাড়া কালবৈশাখী সৃষ্টির জন্যে প্রয়োজন, জলভরা মেঘকে দাঁড় করিয়ে রাখবার জন্যে পর্বতের মত কোনও বাধার অবস্থান। কলকাতা ও আর নিকটবর্তী অংশে কোনও মাথা উঁচুকরা হিমালয় পাহাড় দাঁড়িয়ে নেই, তাই বৃষ্টির জন্যে দরকার শহরের উত্তরে 1524 মিটার উঁচু পাঁচিল। কথাটা অবাস্তব হলেও মিথ্যা নয়। পাঁচিল একটা আছে, যদিও তা অদৃশ্য। বিভিন্ন তাপমাত্রার দুই বিস্তৃত বায়ুস্তর এক জায়গায় মিলিত হলে তাদের পার্থক্য-পৃষ্ঠকে বলা হয় সম্মুখ পৃষ্ঠ বা ফ্রন্ট্যাল সারফেস। এই পার্থক্য-পৃষ্ঠ ও পৃথিবী-পৃষ্ঠের ছেদরেখাকে আবহ-বিজ্ঞানে ফ্রন্ট বলে এবং সেটাই অদৃশ্য পাঁচিলের কাজ করে দেয়। দুটি বিভিন্ন অঞ্চলের বাতাস পরস্পরের নিকটবর্তী হলেই সংঘর্ষ সুরু হয়ে যায়। ভিন্ন ধরণের বাতাসের কথা ভাবলেই সাধারণতঃ মনে পড়ে দক্ষিণের বঙ্গোপসাগর থেকে আসা দক্ষিণা বাতাস এবং ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে আসা উত্তুরে হাওয়া।

পৃথিবীর ক্রমাগত ঘূর্ণনের ফলে ভিন্ন ঘনত্বের দুটি বিস্তৃত বায়ুপ্রবাহের পার্থক্য-পৃষ্ঠ অনুভূমিক থেকে কিছুটা উপরের দিকে হেলে যায়। পার্থক্য-পৃষ্ঠের এই হেলানোটা শুধু পৃথিবীর আবর্তনের উপরই নির্ভর করে না, উপরে ও নীচে দুটি বায়ুপ্রবাহের মধ্যেকার আপেক্ষিক বেগের জন্যেও এই হেলানো অবস্থাটা ঘটে।

পার্থক্য-পৃষ্ঠ অথবা ফ্রন্টের উন্নতি কোণটি যৎসামান্য (সাধারণতঃ এর ট্যানজেন্ট বা স্পর্শক গড়ে $\frac{1}{100}$ ভাগ হয়ে থাকে)। এই পার্থক্য-পৃষ্ঠের গা বেয়েই আর্দ্র ও উষ্ণ সামুদ্রিক বায়ু ক্রমাগত উপরে উঠে গিয়ে কনডেনশেসন লেভেলে পৌঁছুলেই মেঘ, বৃষ্টি, বজ্রঝটিকা, ঘূর্ণিবাত্যা ইত্যাদির সৃষ্টি হয় বলেই পৃথিবীর আবহাওয়ার অস্তিত্ব রক্ষায় ফ্রন্টের গুরুত্ব অপরিসীম। এই ফ্রন্ট সাধারণতঃ দুই রকম। ওয়ার্ম ফ্রন্ট এবং কোল্ড ফ্রন্ট। বর্ষাকালের একটানা বৃষ্টির জন্যে ওয়ার্ম ফ্রন্ট দায়ী, কিন্তু কোল্ড ফ্রন্ট থেকেই হয় পশলা বৃষ্টি ও বজ্রঝটিকা।

কোল্ড ফ্রন্টে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা বাতাস নীচে ঢুকে পড়ে গরম বাতাসকে উপরের দিকে ঠেলে দেবার চেষ্টা করে। গরম বাতাস উপরে উঠে বৃহদাকার কিউমুলোনিম্বাস মেঘের উৎপত্তি ঘটায় এবং তার ফলে পশলা বৃষ্টি ও বজ্রঝটিকা দেখা দেয়। ঠাণ্ডা বাতাসের মধ্যেও মেঘের সৃষ্টি হতে পারে, কিন্তু তা থেকে বৃষ্টি হয় না।

যে গরম বাতাস ফ্রন্টের গা বেয়ে ওঠে, সেটা যত বেশী অস্থির হবে, বজ্রঝটিকার শক্তি তত বেশী হবে। বজ্রঝটিকার মুখ্য শক্তি ফ্রন্টের মধ্যেই থাকে। ফ্রন্টের নীচের দিকে ভারী বাতাস ও উপরের হাল্কা বাতাস অর্থাৎ ঘনত্বের পার্থক্য দু-দিকেই থাকে। আর ফ্রন্ট সৃষ্টির পক্ষে কার্যকর দুটি বাতাসের তাপমাত্রার পার্থক্যের জন্যেই ধীরে ধীরে জমা হয় বিশাল একটা স্থৈতিক (Potential) তাপশক্তির ভাণ্ডার, যেটা শেষকালে গতীয় শক্তিতে পরিবর্তিত হয়ে বড় বড় বজ্রঝটিকার সৃষ্টি করে।

কোল্ড ফ্রন্ট এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকে না। এর গতিবেগ ঘন্টায় 48 থেকে 64 কিলোমিটার। ফ্রন্টের মধ্যেকার অস্থির বায়ু থেকে বজ্রঝটিকার সৃষ্টি হয়। এখন দেখা যাক, এই ধরণের কোল্ড ফ্রন্ট যখন আমাদের কলকাতার আকাশে এসে পড়ে, তখন কি কি ঘটে?

ফ্রন্টের আবির্ভাবের কিছু আগেই বায়ুর চাপ কমে গিয়ে 1″ অথবা 43 মিলিবারে দাঁড়ায়। কিন্তু ফ্রন্ট এসে পড়া মাত্রই বায়ুর চাপ দ্রুত বাড়তে থাকে। সাধারণ ব্যারোমিটারে এটা বোঝা যায় না। এর জন্যে আবহাওয়া অফিসে স্বয়ংক্রিয় ব্যারোমিটার থাকে। আমরা অনেকেই বলে থাকি কালবৈশাখীর ঝড় হবার পর ঠাণ্ডা ভাবটা হয় কালবৈশাখীর বৃষ্টির জন্যে; কিন্তু বৃষ্টি

যখন হয় না তখনও একটা ঠাণ্ডা ভাবের সৃষ্টি হয়। সকলেই তখন ধরে নেয়, নিশ্চয় আশেপাশে বৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু সেটা ভুল ধারণা। বজ্রঝটিকা সুরু হবার পর কোল্ড ফ্রন্টের ভিতরের স্থৈতিক তাপশক্তির বিশাল ভাণ্ডার থেকে কিছুটা তাপশক্তি শেষ হয় এবং উর্ধ্বাকাশে কিউমুলোনিম্বাস মেঘের মধ্য থেকে অতি শীতল একটা বায়ুপ্রবাহ সজোরে নীচে নামে। তাই বৃষ্টি হোক বা না হোক, কালবৈশাখীর পর আমরা কিছুটা ঠাণ্ডা বোধ করি।

এবার বৃষ্টির প্রসঙ্গে আসা যাক। বজ্রঝটিকা যখন কলকাতার 48-6 কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে থাকে, তখন সামান্য বৃষ্টি হয়। তারপর একেবারে এসে গেলে প্রবল পশলা বৃষ্টি আরম্ভ হয়। কখনো কখনো শিলাবৃষ্টিও হয়। তারপর কলকাতা অতিক্রম করে বজ্রঝটিকা আরো দক্ষিণে চলে গেলে বৃষ্টির বেগও কমে আসে। তারপর আবার দু-এক পশলা বৃষ্টি কোন কোন দিন হয় আবার কখন কখন তাও হয় না। রাত্রি নয়টার পর বেশীর ভাগ দিনই আকাশ পরিষ্কার থাকে।

বজ্রঝটিকা দু-ধরণের। প্রথমটি কোল্ড ফ্রন্টের বজ্রঝটিকা এবং দ্বিতীয়টি স্থানীয় বজ্রঝটিকা। স্থানীয় বজ্রঝটিকা খুব একটা শক্তিশালী হয় না। গ্রীষ্মকালের দুপুরে ভূপৃষ্ঠ যখন গরম হয়ে ওঠে, তখন তার সংস্পর্শে এসে বাতাস গরম ও হাল্কা হয়ে উপরের দিকে উঠে যায়। আবহ-বিজ্ঞানে বায়ুর এই ধরণের উপরে ওঠাকে 'ট্রিগার অ্যাকশন' নামে অভিহিত করা হয়। তারপর এই গরম হাওয়া উর্ধ্বাকাশে ঠাণ্ডা ও বর্ধিত হয়ে কিউমুলোনিম্বাস মেঘ ও শেষে বজ্রঝটিকার সৃষ্টি করে। এভাবে তৈরি স্থানীয় বজ্রঝটিকা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই একটা অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং কালবৈশাখীর বেলায় যে স্থানীয় বজ্রঝটিকা হয়ে থাকে, সংখ্যায় তা নগণ্য।

কালবৈশাখীর সময় উত্তরপ্রদেশ থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত একটা প্রসারিত নিম্নচাপ অঞ্চলে পরিণত হয়। বঙ্গোপসাগর থেকে কোন্ দিকে এবং কি পরিমাণ জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু দেশের অভ্যন্তরে প্রবাহিত হবে, সেটা নির্ভর করে এই প্রসারিত নিম্নচাপের অবস্থান, দিক পরিবর্তন এবং গভীরতার উপর। যে দিন এই নিম্নচাপ অঞ্চলটির অক্ষ এমনভাবে অবস্থিত থাকে যে, সমুদ্রের বাতাস পশ্চিম বঙ্গে এবং ছোটনাগপুরের দিকে বইতে থাকে, সে দিনটি কালবৈশাখীর পক্ষে সবচেয়ে সুবিধাজনক। সকালের দিকে সাধারণতঃ আর্দ্র বাতাসের উচ্চতা 1050 মিটার এবং বিস্তার সুন্দরবনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। বেলা যেই বাড়তে থাকে, অমনি নিম্নচাপ অঞ্চলটি গভীরতর হয়। এর জন্যেই আর্দ্র বাতাসের উচ্চতা এবং বিস্তার দুই-ই বেড়ে যায় ও বেলা তিনটা সাড়ে তিনটার সময় দেখা যায় যে, 1524-1804 মিটার উঁচু একটা সঙ্কীর্ণ বাতাসের স্তর সমুদ্রের উপকূল থেকে একেবারে ছোটনাগপুরে ঢুকে পড়েছে। এই বায়ুস্তরকে আবহ-বিজ্ঞানের ভাষায় বলে moist tongue। এই moist tongue-এর শেষ প্রান্তে উত্তর-পশ্চিম থেকে আসা ঠাণ্ডা বাতাস নীচের দিকে ঠেলে ঢুকে পড়ে কোল্ড ফ্রন্টের সৃষ্টি করে। তারপর এই কোল্ড ফ্রন্টের পিঠের উপর দিয়ে উষ্ণ এবং হাল্কা বাতাস কেবলই উপরে উঠতে থাকে; অর্থাৎ কোল্ড ফ্রন্টের পৃষ্ঠের হেলানো অবস্থাই ট্রিগার অ্যাকশন যোগায়। এছাড়া এই সময় ছোটনাগপুরের অতি উত্তপ্ত ভূপৃষ্ঠ (110° ফা 40° সে) উপযুক্ত ট্রিগার অ্যাকশনের যোগানদার। এই দুই ভাবেই কিউমুলোনিম্বাস মেঘ উৎপন্ন হয়ে প্রথম কালবৈশাখীর আরম্ভ হয়। তারপর কোল্ড ফ্রন্ট যেমন পূর্বদিকে এগুতে থাকে, তখন একটির পর একটি কালবৈশাখীর সৃষ্টি হতে থাকে। এই ধরণের শ্রেণীবদ্ধ বজ্রঝটিকাকে আবহ-বিজ্ঞানে line squall বলে। বিমান চলাচলের

পক্ষে এই শ্রেণীবদ্ধ বজ্রঝটিকা সবচেয়ে বিপজ্জনক। তারপর শীতল ফ্রন্টের প্রভাবে যখন সম্মুখের উষ্ণ বায়ু ভূপৃষ্ঠ থেকে উপরে উঠে যায় ও তার স্থান কোল্ড ফ্রন্ট দখল করে, তখন সেই ফ্রন্টকে occluded front বলে।

উত্তর-পশ্চিম থেকে কালবৈশাখীর আগমনের আগে বায়ুর গতি দক্ষিণ-পূর্ব অভিমুখে মন্থেস্ট টাঙ বরাবর থাকে; অর্থাৎ কালবৈশাখীর বিপরীতে। প্রথমে বায়ুর গতিবেগ সামান্য বেড়ে গেলেও গতি মোটামুটি একই থাকে। তারপর এক সময় হঠাৎ এই দক্ষিণ-পূর্ব বাতাস নিশ্চল হয়ে যায়। এই সময়ে উত্তরে বাতাস প্রবাহিত হয় না, একটা নিস্তব্ধভাব বিরাজ করতে থাকে। পরমুহূর্তে নেমে আসে কালবৈশাখীর ঝড়। এই ঝড় উড়িয়ে নিয়ে যায় তার পথ থেকে সব কিছু। এই ঝড়ের বেগ ঘন্টায় 96-120 কিলোমিটার। কিন্তু উর্ধ্বাকাশের সমস্ত অস্থিরতা এবং কোল্ড ফ্রন্টের যাবতীয় শক্তি যেদিন গতীয় শক্তিতে রূপান্তরিত হয়, সেদিন ঝড়ের বেগ বেড়ে গিয়ে ঘন্টায় 160 কিলোমিটারের উপরে ওঠে।

এই প্রসঙ্গে ঘূর্ণিবাত্যার কথা আলোচনা করা যায়। ঘূর্ণিবাত্যা ও বজ্রঝটিকার উৎপত্তির কারণ একই। কিন্তু উভয়ের মধ্যে তফাৎ হলো, বজ্রঝটিকা স্থানীয়ভাবে ও অনেক কম এলাকায় সংঘটিত হয়। ঘূর্ণিবাত্যা বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে এবং অনেক বেশী সময় ধরে হয় ও তার শক্তিও বজ্রঝটিকার চেয়ে অনেক বেশী। ঘূর্ণিবাত্যা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে গতিবেগের তারতম্যভেদে নানা নামে পরিচিত; যেমন—বঙ্গোপসাগরে সাইক্লোন, চীনসাগরে টাইফুন, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে হারিকেন। এগুলির গতিবেগ ঘন্টায় 160-200 কিলোমিটার। যুক্তরাষ্ট্রের মিসিসিপি নদীর মোহানা দিয়ে প্রবাহিত টর্নেডোর গতিবেগ ঘন্টায় 320 কিলোমিটার। কখনও কখনও এই রকম ঘূর্ণিবাত্যা সমুদ্রের উপর দিয়ে প্রবাহিত হলে সমুদ্রের জলকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে উঁচুতে তুলে জলস্তম্ভের সৃষ্টি করে। মরুভূমিতে ঐ একইভাবে বালুকা-স্তম্ভের সৃষ্টি হয়।

বজ্রঝড় ও ঘূর্ণিবাত্যার আয়তন ও গতির তারতম্য অনুসারে ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা নিরূপিত হয়। এই গতি ঘন্টায় 25 কিলোমিটার থেকে 320 কিলোমিটার পর্যন্ত হয়। সাধারণতঃ অল্প জায়গার উপর দিয়ে প্রবল ঘূর্ণিবাত্যা প্রবাহিত হলে ধ্বংসের মাত্রা বাড়ে। আর বেশী জায়গার উপর দিয়ে গেলে বেগ কমে গিয়ে ধ্বংসের পরিমাণ কমে। ঘূর্ণিবাত্যার কেন্দ্রে বাইরে থেকে বাতাস ঢোকবার সময় উত্তর গোলার্ধে ঘড়ির কাঁটার উল্টা দিকে ও দক্ষিণ গোলার্ধে ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘোরে। প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যার ব্যাস কখনও কখনও 9 কিলোমিটার থেকে 160 কিলোমিটার পর্যন্ত হয়। 1965 সালের বাংলাদেশে ঘূর্ণিবাত্যার গতিবেগ ছিল ঘন্টায় 170 কিলোমিটার। সমুদ্রোপকূলে প্রায় লক্ষাধিক লোকের জীবনহানি ঘটে ও বহু লোক গৃহহীন হয়।

বজ্রঝটিকার বজ্র তৈরি হয় মেঘের মধ্যেকার বৃষ্টিবিন্দুর উপর। বৃষ্টিবিন্দুর ব্যাস 4 মিলিমিটারের বেশী এবং সেকেণ্ডে 8 মিটারের বেশী গতিবেগে পৃথিবীতে নেমে আসবার সময় যদি কিউমুলোনিম্বাস মেঘ সৃষ্টিকারী উর্ধ্বমুখী বায়ুর (গতিবেগ সেকেণ্ডে 8 মিটারের বেশী) সঙ্গে ধাক্কা খায়, তবে তারা চূর্ণ হয়ে আরো ছোট ছোট বিন্দুতে পরিণত হয়। এভাবে ক্রমাগত চূর্ণ হতে হতে কিউমুলোনিম্বাস মেঘের বৃষ্টিবিন্দুগুলির বৈদ্যুতিক আধানও বিভক্ত হয়ে যায়। ধনাত্মক আধান বৃষ্টিবিন্দুগুলির ভিতরে সঞ্চিত হতে থাকে এবং বায়ুর মধ্যে চলে যায় ঋণাত্মক আধান। এই প্রক্রিয়া বার বার চলায় মেঘের মধ্যেকার বৈদ্যুতিক আধানের পার্থক্য বাড়ে ও অতি বিশাল একটা বিদ্যুৎ-বিভবের ভাণ্ডার তৈরি হয়। মেঘ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী বায়ুস্তরের

আস্তরণ ভেদ করে পৃথিবীর বুকে বিদ্যুৎ নেমে আসতে হলে বৈদ্যুতিক বিভব 10 লক্ষ ভোল্ট হওয়া চাই।

কালবৈশাখীর সবটাই মানুষের কাছে ক্ষতি-কারক নয়, তার একটা ভাল দিকও আছে। সারা বসন্ত ও গ্রীষ্ম ধরে সমুদ্র থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প জমা হতে থাকে বাংলার আকাশে। এই জলীয় বাষ্প কালবৈশাখী সৃষ্টি করে লোকের প্রতি বছরই অসুবিধা করে ঠিকই, কিন্তু এই কালবৈশাখী এবং বঙ্গোপসাগরের মাঝখানে প্রাক্‌-মৌসুমী নিম্নচাপগুলি যদি সময়মত ও যথেষ্ট সংখ্যক উৎপন্ন না হয়, তবে পরের বছরের বর্ষাকালে বৃষ্টির সম্ভাবনা অনেক কমে যায় এবং তার ফলে বাংলার চাষী খরার ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। সুতরাং সমুদ্রের জলীয় বাষ্পের সাহায্যে কালবৈশাখীরও প্রয়োজন আছে।

বাংলাদেশের মৎস্য-সম্পদ

শ্রীরাসবিহারী ঘোষ*

মৎস্য-সম্পদে বাংলাদেশ ভারত উপমহাদেশে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে। নদীবহুল এই দেশটি জলজ সম্পদের জন্ম বিশ্বের প্রতিটি দেশেরই বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আয়তনের তুলনায় আমাদের দেশে লোকসংখ্যা অনেক বেশী—প্রতি বর্গমাইলে প্রায় এক হাজার লোকের বাস। পৃথিবীর ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল-গুলির মধ্যে আমাদের দেশ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ভূমির স্বল্পতা আমাদের যে সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছিল, জলের আধিক্য তাহা সমাধানের উপায় করিয়া দিয়াছে। ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, মেঘনা, পদ্মা, কর্ণফুলী প্রভৃতি বড় বড় নদ-নদী ছাড়াও এই দেশে অসংখ্য ছোট ছোট নদী, খাল, বিল, হাওর ও বড় বড় পুকুর আছে। এই গুলিতে সারা বৎসরই প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত এই দেশের ধানক্ষেতগুলি বৎসরের অধি-কাংশ সময় জলমগ্ন থাকায় তাহাতে প্রচুর পরিমাণ মাছ উৎপন্ন হয়। এই দেশের খাড়ি অঞ্চলগুলি মৎস্যসম্পদের জন্ম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল জেলায় বিস্তীর্ণ খাড়ি অঞ্চল আছে। বঙ্গোপসাগরের উপকূলভাগকে সামুদ্রিক প্রাণী ও মৎস্যের ভাণ্ডার বলা যাইতে পারে। বাংলাদেশে নিম্নলিখিত মৎস্য-ক্ষেত্রগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য—

(1) দীঘি ও পুকুর ইত্যাদির সংখ্যা 230135 এবং ইহাদের পরিমাপ 18,9000 একর।

(2) বিল—72,4000 একর।

(3) নদী ও খাল—3520 মাইল দীর্ঘ অথবা 20,51200 একর।

(4) নদীর মোহানা ও খাড়ি অঞ্চল—683 বর্গমাইল।

(5) সামুদ্রিক উপকূলভাগ—340 বর্গমাইল। (কক্সবাজারের টেক্‌নাফ হইতে খুলনার সুন্দরবন পর্যন্ত প্রসারিত)।

(6) ধানক্ষেত—বাংলাদেশে প্রায় 20195000 একর ধানক্ষেত আছে। এগুলির মধ্যে যেখানে প্রচুর জল থাকে, সেখানে যথেষ্ট মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী জন্মায়। জলজ প্রাণীর মধ্যে চিংড়ি, কাঁকড়া ও কচ্ছপ প্রধান।

---

*প্রাণিবিদ্যা বিভাগ—জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা; বাংলাদেশ

মৎস্যের প্রয়োজনীয়তা এবং মৎস্য ও মাংসের উপকারিতার পার্থক্য

মাছ বাঙালীর প্রিয় খাদ্য এবং দৈনন্দিন আহার্যের অন্তর্ভুক্ত। মানবদেহে প্রোটিনের অভাব পূরণের জন্য মাছ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মাছ এবং মাংস মানবদেহের পুষ্টিসাধনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু মাংস সহজপাচ্য নয়, কারণ উহার চর্বিজাতীয় উপাদানসমূহ সম্পৃক্ত অবস্থায় থাকে। অধিক পরিমাণ মাংস ভক্ষণ করিলে এই চর্বিজাতীয় উপাদান হইতে এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন হয়, ইহাকে কোলেষ্টেরল বলে। ইহা আস্তে আস্তে রক্তের মধ্যে আশ্রয় নেয় এবং এই কোলেষ্টেরলের বৃদ্ধিতে হঠাৎ মানুষের হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মৃত্যু ঘটিতে পারে। অপর পক্ষে, মাছের মধ্যে যে চর্বিজাতীয় উপাদান থাকে, তাহা অসম্পৃক্ত; কাজেই অতি সহজে হজম হইতে পারে। কারণ ইহাতে হাইড্রোজেনের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম থাকে। সুতরাং ইহা স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর নহে।

মিঠা ও লোনা জলের মাছ

বাংলা দেশের মৎস্য-সম্পদকে প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যায়; যথা—(1) মিঠা জলের মাছ—যে সমস্ত মাছ মিঠা জলে অর্থাৎ নদী, পুকুর, খাল, বিল ইত্যাদিতে পাওয়া যায়, সেগুলিকে মিঠা জলের মাছ বলে; যেমন—রুই, কাৎলা, মৃগেল, কালবোস, চেতল, কই, শিঙি, মাগুর ইত্যাদি।

(2) সামুদ্রিক বা লোনা জলের মাছ—সমুদ্রের লবণাক্ত জলে বহুবিধ মাছ পাওয়া যায়; যেমন—রূপচাঁদা, পায়রাচাঁদা, রূপাপাটিয়া, সামুদ্রিক কই, ট্যাংরা, সুবর্ণখরিকা, সুরমা, টেকচাঁদা, নারকলি, কুকুরজিভ ইত্যাদি।

মৎস্য-বিশেষজ্ঞেরা এই পর্যন্ত পৃথিবীতে প্রায় 5,800 শ্রেণীর মাছ আবিষ্কার করিয়াছেন। তন্মধ্যে মিঠা জলের প্রায় 2300 শ্রেণীর মাছ এবং প্রায় 3500 শ্রেণীর সামুদ্রিক মাছ আছে।

সামুদ্রিক মাছ সাধারণতঃ 300 ফ্যাদম বা 1200 হাতের বেশী জলের নীচে চলাফেরা করে না। খুব গভীর সমুদ্রেও প্রায় 100 প্রকার মাছ বাস করে। কিছু কিছু সামুদ্রিক মাছ গভীর অন্ধকারে নিজেদের শরীর হইতে উৎপাদিত আলোকরশ্মির সাহায্যে চলাফেরা করে।

মাছে বিভিন্ন প্রকারের উপাদান

আমিষজাতীয় খাদ্য আমাদের নিত্য অপরিহার্য। কয়েক জাতীয় মাছে কি কি উপাদান পাওয়া যায়, তাহা নিম্নে বর্ণনা করা হইল:—

	গ্র্যাম হিসাবে					মিলিগ্র্যাম হিসাবে	
মাছের নাম	জল	প্রোটিন	চর্বি	মোট আয়রন	শরীরের উপযোগী আয়রন	ক্যালসিয়াম	ফস্‌ফরাস
কালবোস	81·0	14·7	1·0	0·33	0·26	320·0	380·0
মৃগেল	75·0	19·5	0·8	1·09	0·41	350·0	280·0
কাৎলা	73·7	19·5	2·4	0·76	0·55	510·0	210·0
রুই	76·7	16·6	1·4	0·85	0·50	680·0	150·0

মাছের স্বভাব

অধিকাংশ মাছ খুব দ্রুত চলাফেরা করে। একটি স্যামন মাছ ঘণ্টায় 16 মাইলেরও বেশী অতিক্রম করে। বোনেট মাছ জাহাজের সহিত পাল্লা দিবার মত ক্ষমতাসম্পন্ন এবং ঘণ্টায় 16 হইতে 20 মাইল অতিক্রম করিতে পারে। বড়কুড়া

ঘণ্টায় 27 মাইল, উড়ুক্ মাছ ঘণ্টায় 35 মাইল, টুনা ও এলবাকর ঘণ্টায় 40 হইতে 50 মাইল পর্যন্ত চলিতে পারে। সীল ও তরবারী মাছ ঘণ্টায় 60 মাইলেরও বেশী গতিতে চলিতে পারে। মাছের ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। ইহাদের কিছুটা স্মরণশক্তি আছে এবং শ্রবণশক্তিও প্রখর। ক্ষুধা পাইলে মাছ অস্থির হইয়া পড়ে এবং ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য অনেক সময় বৃহত্তর মাছ গিলিয়া বসে। জলের মাধ্যমেই মাছের ডিম নিষিক্ত হয়। মাদী মাছ নর মাছের নিকটবর্তী হইয়া ডিম ছাড়ে এবং তৎক্ষণাৎ নর মাছ উহার উপর বীর্য নিঃসৃত করে। এইভাবে নিষিক্ত হইবার পর যথাসময়ে ডিম ফুটিয়া ছানা বাহির হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে বাচ্চা রক্ষার জন্য নর মাছেরই অধিক তৎপরতা দেখা যায়। স্তন্যপায়ী প্রাণীর মত কয়েক জাতীয় মাছ বাচ্চা অথবা ডিমের বিশেষ যত্ন নেয়। ডিম অথবা বাচ্চা রক্ষার জন্য উহারা শত্রুর সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ করে। সি-হর্স ও পাইপ ফিসের ডিমগুলি পুরুষ সি-হর্স ও পাইপ ফিশ তাহাদের দেহস্থ থলিতে জমা রাখে এবং উপযুক্ত সময়ে সেখান হইতেই বাচ্চা বাহির হয়।

মৎস্য চাষ

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অধিক পরিমাণে মৎস্য উৎপাদন করাই মৎস্য-চাষের প্রধান উদ্দেশ্য। মৎস্য-চাষের জন্য আমাদের দেশে প্রচুর জলাশয় আছে, কিন্তু ইহাদের উপযুক্ত ব্যবহারের পদ্ধতি না জানায় আমাদের আশানুরূপ ফল লাভ হয় না। এখানে শুধু মাছ ধরা হয় অথচ উৎপাদনের কোন ব্যবস্থা নাই। পাঁচ বৎসর পূর্বেও বাজারে যে মাছ দেখা যাইত, বর্তমানে তাহার প্রায় এক-তৃতীয়াংশে পৌঁছিয়াছে।

রুই-কাৎলার চাষ—আধুনিক পদ্ধতিতে মৎস্য-চাষের নিয়ম-কানুন জানা না থাকায় অনেকের পক্ষেই আশানুরূপ ফললাভ সম্ভব হয় না। অনাবাদী পুকুরগুলি মশার আবাসস্থলে পরিণত হইয়া থাকে। এই পুকুরগুলি পরিষ্কার করিয়া মাছের চাষ করিলে প্রতি পুকুরে যদি গড়ে 10 মণ মাছও উৎপাদিত হয়, তবে বৎসরে প্রায় 10 লক্ষ মণ মাছ শুধুমাত্র এই সমস্ত পুকুর হইতেই উৎপাদিত হইবে। মৎস্য-চাষে সুফল লাভ করিতে হইলে প্রয়োজন উপযুক্ত পুকুর, উন্নত ধরণের মাছ ও ব্যবহারিক জিনিষপত্র। রুই, কাৎলা, মৃগেল, কালবোস ইত্যাদি মাছ জলজ উদ্ভিদ ভোজী ইহারা একে অন্যকে খায় না। সেই জন্য পুকুরে ইহাদের চাষ ভাল হয়। এই সমস্ত মাছ স্তরভেদে পুকুরে বাস করে। কাৎলা মাছ উপরের স্তরে, রুই মাছ মধ্যস্তরে, মৃগেল ও কালবোস নীচের স্তরে থাকে। আবার জলের বিভিন্ন স্তরে মাছের বিভিন্ন প্রকার খাদ্য আছে, যেমন—প্ল্যাঙ্কটন, স্বেকটন, বেনতন ইত্যাদি। সকল রকমের মাছ এক ধরণের খাদ্যে অভ্যস্ত নয়। কাজেই চার জাতের মাছ একসঙ্গে চাষ করিলে পুকুরের সকল স্তরের খাবার সম্পূর্ণ ব্যবহৃত হয়। মাছের চাষ করিতে হইলে এই সম্পর্কে নিয়ম-কানুন ভালরূপে অবহিত হইতে হইবে। পোনামাছ পুকুরে ছাড়িবার পূর্বে জলজ উদ্ভিদ নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। পুকুরের পাড় বাঁধানো আছে কিনা, সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। মৎস্যভুক্ মাছ এবং অন্যান্য প্রাণীদের দূর করিতে হইবে। শোল, শাল, শিঙি, মাগুর, বোয়াল, চিতল ইত্যাদি মাছ অন্যান্য মাছ খাইয়া ফেলে। প্রয়োজনমত মাঝে মাঝে পুকুরে সার প্রয়োগ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বালুকাময় তলদেশসম্পন্ন গভীর পুকুরে কিভাবে মাছের চাষ করিতে হয়, সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকিলে মৎস্য-চাষে সুফল লাভ করা যায় না। পোনা সংগ্রহ করিবার সময়ও বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। মৎস্য ছাড়িবার পর পুকুরের মধ্যে কয়েকটি আধকাণি বাঁশ পুতিয়া দেওয়া প্রয়োজন। ইহার ফলে কোন মাছ কোন প্রকার

জীবাণুর দ্বারা আক্রান্ত হইলে বাঁশের গায়ে ঘষিয়া তাহা ছাড়াইয়া নিতে পারে। তাছাড়া বাঁশের গায়ে যে শ্যাওলা জন্মায়, তাহা মাছের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। পুকুরের পাড়ে ঝোপ-জঙ্গল বেশী থাকিলে তাহা মাঝে মাঝে পরিষ্কার করা উচিত। আম, জাম, দেবদারু, পেয়ারা ইত্যাদি বড় বড় গাছ থাকিলে উহাদের ছায়ায় মাছের জীবনধারণে বিশেষ উপকার হয়। রাক্ষুসে মাছ ছাড়াও কচ্ছপ, মাছরাঙা, উদ, সাপ, ব্যাং ইত্যাদি রুইজাতীয় মাছের বিশেষ ক্ষতিসাধন করে। কাজেই ইহাদের আক্রমণ হইতে মাছ রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য।

পৃথিবীতে অস্থিময় মাছের সংখ্যাই অধিক। তন্মধ্যে কাৎলাজাতীয় মাছই প্রায় এক-তৃতীয়াংশ স্থান অধিকার করিয়াছে। তাহার কারণ, ইহাদের প্রজননশক্তি অত্যন্ত বেশী। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, 410 তোলা ওজনের একটি রুই মাছ এক মরসুমে 19 লক্ষ 5 হাজার ডিম ছাড়ে।

তেলাপিয়ার চাস—রুই, কাৎলা ইত্যাদি মাছের সঙ্গে তেলাপিয়ার চাষ করা যাইতে পারে। কিন্তু তেলাপিয়ার সংখ্যা যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে না পারিলে ঐ সকল মাছের পোনা সময়মত বাড়িতে পারে না। কাজেই একই পুকুরে অন্যান্য মাছের সঙ্গে তেলাপিয়ার চাষ না করাই উচিত। তেলাপিয়া বিদেশী মাছ। ইহার আদি বাসস্থান পূর্ব আফ্রিকা। 1939 সালে পূর্ব জাভার কোন একটি উপহ্রদ হইতে এই মাছ পাওয়া যায়। 1954 সালে ইন্দোনেশিয়া হইতে এই মাছ বাংলাদেশে আমদানী করা হয়। তেলাপিয়া মাছ বিশেষ অর্থকরী সম্পদ। এই মাছের প্রজনন ক্ষমতা খুব বেশী। স্ত্রী-মাছ বৎসরে 3/4 বার ডিম ছাড়ে। চার মাসের মাছ প্রায় 6 ছটাক ওজনের হইয়া থাকে এবং তখনই খাইবার উপযোগী হয়। পুকুরে এই মাছের চাষ অত্যন্ত ফলপ্রসূ হইয়া থাকে। তেলাপিয়া মাছের কয়েকটি বিশেষ গুণ আছে। তেলাপিয়া প্রোটিনসমৃদ্ধ ও সহজপাচ্য মাছ। ইহার চাষ অত্যন্ত লাভজনক। তেলাপিয়া বদ্ধ জলাশয়ে ডিম পাড়ে। কাজেই হাজা বা মজা পুকুর, ডোবা পরিষ্কার করিয়া তেলাপিয়ার চাষ করা যায়। পুকুর ছাড়া ধানক্ষেতেও তেলাপিয়ার চাষ করা চলে। জাপান, চীন, ইন্দোনেশিয়া ও অন্য কয়েকটি দেশে ধানক্ষেতে তেলাপিয়ার চাষ হইয়া থাকে। জাভায় এইভাবে বৎসরে 6,000 টন মাছ উৎপাদিত হয়। কিন্তু আমাদের দেশে খুলনা ও সুন্দরবন ছাড়া আর কোথাও ইহার চাষের ব্যবস্থা নাই। তাহার প্রধান কারণ—আমাদের ধানক্ষেতের আল এত নীচু যে, ইহার মধ্যে মাছ আটকাইয়া রাখা সম্ভব নয়। তেলাপিয়া প্রায় 600 প্রকারের আছে। বাংলাদেশে যে কয়েক প্রকার তেলাপিয়া প্রবর্তন করা হইয়াছে, তাহাদের সবগুলিই ধানক্ষেতে চাষ করিবার উপযোগী।

মৎস্য-উৎপাদনে কতিপয় ক্ষতিকারক উদ্ভিদ :—নানাপ্রকার অবাঞ্ছিত জলজ উদ্ভিদের দরুণ আমাদের দেশের প্রায় শতকরা 80 ভাগ পুকুরই অনাবাদী থাকে। একদিকে যেমন পুকুরে মাছ উৎপাদন করিতে না পারায় দেশের যথেষ্ট অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়, অন্যদিকে তেমনি দূষিত জলে মশা জন্মিয়া জাতীয় স্বাস্থ্যের ক্ষতিসাধন করে। আমাদের দেশে পুকুরে যে সমস্ত অবাঞ্ছিত উদ্ভিদ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে কচুরী-পানা, ছোটপানা, গুঁড়িপানা ইত্যাদি ভাসমান অবস্থায় থাকে। চাঁদমালা, ত্রিমস্তক, শিঙ্গারা (পানিফল), পদ্ম, শালুক ইত্যাদি নির্গতমুখ পাতা। কেশরা, কলমি, হেলেঞ্চা ইত্যাদি ছড়ানো জলজ শাক। এই সমস্ত উদ্ভিদ পুকুরে অল্প পরিমাণ থাকিলে সাধারণতঃ মাছের কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু

পাটাশ্যাওলা, ঝরঝাঁঝি, পাতাঝাঁঝি ইত্যাদি নিমজ্জমান উদ্ভিদ মৎস্য-চাষে সর্বাপেক্ষা বেশী ক্ষতিসাধন করিয়া থাকে। এই সমস্ত অবাঞ্ছিত উদ্ভিদ সমূলে বিনষ্ট করিবার জন্য নানাপ্রকার রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা হয়। কিন্তু আমাদের দেশে রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে এই সমস্ত উদ্ভিদ দূর করা কঠিন। কারণ, প্রথমতঃ ইহা খুব দামী; দ্বিতীয়তঃ এই রাসায়নিক দ্রব্য সঠিকভাবে ব্যবহার করিতে না পারিলে অনেক সময় পুকুরের জল আরও বেশী দূষিত হইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। 2, 4, D অথবা ডাইক্লোরোফিনঅক্সিঅ্যাসিটিক অ্যাসিড সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ও কার্যকরী রাসায়নিক পদার্থ হিসাবে পরিচিত। ইহা ব্যবহার করিলে মাছের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত প্ল্যাঙ্কটনেরও কোন ক্ষতি হয় না। কাজেই মাঝে মাঝে পুকুরে এই রাসায়নিক দ্রব্যটি ব্যবহার করিয়া অবাঞ্ছিত উদ্ভিদগুলি পরিষ্কার করিয়া ফেলা একান্ত প্রয়োজন।

পুকুরে সার প্রয়োগ—পুকুরে সার দেওয়ার পরিমাণ সম্পর্কে বলা কঠিন। প্রত্যেকটি পুকুরের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। গোবর, অ্যামোনিয়াম সালফেট, আবর্জনা, খৈল, হাড়ের গুঁড়া ও মাছের শুট্‌কী আমাদের দেশে পুকুরে সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। লাইম স্টোন, ফস্‌ফেট, পটাস, নাইট্রোজেন, ম্যাগ্‌নেসিয়াম, সবুজ সার এবং আরও নানাপ্রকার জৈব সার পুকুরে ব্যবহার করা যায়।

এই সমস্ত সার অল্প পরিমাণ দিবার পর যদি পুকুরের জল অপেক্ষাকৃত ঘন ও সবুজ বর্ণ ধারণ করে, তবে বুঝিতে হইবে, উহাতে আর সারের প্রয়োজন নাই। সার দিবার ফলে মাছের খাদ্য শ্যাওলা প্রভৃতি উদ্ভিদ ভাল বাড়ে। এইগুলিই মাছের প্রকৃত খাদ্য। সার দিবার পূর্বে পুকুরে মাছের খাবার আছে কিনা, তাহা পরীক্ষা করিয়া সার দিতে হইবে। একটি হাত জলে ডুবাইবার পর যদি কনুইর নীচের অংশ দেখা না যায়, তবে বুঝিতে হইবে জলে যথেষ্ট সার আছে। একটি সাদা কাঠির সাহায্যেও ইহা প্রমাণ করা যায়। কাঠিটা প্রায় 10 ফুট জলের মধ্যে ডুবাইতে হইবে। যদি ইহা দৃষ্টিগোচর হয়, তবে বুঝিতে হইবে—পুকুরে আরও সারের দরকার। চাউলের কুঁড়া, গমের ভুষি, ভাত সার হিসাবে ব্যবহার করা যায়। অধিক সারে যেন জল খারাপ না হয়, সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। জল দূষিত হইলে মাছ মরিবার সম্ভাবনা থাকে।

ম্যালেরিয়া নিবারণে মাছের ভূমিকা—স্বল্পস্থায়ী জলাশয়ে শুককীটভোজী মৎস্য-চাষ সর্বাপেক্ষা ফলপ্রদ। মেজর জেনারেল ক্যাণ্ডলের মতে, ম্যালেরিয়া নিরোধকল্পে যে সমস্ত মাছ ব্যবহার করা যাইতে পারে, তাহাদের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি থাকা দরকার।

(1) মাছ খুব ছোট আকৃতির হইতে হইবে, যেন আগাছার মধ্যেও অল্প জলে বাঁচিয়া থাকিতে পারে।

(2) মাছগুলি যথেষ্ট জীবনীশক্তিসম্পন্ন এবং কষ্টসহিষ্ণু হইতে হইবে। ডাঃ নাজির আহম্মদ প্রায় 22 বৎসর পূর্বে এই সম্পর্কে গবেষণা করিয়া দেখিয়াছেন যে, আমাদের দেশে খলিসা ও চাঁদা মাছ অপরিষ্কার ও অল্প জলে বাঁচিয়া থাকিতে পারে এবং প্রতিদিন গড়ে একটি খলিসা 150টি শুককীট ও মূককীট এবং চাঁদা 120টি মশার বাচ্চা খাইয়া থাকে। মশা বিনষ্টকারী জীব হিসাবে এই মাছগুলি বিশেষ পরিচিত। কাজেই এগুলি যেন বিনষ্ট না হয়, সেদিকে প্রত্যেকেরই সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। এই মাছগুলি আমাদের পরম উপকারী বন্ধু। কাজেই ইহারা যেন আমাদের উপকার করিবার পথে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন না হয়, সেই জন্য জনসাধারণকে সতর্ক করিয়া দেওয়া দরকার।

মৎস্য উৎপাদনের পরিমাণ ও চাহিদা—বাংলাদেশে ছোট-বড় বহু রকমের মাছ আছে। এখানকার মিঠা ও নোনা জলে প্রায় 120 প্রকার বিভিন্ন শ্রেণীর মাছ পাওয়া যায়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, বাংলাদেশে প্রতি বৎসর প্রায় 36024000 মণ মাছ উৎপাদিত হয়। ইহার অধিকাংশই মিঠা জল হইতে পাওয়া যায়।

বাংলাদেশের লোকসংখ্যা প্রায় সাড়ে সাত কোটি। আমিষজাতীয় খাদ্যের জন্য এই দেশের লোক মাছ ও মাংসের উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল। দেশের শতকরা 90 জন লোকই মাছ বিশেষ পছন্দ করে। মাছ আমাদের দেশের মূল্যবান সম্পদ হওয়া সত্ত্বেও উৎপাদনের সীমাবদ্ধতায় দেশবাসীর পক্ষে ইহা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া সম্ভব হয় না। মেট্রিক টন হিসাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বৎসরে মাছ উৎপাদনের পরিমাণ হইতে এই সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা যাইবে; যেমন—জাপানে 47, যুক্তরাষ্ট্র 29, সোভিয়েট রাশিয়া 26, চীন 25, নরওয়ে 2·1, ক্যানাডা 1·07, যুক্তরাজ্য 1·05.; আর ভারতে উৎপাদনের পরিমাণ মাত্র 1·10।

আমাদের দেশের প্রতিটি লোকের মাথাপিছু মাছের পরিমাণ প্রতি বৎসরে 4-5 কিলোগ্রাম। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় এই পরিমাণ অত্যন্ত নগণ্য। মৎস্য-সম্পদের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেশে মাছ উৎপাদনের পরিমাণ নিঃসন্দেহে অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক

শতকরা 60 ভাগ মাছ স্বাদু বা মিঠা জল হইতে এবং শতকরা 40 ভাগ নোনা জল হইতে ধরা হয়। সাধারণতঃ সমুদ্রোপকূল এবং নদীতীরবর্তী অঞ্চলগুলিতে মাছের কিছু প্রাচুর্য দেখা যায়, কিন্তু লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত যাতায়াত ব্যবস্থা ও সংরক্ষণের অসুবিধার জন্য দেশের অভ্যন্তর ভাগের অঞ্চলসমূহে টাট্‌কা মাছের পরিমাণ অত্যন্ত কম।

মৎস্যদেহের প্রয়োজনীয় অংশসমূহ ও তদ্দ্বারা তৈরি বিভিন্ন দ্রব্য—

1. মৎস্য-সার—মাছের আঁশ, পাখনা, নাড়ী-ভুঁড়ি ও চিংড়ির খোলস শুকাইয়া চূর্ণ করিয়া মৎস্য-সার পাওয়া যায়। ইহাতে নাইট্রোজেন, ক্যালসিয়াম, ফস্‌ফরাস প্রভৃতি থাকে। এই মৎস্যচূর্ণ হাঁস-মুরগীর খাদ্য হিসাবেও ব্যবহৃত হয়।

2. মৎস্যজাত আঠা—পরিত্যক্ত আঁশ হইতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে আঠা তৈয়ারী হয়।

3. হাঙরের যকৃতের তৈল—হাঙরের যকৃৎ হইতে এক প্রকার তৈল পাওয়া যায়। ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন-এ ও সি আছে।

অনেক মাছ হইতে তেল পাওয়া যায়। মৎস্যজীবীরা ইহা আলো জ্বালাইবার জন্য ব্যবহার করিয়া থাকে।

4. ভাল ভাল মাছ শুকাইয়া চূর্ণ করিয়া ফিস ফ্লাওয়ার তৈয়ারী করা হয়। ইহা উত্তম শ্রেণীর খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

5. মাছ হইতে উৎকৃষ্ট ধরণের কাপড় কাচিবার সাবান ও ছাপিবার কালি তৈয়ার হয়।

শুট্‌কী মাছ উৎপাদন—আমাদের দেশে বৎসরে প্রায় 20 লক্ষ মণ শুট্‌কী মাছ উৎপাদিত হয়। সাধারণতঃ কক্সবাজার হইতে 6 মাইল দূরবর্তী সুনাদিয়া দ্বীপে, খুলনার সুন্দরবন ও অন্যান্য কয়েকটি জায়গায়, শুট্‌কী মাছ উৎপাদিত হয়। রৌদ্রে শুকাইয়া বা ধূম প্রয়োগ করিয়া এই শুট্‌কী মাছ প্রস্তুত করা হয়। লবণ মাখাইয়া নোনা শুট্‌কীও কিছু কিছু তৈয়ারী করা হয়। কিন্তু এই শুট্‌কী মাছ অনেক সময়েই ভালভাবে শুকানো হয় না বলিয়া অতি অল্প সময়ে নষ্ট হইয়া যায়। ইহাতে 20 ভাগেরও অধিক পরিমাণ জল এবং সতর্কতার অভাবে প্রচুর পরিমাণ বালি ও ময়লা থাকে। কাজেই ইহা খাইবার অনুপযোগী হইয়া

পড়ে। শুট্‌কী মাছ এই দেশের অনেকেরই উপাদেয় খাদ্য এবং অন্যান্য দেশেও রপ্তানী হয়। কাজেই শুট্‌কী মাছের উৎপাদন ও রক্ষার ব্যাপারে উন্নত মানের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রবর্তন করা একান্ত প্রয়োজন।

মৎস্যজীবীদের বর্তমান অবস্থা ও উন্নতির উপায়

মাছ ধরা ও মাছ বিক্রয় করা জেলেদের প্রধান ব্যবসায় ও উপজীবিকা। বংশানুক্রমিকভাবে জেলেরা মৎস্যসংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ। বাংলাদেশে 6 লক্ষেরও অধিক জেলে বাস করে। ইহারা নিরীহ, গরীব, নিরক্ষর, দুর্বল ও অবহেলিত। তাহাদের অধিকাংশই দিন আনে, দিন খায়। সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করিয়া তাহারা যে মাছ ধরে, তাহাতে তাহাদের স্বচ্ছল জীবনযাত্রার সংস্থান হয় না। জাতীয় সম্পদের উন্নতিবিধানে এই স্বাধীন দেশকে মৎস্য-সম্পদে সমৃদ্ধ, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সমৃদ্ধশালী করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য দেশবাসী সকলের জেলেদের উন্নতির জন্য চেষ্টা করা একান্ত প্রয়োজন। তাহারা যাহাতে এই ব্যবসায় ছাড়িয়া জীবিকা অর্জনের প্রয়াসে অন্য পথে না যায়, তাহার জন্য সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা কর্তব্য। বর্তমানে আধুনিক নৌকা, জাল ও মাছ ধরিবার সরঞ্জামে জাপান, নরওয়ে, সুইডেন, গ্রেট বৃটেন, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রাশিয়া অনেক অগ্রগামী। কিন্তু আমাদের দেশ মাছ ধরিবার সরঞ্জাম ও কৌশলে এখনও অনেক পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে। মাছ ধরিবার আধুনিক কলা-কৌশল সম্পর্কে জেলেদিগকে শিক্ষা দিবার প্রয়াসে অধিক সংখ্যক শিক্ষা-কেন্দ্র স্থাপন করিয়া উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। তাহারা যেন সমাজের দুর্বৃত্তদের হাতে লাঞ্ছিত হইতে না পারে, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে ও ইজারা ব্যবস্থা তুলিয়া দিতে হইবে। তাহারা যেন সর্বপ্রকার অজ্ঞতা ও কুসংস্কার দূর করিয়া নিজেদের চেষ্টায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থ ও ক্ষমতা অধিকারে স্বাবলম্বী হইতে পারে, তাহার জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে। দেশের উন্নতিকল্পে এক বিরাট দায়িত্ব তাহাদের উপর অর্পিত। কাজেই সুখী ও স্বচ্ছল জীবনধারণের মধ্য দিয়া তাহারা যেন একাগ্রচিত্তে ও সততার সঙ্গে দেশের সম্পদের বৃদ্ধিসাধনে আত্মনিয়োগ করিতে পারে, ইহাতে সকলেরই আন্তরিক সহযোগিতা একান্ত কাম্য। স্বাধীন বাংলাদেশ গড়িবার কাজে জেলেদের অবদান হইবে উল্লেখযোগ্য।

জীবনীতি-বিজ্ঞান

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসাক ও শ্রীজগৎজীবন ঘোষ*

বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান এগিয়ে চলেছে বিচিত্র চমক লাগিয়ে। তার গতির কোন বিরাম নেই। অনেক অজানা রহস্যের সন্ধান সে দিয়েছে। বিজ্ঞানের কল্যাণে বাইরের জগৎ মানুষের কাছে অনেকখানি সোজা হয়ে ধরা দিয়েছে। কিন্তু বিংশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে মানুষের সামনে নতুন জ্ঞানের পথ খুলে দিয়েছে জীব-বিজ্ঞান। স্পষ্ট ভাষায় জীব-বিজ্ঞান জানান দিয়ে দিয়েছে—বাইরে থেকে যাই মনে হোক না কেন, আসলে মানুষের সত্তার মূলে রয়েছে জড় পদার্থের ক্রিয়া, যার প্রকাশেই প্রাণের প্রকাশ—তথা জীবসত্তার অস্তিত্ব। ফলে মানুষ স্বেচ্ছায় নেমে এসেছে ভগবানের উত্তরাধিকারীর আসন থেকে, স্বীকার করেছে সব মানুষই—সে মহত্তম দার্শনিক সক্রেটিস বা নিষ্ঠুরতম তৈমুর, যাই হোক না কেন—বিবর্তনের ফসলমাত্র। আজ তাই আমরা বিশ্বাস করি মানুষের এমন কিছু থাকতে পারে না, যা বিজ্ঞান দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। এর ফলে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে এসেছে নতুন পরিবর্তন, আর তার অভিঘাতে সমাজদেহও পরিবর্তিত হয়েছে।

জীব-জগৎ প্রকৃতি এবং আধিব্যাধি উভয়েরই দাস। একদিকে যেমন পৃথিবীর চারদিকে চাঁদের আবর্তন মানুষের শরীর—তথা মনকে দোলা দেয়, অপরদিকে জরা, মৃত্যু প্রায়শঃই তাকে নিজের অসহায় অবস্থার কথা মনে করিয়ে দেয়। এই অন্ধকারে একমাত্র বিজ্ঞানই তাকে খানিকটা আলোর সন্ধান দিতে পেরেছে। জীব-বিজ্ঞান তাকে আশা দিয়েছে, অচিরেই হয়তো জরা, মৃত্যু ইত্যাদিকে ভয় না করলেও চলবে আর তাই মানুষও সোৎসাহে তাকে অভিনন্দন জানিয়েছে। জীব-বিজ্ঞান যে মানুষের জীবনের মান উন্নয়নে কিছুটা সার্থক ভূমিকা নিয়েছে, সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে অজ্ঞতার ফলে জীব-বিজ্ঞানের ব্যবহার জীবনের অস্তিত্বকে পর্যন্ত বিপন্ন করে তুলেছে। যে সব কীটঘ্ন পদার্থকে (Pesticide) এক সময়ে বেশী ফসল উৎপাদনের জন্যে অপরিহার্য বলে মনে হয়েছিল, সেগুলি শস্যের মধ্যে জমে থেকে পরে প্রাণীদের যে ক্ষতি করে, তা জানবার পর অনেকেই সেগুলিকে ব্যবহার করবার বিপক্ষে রায় দিয়েছেন; অর্থাৎ বিজ্ঞানের যে ফসল কল্যাণের কাজে ব্যবহার করা হয়েছিল, তা শেষ পর্যন্ত মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা নিশ্চয়ই মানুষের অজ্ঞতার ফল। কিন্তু জীব-বিজ্ঞানের ইচ্ছাকৃত অপব্যবহারও ইতিমধ্যে কম হয় নি। নিষ্পত্রকারী পদার্থ (Defoliant) বা স্নায়ুঅসাড়ক গ্যাস (Nerve gas) এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আজ তাই কেবলমাত্র বিজ্ঞানের সাহায্যে সুন্দর সমাজ তৈরির কথা অলীক কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। সমাজকে সুস্থভাবে বাঁচতে হলে আজ প্রয়োজন নতুন এক বিজ্ঞানের, যার মূলনীতি হবে জীব-বিজ্ঞানের মূল তথ্য আর তার মধ্যে থাকবে যান্ত্রিক বিজ্ঞানের বাইরের একটা সামাজিক মূল্য-বোধ, তথা দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টি। এই ধরণের বিজ্ঞানই হলো জীবনীতি-বিজ্ঞান (Bio-ethics), বা বিজ্ঞান হয়েও মানবতান্ত্রিক।

বিজ্ঞানের মূলনীতি বিশ্লেষণ, অংশের মাধ্যমে পূর্ণকে জানার চেষ্টা। জীব বিজ্ঞানী তাই প্রাণকে বিশ্লেষণ করে তার রহস্যকে জানতে চেয়েছে।

---

* প্রাণরসায়ন বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রাণীকে ভেঙে সে পেয়েছে কোষ, কোষকে বিশ্লেষণ করে পেয়েছে অণু-পরমাণু। কিন্তু হঠাৎ চোখ খুলে দেখতে গিয়ে আবিষ্কার করেছে—অণু-পরমাণুর প্রাণ নেই, বিশ্লেষণের পথে প্রাণসত্তা হারিয়ে গেছে, কোথায় বা কখন, তা জানা নেই। জীব-বিজ্ঞানের বিশ্লেষণে তাই অণুর আচরণের অনেক কথাই ধরা দিয়েছে, কিন্তু প্রাণের খবর মেলে নি। তাই আজ অনেক চিন্তাশীল বিজ্ঞানীর মনে সন্দেহ জেগেছে—বিশ্লেষণের পথে প্রাণের রহস্যের কোন কিনারা হবে কিনা, যদিও প্রাণী ও অণুকে একেবারে আলাদা করে দেখা যায় না, তবুও কেবলমাত্র অণুর খবরে প্রাণের সঠিক খবর পাওয়া যাবে কিনা; অর্থাৎ আজকের জীব-বিজ্ঞানীর সামনে প্রবলতম প্রশ্ন—জীব-বিজ্ঞানের গবেষণার বিষয় কি হবে—অণু না প্রাণী, অংশ না পূর্ণ, খণ্ড না অখণ্ড ?

জীব-বিজ্ঞানে খণ্ডবাদ বনাম অখণ্ডবাদ
(Reductionism versus holism)

আজকের জীব-বিজ্ঞানের যেটুকু প্রগতি—যদি তাকে প্রগতি বলি—তা হলো আণবিক জ্ঞান বা খণ্ডবাদের প্রগতি। যেহেতু প্রাণীর গঠনের মূলে রয়েছে অণু সেহেতু অণুকে জানলে প্রাণকে জানা যাবে, এটাই খণ্ডবাদের মূলমন্ত্র। আজকের খণ্ডবাদের অগ্রগতিতে অনুঘটকের মত কাজ করেছে ওয়াট্‌সন ও ক্রিকের ডি. এন. এ-গঠন-তত্ত্ব। প্রাণীকে কোষে, কোষকে অণুতে বিশ্লেষণ করবার পথে জীব-বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেছে ডি. এন. এ, যা কোষের প্রায় সব ক্রিয়াকলাপ—এমন কি, নিজের সব প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে। ডি. এন. এ. এমন এক অণু, যাতে জড় অস্তিত্ব এবং প্রাণের চেতনা—এই দুটি ধর্ম মিথুনীকৃত। তাই আণবিক জীব-বিজ্ঞানীরা সোৎসাহে ঘোষণা করলেন, অণুর বৈশিষ্ট্যই প্রাণের বৈশিষ্ট্যের গোড়ার কথা, অর্থাৎ অণুকে জানা গেলে প্রাণের রহস্য আপনা থেকেই ধরা দেবে।

কিন্তু আজ পর্যন্ত ডি. এন. এ-র সাহায্যে মানুষ তো দূরের কথা, কোন প্রাণীরও বাহ্যিক আচরণ কেমন হবে, সে সম্পর্কে কিছু হলফ করে বলা যায় নি। প্রাণীর একটা কোষকে দেখে সে প্রাণী সম্পর্কে কোন বাস্তব ধারণা আমাদের মনে আসে না কিংবা সমাজের এক-একটি লোককে দেখে তারা একত্রিত অবস্থায় কেমন ব্যবহার করবে, তা বলা সম্ভব নয়; অর্থাৎ খণ্ডকে দেখে অখণ্ড সম্পর্কে ধারণা করবার কোন পথ আমরা জানি না। অনেকের ধারণা, আমাদের জ্ঞান সীমিত বলেই এটা হচ্ছে। কিন্তু অনেক জীব-বিজ্ঞানী আজ বলতে সুরু করেছেন—পূর্ণকে তার নিজের মত করে ভাবতে হবে, অংশের মাধ্যমে তার ঠিকানা কোন দিন মিলবে না। তাই বলে অখণ্ডবাদী জীব-বিজ্ঞানীরা ভাববাদী (Vitalist) Michael Polanji প্রমুখ জৈব বিজ্ঞানীদের মত মনে করেন না, "Life is not explainable in terms of chemistry and physics alone, and the added ingredients transcend the realm of knowledge that is available to the minds of men."

জীব-বিজ্ঞানের সীমিত জ্ঞানের উপর নির্ভর করে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বহু অপপ্রয়োগ হয়েছে, যা মানবসমাজের সুদূরপ্রসারী ক্ষতিসাধন করেছে। তাই অখণ্ডবাদী জীব-বিজ্ঞানীদের বক্তব্য—প্রাণী, তথা প্রাণকে বোঝবার কাজে যেখানে প্রয়োজন আণবিক জ্ঞানকে ব্যবহার করতে হবে। প্রকৃতির সঙ্গে প্রাণীর কি সম্পর্ক (অণুর নয়), এই নিয়ে আরম্ভ হবে অখণ্ডবাদী জীব-বিজ্ঞানের এবং এই বিজ্ঞানের সাহায্যে পরিবেশ ও প্রাণীর পারস্পরিক সম্পর্ক, বিভিন্ন পরিবেশে প্রাণীর ব্যবহার ইত্যাদিকে ব্যাখ্যা করতে হবে।

প্রাণ—পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেবার যন্ত্রবিশেষ

প্রাণের স্বরূপ কি? এই প্রশ্নের উত্তর কোথাও মেলে নি। আজকের দিনের জীব-বিজ্ঞানীর মতে, প্রাণ জীবদেহের অণুর পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার এক বিশেষ ধরণের বহিঃপ্রকাশ। জীব-বিজ্ঞানী Reiner মনে করেন, মানুষ পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলবার ক্ষমতাবিশিষ্ট এক যন্ত্র। যেহেতু প্রাণীর মধ্যে যে নিয়ন্ত্রণ তার উৎস আণবিক গঠনের কোন এক স্তরে, তাই জীবনীতি-বিজ্ঞানের মূল কাঠামো প্রাণ সম্পর্কে আমাদের 'আণবিক জ্ঞানের' উপর নির্ভর করেই তৈরি করতে হবে। এই সমস্ত 'আণবিক জ্ঞান' হবে এমন সব তথ্য, যার সত্যতা সম্পর্কে কোন জীব-বিজ্ঞানীর কোন সন্দেহ নেই। বিজ্ঞানী Van Renssaelaer Potter এই ধরণের 12-টি মূলনীতির কথা উল্লেখ করেছেন।

(1) প্রত্যেক জীবসত্তা অণুর এক বিশেষ সমন্বয়, যা ক্রমাগত ধ্বংস ও সৃষ্টির ব্যাপকতার মধ্যে নিজের অস্তিত্বকে রক্ষা করে চলেছে। সমন্বয় সাধনের প্রতি স্তরেই শক্তির প্রয়োজন হয় বা শক্তির উদ্ভব হয়।

(2) অনুঘটন—জীবকোষের বেশীর ভাগ প্রক্রিয়া এত মন্থরগতিতে চলে যে, অনুঘটক ছাড়া এই প্রক্রিয়াগুলি প্রায় নিশ্চল হয়ে পড়ে। কোষ যে অনুঘটক ব্যবহার করে, তা হলো এনজাইম। এক একটি এনজাইম এক এক রকমের রাসায়নিক ক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করবার কাজে লাগে।

(3) শক্তির উৎস—জীবনের অস্তিত্বের জন্যে সব সময়েই শক্তির প্রয়োজন। এই শক্তি কোষের বিভিন্ন রকমের কাজে ব্যবহৃত হয়। তাই কোষ বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোষের শক্তিদায়ক এবং শক্তিগ্রাহক বিক্রিয়াগুলিকে একসঙ্গে সংযুক্ত রাখে অন্যথায় জীবনের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে।

(4) কোষে বিশেষ কোন অণু শক্তি উৎপাদনের কাজে বা কোষ গঠনের কাজে লাগতে পারে। তাই কোষে প্রায় সব প্রয়োজনীয় পদার্থই একাধিক প্রক্রিয়ায় তৈরি হয় এবং বিভিন্নভাবে কাজে লাগে।

(5) প্রতিটি কোষে, তথা কোষ-সংগঠনের প্রতি ধাপে যৌগিক পদার্থরূপে কিছু পরিমাণ শক্তি জমা থাকে। এই শক্তির উৎস যথাযথ অবস্থায় রাখবার প্রক্রিয়া কোষের মধ্যে থাকে।

(6) প্রতিটি জীবকেই পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলতে হয় এবং মানিয়ে চলবার জন্যে প্রয়োজনীয় সংকেত কোষের ডি. এন.-এ-তে জমা থাকে। প্রকৃতির সঙ্গে মানিয়ে নেবার পথে উন্নততর প্রাণীর বেলায় মস্তিষ্কেরও একটা বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। এই বাহিত সংকেতই বিশেষ এনজাইম, হর্মোন ইত্যাদি তৈরির মাধ্যমে প্রাণীকে পরিবেশের সঙ্গে বিরামহীন সংগ্রামে সাহায্য করে।

(7) কোষের বাহিত সংকেত বংশানুক্রমে বাহিত হওয়া প্রয়োজন এবং ডি-এন-এ দ্বিত্বকরণের মাধ্যমে সংকেত কোষ থেকে কোষান্তরে বাহিত হয়।

(8) সংকেত দ্বিত্বকরণে ভুলের এক বিশেষ সম্ভাবনা থাকে। এই ভুলের ফলেই বংশপরম্পরায় বাহিত সংকেত, তথা জীবের ধর্মে পার্থক্য দেখা দেয়। এই ভুল পরে জীবের দ্বারা বাহিত হয় এবং প্রকৃতির পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। এটাই ডারউইনের তত্ত্বের মূল কথা এবং বিবর্তনের মূল সূত্র।

(9) প্রত্যেক জীবের মধ্যে নিজের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণের জন্যে বিশেষ প্রক্রিয়া আছে। এর সাহায্যে জীব তার শারীরিক ও মানসিক সংবেদনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। অবশ্য জীনগত সংকেতের উপর নির্ভর করে এই নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা কম-বেশী হতে পারে।

(10) কোষের বিভিন্ন প্রক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্তরে নিয়ন্ত্রিত হয়। আবার শরীরের বিভিন্ন প্রক্রিয়া বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত হয়। এটাই কোষ তথা জীবের বিশেষ ধরণের গঠনের মূল কথা।

(11) প্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম পরিবেশে এমন সব ছোটখাটো অণু থাকে, যা কোন অতি প্রয়োজনীয় অণুর সঙ্গে গঠনগত সাদৃশ্যের জন্যে বিশেষ কোন এনজাইমকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। ফলে জীবও স্বাভাবিকভাবেই এর দ্বারা প্রভাবিত হয়। এছাড়া জানা ও অজানা নানা ধরণের রশ্মি এবং রাসায়নিক পদার্থ প্রাকৃতিক পরিবেশে থাকে, যা আমাদের কোষের বিশেষ ক্ষতি করতে পারে।

(12) প্রতিটি জীব জীনবাহিত সংকেতের উপর নির্ভর করে পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেবার ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ ক্ষমতা পেয়ে থাকে, যার সাহায্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে সে নিজেকে বাঁচাতে সক্ষম হয়।

অস্তিত্বের তিন ধাপ—ব্যক্তিগত, সামাজিক ও কৃষ্টিগত

প্রাণ পৃথিবীতে আবির্ভাবের পর থেকে অনেক বন্ধুর পথ পেরিয়ে এসেছে, বাহ্যিক রূপ ও অন্তঃপ্রকৃতি উভয়েরই বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে। এই দীর্ঘ পথে অনেকেই এসেছে, অনেকে প্রকৃতির সঙ্গে দ্বন্দ্বে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছে আর যারা তা পারে নি, তারা হারিয়ে গেছে। এই সবের মূলে রয়েছে প্রাণীর পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেবার ক্ষমতার তারতম্য। মানুষের ক্ষেত্রে পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেবার তিনটি ভিন্ন স্তর—ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং কৃষ্টিগত।

পরিবেশের সঙ্গে ছোটখাটো সমঝোতা আমাদের সারাক্ষণই চলছে। একটু বেশী শীত বা গরম, কড়া আওয়াজ—এমন কি, অফিস যাবার বাসে ঝুলে যাওয়া ইত্যাদি। এসব ঘটনার ফলে জীবের আণবিক গঠনে নিশ্চয়ই পরিবর্তন হচ্ছে, যা হয়তো চোখে—এমন কি, যন্ত্রের কাঁটায়ও ধরা দিচ্ছে না। কিন্তু আণবিক গঠনের সামান্য পরিবর্তনও জীবকে প্রভাবিত করে এবং বিবর্তনের ক্ষেত্রে এদের প্রভাব খুব তুচ্ছ নয়। পরবর্তী স্তরে মানুষ সমাজের সঙ্গে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করে। এখানে সামাজিক অস্তিত্ব বজায় রাখবার তাগিদে মানুষ সহগামীদের সঙ্গে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করে। পরবর্তী বা শেষ স্তর হলো কৃষ্টিগত স্তর।

মানিয়ে নেবার ক্ষমতা, যে ধরণেরই হোক না কেন, নির্ভর করে জীন এবং পরিবেশ দুটিরই উপর। প্রকৃতি শেষ পর্যন্ত বেছে নেবে—কে টিকে থাকবে। তাই প্রকৃতি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানই যথেষ্ট নয়, আজকের দিনের বড় প্রয়োজন প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক সম্পদের মানবাত্মিক ব্যবহার। এটা আজকের মানুষ এবং তার ভবিষ্যৎ বংশধর—উভয়ের ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য।

জীবনীতি-বিজ্ঞান ও সমাজ

জীব-বিজ্ঞানের প্রগতি তর্কাধীন নয়। কিন্তু শিল্প, সাহিত্য বা বিজ্ঞানের অন্যান্য দিকের মত জীব-বিজ্ঞান সরলরেখায় চলে না। তাই জীব-বিজ্ঞানের বাঁকা পথে কিন্তু বিংশ শতকের শেষ পাদে চিন্তাধারা এবং প্রয়োগে জীব-বিজ্ঞানের এমন মৌলিক পরিবর্তন হয়েছে, যাকে যুগান্তর বললেও অত্যুক্তি হয় না।

এক কালে বিজ্ঞান ও সমাজের চলাফেরা স্বতন্ত্র পথেই হতো, কিন্তু আজকের বিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজকে পৃথক করে দেখবার কোন যুক্তি নেই। বিজ্ঞানের অভিঘাতে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে পরিবর্তন এসেছে, কিন্তু জীব-বিজ্ঞানের সংঘাতে আজ যে পরিবর্তন হতে চলেছে, তা শ্রেয়-এর সঙ্গে প্রেয়-এর সংঘাত নয়, প্রাচীন মূল্য-

বোধের সঙ্গে নবীন মূল্যবোধের সংঘাত। এই সংঘাত শ্রেয় এবং প্রেয়-এর সংঘাতের তুলনায় দারুণতর। তাই বিজ্ঞানের ব্যবহারে শ্রেয়নীতির প্রয়োগে যারা সোচ্চার, তাদের মেজাজে ভাববাদের আমেজ কিঞ্চিৎ লেগেছে—এই অভিযোগ আংশিক সত্য হলেও একথা অনস্বীকার্য যে, অতীতের অভিজ্ঞতা এবং মানবিক মূল্যবোধের উপর নির্ভর করেই বহু দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন বিজ্ঞানীই মনে করেন, জীব-বিজ্ঞানের বল্গাবিহীন অপপ্রয়োগ আর চলা উচিত নয়। নীতিবিজ্ঞান আমাদের জানিয়ে দেয়, ভাল বলতে কি বোঝায় আর জীববিজ্ঞান স্পষ্ট ভাষায় জানান দিয়ে দেয়, সীমিত বিশ্বে সসীম জীবসত্তার পক্ষে কি পাওয়া সম্ভব। এর কোন সর্বজনগ্রাহ্য সমাধান এক্ষুণি পাওয়া যাবে, এমন সাহস করা ঠিক নয়। তবে এই সমাধান পাবার পথ নিঃসন্দেহে জীবনীতি-বিজ্ঞান—যার কাজ হবে "To balance cultural appetites against physiological needs in terms of public policy."—বিজ্ঞানের হাত থেকে মানবতাকে বাঁচাবার একমাত্র রক্ষাকবচ।

গ্যাসের তরলীকরণ ও অতি নিম্ন উষ্ণতা

অরূপ রায়

গ্যাসের গতিসূত্র (Kinetic theory) অনুধাবন করলে সহজেই বোঝা যায় যে, চাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গ্যাসীয় পদার্থের অণুগুলি খুব কাছাকাছি এসে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে যদি অণুগুলির বেগও হ্রাস করানো যায়, তবে গ্যাসটি তরলে পরিণত হয়ে যেতে পারে।

উপরিউক্ত ধারণা থেকেই বৈজ্ঞানিকেরা গ্যাসকে তরল অবস্থায় পরিণত করবার জন্যে পরীক্ষা আরম্ভ করেন। আসল বক্তব্য আরম্ভ করবার আগে আমাদের জানতে হবে—গ্যাস কি এবং তার সঙ্গে বাষ্পের তফাৎ কি? সর্বপ্রথম J. B. Von Helmont (মৃত্যু 1644) বিজ্ঞানশাস্ত্রে গ্যাস শব্দটিকে ব্যবহার করেন। এখন যে সব বায়বীয় পদার্থের উষ্ণতা সঙ্কট উষ্ণতার (Critical temperature) নীচে, তাদের ভেপার বা বাষ্প এবং যে সমস্ত বায়বীয় পদার্থের উষ্ণতা সঙ্কট উষ্ণতার উপরে, তাদের গ্যাস বলে। বাষ্প সহজেই চাপের প্রভাবে তরলিত হয়, কিন্তু গ্যাস তরল করতে উষ্ণতা হ্রাস ও চাপ উভয়েরই প্রয়োজন।

গ্যাসকে তরল করবার চেষ্টা এক দীর্ঘ ইতিহাস—একে মোটামুটি তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়। প্রথম পর্যায়ে সঙ্কট উষ্ণতার কোন ধারণা বৈজ্ঞানিকদের ছিল না। তখন গ্যাসকে যথাসম্ভব শীতল করে চাপ প্রয়োগ করা হতো। ফ্যারাডে ও তাঁর পূর্বসূরীরা ছিলেন এই পর্যায়ের বৈজ্ঞানিক। দ্বিতীয় পর্যায়ে গ্যাসকে সঙ্কট উষ্ণতার নীচে নামিয়ে অতঃপর চাপ প্রয়োগের দ্বারা তরলে পরিণত করা হতো। তৃতীয় পর্যায়ে জুল-টমসন প্রতিক্রিয়ার (Joule-Thomson Effect) সাহায্যে অতি নিম্ন সঙ্কট উষ্ণতার গ্যাসকে তরলিত করা হয়। এখন সংক্ষিপ্তভাবে গ্যাসকে তরল অবস্থায় পরিণত করবার ইতিহাস আলোচনা করা যাক।

সর্বপ্রথম Boerhaave গ্যাসীয় পদার্থকে তরল করবার চেষ্টা করেন। 1732 সালে তিনি

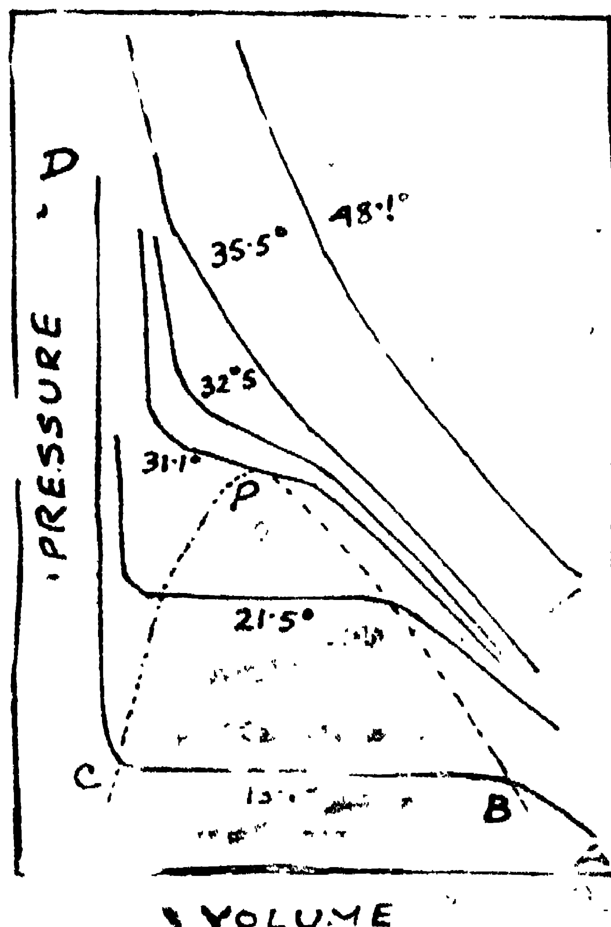
বাতাস নিয়ে পরীক্ষা চালান, কিন্তু ব্যর্থ হন। এই সময়ের বহু বিজ্ঞান-সাধকই বাতাসকে তরল করবার প্রয়াস পান, কিন্তু কেবলমাত্র বাতাসের জলীয় বাষ্প ছাড়া আর অন্য কোন উপাদান তরল করতে অসমর্থ হন। Von Marum 1799 সালে ও বায়ুমণ্ডলীয় চাপ প্রয়োগ করে অ্যামোনিয়াকে তরল অবস্থায় পরিণত করেন। সেই বছরেই De Morveau, De Fourcroy, Vanquelin −40°C উষ্ণতায় অ্যামোনিয়া গ্যাসকে শীতল করে তরলিত করেন। এই সময় Monge এবং Clouet প্রথমে শীতল ও পরে চাপ প্রয়োগ করে তরল SO_2 পান। কিন্তু এই সকল বৈজ্ঞানিকদের কার্যপ্রণালী বহু ত্রুটিপূর্ণ ছিল সন্দেহ নেই। কারণ পরীক্ষায় ব্যবহৃত গ্যাস সম্পূর্ণ শুষ্ক থাকতো না এবং জলীয় বাষ্প থেকে প্রাপ্ত তরলকেই (জল) পরীক্ষণীয় গ্যাসের তরল অবস্থা বলে ভুল করা হতো। প্রাথমিক উদ্যোক্তাদের মধ্যে যথাযথ ও নির্ভুল হিসাবে Northmore-এর নামই উল্লেখযোগ্য। তিনি 1805 সালে ক্লোরিন, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড গ্যাস এবং সালফার ডাই-অক্সাইড গ্যাসকে চাপ প্রয়োগ করে তরল করেন, কিন্তু কার্বন ডাই-অক্সাইড তরল করতে ব্যর্থ হন।

প্রকৃতপক্ষে সুনির্দিষ্ট পথে গ্যাসকে তরলে পরিণত করবার জন্যে পরীক্ষাকার্য চালান মাইকেল ফ্যারাডে। তিনি উল্টা V আকারের একটি টিউব নিয়ে তার এক-প্রান্তে ক্লোরিন গ্যাস উৎপন্ন করবার বিকারক নেন ও মুখটি গালিয়ে বন্ধ করে দেন। অপর প্রান্তটি হিমমিশ্রণের (নুন ও বরফ) মধ্যে ডুবিয়ে রাখেন। বিকারকপূর্ণ দিক উত্তপ্ত করলে ক্লোরিন গ্যাস উৎপন্ন হতে থাকে ও সঙ্গে সঙ্গে চাপ বৃদ্ধি পায় এবং পরিশেষে ক্লোরিন নিজেরই উৎপন্ন চাপে তরল হয়ে যায় ও শীতল অংশে জমা হয়। এভাবে তিনি ক্লোরিন ছাড়াও হাইড্রোজেন সালফাইড, সায়ানোজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড, হাইড্রোজেন ব্রোমাইড, অ্যামোনিয়া প্রভৃতি বায়ুমণ্ডলীয় গ্যাস তরল করতে সক্ষম হন। Colladon 400 বায়ুমণ্ডলীয় চাপ ও −30°C উষ্ণতা প্রয়োগ করেও বাতাসের অবস্থান্তর ঘটাতে ব্যর্থ হন। ঢালাই লোহার পাত্র প্রস্তুত করে M. Thilorier কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসকে ফ্যারাডের পদ্ধতিতে তরল অবস্থায় পরিবর্তিত করেন এবং প্রাপ্ত তরল পদার্থটিকে আংশিক বাষ্পীভূত করে কঠিন কার্বন ডাই-অক্সাইড পান। তিনি কঠিন CO_2 ও ইথারের সাহায্যে এক প্রকার হিমমিশ্রণ প্রস্তুত করেন এবং −110°C উষ্ণতা পেতে সক্ষম হন 1835 সালে। Thilorier-এর হিমমিশ্রণের সাহায্যে ফ্যারাডে 1845 সালে ইথিলিন, ফস্ফিন টেট্রাফ্লুরাইড, বোরন টেট্রাফ্লুরাইড গ্যাস তরল করেন ও কিছু তরলসাধ্য গ্যাসকে কঠিনেও পরিণত করেন।

−110°C উষ্ণতায় অনেক গ্যাস প্রচণ্ড চাপ প্রয়োগ সত্ত্বেও অবিকৃত থেকে যায়; যেমন—হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, বাতাস, কার্বন মনোক্সাইড ও মিথেন। J. O. Natterer (1844-45) অতি উচ্চ চাপ প্রয়োগ করা সত্ত্বেও তাদের তরলিত করতে সক্ষম হন নি। তিনি বিশেষভাবে নির্মিত পাম্পের দ্বারা 3000 বায়ুমণ্ডলীয় চাপ সৃষ্টি করেছিলেন। শেষে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয় যে, এই সব গ্যাসকে কখনই তরল করা যাবে না। তাঁরা এই গ্যাসগুলিকে স্থায়ী গ্যাস (Permanent gas) নামে অভিহিত করেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাঁদের এই ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়।

গ্যাস তরলীকরণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি দেন T. Andrews 1869 সালে। প্রকৃতপক্ষে তিনিই দ্বিতীয় পর্যায়ের সূত্রপাত করেন। গ্যাসের আয়তন, উষ্ণতা ও চাপ

বিভিন্নভাবে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করে তিনি গ্যাস তরলীকরণের পদ্ধতিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যান। তিনি বিভিন্ন নির্দিষ্ট উষ্ণতায় CO_2-এর বিভিন্ন চাপে প্রাপ্ত আয়তনের সাহায্যে একটি লেখচিত্র অঙ্কন করেন। এটি Andrews Isothermal বা অ্যাণ্ড্রুজের সমউষ্ণতা লেখ নামে পরিচিত (1নং চিত্র)। অ্যাণ্ড্রুজের সমউষ্ণতা



1নং চিত্র

লেখ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, 13·1°C-এ নিম্ন চাপ A-বিন্দুতে CO_2 পুরাপুরি গ্যাসীয়। তারপর চাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আয়তনের হ্রাস ঘটে বয়েলের সূত্র অনুযায়ী (চিত্রে AB অংশ)। B বিন্দুর চাপে CO_2 তরল হতে থাকে এবং আয়তনও দ্রুত কমে আসে এবং C বিন্দুতে CO_2 পুরাপুরি তরল হয়ে যায়। লেখর CD অংশ নির্দেশ করে—চাপ বৃদ্ধি ঘটলেও তরল CO_2-এর আয়তনের বিশেষ সংকোচন হয় না, অতএব লেখর AB অংশে CO_2 সম্পূর্ণ গ্যাস, CD অংশে সম্পূর্ণ তরল এবং BC অংশে গ্যাস ও তরল এই দুটি অবস্থারই মিশ্রণ। আবার যেহেতু BC অক্ষ আয়তন অক্ষের সমান্তরাল, সেহেতু বলা যেতে পারে যে, চাপ ধ্রুবক যখন তরল ও গ্যাসীয় অবস্থা একই সঙ্গে অবস্থান করে। 21·5°C উষ্ণতায় আয়তন-চাপ লেখর ধর্ম একই থাকে, কেবল মধ্যভাগের সমান্তরাল অংশের দৈর্ঘ্য কিছুটা ছোট হয়। 31·1°C উষ্ণতায় এই মধ্যভাগের বিস্তার বলতে গেলে বিন্দুতে পরিণত হয় আর 31·1°C-এর উপর পৃথকভাবে লেখর মধ্য অংশ বলতে কিছু থাকে না। অ্যাণ্ড্রুজ দেখেছিলেন 31·1°C উষ্ণতার উপর CO_2 গ্যাসকে 400 বায়ুমণ্ডলীর চাপ প্রয়োগ করলেও তরল করা যায় না অথচ 31·1°C উষ্ণতায় মাত্র 75 বায়ুমণ্ডলীর চাপেই CO_2 তরল হয়ে যায়। সুতরাং বলা যেতে পারে উষ্ণতার এমন একটা সীমা আছে, যার উপরে উষ্ণতা থাকলে যত চাপই প্রয়োগ করা হোক না কেন CO_2-কে তরল করা যাবে না। পরে তিনি দেখান যে, প্রত্যেক গ্যাসেরই এরকম একটি উষ্ণতাসীমা আছে। সর্বোচ্চ যে উষ্ণতায় এবং ঠিক যে উষ্ণতায় উপরে যত চাপই প্রয়োগ করা হোক না কেন, গ্যাসকে তরলে পরিণত করা যায় না—সেই উষ্ণতাকেই সেই গ্যাসের সঙ্কট উষ্ণতা বলে।

সঙ্কট উষ্ণতা আবিষ্কারের ফলে বোঝা গেল, স্থায়ী গ্যাসগুলিকে এতদিন কেন তরল অবস্থায় পরিণত করা সম্ভব হচ্ছিল না। কারণটি আর কিছুই নয়—চাপ প্রয়োগের আগে তাদের যথেষ্ট পরিমাণে শীতল করা হয় নি অর্থাৎ সঙ্কট উষ্ণতার নীচে নামানো হয় নি।

অ্যাণ্ড্রুজের আবিষ্কারের ফলে বৈজ্ঞানিকদের সামনে নতুন একটা সমস্যা দেখা দিল—কেমন করে নিম্ন উষ্ণতার সৃষ্টি করা সম্ভব। কারণ অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন, হিলিয়ামের সঙ্কট

উষ্ণতা যথাক্রমে $-118^{\circ}C, -146^{\circ}C, -241^{\circ}C$ ও $-268^{\circ}C$.

1877 সালে R. P. Pictet তরল অক্সিজেন প্রস্তুত করতে সক্ষম হন। তিনি কাসকেড পদ্ধতির (Cascade process) সাহায্যে অক্সিজেনকে সঙ্কট উষ্ণতায় নিয়ে আসেন। কাসকেড পদ্ধতিতে একটি শীতকের মধ্য দিয়ে CO_2 গ্যাস পাঠানো হয় ও শীতক নল ঘিরে নিম্ন চাপে তরল SO_2 দ্রুত বাষ্পীভূত করা হয়। ফলে CO_2 গ্যাস সহজেই তরল হয়ে যায়। এবার উৎপন্ন তরল CO_2-কে অপর একটি শীতক নলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত অক্সিজেন ঘিরে নিম্ন চাপে বাষ্পীভূত করা হয়। ফলে উষ্ণতা নেমে $-120^{\circ}C$-এ পৌঁছায়। এই সময় 500 বায়ুমণ্ডলীয় চাপ প্রয়োগের দ্বারা অক্সিজেন তরল করা হয়। বিশুদ্ধ তরল অক্সিজেনের একটা সুন্দর নীল রং আছে।

L. Cailletet (1877) অন্য একটি পদ্ধতিতে অক্সিজেন নাইট্রোজেন, বাতাস, কার্বন মনোক্সাইড প্রভৃতি গ্যাসকে তরল করেন। এটির নাম অ্যাডিয়াবেটিক প্রসারণ (Adiabatic expansion) পদ্ধতি। 1884 সালে পোলিশ বিজ্ঞানী S. von Wroblewske এবং Olschewski কাসকেড পদ্ধতিতে তরল অক্সিজেন ব্যবহার করে হাইড্রোজেন গ্যাসকে তরল করবার চেষ্টা চালান, কিন্তু তাঁদের চেষ্টা বিফলতায় পর্যবসিত হয়।

Kamerlingh Onnes 1894 সালে কাসকেড পদ্ধতিতে ইথিলিন ও মিথাইল ক্লোরাইড ব্যবহার করে অক্সিজেনকে তরল করেন। কাসকেড পদ্ধতিতে প্রাপ্ত সর্বনিম্ন তাপমাত্রা $-218^{\circ}C$ তরল অক্সিজেন ব্যবহার করে। কিন্তু হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের সঙ্কট উষ্ণতা যথাক্রমে $-241^{\circ}C$ ও $-268^{\circ}C$; সুতরাং কাসকেড পদ্ধতিতে এই দুটি গ্যাসকে তরল করা গেল না।

কাসকেড পদ্ধতি যখন হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামকে তরল করতে ব্যর্থ হলো, তখন জুল-টমসন প্রতিক্রিয়ার প্রতি অনেকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। J. P. Joule ও W. Thomson (Lord Kelvin) বিভিন্ন গ্যাস নিয়ে এক ধরণের বিশেষ পরীক্ষা চালান (1852-1862)। 1807 সালে সর্বপ্রথম গে-লুসাক এই ধরণের পরীক্ষা করেন। তাঁরা দেখেন, উচ্চ চাপে রক্ষিত গ্যাসকে যদি হঠাৎ নিম্ন চাপে প্রসারিত হতে দেওয়া হয়, তবে উষ্ণতার পরিবর্তন ঘটে। এই প্রতিক্রিয়াকেই জুল-টমসন প্রতিক্রিয়া বলে। বিভিন্ন গ্যাস নিয়ে তাঁরা এই পরীক্ষাটি করেন এবং নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

(1) জুল-টমসন প্রতিক্রিয়ার ফলে গ্যাসের উষ্ণতার যে পরিবর্তন হয়, তা উচ্চ চাপ ও নিম্ন চাপের অন্তরফলের সমানুপাতিক।

(2) সাধারণ উষ্ণতায় সকল গ্যাসই, কেবল হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম ছাড়া, জুল-টমসন প্রতিক্রিয়ার ফলে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাসের উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়।

(3) প্রত্যেক গ্যাসেরই একটি নির্দিষ্ট ব্যস্ত-উষ্ণতা (Inversion temperature) আছে। গ্যাস প্রাথমিক অবস্থায় এই উষ্ণতার উপরে থাকলে উষ্ণতা জুল-টমসন প্রতিক্রিয়ায় বৃদ্ধি পায় এবং এর নীচে থাকলে উষ্ণতা হ্রাস পায়; অর্থাৎ যে উষ্ণতায় জুল-টমসন প্রতিক্রিয়ার উষ্ণতা চিহ্ন পরিবর্তন করে, তাকেই ব্যস্ত উষ্ণতা বলে।

সর্বপ্রথম Cailletet এই জুল-টমসন প্রতিক্রিয়াকে কাজে লাগিয়ে 1877 সালে গ্যাসকে (তরল করবার জন্যে) শীতল করবার চেষ্টা করেন। অক্সিজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি গ্যাসের ব্যস্ত উষ্ণতা সাধারণ তাপমাত্রার উপরে, কিন্তু হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের ব্যস্ত উষ্ণতা যথাক্রমে $-80^{\circ}C$ এবং $-240^{\circ}C$। J. Dewer (1900) জুল-টমসন প্রতিক্রিয়াকে গ্যাসের উষ্ণতা হ্রাসের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে হাইড্রোজেন গ্যাস

তরলিত করেন। তিনি তরল নাইট্রোজেনকে নিম্ন চাপে বাষ্পীভূত করে কাসকেড প্রণালীতে হাইড্রোজেন গ্যাসকে প্রথমে —200°C উষ্ণতায় নামিয়ে আনেন। তারপর শীতল গ্যাসকে জুল-টমসন প্রতিক্রিয়ার সাহায্যে তার সঙ্কট উষ্ণতার নীচে (প্রায় —250°C) নামিয়ে আনেন এবং 150 বায়ুমণ্ডলীয় চাপ প্রয়োগ করে তাকে তরলে পরিণত করতে সক্ষম হন। Dewer হাইড্রোজেন গ্যাসকে কঠিনে পরিণত করবার সাফল্যও অর্জন করেন। প্রাপ্ত তরল হাইড্রোজেনকে নিম্ন চাপে দ্রুত বাষ্পীভূত করতে থাকলে তার উষ্ণতা আরও হ্রাস পায় ও —259°C-এ উপনীত হলে তা কঠিনে পরিণত হয়। তরল ও কঠিন উভয় হাইড্রোজেনই স্বচ্ছ ও বর্ণহীন।

হিলিয়াম গ্যাস তরল করবার কৃতিত্ব অর্জন করেন বৈজ্ঞানিক H. Kamerlingh Onnes 1908 সালে। তিনি নিম্ন চাপে তরল হাইড্রোজেন বাষ্পীভূত করে কাসকেড পদ্ধতির সাহায্যে হিলিয়াম গ্যাসের উষ্ণতা —255°C-এ নিয়ে আসেন। অতঃপর জুল-টমসন প্রতিক্রিয়ার সাহায্যে সঙ্কট উষ্ণতার নীচে উষ্ণতা নামাতে সক্ষম হন। সঙ্কট উষ্ণতার নীচে উষ্ণতা নামিয়ে তিনি হিলিয়াম গ্যাসকে 150 বায়ুমণ্ডলীয় চাপের সাহায্যে তরলে পরিণত করেন। চাপ প্রয়োগ করে তিনি তরল হিলিয়ামকে কঠিনে পরিণত করবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন, তবে হিলিয়ামের উষ্ণতা তিনি 0.82°k-তে নামাতে সক্ষম হন। Onnes-এর মৃত্যুর পর Keesam 130 বায়ুমণ্ডলীয় চাপ প্রয়োগ করে হিলিয়ামকে কঠিনে পরিণত করেন। পরে অবশ্য 4.2°k উষ্ণতায় 140 বায়ুমণ্ডলীয় চাপ প্রয়োগে ও 1.1°k উষ্ণতায় 23 বায়ুমণ্ডলীয় চাপ প্রয়োগে তাকে কঠিন করা সম্ভব হয়েছে। Keesam ও Clausius তরল হিলিয়াম নিয়ে বহু পরীক্ষাকার্য চালান। তাঁদের মতে, তরল হিলিয়াম দুটি অবস্থায় থাকে—He I ও He II। এই দুটি অবস্থা কঠিন হিলিয়ামের সঙ্গে 2°k উষ্ণতায় ত্রি-বিন্দুতে (Triple point) সাম্যাবস্থায় (Equillibrium) থাকে। তরল হিলিয়াম নিয়ে সবচেয়ে বেশী পরীক্ষাকার্য চালান Guiaque। তিনি তাঁর ফলাফল একটি মনোগ্রাফের (Monograph) মাধ্যমে প্রকাশ করেন। Kamerlingh Onnes ভারতবর্ষের ত্রিবাঙ্কুর অঞ্চলের মোনাজাইট বালুকা (Monazite Sand) থেকে হিলিয়াম সংগ্রহ করেন। হিলিয়াম তরলীকরণ খুব ব্যয়সাধ্য এবং পৃথিবীতে খুব কমই হিলিয়াম তরল করবার প্ল্যান্ট আছে।

ইংল্যাণ্ডের বৈজ্ঞানিক W. Hampson (1895) ও জার্মান বৈজ্ঞানিক C. von Linde (1895) পৃথকভাবে শিল্পপদ্ধতিতে বাতাস তরল করতে স্বতঃশীতলীভবন ও জুল-টমসন প্রতিক্রিয়া কাজে লাগান। Linde বাতাসকে 200 বায়ুমণ্ডলীয় চাপ থেকে 40 বায়ুমণ্ডলীয় চাপে ও Hampson 200 বায়ুমণ্ডলীয় চাপ থেকে 1 বায়ুমলীয় চাপে প্রসারিত হতে দেন। বিজ্ঞানী Claude-ও (1900-05) বায়ু তরল করতে জুল-টমসন প্রতিক্রিয়া ব্যবহার করেন। গ্যাসসমূহকে তরলিত করতে Claude কয়েকটি সমস্যার সম্মুখীন হন। অ্যাডিয়াবেটিক প্রসারণের সময় গ্যাসের উষ্ণতা যখন হ্রাস পায়, তখন পিস্টন ও মেসিনের পিচ্ছিল তেল জমে গিয়ে যন্ত্র অকেজো করে দেয়। তাই তিনি পিচ্ছিল তেল হিসাবে পেট্রোলিয়াম ইথার ব্যবহার করেন। পেট্রোলিয়াম ইথার —160°C পর্যন্ত পিচ্ছিল থাকে। পেট্রোলিয়াম ইথার ও ভেসেলীনের মিশ্রণ ব্যবহার করেও যথেষ্ট সুফল পান। 1934 সালে P. Kapitza Claude-এর মেসিনে পিচ্ছিল পদার্থ ব্যবহারের সমস্যার নতুনভাবে সমাধান করেন। তিনি মেসিনে সিলিণ্ডার ও পিস্টনের মধ্যে খুব সামান্য ফাঁক রাখেন, ফলে প্রকৃতপক্ষে তাদের কোন সংযোগ ঘটে না। তাই পিচ্ছিলিকরণেরও কোন প্রয়োজন হয় না। পিস্টন ও

সিলিণ্ডারের মাঝখান দিয়ে উচ্চ চাপের গ্যাস সহজেই বেরিয়ে যায়, কিন্তু পিস্টন এত তাড়াতাড়ি যাওয়া-আসা করে যে, খুব সামান্য পরিমাণ গ্যাসই বের হয়।

F. Simon (1926) এক বিশেষ পদ্ধতিতে হিলিয়াম গ্যাসের উষ্ণতা সঙ্কট উষ্ণতার নীচে নামিয়ে তরল করেন। যখন কোন গ্যাস অঙ্গার কর্তৃক শোষিত হয়, তখন তাপের উদ্ভব ও শোষিত গ্যাস বের করে নিলে তাপের শোষণ হয়। এই তত্ত্বকে তিনি কাজে লাগান। সক্রিয় অঙ্গারকে (Active charcoal) তরল হাইড্রোজেনের সাহায্যে ঠাণ্ডা করলে তা প্রচুর পরিমাণে হিলিয়াম গ্যাস শোষণ করে। এখন পাম্পের সাহায্যে এই শোষিত গ্যাস টেনে নিলে অঙ্গারের উষ্ণতা সঙ্কট উষ্ণতার নীচে নেমে আসে। এই সময় চাপ প্রয়োগ করে হিলিয়ামকে তরল করা হয়।

গ্যাসকে তরলে পরিণত করতে, বিশেষ করে হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাসকে তরল করতে যখন অত্যধিক নিম্ন তাপমাত্রার প্রয়োজন দেখা দিল, তখন বৈজ্ঞানিকদের চেষ্টা চলতে লাগলো—কি করে −273°C বা 0°K উষ্ণতা পাওয়া যায়। Kemerlingh Onnes 0·82°K ও Keesom 0·71°K উষ্ণতা সৃষ্টি করেন তরল হিলিয়ামের সাহায্যে। 1926 সালে P. Debye ও W. F. Guiaque নিম্ন তাপমাত্রা সৃষ্টির জন্যে অ্যাডিয়াবেটিক বিচুম্বকনের (Adiabatic demagnetization) প্রস্তাব করেন। অ্যাডিয়াবেটিক বিচুম্বকনের ভিত্তি রচনা করেন P. Curie (1895)। তিনি বলেন, ডায়াম্যাগ্নেটিক (Diamagnetic) পদার্থগুলির ধর্ম সাধারণতঃ ক্ষেত্র প্রাবল্য (Field strength) এবং উষ্ণতা নিরপেক্ষ কিন্তু প্যারাম্যাগ্নেটিক (Paramagnetic) পদার্থের চুম্বকপ্রবণতা (Susceptibility) পরম উষ্ণতার সঙ্গে ব্যস্তানুপাতে পরিবর্তিত হয়। আবার চুম্বকপ্রবণতা ক্ষেত্র-প্রাবল্যের সমানুপাতিক। এই মতবাদকে Curie-Langevin তত্ত্ব বলা হয়। এই মতবাদকে কাজে লাগিয়ে Debye-এর প্রদর্শিত পথে উষ্ণতাকে পরম শূন্যের খুব কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। এই পদ্ধতিতে প্রথমে প্যারাম্যাগ্নেটিক পদার্থকে একটি আধারে রেখে তরল হিলিয়ামের সাহায্যে 1°K-তে নিয়ে আসা হয়। আধারের মধ্যে হিলিয়াম গ্যাস নিম্নচাপে রাখা হয়। এখন 30,000 গস্ ক্ষেত্র-শক্তি প্রয়োগ করা হয়। এই সময় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে, কিন্তু উৎপন্ন তাপ আধারের ভিতর নিম্নচাপে রক্ষিত হিলিয়াম কর্তৃক বিকিরিত হয়ে যায় ও উত্তপ্ত প্যারাম্যাগ্নেটিক পদার্থটি আবার তরল হিলিয়াম কর্তৃক ঠাণ্ডা হয়ে 1°K-তে নেমে আসে। এই সময় আধারের হিলিয়াম পাম্প করে বের করে নেওয়া হয় ও চৌম্বক ক্ষেত্র অপসারিত করা হয়। প্যারাম্যাগ্নেটিক পদার্থটির উষ্ণতা দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে। Guiaque 1933 সালে গ্যাডোলিনিয়াম সালফেট ব্যবহার করে 0·16°K উষ্ণতা সৃষ্টি করেন। De Hess সিরিয়াম ক্লোরাইড ও ডিসপ্রোসিয়াম (Dysprosium) ইথাইল সালফেট ব্যবহার করে যথাক্রমে 0·15°K ও 0·09°K উষ্ণতা পান। F. Simon ও N. Kürti 1935 সালে ফেরিক অ্যামোনিয়াম ফটকিরি ব্যবহার করে আরও ভাল ফল পান। 1935 সালেই W. J. de Hess ও E. C. Wiersma পটাসিয়াম ক্রোম ফটকিরির সাহায্যে 0·003°K উষ্ণতার সৃষ্টিতে সাফল্য লাভ করেন। আজকাল খুব সহজেই চৌম্বক পদ্ধতিতে 0·01°K থেকে 0·02°K উষ্ণতা সৃষ্টি করা সম্ভব হচ্ছে। কিন্তু এই প্রচণ্ড নিম্ন তাপমাত্রা মাপতে তাপমান যন্ত্রের যথেষ্ট অভাববোধ করেন বিজ্ঞানীরা।

সঞ্চয়ন

কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদ সন্ধানের উদ্যোগ

কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদ সংগ্রহের যে পরিকল্পনাটি গ্রহণ করা হয়েছে, তা সমগ্র মানবজাতির সম্মুখে এক বিপুল সমৃদ্ধির ইঙ্গিত বয়ে নিয়ে এসেছে। ভারত-সহ পৃথিবীর 22টি রাষ্ট্র এই পরিকল্পনা রূপায়ণে উদ্যোগী হয়েছে। 70টি রাষ্ট্র প্রত্যক্ষভাবে এর সুযোগ-সুবিধা পাবেন। এজন্যে আমেরিকা ও ব্রেজিলে যে কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে তথ্যসন্ধানী কেন্দ্র রয়েছে, তাতে ঐ সকল রাষ্ট্রের কর্মীদের তালিম দেওয়া হয়েছে।

এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কৃষি, বনবিজ্ঞান, জল ও ভূমি সম্পদের ব্যবস্থাপনা এবং ধাতব সম্পদ সম্পর্কে তথ্যসংগ্রহ করা হবে। তাছাড়া সমুদ্র-বিজ্ঞান, আকাশ ও জলপথে পরিবহন, জলবায়ু দূষিতকরণ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে সঙ্কেত দেবার বিষয়েও উপগ্রহের মাধ্যমে তথ্য-সংগ্রহ ও সমীক্ষা গ্রহণ করা হবে।

সমবেত প্রচেষ্টায় এই প্রথম ভারত উপমহা-দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের সমীক্ষা, সন্ধান ও হিসাব নেবার ব্যবস্থা হচ্ছে। সৌদী আরব প্রভৃতি রাষ্ট্রে পঙ্গপালের জন্মস্থান সম্পর্কে এই প্রথম তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা হচ্ছে।

পৃথিবীর সম্পদ-সন্ধানী এই সকল মার্কিন উপগ্রহের নামকরণ করা হয়েছে—আর্থ রিসোর্সেস টেকনোলজী স্যাটেলাইট। এই রকম দুটি পরীক্ষা-মূলক কৃত্রিম উপগ্রহ 1972 ও 1973 সালে মহাকাশে উৎক্ষেপণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। ঐ সকল উপগ্রহে থাকবে বহু বর্ণালীর বা মাল্টি স্পেকট্র্যাল অপ্‌টিক্যাল ক্যামেরা ও অবলোহিত রশ্মির সাহায্যে বহুদূর থেকে তথ্য সংগ্রহের নানা প্রকার যন্ত্রপাতি। এই প্রথম সমগ্র বিশ্বের প্রাকৃতিক সম্পদের একটা মোট হিসাব নেবার জন্যে চেষ্টা করা হচ্ছে।

এর আগে নিম্বাস নামে আবহাওয়া সম্পর্কে তথ্যসন্ধানী মার্কিন উপগ্রহ মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে এবং পরিকল্পনা সম্পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিতও হয়েছে। এক টন ওজনের প্রাকৃতিক সম্পদ-সন্ধানী এই উপগ্রহের আভ্যন্তরীণ গঠন এবং এর পাখায় সূর্যালোক থেকে শক্তি সংগ্রহের ব্যবস্থা ঠিক নিম্বাসেরই অনুরূপ হবে। আর জেমিনি ও অ্যাপোলো পরিকল্পনা রূপায়ণে এবং 1968 সাল থেকে মেক্সিকো, ব্রেজিল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিমানের সাহায্যে প্রাকৃতিক সম্পদের সমীক্ষা গ্রহণকালে যে ধরণের ক্যামেরা ও অব-লোহিত রশ্মি বা ইনফ্রারেড লেন্স ব্যবহৃত হয়েছিল, সেই ধরণের ক্যামেরা ও অবলোহিত রশ্মির সাহায্যে বহু দূর থেকে তথ্য সংগ্রহের সাজসরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি এতে থাকবে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের বিজ্ঞান দপ্তরের উপদেষ্টা ডক্টর এডওয়ার্ড ই. ডেভিড (জুনিয়ার) কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের ব্যাপক কার্যসূচী প্রণয়নের কারণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এর ফলে পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে কোন্ প্রকার তথ্য কার কাছে মূল্যবান ও ফলপ্রসূ বলে পরিগণিত হতে পারে, সে বিষয়ে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে আরও ভালভাবে ওয়াকিবহাল হওয়া যাবে। তারপরে প্রকৃত প্রয়োজনানুযায়ী সেই সম্পদকে কাজে লাগাবার ব্যবস্থা করা যাবে।

বিভিন্ন দেশের সদস্যদের নিয়ে গঠিত একটি কমিটি সম্প্রতি এই পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করেছেন। এই কার্যসূচী রূপায়ণের উদ্দেশ্যে প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহটি আগামী মে মাসে মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হবে।

ঐ উপগ্রহ প্রচুর পরিমাণ তথ্য পৃথিবীর বিভিন্ন কেন্দ্রে পাঠাবে। এই সকল তথ্যের সদ্ব্যবহারের উপরেই যে এই পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করছে, সে বিষয়ে কমিটির সকল সদস্যই একমত। তাঁদের অভিমত, যে সকল অঞ্চল এই সকল তথ্যকে কার্যক্ষেত্রে রূপ দিবে, তা তাদের কাছে যাতে বোধগম্য হয়, তার ব্যবস্থা করতে হবে।

অস্ট্রেলিয়ার ব্যুরো অব মিনারেল রিসোর্সেস-এর পৃথিবীর সম্পদ-সন্ধানী কমিটির চেয়ারম্যান ডক্টর নরম্যান ফিশার কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে এই তথ্য সংগ্রহের পরিকল্পনা সম্পর্কে বলেছেন যে, এই পরিকল্পনা রূপায়ণের ব্যাপারে তেমন কোন সমস্যা না থাকলেও আজ বা কাল, মহাকাশের সীমানা এবং কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণের সর্ত নিয়ে আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদনের প্রয়োজন হতে পারে।

ন্যাশন্যাল অ্যাকাডেমী অব সায়েন্সেস-এর করেন সেক্রেটারী এবং ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেক্‌নোলোজীর সদস্য ডক্টর হ্যারিসন এস. ব্রাউন তাঁর এই কথার উত্তরে বলেন যে, এই সম্পর্কে রাষ্ট্রসংঘের তত্ত্বাবধানেই নিয়মমাফিক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে তিনি এই প্রশ্নও করেন—কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা বা আন্তর্জাতিক আইনের প্রকৃত কোন প্রয়োজনীয়তা আছে কি? তিনি বলেন যে, আমেরিকা এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন উভয় দেশেরই মহাকাশে সামরিক লক্ষ্যবস্তু সম্পর্কে তথ্যসন্ধানী কৃত্রিম উপগ্রহ রয়েছে। কিন্তু কোন দেশই অন্যের উপগ্রহটিকে গুলিবিদ্ধ করে পৃথিবীতে নামিয়ে আনছেন না। তথাকথিত স্পাই স্যাটেলাইট বা গোয়েন্দা উপগ্রহে এই সকল সম্পদ-সন্ধানী উপগ্রহের তুলনায় অনেক বেশী শক্তিশালী ক্যামেরা ও রিমোট সেন্সার যন্ত্রপাতি থাকে।

এই পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত হলে সমগ্র পৃথিবীতে প্রায় ডজনখানেক পৃথিবীর সম্পদ সম্পর্কে তথ্যকেন্দ্র গড়ে উঠবে এবং এক-একটি কেন্দ্র ঐ বিশেষ এলাকায়, বিশেষ দেশের কাজে লাগবে।

বৈদ্যুতিক গোলক

সোভিয়েট বিজ্ঞান লেখক বি. উমারোভ একটি নিবন্ধে লিখেছেন—বৈদ্যুতিক গোলক প্রকৃতির এমন একটা অদ্ভুত ব্যাপার, যা শত শত বছর ধরে বিজ্ঞানীদের বিভ্রান্ত করেছে। তাঁদের পরিশ্রম ও উদ্যোগ সত্ত্বেও এই গোলকের রহস্য উদ্‌ঘাটন করা আজও সম্ভব হয় নি।

বৈদ্যুতিক গোলকের বৈশিষ্ট্য এই যে, তা অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা দেয় এবং খুব তাড়াতাড়ি অপসৃত হয়। গবেষণাগারে এই বৈদ্যুতিক গোলক সৃষ্টির প্রচেষ্টা আজো সফল হয় নি। এই কথা সত্য যে, একবার সোভিয়েট বিজ্ঞানী জি. বাবোতের প্রচেষ্টায় আকস্মিকভাবে বৈদ্যুতিক গোলকের অনুরূপ একটা কিছুর সৃষ্টি হয়েছিল। গবেষণার সময় ইলেকট্রোডের মধ্যে যখন তীব্র টান বৃদ্ধি পেল, তখন প্রকাণ্ড একটা উজ্জ্বল আলোর গোলক সশব্দে জ্বলে উঠলো।

অতীতে এবং বর্তমানে আমাদের দেশের শত শত বিজ্ঞানী এই বিদ্যুতের গবেষণায় ব্যাপৃত

ছিলেন এবং এখনো আছেন। তাঁদের মধ্যে এম. এ. লেভ্রেন্তিয়েভ এবং পি. এল. কাপিৎসার মত বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীরাও আছেন।

বিজ্ঞানীরা অনেক তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছেন। সব তত্ত্বেরই যুক্তি আছে, কিন্তু কোন অনুমানই ভ্রান্তির অতীত নয়। কারো কারো মতে, এটা হলো একটা ঘনীভূত প্লাজ্‌মা, বহুদিন ধরে যা সাধারণ বিদ্যুৎ স্ফুরণের দ্বারা পুষ্ট।

এই মতবাদের বিরোধীরা বলেন যে, সাধারণ বিদ্যুৎ স্ফুরণের ফলে এই শিখা জ্বলে উঠে রাসায়নিক উপাদানগুলি দগ্ধ হয়। আরেকটা অনুমানও আছে—সাধারণ বিদ্যুৎ স্ফুরণের ফলেই গোলকের বিদ্যুৎ স্ফুরণ হয়, কিন্তু তার শক্তির উৎস হলো বেতার-তরঙ্গ। কখনো কখনো এক অনুমান অন্য অনুমানকে নাকচ করে এবং এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে, এই স্ফুরণ এমন অলৌকিক ঘটনা সৃষ্টি করে, যা সোজাসুজি ব্যাখ্যা করা যায় না।

একটা বিদ্যুতের গোলক টেলিভিশন এবং রেডিও বন্ধ করে দেয়। টেলিফোন অকেজো করে দেয়। বাড়ীর দরজায় বিদ্যুৎ-বোতাম টিপে দেয়। তারা বাগদাদের চোরের মত নিপুণভাবে আংটি এবং চুড়ি খুলে নেয়। আসলে তার ছুলে নেয় না, বরং এক পলকে সেই ধাতুকে উবিয়ে দেয়—হাতে তার এতটুকু চিহ্নও থাকে না।

কি করে এসবের ব্যাখ্যা করা যায়? এই রকম একটা মত আছে যে, বৈদ্যুতিক গোলকে দুটি উপাদান আছে। বহিরাবরণের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ প্রবাহিত হয় এবং একটি চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়। গোলকের মধ্যে একটি গভীর শূন্যতা আছে এবং সর্বদাই এটা প্রচণ্ড শক্তির দ্বারা বিদীর্ণ হয়। ইলেকট্রোম্যাগ্‌নেটিক শক্তিগুলি গোলকটিকে চূর্ণ করতে চেষ্টা করে, আর বায়ুর চাপ তাকে চাপ দিয়ে ঠেলে রাখে। এই বিদ্যুতের আয়ু নির্ভর করে ভারসাম্যের স্থায়িত্বের উপর। এজন্যে বোধ হয় গোলকটি আংটি এবং চুড়ির ব্যাপারে উদাসীন নয়। পলকের মধ্যেই ধাতব দ্রব্যে তা অভূতপূর্ব তরঙ্গ সৃষ্টি করতে পারে। বড় বড় জিনিষ উবিয়ে দেবার পক্ষে এই শক্তিই যথেষ্ট।

অসামান্য গোলকটির এটাই হলো বহুমুখী, রহস্যজনক এবং সম্ভাবনাপূর্ণ রূপ। দিনের পর দিন বিজ্ঞানীরা গবেষণাগারে এই সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাচ্ছেন। তাঁরা বৈদ্যুতিক গোলকের জন্ম-রহস্য সম্পর্কে বিশদভাবে গবেষণা চালাচ্ছেন এবং এই শক্তিকে আয়ত্তে আনতে চেষ্টা করছেন। শেষ পর্যন্ত প্রকৃতির এই বিপুল উপহারকে সংহত করে আমরা হয়তো শক্তির এক অভূতপূর্ব উৎসের সন্ধান পাব।

রঙের অনুভূতি

যোগেন দেবনাথ*

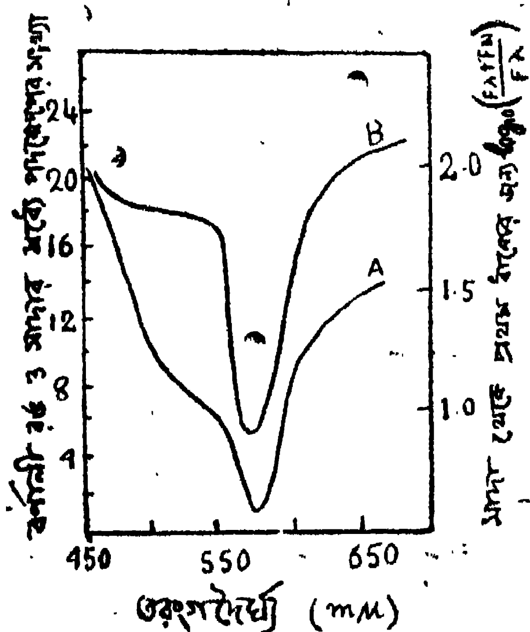
লাল, নীল, হলদে, সবুজ—প্রকৃতি জোড়া এমনি রঙের ছড়াছড়ি। রঙীন দুনিয়ার বিপুল বৈচিত্র্যে একাত্মভাবে মিশে আছে সৌন্দর্যের যাদুকাঠি। এই বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্যের বেদীমূলে রয়েছে যে বর্ণ বা রং, বাস্তব জগতে তার যথার্থ অস্তিত্ব সত্যই আছে কিনা এবং থাকলে তার সত্যকার স্বরূপ কি, জানা নিতান্তই প্রয়োজন। কেন না, কীট-পতঙ্গের কাছে এর কোন মূল্যবোধই নেই—দুনিয়াটা তাদের কাছে সাদামাটা। মানুষ সমেত যেসব প্রাণী বিশেষ ধরণের সংজ্ঞাবহ ও বিশ্লেষণধর্মী অঙ্গের অধিকারী, শুধুমাত্র তাদের কাছেই রঙের মূল্যবোধ রয়েছে। তারা দৃশ্য আলোর বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের মধ্যে যেমন প্রভেদ-রেখা টানতে পারে, তেমনি পারে আলোর তীব্রতাকে পৃথক করতে। বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলো মানুষের চোখে অবস্থানকারী রেটিনার গ্রাহককোষে যে উত্তেজনার সৃষ্টি করে, তার ব্যাপ্তিও ভিন্ন। দুটি বর্ণকে একই মনে হবে যদি তারা গ্রাহককোষে একই ভাবে সমপরিমাণ উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে। লাল ফুল থেকে ফিরে আসা আলো (620-700 $m\mu$) রেটিনার গ্রাহককোষে যদি সবুজ ফুল থেকে ফিরে আসা আলোর (500-570$m\mu$) সমান উত্তেজনা জাগাতে সক্ষম হয়, তবে লাল ফুলকে সবুজ বলেই মনে হবে। একইভাবে 580$m\mu$ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলো চোখে পড়ে যেমন হলদে রঙের অনুভূতি জাগায়, তেমনি লাল ও সবুজের সংমিশ্রণও একই অনুভূতি জাগাতে পারে। এছাড়া আরও একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা গেছে, প্রতিটি বর্ণালী-রং গ্রাহককোষে যে বিশেষ উত্তেজনা সৃষ্টি করে এবং যার জন্যে বিশেষ অনুভূতি জাগ্রত হয়, পরিবর্তিত পরিবেশে পড়ে তারও পরিবর্তন ঘটে। উদাহরণ স্বরূপ, তীব্র লাল আলোতে মিনিট কয়েক তাকাবার পর কেউ যদি হলদে রঙের দিকে তাকায়, তাহলে হলদে রংকে তার সবুজ বলেই অনুভূত হবে।

প্রধানতঃ তিনটি জিনিযের উপর রঙের অনুভূতি নির্ভর করে। যথা বর্ণ (লাল, নীল ইত্যাদি), বর্ণের তীব্রতা (উজ্জ্বলতার পরিমাপ) এবং বর্ণের সম্পৃক্তি। বর্ণের বিশুদ্ধতা বলতে যা বোঝায় সম্পৃক্তি অনেকটা সেরকমই। অবশ্য অন্যভাবেও এর সংজ্ঞা দেওয়া যায়। সমান উজ্জ্বল এবং বর্ণহীন ধূসর থেকে একটি নির্দিষ্ট বর্ণের পার্থক্য কতটুকু, পরিমাণগতভাবে সে-টুকুই তার সম্পৃক্তি। দু-ভাবে এই সম্পৃক্তির পরিমাপ করা চলে। সাদা আলোতে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ বর্ণকে মিশিয়ে মিশিয়ে সাদা থেকে তাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রঙে নিয়ে আসা অথবা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বর্ণে সাদা আলোকে মিশিয়ে মিশিয়ে একইভাবে তাকে সাদার সঙ্গে ন্যূনতম বোধগম্য করে তোলা। মূল বর্ণ ও সাদার মধ্যে ন্যূনতম এই প্রভেদরেখা টানতে যে আঙ্কিক পদক্ষেপের প্রয়োজন, তাকেই সেই বর্ণের সম্পৃক্তির মাপকাঠি স্থির করা হয়েছে। 1নং চিত্রে তারই উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। সাদা থেকে শুধুমাত্র একটি বোধগম্য ধাপে বর্ণের যে পরিবর্তন সূচিত হয়, তাই দেখানো হয়েছে A-রেখার মারফত (অক্ষ ডানপাশে)। F, বর্ণালী রঙের প্রবাহ এবং Fw, সাদা আলোর প্রবাহ। বর্ণালী রং ও সাদা আলোর মধ্যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পর্যায়ক্রম দেখানো হয়েছে B-রেখার মাধ্যমে (অক্ষ বামপাশে)।

* শারীরবৃত্ত বিভাগ, মেদিনীপুর কলেজ, মেদিনীপুর

স্পষ্টতঃই দেখা যাচ্ছে বর্ণালীরঙের সম্পৃক্তি দারুণ ভাবে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে পরিবর্তিত হয়েছে। প্রান্তসীমায় যেমন বেগুনী ও লালের তীব্র সম্পৃক্তি ঘটেছে, তেমনি নিতান্ত অসম্পৃক্তি ঘটেছে হলদে ও সবুজের বেলায়। সাধারণভাবে বর্ণালী আলোর সংমিশ্রণে যেসব রঙের উৎপত্তি ঘটে, মূল রং থেকে তাদের সম্পৃক্তি কম হয়।

গোটা বর্ণালী চোখে পড়ে যে প্রক্রিয়ায় সাদা আলোর অনুভূতি জাগায়, ঠিক একই প্রক্রিয়ায় সাদা আলোর অনুভূতি জাগাতে পারে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট পরিমাণ হলদে ($\lambda - 80m\mu$) ও নীল ($\lambda - 479m\mu$) আলোর সংমিশ্রণ। এভাবে হলদে



1নং চিত্র

ও নীল আলো থেকে সাদা আলোর পুনর্গঠন পরিপূরক বর্ণের অনুক্রমের একটি উদাহরণ মাত্র। বর্ণালীর বিশেষ তিনটি রংকে (লাল, হলদে ও সবুজ) মিশিয়ে মিশিয়ে এভাবে সাদা আলোর পুনর্গঠন সম্ভব। এছাড়াও আলোর এমনি অসংখ্য তরঙ্গযুগল রয়েছে, যাদের নির্ভুল সংমিশ্রণে সাদা আলোর প্রাপ্তিযোগ ঘটে। 1নং তালিকায় তারই কিছু নমুনা তুলে ধরা হয়েছে।

1নং তালিকা

তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ($m\mu$)	সাদার পুনর্গঠনে প্রয়োজনীয় শক্তির লগ
700	2·20
492	0·70
650	0·81
492	0·71
600	0·30
489	0·63
580	0·495
479	0·586
570	0·720
450	0·430
568·5	0·77
410	1·398

গোটা বর্ণালী বা সাদা আলো রেটিনায় অবস্থানকারী গ্রাহককোষে যেভাবে উদ্দীপনা জাগায় এইসব জোড়া তরঙ্গের আলোও একই ভাবে উত্তেজনা সৃষ্টি করে সাদা আলোর অনুভূতি জাগায়।

বর্ণালী রং শারীর-বিজ্ঞানের দিক দিয়েও কম উৎসাহব্যঞ্জক নয়। এদের যখন তখন ও নির্দিষ্ট উত্তেজক হিসাবে যেমন ব্যবহার করা চলে, তেমনি সহজে সংমিশ্রণ করাও সম্ভব। এছাড়া অন্যসব বর্ণের সীমারেখা নিরূপণের প্রারম্ভিক ক্রমহিসাবেও এদের ব্যবহার করা চলে। তবে বর্ণের অনুভূতির বুনিয়াদ খুঁজতে গিয়ে একসময়— বৈজ্ঞানিকেরা আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের চেয়ে চোখের রেটিনায় অবস্থানকারী গ্রাহককোষে উৎপন্ন

স্নায়ুউত্তেজনার বৈশিষ্ট্যের উপর জোর দিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে গ্র্যানিট ও তাঁর সহকর্মীদের নাম উল্লেখ করা চলে। তাঁরা নির্দিষ্ট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোর পছন্দসই অভিযোজনের সাহায্যে এবং আরও নানা পরীক্ষা থেকে দেখেছেন অনেক স্নায়ুতন্তুর প্রতিক্রিয়া আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের পরিবর্তনে বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। যেসব স্নায়ুতন্তু থেকে এধরণের পরিবর্তনসূচক খবরাখবর জোগাড় করা সম্ভব, তাদেরকে—সুর আন্দোলক বা মডুলেটর বলা হয়। সত্যই এরা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এদের ভিতরকার পরিবর্তন রেটিনায় অবস্থানকারী এমনসব পদার্থের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দ্রুততালে পরিবর্তিত হয়, যখন চোখে এসেপড়া আলোক তরঙ্গের পরিবর্তন ঘটে। এসব পদার্থই আসলে বর্ণের পৃথকীকরণে অংশগ্রহণ করে। অবশ্য তাদের কাজের বিশদ ব্যাখ্যা এখনও প্রশ্নাতীত নয়। ইঁদুর, গিনিপিগ ইত্যাদি প্রাণীর রেটিনার সীমাবদ্ধ পরিধিকে ব্যবহার করে রকমারি মডুলেটর রেখা পাওয়া গেছে। কারো কারো মতে এধরণের রেখার উৎপত্তি বিভিন্ন কারণসঞ্জাত হতে পারে। সরাসরি গ্রাহককোষ অথবা রেটিনার বিভিন্ন অংশের কোষের মধ্যে ক্রিয়াবিক্রিয়াও এদের উৎপত্তির কারণ হতে পারে।

1807 সালে যোয়্যাস রঙের অনুভূতির ত্রিবর্ণ-ভিত্তিক বৈশিষ্ট্যের উপর জোর দেন। এরপর হেমহোজ অপরিমেয় গবেষণার সাহায্যে তাঁর ত্রিবর্ণ মতবাদের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং তার বিকাশ ঘটান। বর্ণালী বহির্ভূত রং-সমেত সবরকমের রংকে শুধুমাত্র তিনটি প্রাথমিক উদ্দীপক বা বর্ণালীর তিনটি পরিচ্ছন্ন তরঙ্গ বিস্তারের (নীল, সবুজ ও লাল) ব্যবহারে এবং তাদের বিভিন্ন সমানুপাতিক সংমিশ্রণে লাভ করা সম্ভব। এই বিশেষ প্রাথমিক তিনটির প্রতিটির তীব্রতার একটি নির্দিষ্ট মাপকাঠি রয়েছে, যাদের যথাযথ সংমিশ্রণে সঠিক বর্ণ, তার উজ্জ্বলতা ও সম্পৃক্তির প্রকাশ ঘটে। যে কোন বর্ণকে নীচের সূত্রের সাহায্যে প্রকাশ করা চলে। যেমন—

$$aC=xB+yG+zR$$

এখানে a যেমন C বর্ণের উজ্জ্বলতার পরিমাণ, তেমনি x, y ও z যথাক্রমে নীল, সবুজ ও লালের উজ্জ্বলতার মাপকাঠি। এই সূত্রকে ব্যবহার করে যে কোন একপ্রস্থ প্রাথমিককে প্রকাশ করা চলে। যেমন—

$$aC=x_1B'+y_1G'+zR'$$

এই সূত্রটি তাই প্রতিটি বর্ণের বেলায়ই প্রযোজ্য—বর্ণটি বর্ণালীর অন্তর্ভুক্ত কিনা—এ প্রশ্ন তখন অবান্তর। দ্বিতীয়প্রস্থ প্রাথমিকের (B', G' এবং R') প্রত্যেকটিকে যদি প্রথমপ্রস্থ উদ্দীপকের মানদণ্ডে বিচার করা হয়, তবে অতি সহজেই একপ্রস্থ উদ্দীপককে অন্যপ্রস্থে রূপান্তরিত করা চলে। যথা—

$$x_1B'=p\ B+q\ G+r\ R$$
$$y_1''G'=P_1B+q_1G+r_1R$$
$$z\ R'=P_2B+q_2G+r_2R$$

এবং aC-কে এই তিনের সমষ্টি হিসাবে ধরা যায়।

দুই বা ততোধিক আলোর সংমিশ্রণ থেকে উৎপন্ন মিশ্র আলোর উজ্জ্বলতা পৃথক পৃথক উদ্দীপকের উজ্জ্বলতার সমষ্টির সমান। ac_1 একটি বর্ণ এবং bc_2'' যদি অপর আর একটি বর্ণ হয়, তবে তাদের প্রত্যেককেই আগের মত প্রকাশ করা চলে। যথা—

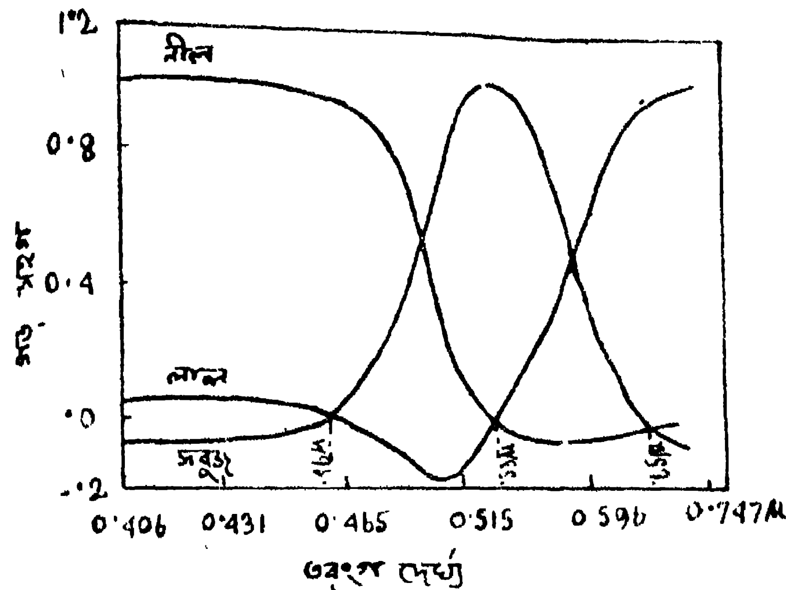
$$aC_1=x_1B+y_1G+zR$$
$$aC_2=x_2B+y_2G+zR$$

এই দুইয়ের সংমিশ্রণে নবজাত যে বর্ণের প্রকাশ সম্ভব, তাকেও একইভাবে প্রকাশ করা যায়। যেমন, $C_3=ac_1'+bc_2''$। এই নবজাত মিশ্র আলোর উজ্জ্বলতা a+b এবং সম্পূর্ণ সমীকরণটির চেহারা গিয়ে দাঁড়াচ্ছে—

$$(a+b)C_1=(x_1+x_2)B+(y_1+y_2)G+(z_1+z_2)R$$

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, তিনটি প্রাথমিক বা মুখ্য বর্ণের উজ্জ্বলতার পরিমাণের সাহায্যে যেমন কোন বর্ণকে প্রকাশ করা চলে, তেমনি বর্ণালী রঙের সংমিশ্রণ ঘটালে তাদের উপাদানগুলির উজ্জ্বলতাকেও সবরকম ব্যবহারিক উদ্দেশ্যে সংযোজন করা যায়। আলোচিত দুটি কলাফলই মূলতঃ রকমারি বর্ণের মাপকাঠি এবং তাদের নির্দিষ্টকরণের মুখ্য নির্দেশক।

তিনটির (650mμ, 530mμ এবং 460mμ) সহায়তায় যদি বর্ণালী রংকে একে একে ম্যাচ করানো যায়, তা হলে প্রথমতঃ সাদার সঙ্গে তাদের মানানসই পরিমাণকে একক হিসাবে গণ্য করা যাবে এবং একে ভিত্তি করেই অন্যসব রঙকে বিচার করা চলবে। 2নং ছবিটি এইসব কলাফলের ভিত্তিতেই পাওয়া গেছে। y-অক্ষে তিনটি প্রাথমিকের যে অনুপাত দেওয়া আছে, তাদের সঠিক সংমিশ্রণে যে কোন বর্ণের উৎপত্তি সম্ভব। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে বর্ণালীর নীল অংশে



2নং চিত্র

প্রাথমিক উদ্দীপক তিনটির জুতসই এককের বিচারও নানাভাবে করা হয়েছে। বর্ণালীর এই মুখ্য বর্ণ তিনটিকে যদি এমনভাবে বাছাই করা হয়, যাতে তাদের একটা নির্দিষ্ট মাত্রার সংমিশ্রণ সাদা রঙের প্রকাশ ঘটায়, তা হলে সাদার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এই প্রাথমিক তিনটির নির্দিষ্ট উজ্জ্বলতা যথাক্রমে লাল, নীল ও সবুজ উদ্দীপকের একক বলে পরিলক্ষিত হতে পারে। এই শর্ত মেনে নিলে হরেক-রকম বর্ণকেই এই এককের সাহায্যে প্রকাশ করা সহজ। উদাহরণস্বরূপ মুখ্য উদ্দীপক সবুজ উদ্দীপক না-ধর্মী। সবুজ অংশে লাল উদ্দীপককে মানানসই বা ম্যাচিং ক্ষেত্রে নামিয়ে আনতে হয়েছে।

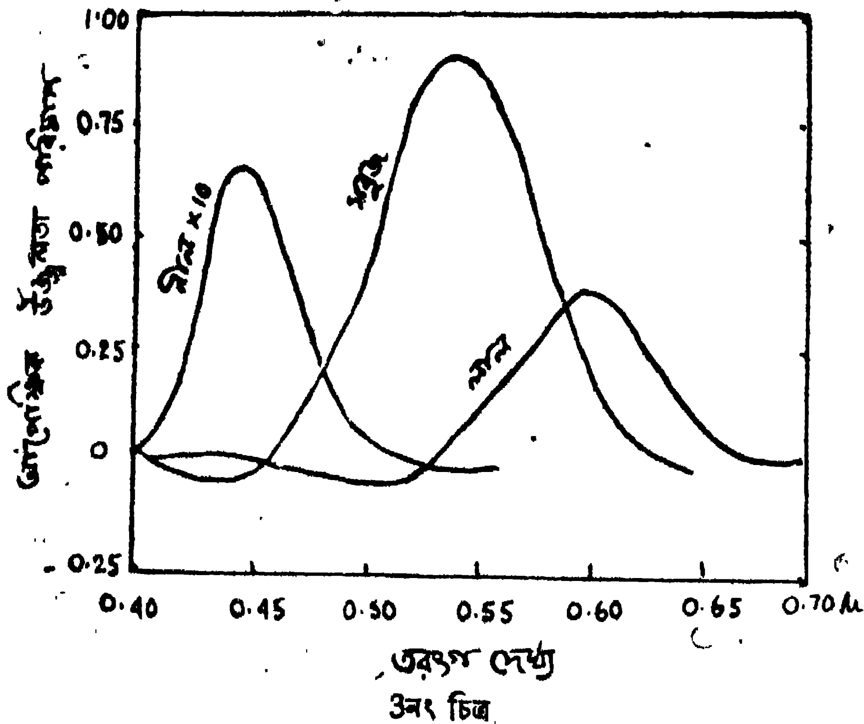
অন্যান্য এককের সন্তোষজনক ব্যবহারও পাওয়া গেছে। সেসব ক্ষেত্রে পরিমাণগতভাবে লাল ও সবুজকে মিশিয়ে হলুদের সঙ্গে অথবা নীল ও সবুজকে মিশিয়ে নীলাভ সবুজের সঙ্গে ম্যাচ করানো হয়েছে।

2নং ছবির সংখ্যাগুলিকে যদি উজ্জ্বলতার মাপকাঠিতে অর্থাৎ নীল, সবুজ ও লাল বিকিরণের

অবিমিশ্র পরিমাণের আওতায় নিয়ে আসা হয়, তবে বর্ণালী রঙের সঙ্গে ম্যাচিং-এর সম্পর্ককে 3নং ছবির সাহায্যে চিত্রিত করা চলে। নীল উদ্দীপকের উজ্জ্বলতার মাত্রা খুবই কম বলে তাকে 10 দিয়ে গুণ করা হয়েছে। রং ও রঙের সম্পৃক্তির উপর নীল উদ্দীপকের প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে, কিন্তু উজ্জ্বলতার উপর তার কার্যকরী ক্ষমতা খুবই কম।

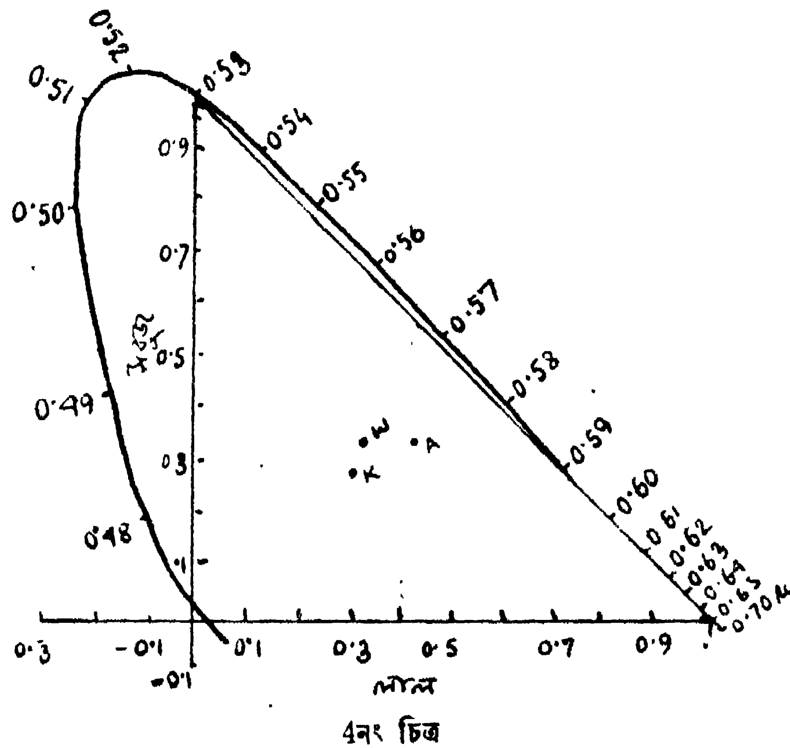
2নং ছবিতে সহগগুলিকে একের ভগ্নাংশ হিসাবে দেখানো হয়েছে। 4নং ছবিতে তারই প্রকাশ ঘটেছে অন্যভাবে। এখানে বর্ণালীর লাল ও সবুজের সহগকে [R ও G] পরস্পরের বিপরীতে রাখা হয়েছে। এক থেকে অন্যদের বাদ দিলে নীলের সহগের সন্ধান পাওয়া সম্ভব [যেহেতু R+G+B=1]। এই ছবিটি যথার্থই কৌতুহলোদ্দীপক, কেননা অনেক নির্দিষ্ট মানের বর্ণ তালিকার এ হলো একটি ভিত্তিস্বরূপ। উদাহরণ হিসাবে সি. আই. ই বা Commission Internationale d' Eclairage-এর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এই চার্টের উপর ভিত্তি করেই যার গোড়া পত্তন হয়েছে। চার্টের অবস্থান দেখে যে কোন বর্ণকে নির্দিষ্টকরণ সম্ভবপর। 0·33,0·33 বিন্দুর দ্বারা সাদা বিন্দুর অবস্থান জ্ঞাপন করা হয়েছে। এই বিন্দু থেকে বর্ণালীর সঞ্চার-পথের দিকে রঙের সম্পৃক্তি ধীরে ধীরে বেড়ে গেছে।

রঙের এই বৈচিত্র্যের শারীরতাত্ত্বিক মূল্যায়নে আবার ফিরে আসা যাক। চোখের রেটিনায় অবস্থানকারী রড ও কোণ গ্রাহককোষের মধ্যে রঙের অনুভূতির জন্যে কোণ গ্রাহককোষই দায়ী। রেটিনার যে অংশে এই কোণ গ্রাহক-কোষের প্রাধান্য সবচেয়ে বেশী বা যে অংশ পুরোপুরি রড গ্রাহককোষ মুক্ত (ফভিয়া কেন্দ্র), তার উপর ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলো ফেলে পরীক্ষা করা হয়েছে। পরীক্ষা থেকে জানা গেছে তিন-রকমের কোণ গ্রাহককোষের অস্তিত্ব সেখানে রয়েছে এবং এরাই মূলতঃ রঙের অনুভূতির জন্যে দায়ী। বিশেষ করে এদের প্রত্যেকের অভ্যন্তরে



3নং চিত্র

পৃথক পৃথক যে রাসায়নিক পদার্থ বর্তমান, তারাই এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের অংশীদার। এরকম একটা ইঙ্গিত আগেও দেওয়া হয়েছে, যা মডুলেটর স্নায়ুতন্তু থেকে পাওয়া গেছে। এই দুটি রাসায়নিক পদার্থের (ক্লোরোল্যাব ও ইরীথ্রোল্যাব ক্রিয়া-বিক্রিয়ার গ্রাহককোষে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, স্নায়ুতন্তু মারফত তাই মস্তিষ্কে পরিচালিত হয় এবং রঙের অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। এক ধরণের কোণ্ গ্রাহককোষ যখন অন্যদের উপর প্রাধান্য পরীক্ষার সময় সেই অংশকে স্থিতিশীল করে রাখতে হয়। অন্যদিকে স্বাভাবিক রঙের অনুভূতি ঘটে থাকে রেটিনার বিস্তৃত এলাকা জুড়ে। চোখ ইচ্ছামত যে কোন দিকে ঘুরাফিরা করে রেটিনার যে কোন অংশকে কাজে লাগাতে পারে। এই পরিস্থিতিতে হেমহোজের ত্রিবর্ণ মতবাদের বক্তব্যই বেশী জোরদার হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। যে প্রাথমিক বর্ণ তিনটির বিভিন্ন বৈচিত্র্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, তাদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের·



4নং চিত্র

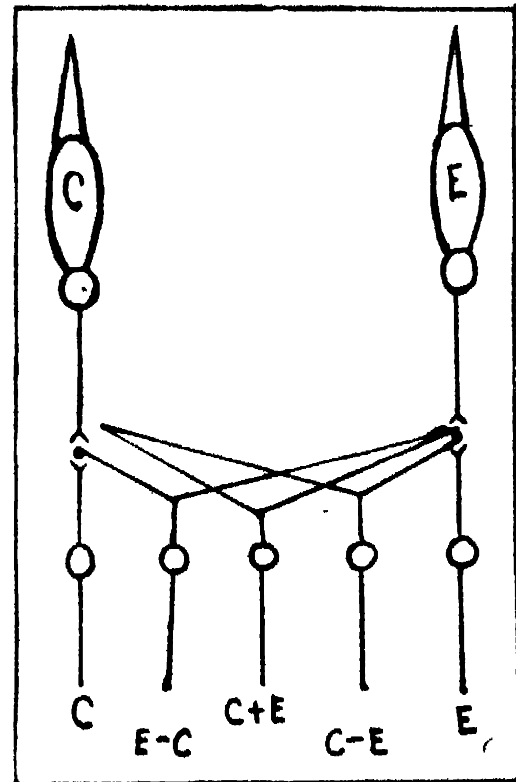
বিস্তার করে; অর্থাৎ ক্লোরোল্যাব যখন ইরীথ্রোল্যাবের উপর প্রাধান্য লাভ করে তখন নীল-সবুজের অনুভূতি জাগ্রত হয়। বিপরীত হলে কমলালেবুর রঙ বা লালের অনুভূতি জাগে। তবে ফভিয়া কেন্দ্রের অনুভূতির ব্যাপার স্বাভাবিকভাবে রঙের অনুভূতির পদ্ধতি থেকে খানিকটা পৃথক। অবশ্য তার কারণও রয়েছে যথেষ্ট। ফভিয়া কেন্দ্রের রড্ গ্রাহককোষমুক্ত এলাকা যেমন খুবই কম (30´ ব্যাসযুক্ত এলাকা), তেমনি বিশ্লেষণ ধর্মী তিন ধরণের কোণ্ গ্রাহককোষের অস্তিত্বের কথা এই মতবাদে স্বীকার করা হয়। এই তিন ধরণের কোণ্ গ্রাহককোষই রঙের অনুভূতির জন্যে দায়ী। যেমন, নীল কোণ্ গ্রাহককোষ স্পষ্টভাবেই বর্ণালীর ক্ষুদ্র প্রান্তের আলোক সম্পাতে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, বর্ণালীর মধ্য অংশের আলোক সম্পাতেও এরা খানিকটা প্রতিক্রিয়াশীল, তবে দীর্ঘ তরঙ্গের আলোতে এরা নিষ্ক্রিয়। সবুজ কোণ্ গ্রাহককোষ সাধারণ-

ভাবেই বর্ণালীর মধ্য অংশের আলোয় সাড়া দেয়। লাল কোণ্ গ্রাহককোষও একইভাবে দীর্ঘ তরঙ্গের আলোতে ক্রিয়াশীল।

তবে মজার ব্যাপার হলো এ অবধি দু-প্রকার কোণ্ গ্রাহককোষের অস্তিত্বের মূল্যায়ণ করা গেছে। তৃতীয় শ্রেণীর অস্তিত্বকে নিয়েই বেঁধেছে যত রকম ঝামেলা। এ রকম কোণ্ গ্রাহককোষের কোন সন্ধান রেটিনাতে পাওয়া যায় নি। তাই এদের প্রতিকল্প হিসাবে তৃতীয় প্রক্রিয়ার উল্লেখ করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়া প্রধানতঃ বর্ণালীর নীল প্রান্তের সঙ্গে জড়িত। এজন্যে একে নীল প্রক্রিয়া বলে অভিবহিত করা হয়েছে। ম্যার্ক ও তাঁর সহকর্মীরা অবশ্য কোণ্ গ্রাহককোষের সঙ্গে এই প্রক্রিয়ার নির্ভরশীলতার উপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন। তবে তাঁদের বক্তব্যকে তাঁরা সঠিক সিদ্ধান্তে টেনে নিয়ে যেতে সক্ষম হন নি। কারণ দেখা গেছে নীল প্রক্রিয়ার মধ্যে এমন সব ধর্মের সমাবেশ রয়েছে, যাদের সঙ্গে জানাশুনা কোন কোণ্ গ্রাহককোষের ধর্মের মিল নেই। এ ব্যাপারে অন্যান্য অভিমতও রয়েছে। ত্রিবর্ণ ভিত্তিক ম্যাচিং সব সময় সঠিক নাও হতে পারে, কারণ তারও একটা নির্দিষ্ট সীমারেখা রয়েছে। দেখা গেছে উজ্জলতার মাত্রা পরিবর্তনকালে ত্রিবর্ণ ভিত্তিক ম্যাচিং বিনষ্ট হয়ে যায়।

স্টাইল নীল অনুভূতির সঙ্গে জড়িত নীল প্রক্রিয়াটিকে একটি জটিল প্রক্রিয়া বলে বর্ণনা করেছেন। একে তিনি π_1, π_2 এবং π_3 এই তিনটি প্রক্রিয়াতে বিশ্লিষ্ট করেছেন। সবুজ ও লাল প্রক্রিয়া তার মতে π_4 এবং π_5। তিনের বদলে এই পাঁচটি প্রক্রিয়ার আবির্ভাব নিশ্চিত-ভাবে নূতনত্বের দাবীদার। তবে এদের গুরুত্ব কতটুকু এখনও তা সঠিকভাবে নির্ণীত ও স্বীকৃত হয় নি। ধাপে ধাপে রঙের সংমিশ্রণে নবজাত রঙের অনুভূতির যে প্রক্রিয়া আলোচিত হয়েছে, তার সঙ্গে π_1 (নীল প্রক্রিয়া) π_4 (সবুজ প্রক্রিয়া) এবং π_5 (লাল প্রক্রিয়া)-এর সাদৃশ্য খুবই বেশী। কভিয়া কেন্দ্র থেকে পরীক্ষালব্ধ যে রেখাচিত্র পাওয়া যায়, তার সঙ্গে π_4 ও π_5 প্রক্রিয়ার ঘনিষ্ঠতাও খুব বেশী। অতএব কভিয়া কেন্দ্রে দু-ধরণের কোণ্ গ্রাহককোষের অস্তিত্বকে কোনভাবেই অস্বীকার করা চলে না।

এই মুহূর্তে আরও একটা বিষয় নিয়ে খানিকটা আলোচনা করা যেতে পারে। বর্ণালীরঙ গ্রাহক



5নং চিত্র

কোষে যে উত্তেজনার সৃষ্টি করে, সব গ্রাহক-কোষে তার পরিমাণ সমান নয়। এই মুখ্য উত্তেজনার অন্তর ফলের মূল্যায়ণ করে পাঠাতে পারে রেটিনায় অবস্থানকারী অন্যান্য স্নায়ুকোষ। এই কোষগুলির অনুভূতির প্রারম্ভিক মাত্রা নিশ্চিত ভাবে গ্রাহককোষ থেকে পৃথক হবে। 5নং ছবিতে এ রকমই একটি সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে। উত্তেজনা সরাসরি C এবং E পথে

এগিয়ে যেতে পারে, আবার একত্রে C+E পথে (উজ্জ্বলতার পরিমাপ হিসাবে) এগোতে পারে। বিকল্প হিসাবে, C−F (নীলাভ সবুজের মাপকাঠি) ও E−C (কমলা-লালের মাপকাঠি) পথে উত্তেজনা পরিবাহিত হতে পারে। রেটিনাতে এই ধরণের স্নায়ুকোষের অস্তিত্ব সম্ভবপর। এরা কোন একপ্রকার গ্রাহককোষের দ্বারা যেমন উত্তেজিত হবে, তেমনি অন্যদের দ্বারা বাধা পাবে।

হেরিং আবার রেটিনায় অবস্থানকারী বিশেষ তিনটি ফটো-রাসায়নিক দ্রব্যের অস্তিত্বের কথা বলেছেন। এই ফটো-রসায়নগুলির বিশ্লেষণ ও পুনর্সংশ্লেষণের উপর রঙের অনুভূতি জড়িত। তার বক্তব্যটা অবশ্য ইয়ং হেম্‌হোজের ত্রিবর্ণ মতবাদেরই সামান্য রূপান্তর। এই ফটো-রসায়ন তিনটির প্রকৃতি এমনই যে, এরা ছয়টি বিভিন্ন বর্ণের অনুভূতি জাগাতে সক্ষম। নীচে এই মতবাদের নমুনা তুলে দেওয়া হলো।

ফটো-রাসায়নিক পদার্থ	রেটিনার কার্যপ্রণালী	অনভূতি
সাদা-কালো	বিশ্লেষণ	সাদা
	পুনর্সংশ্লেষণ	কালো
লাল-সবুজ	বিশ্লেষণ	লাল
	পুনর্সংশ্লেষণ	সবুজ
হলদে-নীল	বিশ্লেষণ	হলদে
	পুনর্সংশ্লেষণ	নীল

এই মতবাদ স্বীকার করলে পরিপূরক বর্ণ তাদের নির্দিষ্ট প্রাথমিক বর্ণের বিরোধী হয়ে পড়ে। তাছাড়া এটি নির্দিষ্ট স্নায়ুশক্তির কথাও স্বীকার করে না, এর মূল বক্তব্য একই স্নায়ুতন্তু ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতিকে মস্তিষ্কে পরিবহন করতে পারে।

উপসংহারে বলা চলে, বর্ণালী-রঙ তাদের নির্দিষ্ট উজ্জ্বলতা ও সম্পৃক্তি নিয়ে রেটিনায় যে উদ্দীপনার সৃষ্টি করে, তার চরম বিচার হয় গুরু-মস্তিষ্কে—বিশেষ করে গুরুমস্তিষ্কের অক্সিপিটাল অংশে। এই অংশটি রঙের অনুভূতির পীঠস্থান। দেখা গেছে এই অংশের ক্ষতিসাধন করলে কোন গ্রাহককোষের কাজকর্ম যেমন ব্যাহত হয়, তেমনি রঙের অনুভূতিও বিনষ্ট হয়। পরিপূরক রঙের বিশ্লেষণও এই একই অংশে সম্পন্ন হয়।

সৌর ধ্রুবক

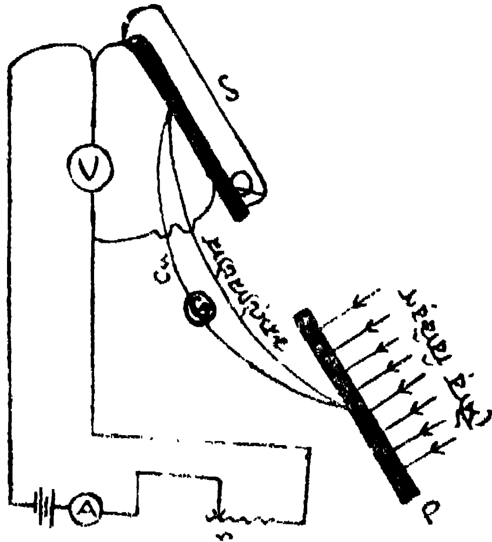
সন্তোষকুমার ঘোড়ই*

মানুষের অভিজ্ঞতার মধ্যে যে সব অভিজ্ঞতা প্রকৃতিতে অপেক্ষাকৃত সার্বজনীন, সেই সব অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ, বিন্যাস ও তাদের আদান-প্রদানের উপায় হলো বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানের নানা বিভাগে আবার নানা প্রকার ধ্রুবকের সন্ধান পাওয়া যায়, যাদের প্রাধান্য ও গুরুত্ব সমগ্র বিজ্ঞান-জগতে পরিলক্ষিত হয়। সৌর বিজ্ঞানে এমনি একটি ধ্রুবক হলো সৌর ধ্রুবক (Solar Constant।)

সূর্য প্রতিনিয়ত তার চতুর্দিকে শক্তি বিকিরণ করে চলেছে, যার সামান্য মাত্র অংশ ($22{,}00 \times 10^{6}$ ভাগের একভাগ মাত্র) আমাদের পৃথিবীতে এসে পৌঁছায়। আবার সূর্যের শক্তির এই ভগ্নাংশের বেশ কিছু অংশ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের জলকণা, তুষারকণা ও মেঘ থেকে প্রতিফলিত এবং ধূলি-কণা ও বায়ুকণার দ্বারা বিচ্ছুরিত হয়। তাছাড়া

* পদার্থবিদ্যাবিভাগ, মেদিনীপুর কলেজ, মেদিনীপুর।

দিনের নানা ভাগে ও বছরের নানা ঋতুতে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল এই শক্তির শতকরা কুড়ি থেকে চল্লিশ ভাগ শোষণ করে নেয়। তাই পৃথিবীতে বসে সূর্য থেকে আসা প্রকৃত শক্তির মাত্রা নিরূপণ করা দুরূহ হয়ে পড়ে। ফলে খোঁজ করতে হয় একটি ধ্রুবক পরিমাপকের। এই পরিমাপকটি হলো সৌর ধ্রুবক। সূর্য থেকে পৃথিবীর গড় দূরত্বে



অ্যাংষ্ট্রমের পাইরহেলিওমিটার। P ও Q-দুটি একই মাপের ধাতব কালো পাত। P পাতে সৌর বিকিরণ লম্বভাবে পড়ছে। Q পাতটি S পর্দার দ্বারা ঢাকা, যাতে পাতটির উপর কোন সৌর বিকিরণ না পড়তে পারে। (Cu-কনষ্ট্যানট্যান) একটি থার্মোকাপ্ল্। G-গ্যালভানোমিটার, V-ভোল্টামিটার, A-অ্যাম্মিটার, r-পরিবর্তনীয় রোধ, P পাত যতটা শক্তি গ্রহণ করে, তা Q পাতের সঙ্গে তড়িৎ-বর্তনী ব্যবহার করে মাপা হয়।

রাখা একটি একক ক্ষেত্রফলের কালো বস্তু (যা সকল তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বিকিরণ শোষণ করে) এক মিনিটে লম্বভাবে আপতিত যে পরিমাণ সৌর শক্তি গ্রহণ করে, তাকে সৌর ধ্রুবক বলা হয়। এখানে অবশ্য ধরে নেওয়া হচ্ছে যে, বায়ুমণ্ডলে কোন প্রকারে সৌর শক্তি নষ্ট হচ্ছে না কিংবা বলা যায় বায়ুমণ্ডলের উপস্থিতিই নেই। সৌর ধ্রুবক জেনে সূর্যের আলোকমণ্ডলের তাপমাত্রা এবং সৌর বিকিরণের পরিমাণ সম্বন্ধে সহজে ধারণা করা যায়।

সৌর ধ্রুবক নানা উপায়ে নির্ধারণ করা যায়। যে সব যন্ত্র দিয়ে সৌর ধ্রুবক নির্ধারণ করা হয়, সেগুলির নাম পাইরহেলিওমিটার (Pyrheliometer) বা অ্যাক্টিনোমিটার (Actinometer)। একটি কালো বস্তুর উপর সৌর বিকিরণ লম্বভাবে ফেলা হয় এবং নানা উপায়ে তার পরিমাপ করা হয়। কালো বস্তুটি তার একক ক্ষেত্রে এক মিনিটে যে পরিমাণ সৌর শক্তি গ্রহণ করে, সেটাই হয় সৌর ধ্রুবকের মান। এখানে একটি সহজ পাইরহেলিওমিটারের চিত্র দেওয়া হলো। বেশ উঁচু জায়গায়, খুব ভাল আবহাওয়ায় পরীক্ষা করা ভাল। কারণ এর ফলে সৌর শক্তির প্রতিফলন, বিচ্ছুরণ, বিশোষণ প্রভৃতি বেশ কম হয়। পরীক্ষালব্ধ সৌর ধ্রুবকের মানকে অবশ্য বায়ুমণ্ডলের বিচ্ছুরণ, বিশোষণ প্রভৃতির জন্যে সংশোধন করে প্রকৃত সৌর ধ্রুবকের মান গ্রহণ করা হয়। বর্তমানে বায়ুমণ্ডলের একেবারে বাইরে থেকেও সৌর ধ্রুবক নির্ণয় করা যেতে পারে। 1902 সাল থেকে স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউশনে মাপা সৌর ধ্রুবের গড় মান হলো;

1902 সাল থেকে 1912 সাল পর্যন্ত—1·933 ক্যালরি, প্রতি বঃ সে.মিটারে, প্রতি মিনিটে।

এবং 1912 সাল থেকে 1920 সাল পর্যন্ত—1·946 ক্যালরি প্রতি বঃ সে.মিটারে প্রতি মিনিটে।

যদি শক্তির একক ক্যালরিতে না প্রকাশ করে আর্গে প্রকাশ করা হয়, তাহলে সৌর ধ্রুবকের মান দাঁড়ায় $1·36 \times 10^{6}$ আর্গ প্রতি বঃ সে. মিটারে, প্রতি সেকেণ্ডে এবং এথেকেই সূর্য থেকে মোট বিকিরণের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রতি সেকেণ্ডে $3·86 \times 10^{33}$ আর্গ।

আগে মনে করা হতো যে, সূর্য থেকে নির্গত শক্তির পরিমাণ সব সময় সমান ও অর্থাৎ সৌর

শক্তির বৃদ্ধিও নেই, হ্রাসও নেই। সুতরাং সংজ্ঞা অনুযায়ী সৌর ধ্রুবকের মানও নির্দিষ্ট হওয়া উচিত। কিন্তু পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, 1954 সাল থেকে 1959 সাল পর্যন্ত সূর্যের ঔজ্জ্বল্য শতকরা দু-ভাগ বেড়ে গেছে। ইউরেনাস ও নেপচুন গ্রহের দ্বারা প্রতিফলিত সূর্যরশ্মির বর্ণালীর নীল অংশের সঙ্গে কাছাকাছি ষোলটি নক্ষত্রের প্রত্যক্ষ আলোর তুলনা করে এই ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধির পরিমাণ পাওয়া গেছে। তাই বলা যেতে পারে যে, সৌর ধ্রুবকের মানেরও পরিবর্তন ঘটেছে। তাছাড়াও দেখা যায় যে, সৌরকলঙ্ক বৃদ্ধি বা হ্রাসের সঙ্গে সৌর ধ্রুবকের মানও পরিবর্তিত হয়। সূর্যে কলঙ্ক দেখা দিলে সূর্য থেকে বিকিরণের পরিমাণ বেড়ে যায়। বিজ্ঞানী অ্যাংষ্ট্রম (Ångström) সৌর ধ্রুবকের সঙ্গে সৌরকলঙ্কের একটি সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। সম্পর্কটি হলো, $S = 1{\cdot}903 + 0{\cdot}011\sqrt{N} - 0{\cdot}0006N$. S = সৌর ধ্রুবকের মান, N = একটি গুণাঙ্ক, যা সৌরকলঙ্কের সংখ্যা ও পরিমাপের গুণ বা প্রকৃতি প্রকাশ করে।

সূর্যে শক্তির পরিমাণ অসাধারণ। যদি সমগ্র সূর্যকে চল্লিশ ফুট গভীরতাবিশিষ্ট বরফের দ্বারা আবৃত করা যায়, তবে তা সূর্যের তাপে এক মিনিটেই সম্পূর্ণ গলে জল হয়ে যাবে। কিংবা যদি দু-মাইল ব্যাস নিয়ে পৃথিবী থেকে সূর্য পর্যন্ত (93,000,000 মাইল) কোন বরফের সেতু নির্মাণ করা যায় এবং কোন উপায়ে যদি সমগ্র সৌর শক্তি তার উপর ফেলা যায়, তাহলে এক সেকেণ্ডের মধ্যেই সমগ্র বরফ সেতু গলে যাবে এবং আট সেকেণ্ডের মধ্যে সমস্ত বরফগলা জল বাষ্পে পরিণত হবে। এই উদাহরণ দুটি সৌর শক্তির প্রচণ্ডতার প্রমাণ দেয়।

এখন দেখা যাক যদি সৌর ধ্রুবকের মান পরিবর্তিত হয় অর্থাৎ সৌর বিকিরণের মাত্রা বৃদ্ধি বা হ্রাস পায়, তাহলে পৃথিবীর আবহমণ্ডলের কি প্রকার পরিবর্তন ঘটে। যদি সৌর ধ্রুবকের মান বাড়ে অর্থাৎ সূর্যে বিকিরণের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, তাহলে এই বিকিরণ বৃদ্ধির দরুণ পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে। সেই সঙ্গে পৃথিবীতে বাষ্পীভবন বেশী হবে, আকাশে আরও বেশী মেঘ জমা হবে, সমতলে বৃষ্টিপাত ও পর্বতগাত্রে তুষার-পাত বৃদ্ধি পাবে। অধিক তুষার জমা হবার ফলে পর্বতগাত্র থেকে তুষার-ধ্বস নামবে এবং তা সমতলের দিকে হিমবাহ বা তুষার-নদীর আকারে নামতে থাকবে। এমনি করে পৃথিবীর স্থলভাগের প্রায় এক চতুর্থাংশ বরফাচ্ছাদিত হয়ে যাবে। চারদিকে হিমশীতলতা বিরাজ করবে। আরম্ভ হবে তুষার যুগ (Ice age), যাকে ভূতত্ত্ববিদেরা Pleistocene Epoch বলেন। তুষার যুগে পৃথিবীর স্থলভাগে, বিশেষ করে মেরুপ্রদেশে বেশী বরফ জমা হবার ফলে সমুদ্রে জলের পরিমাণ কমে যাবে এবং সমুদ্র উপকূল থেকে দূরে সরে যাবে। কিন্তু যদি সূর্যের বিকিরণমাত্রা ক্রমশঃ আরও বাড়তে থাকে তখন পৃথিবী আরও বেশী উত্তপ্ত হবে। ফলে সমস্ত বরফ গলতে সুরু করবে এবং চারদিকের উষ্ণতা বৃদ্ধি পাবে, তুষার যুগের অবসান হবে—সুরু হবে আন্তঃতুষার যুগ (Inter-Glacial Period)। সৌর বিকিরণের চরম অবস্থায় অর্থাৎ আন্তঃতুষার যুগের শেষের দিকে সমগ্র পৃথিবীতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে, যাকে বলা হয় বর্ষণমুখর কাল বা Pluvial period। সমুদ্র ও হ্রদে জলস্ফীতি দেখা দেবে, যার ফলে উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলি জলপ্লাবিত হয়ে যাবে।

সৌর বিকিরণ চরম অবস্থায় পৌঁছুবার পর আবার কমতে সুরু করবে, ফলে পৃথিবীতে আবার বরফ জমতে আরম্ভ করবে, তুষার নদী বইতে সুরু করবে এবং সৃষ্টি হবে দ্বিতীয় তুষার যুগের। সৌর বিকিরণ কমতে কমতে এবার অবম অবস্থায় পৌঁছায়। পৃথিবী এই অবস্থায় বেশ শীতল, সুতরাং বাষ্পীভবন প্রায়ই হবে না—ফলে তুষারপাত যৎসামান্য ঘটবে। তুষারপাত না হবার ফলে ধীরে

ধীরে তুষারনদী বা হিমবাহের মৃত্যু ঘটবে। আবার দেখা দেবে আন্তঃতুষার যুগ। তাহলে দেখা গেল যে, সৌর বিকিরণের একটি সম্পূর্ণ চক্রে পৃথিবীতে দুটি তুষার যুগ ও দুটি আন্তঃতুষার যুগের সৃষ্টি হবে। ডক্টর সিম্পশন এই তত্ত্ব প্রকাশ করেন। অবশ্য অতীতে সৌর ধ্রুবকের মানের বেশ পরিবর্তন হয়েছিল কিনা, সে সম্বন্ধে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সন্দেহ প্রকাশ করেন। বিজ্ঞানীদের মতে, অতীতে বা বর্তমানে সৌর বিকিরণের পরিমাণ খুব বেশী বৃদ্ধি বা হ্রাস পায় নি। এই প্রসঙ্গে বলা যায়—বর্তমানকালে Dr. Ewing এবং Dr. A. T. Wilson তুষার যুগ সৃষ্টির কারণ সম্বন্ধে আলাদা আলাদা তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন, যা অনেক বিজ্ঞানী মেনে নিয়েছেন। তবে তাঁদের উভয়ের মতে, বর্তমানে আমরা আন্তঃতুষার যুগে বাস করছি। সামনে তুষার যুগ আসছে।

তবে বিজ্ঞানী Hoyle ও Littleton দেখিয়েছেন যে, সূর্যের পরিক্রমার পথে যদি কোনদিন একটা বিস্তৃত মহাজাগতিক কণাপুঞ্জ পড়ে, তাহলে কণাগুলি সূর্যের অভ্যন্তরে আছড়ে পড়বে, ফলে কণাগুলির গতিশক্তি তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে সমগ্র সূর্যের বিকিরণমাত্রা বাড়িয়ে দেবে। এরূপ বিস্তৃত মহাজাগতিক কণাপুঞ্জের কেন্দ্রস্থলের ঘনত্ব বেশী, সুতরাং স্বভাবতঃই প্রথমে সৌর বিকিরণের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে পেতে একবার চরম অবস্থায় আসবে এবং তারপর কমতে সুরু করবে। অবশ্য এরূপ একটি মহাজাগতিক কণাপুঞ্জ পার হতে সময় লাগবে প্রায় এক লক্ষ বছর। এভাবে যদি কোন দিন সৌর বিকিরণের মাত্রা বা সৌর ধ্রুবকের মানের যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটে, তাহলে ভবিষ্যতে সিম্পসনের তত্ত্ব অনুযায়ী পৃথিবীতে তুষার যুগও নামতে পারে।

বিজ্ঞান-সংবাদ

রকেট-টর্চ

একটি দ্রুত ধাবমান মোটর গাড়ী রাস্তার পাশে ধাক্কা খেয়ে একেবারে উল্টে গেল এবং গাড়ীটির দরজা এমনভাবে আটকে গেল যে, আরোহীদের আর কিছুতেই বের করে আনা সম্ভব হলো না। দরজা ভেঙ্গে বা কেটে তাদের যে বের করে আনা হবে, এমন কোন যন্ত্রপাতিও তখন কারো সঙ্গে ছিল না। এমন সময়ে একটি যুবক একটি রকেট-টর্চ হাতে নিয়ে দৌড়ে এলো। ঐ অদ্ভুত ধরণের টর্চের রিং টানামাত্র সেটি জ্বলে উঠলো। তারপর ঐ ভাঙ্গা গাড়ীর যে অংশ কেটে আরোহীদের বের করে আনতে হবে, সেই অংশের উপর আলো ফেলে সেই অংশটি অতি দ্রুত কেটে নিয়ে আরোহীদের বের করে আনা হলো। আরোহীরা দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে গেলেন।

এটি ছিল একটি সাজানো ঘটনা। ঐ অভিনব টর্চটির কার্যকারিতা পরীক্ষা করে দেখবার জন্যেই ঐ দুর্ঘটনা ঘটানো হয়েছিল। গাড়ীটির গতি ও চলা নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছিল একটি কেন্দ্র বা রিমোট কন্ট্রোল সেণ্টার থেকে, আর যাত্রীরা ছিল সাজানো পুতুল।

এই রকেট-টর্চটির দৈর্ঘ্য 17.5 ইঞ্চি, ব্যাস 2.5 ইঞ্চি এবং ওজন 6.75 পাউণ্ড। অফুরন্ত এর প্রাণশক্তি এতে ব্যাটারি বদ্‌লাবার বা রিচার্জ করবার কোন প্রশ্ন নেই। এর তীব্র রশ্মিতে প্রায় সব ধাতুই গলে যায়। ক্যালিফোর্ণিয়ার স্যানফ্রানসিসকোস্থিত ইউনাইটেড এয়ারক্র্যাফ্‌ট

কর্পোরেশনের একটি শাখা ইউনাইটেড টেক্নোলোজী সেন্টার কর্তৃক এই অভিনব যন্ত্রটি উদ্ভাবিত হয়েছে। রকেটকে এতকাল কোন বস্তুকে সামনের দিকে চালিয়ে নেবার জন্যই ব্যবহার করা হয়েছে। রকেটের এই ধরণের ব্যবহার এই প্রথম।

অগ্নিকাণ্ড, বিস্ফোরণ এবং অন্যান্য নানা দুর্ঘটনার সময়ে বিপন্ন ব্যক্তিদের যথাকালে উদ্ধার করতে না পারায় প্রতি বছর বহু লোকের মৃত্যু ঘটে। দুর্ঘটনার পর যথাসময়ে উদ্ধার করতে না পারায় রক্তক্ষরণও বহু ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ হয়ে থাকে। এই অভিনব যন্ত্রটির সাহায্যে তাদের অতি শীঘ্রই উদ্ধার করা সম্ভব হবে। ট্রেনে, বিমানে, মোটর গাড়ীতে পুলিশের গাড়ীতে, অ্যাম্বুল্যান্স গাড়ীতে এই যন্ত্রটি রাখা যেতে পারে। ভবিষ্যতে কৃষি, শিল্প ও বনবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এই যন্ত্র প্রয়োগের বিপুল সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে।

ভারবহনের ক্ষমতা নির্ধারক বৃহত্তম যন্ত্র

পাহাড়ী পথের পুল তৈরি করবার লোহার তারের, সমতল ভূমিতে বড় বড় নদীর উপর পুল নির্মাণের সাজসরঞ্জামের এবং বাড়ী তৈরির কড়িবরগার ভার বহনের ক্ষমতা পরীক্ষা করবার একটি অভিনব যন্ত্র সম্প্রতি আমেরিকায় উদ্ভাবিত হয়েছে। এটি পৃথিবীর বৃহত্তম ভারবহন পরীক্ষণ যন্ত্র। এই যন্ত্রটির 1 কোটি 20 লক্ষ পাউণ্ডের চাপশক্তির সাহায্যে কড়িবরগা প্রভৃতির বহন ক্ষমতা এবং 60 লক্ষ পাউণ্ড শক্তির সাহায্যে কোন তারের টান সইবার ক্ষমতা পরীক্ষা করা যায়। কোন বৃহৎ ভবনের অংশ বিশেষের ভার বহনের ক্ষমতাও এই যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখা সম্ভব।

এই যন্ত্রটির উচ্চতা 101 ফুট। ওয়াশিংটনের মেরীল্যাণ্ডের গেথারবার্গস্থিত ন্যাশন্যাল ব্যুরো অব স্ট্যাণ্ডার্ডসের একতলায় এজন্য নির্মিত একটি বিশেষ ভবনে—এই যন্ত্রটি স্থাপন করা হয়েছে।

রোলিং মিলের সাজসরঞ্জাম প্রভৃতি ভারী বস্তু ওজন করা, তাদের মান ও পরিমাণ নির্ণয় এবং রকেট ইঞ্জিনের চাপের পরিমাণ নির্ণয়ও এই যন্ত্রের সাহায্যে করা যাবে। যেমন স্যাটার্ন রকেট 5-এর সাহায্যেই মার্কিন মহাকাশচারীরা চাঁদে যাচ্ছেন। পৃথিবী থেকে চন্দ্রাভিমুখে যাত্রার সময়ে এই রকেট 75 লক্ষ পাউণ্ডের চাপ সৃষ্টি করে থাকে।

সমুদ্রগর্ভে খননকার্যের জন্যে বিরাট লম্বা লম্বা লৌহদণ্ডের প্রয়োজন হয়ে থাকে। ঐ সকল দণ্ড বাঁকাতে হয়। কি পরিমাণ চাপে ঐ সকল দণ্ড বাঁকানো যেতে পারে, তাও ঐ যন্ত্রের সাহায্যে জানা যেতে পারে। তাছাড়া জলে কোন জাহাজ ও আকাশে কোন রকমের বিমান কি পরিমাণ চাপ সইতে পারে, তাও ঐ যন্ত্রের সাহায্যে নির্ণীত হতে পারে।

এই যন্ত্রটির নামকরণ করা হয়েছে জেন্টেল জায়েণ্ট বা নম্রস্বভাবের একটি দৈত্য। দেখতে যেমন বিরাট, শক্তিও এর প্রচণ্ড। একটি ডিমের চাপ সইবার ক্ষমতা যে কতটুকু, তাও ঐ যন্ত্রের সাহায্যে জানা যেতে পারে।

পেনসিলভ্যানিয়ার গ্রোভসিটির উইডম্যান মেশিন কোম্পানী এই যন্ত্রের পরিকল্পনা করেন। আর তৈরি করেন, ওহায়োর সালেমস্থিত ই ডাব্লিউ ব্লিশ কোম্পানী। ওহায়োর ক্লীভল্যাণ্ডস্থিত ম্যাকডোয়েল ওয়েলম্যান কোম্পানী যন্ত্রাংশ একত্রিত করে এর পূর্ণরূপ দিয়েছেন।

শব্দ, তাপ, শৈত্যনিরোধক জানালা

পেনসিলভ্যানিয়ার পিটস্‌বার্গস্থিত পি পি জি ইণ্ডাস্ট্রিজের গ্লাস রিসার্চ লেবরেটরী নূতন এক ধরণের জানালা তৈরি করেছেন। এই জানালা শব্দ, তাপ, আর্দ্রতা, শৈত্য ও বায়ু নিরোধক।

কাচের এই জানালাটির একটি পাট এক ইঞ্চির আট ভাগের তিন ভাগ, আর একটি পাট এক ইঞ্চির চার ভাগের এক ভাগ পুরু। ঐ দুটি পাটের মাঝখানে দু-ইঞ্চি ফাঁক রাখা হয় এবং বাইরের আলো ও তাপ ঘরের ভিতরে প্রতিফলনের জন্যে ঐ শূন্যস্থানে একটি পাতলা ফিল্ম এঁটে দেওয়া হয়। এই ফিল্মের নাম 'সোলারব্যান 500'। ফিল্মের বেধ কমিয়ে বা বাড়িয়ে প্রয়োজনানুযায়ী আলো ও তাপের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। বর্তমানে দু-রকমের জানালা তৈরি করা হচ্ছে। এক প্রকার জানালা দিয়ে বাইরের আলোর শতকরা 42 ভাগ এবং আর এক প্রকার জানালা দিয়ে শতকরা 36 ভাগ আলো ভিতরে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। ফলে ঘর ঠাণ্ডা থাকে, ঘরের ভিতরে যারা থাকেন, তারা কড়া রৌদ্র ও তাপে পীড়িত হন না। ঐ ধরণের জানালা যে কোন আকারের পাওয়া যায়।

টেলিভিসনের মাধ্যমে বৃহৎ এলাকায় পাহারার ব্যবস্থা

রাস্তাঘাটে, বৃহৎ বিপণন কেন্দ্রে, বিরাট এলাকায় টেলিভিসনের মাধ্যমে পাহারার ব্যবস্থা করা যায় কিনা, সে বিষয়ে আমেরিকায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। মিশিগ্যানের ট্রেনটনস্থিত মোটর উৎপাদন সংস্থা ক্রাইজলার কর্পোরেশনের 3000 মোটর গাড়ী রাখবার স্থানে এই বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হচ্ছে।

এই ব্যবস্থায় একজন পাহারাদার টেলিভিসন পর্দার সামনে বসে থাকেন। এটি ক্লোজড্ সার্কিট টেলিভিসন ব্যবস্থা। ঐ ব্যবস্থায় বৈদ্যুতিক তারযোগে সঙ্কেত বাহিত হয় এবং তাতে মাত্র সুনির্দিষ্ট কয়েক স্থানে সেই সকল সঙ্কেত ও সংবাদ পরিবহনের ব্যবস্থা থাকে। ঐ ব্যবস্থার মাধ্যমে ঐ পাহারাদার দিনে এক মাইলের তিন-চতুর্থাংশ স্থানের এবং রাত্রিতে প্রায় আধ মাইল এলাকার উপর নজর রাখতে পারেন। ঐ ব্যবস্থায় বহু দূর থেকে টেলিভিসন ক্যামেরাটির সাহায্যে লম্বালম্বি বা আড়াআড়িভাবে ছবি তোলা যাবে এবং এক মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে ক্যামেরাটিকে অর্ধ-বৃত্তাকারে ঘোরানো যাবে। পুরা এলাকার বা চারদিকের ছবি যাতে তোলা যায়, সেই ভাবেও এই ক্যামেরাটিকে স্থাপন করা যাবে। তাছাড়া একটি সুইচ্ টিপে একটি ছবিকে দশ গুণ বড় করবার এবং আর একটি টিপে টেপ রেকর্ড করবার ব্যবস্থাও সেখানে থাকবে।

আবর্জনাকে নানা উপকরণে রূপান্তরিত করবার উদ্যোগ

ফেলে দেওয়া নানা উপকরণ ও ময়লাকে পুনরায় কি ভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে, এবং পরিবেশকে মালিন্যমুক্ত রাখা যেতে পারে সে বিষয়ে আমেরিকায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। নিউইয়র্ক শহরের ময়লা অপসারণের কয়েকটি প্রতিষ্ঠান আছে। মিঃ চার্লস ম্যাকালুসো ঐ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা। তিনি ময়লা নিষ্কাশন এবং ময়লাকে অন্য জিনিষে রূপান্তরিত করবার একটি অভিনব-যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন। পুরনো বড় বড় মোটর গাড়ী ঐ যন্ত্রে ফেলবার পর দেখা যায় গাড়ীর কাচসমূহ আলাদা হয়ে বেরিয়ে এসেছে। তারপর ধাতব পদার্থ ও কাচ গলিয়ে নূতন নূতন পদার্থ তৈরি করা হচ্ছে। ছোট ছোট কৌটা প্রভৃতি সবই এর মধ্যে ফেলা হয়। যে সব উপাদান ছাইয়ে পরিণত হয়, সেই সব ছাই বাড়ী বা রাস্তা তৈরির মালমশলা হিসাবে কাজে ব্যবহৃত হয়। আর কোন কোন আবর্জনাকে জীবাণুমুক্ত করবার পর ইন্ধন বা জমিতে সার হিসাবে প্রয়োগ করা হয়। আবর্জনা পুড়িয়ে কারখানা চালাবার জন্যে বাষ্পশক্তি উৎপাদনের পরীক্ষা করা হচ্ছে।

কৃত্রিম রেশম

তুহিনেন্দু সিন্‌হা*

রেশম একটি অত্যন্ত মূল্যবান পদার্থ। রেশমের তৈরী জামাকাপড় অনেকেরই প্রিয় এবং আভিজাত্যের নিদর্শনও বটে। কিন্তু এখনকার দিনে বাজারে যে সব রেশমের জামা-কাপড় দেখা যায়, তার মধ্যে অধিকাংশ মোটেই আসল রেশমে তৈরি নয়। আসল রেশম প্রাকৃতিক (Natural fibre) তন্তু আর কৃত্রিম রেশম হলো পুনর্গঠিত তন্তু (Regenerated fibre)। পুনর্গঠিত তন্তু বলা হয় সেই সব তন্তুকে, যার জটিল অণুকে কৃত্রিমভাবে (Synthetically) প্রস্তুত করা সম্ভব নয়। সেই জন্যে প্রাকৃতিক পদার্থ থেকে সেই জটিল অণু সংগ্রহ করে পুনরায় তন্তুর আকারে রূপদান করা হয়।

বস্তুতঃ আসল রেশম ও কৃত্রিম রেশমের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। আবার রাসায়নিক গঠন-তত্ত্বের দিক থেকে এই কৃত্রিম রেশমের সঙ্গে গুটিপোকার আসল রেশমের কোনও মিল নেই। আসল রেশম হলো গুটিপোকার দেহনিঃসৃত একরকম প্রোটিন জাতীয় পদার্থ, যার গঠনে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সঙ্গে নাইট্রোজেন পরমাণু যুক্ত থাকে। কিন্তু কৃত্রিম রেশম তৈরি হয় সেলুলোজ অণুর সাহায্যে, যার গঠনে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন থাকে, কিন্তু নাইট্রোজেন থাকে না। সেলুলোজ সম্বন্ধে একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া দরকার। সেলুলোজ হলো একটি জটিল জৈব রাসায়নিক যৌগ, প্রকৃতির রসায়নে যা উৎপন্ন হয় উদ্ভিদের দেহে। উদ্ভিজ্জ পদার্থমাত্রেই প্রধানতঃ সেলুলোজের দ্বারা গঠিত। কাঠের তন্তু, নানা রকম উদ্ভিজ্জের আঁশ, তুলা প্রভৃতির মুখ্য উপাদান হলো সেলুলোজ।

রাসায়নিক গঠনতত্ত্বের দিক থেকে কৃত্রিম রেশমকে বলা হয় পুনর্গঠিত সেলুলোজ তন্তু (Regenerated Cellulosic fibre)। আর আসল রেশমকে বলা হয় প্রোটিন তন্তু (Protein fibre)।

রাসায়নিক পদ্ধতিতে উৎপাদিত এই কৃত্রিম রেশম বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে পরিচিত। কোথাও এর নাম গ্লান্‌স্ (Glanse), কোথাও লাস্ট্রন (Lustron), আবার কোথাও বলে কেমিকেল সিল্ক (Chemical silk)। কৃত্রিম রেশম শিল্পে আমেরিকাই সবচেয়ে অগ্রসর, আর সে দেশের কৃত্রিম রেশম রেয়ন নামে পরিচিত। আমাদের দেশে আমেরিকার রেয়ন সিল্কের প্রচলনই বেশী।

সাধারণতঃ আমরা বাজারে যে রেয়নের জামা-কাপড় দেখতে পাই, তাদের উৎপাদন-পদ্ধতির ভিত্তিতে তিন ভাগে ভাগ করা হয়; যথা—(1) ভিস্‌কস রেয়ন (Viscose rayon), (2) কিউপ্রামোনিয়াম (Cup-ammonium rayon), (3) অ্যাসিটেট রেয়ন (Acetate rayon)। কিন্তু তাদের মধ্যে রাসায়নিক ধর্মের কোনও পার্থক্য নাই। এই তিন প্রকার রেয়নের মধ্যে ভিস্‌কস রেয়নই বাজারের রেয়ন, তথা কৃত্রিম রেশম। কাজেই এস্থলে ভিস্‌কস রেয়ন সম্বন্ধে আলোচনা করবো।

ভিস্‌কস রেয়ন

বৃটিশ বিজ্ঞানী E. J. Bevan এবং C. E.

---

* কলেজ অব টেক্সটাইল টেকনোলজী, শ্রীরামপুর

Cross যুগ্মভাবে এই পদ্ধতির উদ্ভাবক। ভিস্‌কস রেয়ন প্রস্তুতি এখানে আটটি বিভিন্ন ধাপে বর্ণনা করা হবে।

কাঁচামাল থেকে সেলুলোজ নিষ্কাশন ও ব্লিচিং

ভিসকস রেয়ন তৈরির জন্তে কাঁচামাল হিসাবে সাধারণতঃ সাধারণ কাঠ ও সময়ে সময়ে কোনও সূতা মিলের পরিত্যক্ত তুলা (Cotton linters) ব্যবহার করা হয়। প্রথমে কাঠ খণ্ড খণ্ড করে কেটে ক্যালসিয়াম বাইসালফাইটের মধ্যে ডুবানো হয় এবং পরে বাষ্পের সাহায্যে অতিরিক্ত বায়ুর চাপে চৌদ্দ ঘণ্টা পর্যন্ত সেদ্ধ করা হয়। এর ফলে সেলুলোজের কোন ক্ষতি হয় না, কিন্তু কাঠের মধ্যে অবস্থিত অন্যান্ত বস্তুগুলি বিশ্লিষ্ট হয়ে যায়। এবার ঐ পাত্রের মধ্যে অতিরিক্ত জল দিয়ে লঘু করে পরিস্রুত করলে কাঠের মণ্ড জলের উপর ভেসে ওঠে। ঐ কাঠের মণ্ডকে সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট দিয়ে ব্লিচিং করা হয় এবং পরে তাকে চাদরের আকার দেওয়া হয়। এই চাদরকে বলা হয় কাঠের মণ্ড, এর মধ্যে 90-94% সেলুলোজ থাকে।

স্টিপিং এবং প্রেসিং

এবার ঐ চাদরগুলিকে খাড়াভাবে একটি বিশেষ ধরণের পাত্রের মধ্যে রেখে তার মধ্যে 17.5% সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের দ্রবণ ঢালা হয়। চাদরগুলিকে ঐ দ্রবণের মধ্যে 1-4 ঘণ্টা পর্যন্ত রাখা হয়, ফলে সরু চাদরগুলি ফুলে ওঠে এবং কাঠের মধ্যে অবস্থিত হেমিসেলুলোজ দ্রবীভূত হয়ে যায়। এর জন্তে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবণের রং বাদামী হয়। এই সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সঙ্গে সেলুলোজ বিক্রিয়া করে এবং সোডা সেলুলোজ তৈরী হয়।

শ্রেডিং (Shredding)

এই পদ্ধতিতে সোডা-সেলুলোজের চাদরগুলিকে দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে একটি বিশেষ ধরণের মেশিনে (Shredding machine) সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম চূর্ণে পরিণত করা হয়।

এজিং

এই এজিং একটি বিশেষ ধরণের যান্ত্রিক ব্যবস্থা, যার মধ্যে চাপ ও তাপমাত্রা পরিবর্তনের ব্যবস্থা আছে। এখন 22°C তাপমাত্রায় 2-3 দিন ঐ পাত্রের মধ্যে সোডা সেলুলোজের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম চূর্ণগুলি রেখে দেওয়া হয়। এর ফলে সেলুলোজের অণুর লম্বা শৃঙ্খল ভেঙ্গে ছোট ছোট সেলুলোজ অণু শৃঙ্খল (Short chain molecule) হয়ে যায়।

মন্থন বা জেন্থেশন (Churning Or Xanthation)

এবার সোডা সেলুলোজের চূর্ণগুলিকে কার্বন ডাই সালফাইডের সঙ্গে মিশিয়ে 20-25°C তাপমাত্রায় 3-4 ঘণ্টা ধরে একটি মন্থন পাত্রের মধ্যে রেখে পাত্রটিকে আস্তে আস্তে ঘুরানো হয়। এর ফলে কার্বন ডাই সালফাইডের মধ্যে সোডা সেলুলোজ দ্রবীভূত হয়ে সোডিয়াম সেলুলোজ জেন্থেট তৈরি হয়। সাধারণতঃ সমগ্র সোডা সেলুলোজের ওজনের 10% কার্বন ডাই সালফাইড মেশানো হয়।

মিশ্রণ

এই পদ্ধতিতে সোডিয়াম সেলুলোজ জেন্থেটকে 6.5% সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের মধ্যে 4-5 ঘণ্টা রেখে দেওয়া হয়। এর ফলে সোডিয়াম সেলুলোজ জেন্থেট দ্রবীভূত হয়ে যায় এবং পরিষ্কার করে ঘন বাদামী বর্ণের তরল পদার্থ তৈরি করা হয়। এই বাদামী বর্ণের তরল পদার্থকেই ভিস্‌কস বলে। এই ভিস্‌কসের মধ্যে প্রায় 7.5% সেলুলোজ বর্তমান থাকে।

রাইপেনিং

এই পদ্ধতিতে ভিস্‌কস দ্রবণকে 10-18°C তাপমাত্রায় 4-5 দিন রেখে দেওয়া হয়। এই সময়ের মধ্যে ভেঙে-যাওয়া ছোট ছোট শৃঙ্খল অণুগুলি আবার জোড়া লাগতে আরম্ভ করে এবং শেষে আবার আগের অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তন্তুর স্থায়িত্ব অনেকটা এই পদ্ধতির গুরুত্বের উপর নির্ভরশীল। এখন দ্রবণটি ভিস্‌কস রেয়ন তন্তু তৈরির উপযুক্ত।

স্পিনিং

এবার ঐ ভিস্‌কস দ্রবণকে অসংখ্য সূক্ষ্ম ছিদ্র-বিশিষ্ট পাত্রের মধ্যে নিয়ে পাম্পের সাহায্যে চাপ দিয়ে দ্রবণের সূক্ষ্ম ধারাপ্রবাহ চারদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয় বাইরের একটা বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের জলীয় দ্রবণের মধ্যে। এই দ্রবণে থাকে সালফিউরিক অ্যাসিড, সোডিয়াম সালফেট, জিঙ্ক সালফেট ও গ্লুকোজ। এই সব রাসায়নিক পদার্থের বিক্রিয়ায় ভিস্‌কস সূত্রগুলি জমে আবার সেলুলোজ তন্তুর আকার ধারণ করে।

এই পুনর্গঠিত সেলুলোজের চেহারা হয় অবিকল আসল রেশমের মত চক্‌চকে উজ্জ্বল। আবার কোনও কোনও সময়ে ভিস্‌কস রেয়ন আসল রেশমের থেকেও চক্‌চকে হয়। ভিস্‌কস রেয়নের এই অতিরিক্ত চাকচিক্য ও চমক কমিয়ে আসল রেশমের অনুরূপ করবার রাসায়নিক উপায়ও উদ্ভাবিত হয়েছে এবং এরূপ অপেক্ষাকৃত অনুজ্জ্বল ভিস্‌কস রেয়ন যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এরূপ চাক্‌চিক্য ও চমক কমাবার জন্যে মিশ্রণের সময় সামান্য পরিমাণ টাইটেনিয়াম ডাই-অক্সাইড মিশিয়ে দেওয়া হয়।

কৃত্রিম রেশমের সঙ্গে আসল রেশমের গুণগত দিক থেকে তুলনা করা চলে না। আসল রেশমের তুলনায় এর স্থায়িত্ব অনেক কম। আসল রেশম ঘন ক্ষারের মধ্যে দ্রবীভূত হয় আবার অ্যাসিডের মধ্যে এর স্থায়িত্ব অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী। তাহলেও এই যুগে কৃত্রিম রেশমের বিরাট শিল্প বিভিন্ন দেশে গড়ে উঠেছে, আর লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড এরূপ রাসায়নিক রেশম সূত্রের সুদৃশ্য বস্ত্রাদি উৎপাদিত হয়ে আধুনিক মানুষের রুচি ও সৌখিনতা বাড়িয়েছে। ঔজ্জ্বল্য ও চাক্‌চিক্যে আসল রেশমের মত, অথচ দামে সস্তা এসব নকল সিল্কের কেবল সুদৃশ্য শাড়িই নয়, এ দিয়ে তৈরী বিভিন্ন পোষাক-পরিচ্ছদ, মোজা, রুমাল প্রভৃতি এই যুগে বিশেষ জনপ্রিয়। আবার তুলা বা পশমের আঁশের সঙ্গে এই কৃত্রিম রেশম সূত্র মিশিয়ে ও পাকিয়ে এক রকম মিশ্র সুতা তৈরী হয়, যা দিয়ে নানা রকম কাপড় বোনা হয়। এই কাপড় অপেক্ষাকৃত সুদৃশ্য ও ব্যবহারোপযোগী হয়ে থাকে।

অ্যাসবেস্টস

অমলকান্তি ঘোষ

অ্যাসবেস্টস আঁশযুক্ত একপ্রকার খনিজ পদার্থ। এই আঁশগুলি আলাদা করে পাক দিয়ে সুতা তৈরি করে বোনবার কাজে ব্যবহার করা যায়। অ্যাসবেস্টস তাপসহ ও অদাহ্য পদার্থ।

অ্যাসবেস্টস ম্যাগনেসিয়াম সিলিকেট বলে পরিচিত। দুই জাতীয় অ্যাসবেস্টস আছে; যথা—

1. ক্রিজোটাইল বা সারপেন্টাইন অ্যাসবেস্টস। এটি একপ্রকার জলযুক্ত ম্যাগ্‌নেসিয়াম সিলিকেট।

2. অ্যাম্ফিবোল অ্যাসবেস্টস। এটি জলযুক্ত লৌহ ক্যালসিয়াম ম্যাগ্‌নেসিয়াম সিলিকেট। অ্যাম্ফিবোলের মধ্যে পড়ে অ্যান্‌থোফাইলাইট, অ্যামোসাইট, ক্রোসিডোলাইট, ট্রিমোলাইট ও অ্যাক্টিনোলাইট।

ক্রিজোটাইল অ্যাসবেস্টস পাওয়া যায় সারপেন্টিটাইট নামক আগ্নেয় শিলায়। এই অ্যাসবেস্টস শিলার মধ্যে শিরার ন্যায় সঞ্চিত থাকে। শিরার ভিতর অ্যাসবেস্টসের আঁশগুলি আড়াআড়িভাবে অবস্থিত থাকে। এর আঁশগুলি ছোট, শক্ত এবং বোনবার কাজের উপযোগী। অ্যাম্ফিবোল অ্যাসবেস্টস সিস্ট নামক একপ্রকার পরিবর্তিত শিলার মধ্যে থাকে। এর আঁশগুলি শিরার সমান্তরাল ও দীর্ঘ হলেও ভঙ্গুর হবার ফলে বোনবার কাজের অনুপযোগী।

খনি থেকে অ্যাসবেস্টস চাপড়ার আকারে পাওয়া যায়—দেখতে কতকটা পাটের গোড়ার মত আঁশের গুচ্ছ। রং সাদা, সবুজ বা বাদামী, প্রায় শণ বা রেশমের মত চকচকে। আঁশগুলি সহজে পৃথক করা যায়। আঁশের দৈর্ঘ্য, সূক্ষ্মতা, নমনীয়তা, টান সহ্য করবার ক্ষমতা, তাপ ও বিদ্যুৎ সহনক্ষমতা, অ্যাসিডে অদ্রবণীয়তা ও বয়নকার্যে উপযোগিতার উপর অ্যাসবেস্টসের উৎকর্ষ ও মূল্য নির্ভর করে। উপরিউক্ত গুণগুলি থাকবার ফলে অ্যাসবেস্টস শিল্পে ব্যবহৃত হয়। ক্রিজোটাইল ও অ্যাম্ফিবোল অ্যাসবেস্টসের মধ্যে ক্রিজোটাইল অ্যাসবেস্টসই শ্রেষ্ঠ। পৃথিবীর অ্যাসবেস্টসের 90%ই ক্রিজোটাইল অ্যাসবেস্টস।

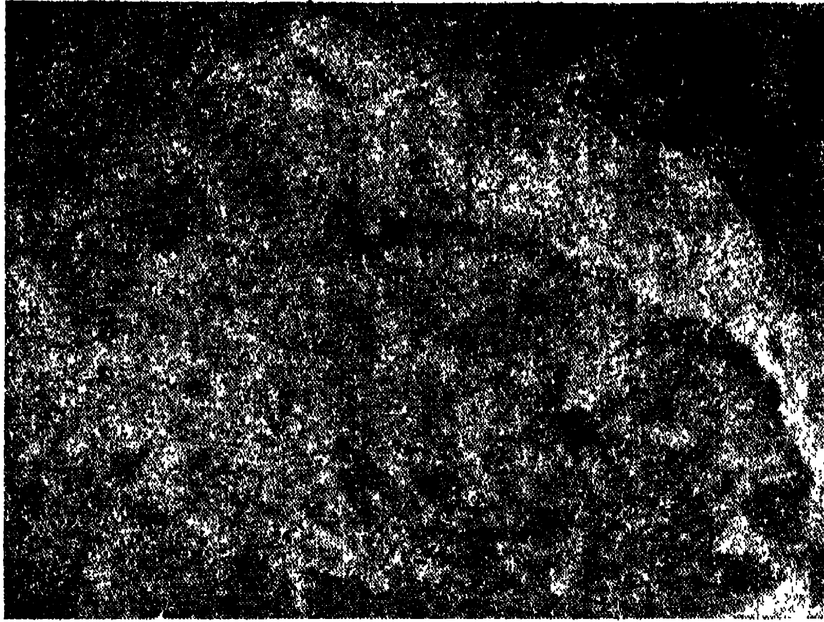
অ্যাসবেস্টসের ব্যবহার মানুষ প্রাচীন কাল থেকেই জানতো এবং নানা কাজে তা ব্যবহার করতো। প্রাচীন চীন ও মিশর দেশের লোকেরা যে অ্যাসবেস্টসের তৈরি কাপড় ও মাদুর ব্যবহার করতো, তার প্রমাণ আছে। রোমানরা অ্যাসবেস্টস দিয়ে শবাচ্ছাদনী ও টেবিলের ঢাকনা তৈরি করত। অভিজাত ব্যক্তি ও রাজাদের মৃতদেহ অ্যাসবেস্টসের তৈরী বস্ত্র জড়িয়ে সমাধিস্থ করা হতো। প্রাচীন রোমে দেবদেবীর পূজায় নিয়োজিত কুমারীরা যে পবিত্র প্রদীপ বহন করতো, তার পল্‌তে অ্যাসবেস্টস দিয়ে তৈরি হতো। অ্যাসবেস্টসের তৈরি পল্‌তে কখনও পুড়ে যায় না, ফলে আগুনের শিখাও অনির্বাণ থাকতো।

পর্যটক মার্কো পোলো ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তাতার সাম্রাজ্যে অ্যাসবেস্টসের সন্ধান পান। তিনি এর সন্ধান পেয়েই চুপ করে বসে থাকেন নি। শিলা থেকে কেমন করে অ্যাসবেস্টস নিষ্কাশন করা যায় এবং তা দিয়ে কেমন করে কাপড় বোনা যায়, সেই কৌশল আয়ত্ত করেন। সাইবেরিয়ার মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করবার সময় তিনি আকরিক অ্যাসবেস্টস আবিষ্কার করেন। তিনি সেগুলি শুকিয়ে খলের মত একটি পাত্রের মধ্যে

গুঁড়া করেন এবং আকরিকের ময়লাগুলি পরিষ্কার করে ফেলেন। তারপর সেই অ্যাসবেস্টস দিয়ে কাপড় বোনবার ব্যবস্থা করেন। মার্কো পোলোর পর বহু বছর পর্যন্ত অ্যাসবেস্টস সম্বন্ধে বেশী কিছু শোনা যায় নি। এর অনেক বছর পর রাশিয়ার উরাল পর্বতশ্রেণীতে অ্যাসবেস্টস পাওয়া যায় এবং সেখানে অ্যাসবেস্টসশিল্পের পত্তন হয়। বর্তমান শতকের অ্যাসবেস্টসশিল্পের গোড়া-পত্তন হয় 1868 সালে, যখন ইটালীতে 200 টন অ্যাসবেস্টস উৎপন্ন হয়। এরপর পৃথিবীর নানা দেশে অ্যাসবেস্টসশিল্প গড়ে উঠতে থাকে এবং বহু লোক এই শিল্পে সংশ্লিষ্ট থেকে জীবিকা অর্জনে ব্যাপৃত হয়।

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ অ্যাসবেস্টস উৎপাদনের স্থান ক্যানাডার অন্তর্গত দক্ষিণ কুইবেক। পৃথিবীর অর্ধেকের বেশী অ্যাসবেস্টস এখানে উৎপন্ন হয়। এরপর সোভিয়েট রাশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা সম্মেলন, দক্ষিণ রোডেসিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, সাইপ্রাস ও ইটালী। ভারতে পাওয়া যায় অন্ধ্র প্রদেশের কাডাপ্পা জেলায়, বিহারের সিংভূম ও উড়িষ্যার সারাইকেলা এবং খাইশোরে।

খনি থেকে আকরিক অ্যাসবেস্টস বের করবার জন্যে বায়ুচালিত ড্রিল, ছেনি-হাতুড়ী এবং বিস্ফোরক পদার্থ ব্যবহার করা হয়। আকরিক অ্যাসবেস্টস খনি থেকে তুলে নিয়ে ভেঙ্গে গুঁড়া করে আঁশগুলি আলাদা করে ফেলা হয়। এর ভিতর যে সব পাথর এবং ভাঙ্গা রকড্রিল থাকে, সেগুলি বের করে দেবার জন্যে সেন্টিফিউগ্যাল সেপারেটর (Centrifugal Separator) ও বৈদ্যুতিক চুম্বক ব্যবহার করা হয়। এইবার এই অ্যাসবেস্টসকে নিম্নোক্ত তিন ভাগে ভাগ করা হয়:



আকরিক ক্রিজোটাইল অ্যাসবেস্টস

1. লম্বা আঁশওয়ালা অ্যাসবেস্টস (3/8" বা তার চেয়ে বড়), যা বোনবার জন্যে কাজে লাগবে।

2. এর চেয়ে ছোট আঁশওয়ালা অ্যাসবেস্টস, যা দিয়ে মিলবোর্ড ইত্যাদি তৈরি করা যায়।

3. একদম শেষে যে গুঁড়া পড়ে থাকে, সেগুলি ব্যবহৃত হয় সিমেন্ট, পেন্ট এবং বয়লার ও পাইপ আচ্ছাদনের জন্যে।

অ্যাসবেস্টসের লম্বা আঁশগুলি পাক দিয়ে এক আঁশযুক্ত কিংবা বহু আঁশযুক্ত সূতা তৈরি করে চাদর, দড়ি ও ফিতা প্রস্তুত হয়। তাপসহ ও অদাহ্য বলে অ্যাসবেস্টসের চাদর দিয়ে তৈরি পোষাক ও দস্তানা পরে অগ্নিনির্বাপক বাহিনীর কর্মী, লোহা ঢালাই বা সেলুলয়েড কারখানার শ্রমিকেরা আগুনের তাপের মধ্যেও নিরাপদে কাজ করতে পারে। চকচকে অ্যাসবেস্টসের আঁশ দিয়ে তাপোজ্জ্বল ম্যান্টেল তৈরি হয়। ব্রেক ও ক্লাচ লাইনিং তৈরি হয় অ্যাসবেস্টসের সঙ্গে সরু পিতলের তার দিয়ে মজবুত করে বুনে। অ্যাসবেস্টসের তৈরি বেল্ট কনভেয়র গরম জিনিষকে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিয়ে যায়। বাষ্পের পাইপের ফ্লান্জে যে প্যাকিং বা গ্যাসকেট ব্যবহার করা হয়, তাতে অ্যাসবেস্টস ও রবার থাকে। অনেক সময় এই জয়েন্টি'কে শক্ত করবার জন্যে পিতলের সরু তারের উপর বোনা অ্যাসবেস্টসের কাপড় ব্যবহার করা হয়। গরম জলের পাইপ কিংবা বয়লারের তাপের বিকিরণে যে তাপশক্তি ক্ষয় হয়, তা রোধ করবার জন্যে অ্যাসবেস্টসের দড়ি দিয়ে পাইপ বা বয়লারের গা মুড়ে দেওয়া হয় এবং তার উপর অ্যাসবেস্টসের চূর্ণ জলের সঙ্গে মিশিয়ে প্রলেপ দেওয়া হয়। ছোট আঁশওয়ালা অ্যাসবেস্টস দিয়ে মিলবোর্ড, অ্যাসবেস্টস কাগজ প্রস্তুত হয়। অ্যাসফ্যাল্ট, বিভিন্ন শ্রেণীর প্লাস্টিক পদার্থ এবং রঙে অ্যাসবেস্টসের গুঁড়া ব্যবহৃত হয়।

অ্যাসবেস্টসের বিদ্যুৎ সহনক্ষমতা থাকায় বৈদ্যুতিক সরু কিংবা মোটা তার, সুইচ-বোর্ড এবং বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিতে অ্যাসবেস্টস বিদ্যুৎ-প্রতিরোধকের কাজ করে। কোন কোন জাতীয় অ্যাসবেস্টস অ্যাসিডের সংস্পর্শে নষ্ট হয় না। এগুলি অ্যাসিড ছাঁকবার কাজে লাগে।

অ্যাসবেস্টসের সবচেয়ে বেশী ব্যবহার হয় অ্যাসবেস্টস-সিমেন্ট শিল্পে। সিমেন্ট ও অন্যান্য জমাট বাঁধবার উপকরণের সঙ্গে ছোট আঁশযুক্ত অ্যাসবেস্টস (শতকরা 15-20) ভাগ মিশিয়ে পাইপ, টালি, শ্লেটের মত সমতল ও ঢেউ তোলা সিট তৈরি হয়। এই সিটগুলি গৃহনির্মাণে গ্যালভানাইজড্ সিটের বদলে খুব চলে। এই সিট বেশী তাতে না, মরচে পড়েও নষ্ট হয় না। ভারতে অ্যাসবেস্টস-সিমেন্ট শিল্প বেশ ভালভাবেই গড়ে উঠেছে।

কেপ্‌লার সম্বন্ধে কয়েকটি চিন্তা ও প্রশ্ন

গগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়*

কেপ্‌লারের চতুর্থ জন্ম-শতবার্ষিকী স্মরণে আহুত সভায় কিছু বলবার সুযোগ পাওয়ার জন্যে বিজ্ঞান পরিষদ ও ভারতীয় সায়েন্স কংগ্রেসকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আদৌ বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক না হয়েও কেপ্‌লার সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলবার আমন্ত্রণ আমি সানন্দে গ্রহণ করেছি, কারণ যখন কোনও বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর জীবন আমরা স্মরণ করি, তখন আমাদের মনে কিছু চিন্তা ও প্রশ্নের উদয় হয়। কেপ্‌লার সম্বন্ধে সামান্য জেনেও সেই রকম চিন্তা ও প্রশ্ন আমার মনে কিছু আছে। শ্রোতাদের মনেও নিশ্চয় আছে—তবু আমার চিন্তা ও প্রশ্নগুলি শ্রোতাদের কাছে উপস্থিত করবার সুযোগটুকু আমি পেয়ে হারালাম না।

প্রশ্ন ও চিন্তার মধ্যে আবদ্ধ থাকলাম বলে, সময় সংক্ষেপ করবার জন্যে ও বন্ধুবর সময় সেন মহাশয়ের সঙ্গে যেন কোনও কথার পুনরুক্তি না হয়, সে জন্যে কেপ্‌লার সম্বন্ধে ঐতিহাসিক দিকটা আদৌ বলবো না।

ষোড়শ শতাব্দী বিজ্ঞানের একটি স্মরণীয় শতাব্দী। এই সময় গ্যালিলিওর আবির্ভাব ঘটেছে। এই সময় তথ্য ও পরীক্ষার গুরুত্ব পদার্থবিদ্‌ তথা সমস্ত বিজ্ঞানীর কাছে সুস্পষ্ট হয়েছে। এই শতাব্দীরই একটি বিশিষ্ট বিজ্ঞানী কেপ্‌লার।

কেপ্‌লার জীবনের প্রারম্ভে ঠিক করেছিলেন ধর্ম সংস্কার যাবেন, কিন্তু সে সময়কার তাঁদের দেশের ধর্ম সংস্কার সঙ্কীর্ণ সংস্কারহেতু সে পথ ত্যাগ করেন। অতঃপর তিনি বিশেষভাবে গণিত অধ্যয়ন দিয়ে তাঁর জীবন আরম্ভ করেন।

এখানে আমার কিছু বক্তব্য আছে। সঙ্কীর্ণতা তো মানুষের সর্বক্ষেত্রেই আছে। বিজ্ঞানীদের মধ্যেই কি সঙ্কীর্ণ সংস্কার নেই? কিন্তু বিজ্ঞানে একা চলা সম্ভব, অন্ততঃ তখন ছিল। একের সঙ্কীর্ণ সংস্কারে সেখানে অন্যের কিছু এসে যায় না। সেই জন্যেই কি কেপ্‌লার বিজ্ঞানের পথ অবলম্বন করেছিলেন?

কেপ্‌লার টাইকোব্রাহীর সহকারী হিসাবে কিছুদিন কাটান। এই সময়টা তাঁর সুসময় নয়। কিন্তু কিছুদিন পর টাইকোব্রাহীর মৃত্যু হয় এবং তাঁর সংগৃহীত সমস্ত তথ্য কেপ্‌লার পান। প্রায় এরই সাহায্যে তিনি তাঁর খ্যাত বিধিগুলি আবিষ্কার করেন। ধৈর্যের প্রয়োজন বিজ্ঞানীর জীবনে কতটা, এই ঘটনা থেকে আমরা তা বুঝি।

কেপলারের দীর্ঘদিনের ধৈর্য ও প্রচেষ্টার ফল নিউটন পেয়েছিলেন। ঠিক সেই মতে স্পেকট্রো-স্কোপিস্টদের দীর্ঘদিনের তথ্যানুসন্ধান কণাতত্ত্ব-বিদ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। পরমাণুবিদ্যায় কি আমরা সেইভাবে চলেছি? চলছি না এমন কথা আমার বক্তব্য নয়—এই বিষয় চিন্তা করবার আছে, এই আমার বক্তব্য। হয়তো সেদিনের পথ ও আজকের পথ এক হওয়া সম্ভব নয় বা যুক্তিযুক্ত নয়। বিজ্ঞানের ঐতিহাসিকেরা হয়তো এই বিষয়ে দৃষ্টি রাখবেন।

কেপ্‌লারের অবদানের মধ্যে এমন কিছু বর্তমান, যা অনেক বিজ্ঞানীর কাছে সুস্পষ্ট হলেও সর্বসাধারণের সে বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। গ্রহের চালচলন লক্ষ্য করে কেপ্‌লার যে কয়টি

---

* পদার্থবিদ্যা বিভাগ, আই. আই. টি., খড়্গপুর

নিয়ম দেখতে পান, তাকে ব্যবহারিক বিধি বলা যেতে পারে; অর্থাৎ কোনও সম্পূর্ণ তত্ত্ব (Theory) তা নয়। নিউটন সমস্ত বলবিদ্যার পূর্ণ তত্ত্ব জগতের কাছে উপস্থিত করেছিলেন। কেপ্‌লার-কৃত মাত্র দুটি বিধি থেকেই নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব পাওয়া যেতে পারে। কেপ্‌লারের অন্য বিধিটি থাকায় তত্ত্ব ও ব্যবহারিক বিধি পরস্পরকে সুদৃঢ় করে—সর্বসাধারণের এটাই জানা প্রয়োজন। এই কারণে কেপ্‌লারের দান—এই ধরণের দানের আদর্শ।

[23শে ফেব্রুয়ারী '72 ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস ও বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে বসু বিজ্ঞান মন্দিরে অনুষ্ঠিত কেপ্‌লারের চতুর্থ জন্ম-শতবার্ষিকী স্মরণ সভায় প্রদত্ত ভাষণের সারাংশ।]

কলকাতায় বিজ্ঞান কংগ্রেসের 59তম অধিবেশন

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়*

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের 59তম বার্ষিক অধিবেশন এই বছর (1972) জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে আলিগড়ে হবার কথা ছিল। প্রস্তুতিপর্ব সেইভাবে অগ্রসর হচ্ছিল। হঠাৎ গত ডিসেম্বর মাসে পাক-ভারত যুদ্ধ সুরু হওয়ায় সারা দেশে আপৎকালীন অবস্থা ঘোষিত হলো। তার ফলে জানুয়ারীর গোড়ায় আলিগড়ে বিজ্ঞান কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন স্থগিত রাখতে হয়। যুদ্ধ শেষ হবার পর আলিগড়ে বার্ষিক অধিবেশন আয়োজন করবার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু তা সফল হয় নি। শেষ পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই অধিবেশন আয়োজনের দায়িত্ব গ্রহণে এগিয়ে আসেন। এর আগে কলকাতায় শেষবার অধিবেশন হয়েছিল 1964-65 সালে সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে।

এবারের অধিবেশন হয়েছিল চার দিনব্যাপী 20—23 ফেব্রুয়ারী। 20শে ফেব্রুয়ারী সকালে বিজ্ঞান কলেজের প্রাঙ্গণে সুসজ্জিত মণ্ডপে বিশিষ্ট বিদেশী বিজ্ঞানী ও ভারতের নানা প্রান্ত থেকে আগত প্রায় দু-হাজার প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে প্রাক্-হীরক জয়ন্তী অধিবেশনের উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিদ্যাবিষয়ক মন্ত্রী শ্রী সি. সুব্রহ্মণ্যম। এবারের অধিবেশনে মূল সভাপতি ছিলেন বিশিষ্ট ভূতত্ত্ব-বিজ্ঞানী ও সাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর ডাব্লিউ. ডি. ওয়েষ্ট। প্রারম্ভে সমবেত বিজ্ঞানী ও প্রতিনিধিদের স্বাগত জানান কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আচার্য ও পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রী এ. এল. ডায়াস এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ সেন।

শ্রীসুব্রহ্মণ্যম তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে দেশের সমস্ত সম্পদ ও সুযোগসুবিধা কাজে লাগিয়ে ভারতকে দ্রুত স্বয়ম্ভর করে তুলতে এদেশের সকল বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ্‌দের পরস্পরের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করে চলবার জন্যে আহ্বান জানান। তিনি বলেন দেশ আজ এমন এক পর্যায়ে পৌঁচেছে যে, প্রয়োজনীয় অগ্রাধিকার, সঠিক পরিকল্পনা ও সক্রিয় সমর্থন পেলে দেশ এখন

* দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং, কলিকাতা-29

আমাদের অর্থনীতিকে স্বয়ম্ভর করবার জন্যে দ্রুত পদক্ষেপে অগ্রসর হতে পারে। কিন্তু যতদিন আমরা একটি মজবুত বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী ভিত্তি গড়ে তুলতে না পারছি, ততদিন আমরা অনগ্রসরতার আওতামুক্ত হতে পারছি না অথবা অন্যের উপর নির্ভরশীলতা ছাড়তে পারছি না।

উপসংহারে বিজ্ঞানকে লোকরঞ্জক করে তোলবার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দিয়ে শ্রীসুব্রহ্মণ্যম বলেন, কিশোর ও তরুণদের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার। আধুনিক প্রচার ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশের সাধারণ মানুষকে বিজ্ঞান সচেতন করে তুলতে হবে।

মূল সভাপতি ডক্টর ওয়েস্ট তাঁর 'ভারতের কল্যাণে ভূতত্ত্ব' সম্পর্কিত আলোচনায় বলেন: জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় পৃথিবীর সমস্ত উন্নত দেশ ভূতত্ত্বের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করলেও ভারত এই ব্যাপারে অনেক মন্থর গতিতে কাজ সুরু করেছিল। গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে আমাদের দেশে খনিজ সম্পদ অনুসন্ধানের দায়িত্ব পড়েছিল ভারতীয় ভূতত্ত্ব সমীক্ষার উপর। এই বিভাগটির তখন একমাত্র লক্ষ্য ছিল—দেশে কয়লার অনুসন্ধান করা। পরবর্তীকালে অনুসন্ধানের কাজ ব্যাপকতর হয়েছে। লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র, সোনা এবং খনিজ লবণ সম্পর্কে আমাদের বিশেষভাবে কাজ সুরু হলো। তবু বলা চলে, কাজের পরিধির দিক থেকে ভারতে ভূতত্ত্ব সমীক্ষা বিভাগ পৃথিবীর তৃতীয় প্রাচীনতম বিভাগরূপে পরিগণিত হলেও, আজ থেকে প্রায় তিন দশক আগেও এর আয়তন ছিল অত্যন্ত ক্ষুদ্র। স্বাধীনতা অর্জনের পর ভূতত্ত্ব সমীক্ষার ব্যাপকতা অনেকখানি বেড়ে গেছে। পরে অবশ্য ভূতত্ত্ব সমীক্ষার দায়িত্ব অনেকটা বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে।

উপসংহারে ডক্টর ওয়েস্ট বলেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যাপারে আমাদের মধ্যে সব সময় একটা অসন্তোষ ও আত্মসমালোচনার প্রবণতা কাজ করছে। এটা উচিত নয়। এ পর্যন্ত আমরা যা করেছি, তাতে গর্ববোধ করা চলে। আমাদের বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ্‌দের দেখা উচিত অগ্রগতি যেন অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলে। একমাত্র তা হলেই জনসাধারণের কল্যাণ সাধন ও দেশের নিরাপত্তা রক্ষা করা সম্ভব হবে।

মূল সভাপতির ভাষণের পর বিজ্ঞান কংগ্রেসের সম্মানীয় সদস্যপদ প্রদান করা হয় জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং অধ্যাপক টি আর শেষাদ্রিকে।

এরপর বিদেশাগত বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের পরিচয় করিয়ে দেন বিজ্ঞান কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপিকা ডক্টর অসীমা চট্টোপাধ্যায়। এবার বাংলাদেশ থেকে এসেছিলেন সবচেয়ে বেশী সংখ্যক বিজ্ঞানী দল এবং তাঁদের নেতা ছিলেন ডক্টর মহম্মদ কুদরত-ই-খুদা। এ ছাড়া এই দলে ছিলেন বাংলাদেশের পরমাণু শক্তি কেন্দ্রের অধিকর্তা ডক্টর শামসের আলি, ডক্টর ফজলুল হালিম চৌধুরী, ডক্টর এ এইচ পাটওয়ারি, ডক্টর এম এ মহম্মদ হোসেন, ডক্টর আলি নবাব, ডক্টর এম রসিদুল হক, মিঃ ইব্রাহিম হোসেন তালুকদার, মিঃ সিরাজুল ইসলাম, ডক্টর আহমেদ সামসুল ইসলাম, ডক্টর এম আই চৌধুরী, ডক্টর মাজারুল হক, ডক্টর আশুতারুজ্জমান এবং ডক্টর কাতেহ্। বুলগেরিয়া থেকে এসেছিলেন অধ্যাপক কালচো ইভানফ মারকফ; চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে ডক্টর ডেনচেক সোবৎকা, ডক্টর এডমণ্ড কানক্রিন এবং ডক্টর তি বাবুস্কা; পশ্চিম জার্মেনী থেকে অধ্যাপক জি কেলারম্যান এবং ডক্টর ডাব্লিউ জিক, জাপান থেকে অধ্যাপক এম তাসাকা এবং অধ্যাপক এম ইশিমা; পোল্যাণ্ড থেকে অধ্যাপক এডওয়ার্ড বোরোওয়াস্কি; বৃটেন থেকে নোবেল পুরস্কারবিজয়ী অধ্যাপক ডি এইচ আর বার্টন, শ্রীমতী মিরিয়াম গ্রিফিথ

এবং অধ্যাপক এন ডাব্লিউ পিরি; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে অধ্যাপক ই এফ এডলফ এবং অধ্যাপক গ্যাবর ফোডর; সোভিয়েট রাশিয়া থেকে অ্যাকাডেমিশিয়ান এম এইচ চাইলাখিয়ান, অধ্যাপক এস এ আজিমজানোভা এবং অধ্যাপক এম এল পালসনিন।

বিদেশাগত বিজ্ঞানীদের পরিচিতির পর কলকাতার মেয়র শ্রীশ্যামসুন্দর গুপ্ত বিজ্ঞান কংগ্রেস উপলক্ষে আয়োজিত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও বিজ্ঞান পুস্তক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। এই প্রদর্শনীতে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ তাঁদের প্রকাশিত বিজ্ঞান পুস্তক ও পরিষদের হাতে-কলমে বিভাগের সভ্যদের তৈরি মডেল প্রদর্শন করেন।

দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ 21 ফেব্রুয়ারী থেকে বিজ্ঞান কংগ্রেসের তেরোটি শাখার পৃথক পৃথক অধিবেশন সুরু হয় এবং সেখানে সভাপতির ভাষণ, গবেষণাপত্র পাঠ, আলোচনা-চক্র ও বিশেষ বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয়। অন্যান্য বারের মত এবারও কয়েকটি লোকরঞ্জক বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য অধ্যাপক ডি এইচ বার্টনের 'পেনিসিলিনের রসায়ন', অধ্যাপক সুবোধকুমার চক্রবর্তীর 'ভূমিকম্প—প্রকৃতি ও উপযোগিতা', অধ্যাপক বি এম জোহরীর 'টেস্ট-টিউব উদ্ভিদ', ডক্টর নীলরতন ধরের 'খাদ্য ও পুষ্টি', ডক্টর আত্মারামের নবম বার্ষিক ডক্টর বীরেশচন্দ্র গুহ স্মারক বক্তৃতা 'বৈজ্ঞানিক নীতি সম্পর্কে ভাববার কথা' এবং ডক্টর এস ওয়াই পদ্মনাভনের 'ধান বিপ্লবের দিকে' সম্পর্কিত আলোচনা। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ও বিজ্ঞান কংগ্রেসের যৌথ উদ্যোগে 23 ফেব্রুয়ারি বসু বিজ্ঞান মন্দিরের বক্তৃতা-কক্ষে 'মাতৃভাষার বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ ও তার প্রসার' এবং যোহানেস কেপ্‌লার সম্পর্কে বাংলা ভাষায় আলোচনার আয়োজন করা হয়। এই আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং আলোচনায় অংশ-গ্রহণ করেন ডক্টর কুদরত-ই খুদা, ডক্টর শামসের আলি, ডক্টর শামসুল ইসলাম, শ্রীঅমলেন্দু বসু, শ্রীসমরজিৎ কর, ডক্টর গগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সেন। এবার আর একটি উল্লেখযোগ্য আলোচনা হয়েছিল এগ্রোনমিক্স (Egronomics) সম্পর্কে। সাড়ে তিন দিনব্যাপী এই আলোচনা সভার উদ্বোধন করেন উপাচার্য ডক্টর সেন এবং আলোচনার বিভিন্ন বিষয়ে অংশ-গ্রহণ করেন বহু বিশেষজ্ঞ।

এবারের অধিবেশন পূর্ণাঙ্গ না হলেও যথারীতি প্রীতি সম্মেলন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রতিনিধি-দের মনোরঞ্জন করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল, কলকাতার মেয়র এবং স্থানীয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি তিন দিন বিশিষ্ট বিদেশী বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের প্রীতি সম্মেলনে আপ্যায়িত করেন। তিন দিনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শ্রী এ সি সরকার ম্যাজিক, সুরসপ্তক রবীন্দ্রনাথের 'কচ ও দেবযানী' কবিতা অব-লম্বনে নৃত্যনাট্য, শ্রীনিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় সেতার বাদন এবং শিশু রংমহল 'ভারতের সঙ্গীত' নৃত্যানুষ্ঠান পরিবেশন করেন। এছাড়া অধিবেশন শেষে 24 ফেব্রুয়ারীতে বহিরাগত প্রতিনিধিদের কলকাতার বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম ও কলকাতার আশেপাশের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখাবার ব্যবস্থা করা হয়।

অল্প সময়ের প্রস্তুতিতে এবারকার অধিবেশন আয়োজিত হওয়ায় কেউ কেউ পূর্বাহ্ণে সংশয় পোষণ করেছিলেন, কলকাতার এই অধিবেশনে বিজ্ঞান কংগ্রেসের মর্যাদা রক্ষিত হবে কিনা। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের আড়ম্বর এবার না থাকলেও এই অধিবেশনে বিজ্ঞান কংগ্রেসের মর্যাদা যে যথাযথভাবেই বজায় ছিল, এ কথা সকলেই শেষে স্বীকার করেছেন।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

প্রাকৃতিক রবারের কথা

বর্তমান যুগে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপাদান হিসাবে রবার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। বর্তমানে অবশ্য কৃত্রিম রবারের প্রচলনই বেশী, কারণ চাহিদা পূরণের উপযোগী যথেষ্ট পরিমাণ রবার প্রকৃতি থেকে আহরণ করা অসম্ভব, যদিও প্রাকৃতিক রবার বহু কাজেই ব্যবহৃত হয়।

কৃত্রিম রবার আবিষ্কারের পূর্বে প্রাকৃতিক রবারই মানুষের চাহিদা মেটাতো। ক্রিষ্টোফার কলম্বাস প্রথম রবারের সন্ধান পান। তিনি আদিবাসীদের মধ্যে রবারের ব্যবহার লক্ষ্য করেন। তারা প্রাকৃতিক রবার জুতা তৈরির কাজে ব্যবহার করতো। একটি পাত্রে রবারের রস নিয়ে তাতে পা ডুবিয়ে কিছুক্ষণ পরে তুলে নিত। ঐ রস তখন শুকিয়ে একটি প্রলেপ পড়তো। এভাবে কয়েক বার পা ডুবিয়ে প্রলেপটি একটু মোটা হলেই সেটা তাদের জুতার কাজ করতো। কলম্বাসই প্রথম রবার ইউরোপে নিয়ে যান।

1776 খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জোসেফ প্রিষ্টলি লক্ষ্য করেন যে, রবারের দ্বারা কাগজের উপর থেকে পেন্সিলের দাগ তোলা যায়। সে জন্যে ইংরেজীর Rub (ঘষা) শব্দ থেকে এর নাম হয় Rubber বা রবার।

প্রাকৃতিক রবার গাছ থেকে উৎপন্ন হয়। এটা একপ্রকার গাছের রস। যে গাছ থেকে বেশীর ভাগ রবারের রস পাওয়া যায়, তার বৈজ্ঞানিক নাম হিভিয়া ব্রাসিলিয়েনসিস (Hevea Brasiliensis)। রবার গাছের কাণ্ড ছুরি দিয়ে চিরে দিলে রস বের হয়। ঐ রস গাছের গোড়ায় একটি পাত্রে জমা হয়। টাট্‌কা রস আঠালো ও ঘন দুধের মত

সাদা। এই রসে প্রায় শতকরা 60 ভাগ জল, 35·62 ভাগ রবার হাইড্রোকার্বন, 2·03 ভাগ প্রোটিন ও 1·65 ভাগ রেজিন (Resin) থাকে। এক একটি গাছ থেকে বছরে প্রায় 6 পাউণ্ড পরিণত রবার পাওয়া যায়। এই গাছ সিংহলে বেশী জন্মায়, ভারতে কেরালাতেও রবারগাছ জন্মায়।

গাছ থেকে সম্ভ সংগৃহীত রসের সঙ্গে কিছু ব্যাক্টিরিয়া মিশানো হয়। এরা অ্যাসিড উৎপন্ন করে বলে শতকরা 0·6-1 ভাগ অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড মেশানো হয়। একে তখন ফ্যাক্টরীতে জমা রাখবার প্রয়োজনে লিটার প্রতি 0·5-1 গ্রাম সোডিয়ামবাই-সালফাইট মেশানো হয়। এটা জারণ রোধ করে। যখন ঐ রস থেকে রবার প্রস্তুত করা হয়, তখন এতে শতকরা 5 ভাগ অ্যাসেটিক অ্যাসিড মিশিয়ে ঘনীভূত করা হয়। এই ঘনীভূত রবারকে ফিল্টার করে আলাদা করা হয়। এই ঘনীভূত রবারে শতকরা 92 ভাগ রবার হাইড্রোকার্বন থাকে। একে তখন রোলারের মধ্যে দিয়ে চালিয়ে জল নিষ্কাশন করে রবারের চাদর প্রস্তুত করা হয়। এই রবারকে বলা হয় crude rubber বা অপরিণত রবার। এটি খেলার জুতার শোলের কাজে ব্যবহৃত হয়। কারণ এটি শক্ত, ঘাতসহ ও স্থিতিস্থাপক।

ইংল্যাণ্ডে 1800 শতকে টমাস হ্যানকক (Thomas Hancock) ও চার্লস ম্যাসিন-টোস (Charles Masintosh) নামে দুই ভদ্রলোক কাপড়ের দুই পিঠে রবার মাখিয়ে বর্ষাতি প্রস্তুত করবার চেষ্টা করেন। হ্যানকক রবারের দু-একটি ছোটখাটো জিনিসও প্রস্তুত করতে থাকেন। কিন্তু তাঁর কাছে বেশী যন্ত্র না থাকায় এসব জিনিষ তৈরি করা কঠিন ছিল। সে জন্মে তিনি একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করেন এবং তার নাম দেন 'Hancock's Pickle।' এটিই আধুনিক রবার মিলের জনক।

রবারের সঙ্গে গন্ধক, কর্পূর, তৈল ইত্যাদি মিশিয়ে যন্ত্রে চাপ ও তাপ প্রয়োগ করে একে নরম ও নমনীয় করা হয়। এই যন্ত্রে চাপ ও তাপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা আছে। রবার দিয়ে তস্তু, পাইপ, সাইকেল বা মোটরের টায়ার ইত্যাদি তৈরি হয়। সুতার উপর রবারের প্রলেপ লাগিয়ে টায়ার প্রস্তুত করা হয়।

আমেরিকায় প্রায় 1800 খৃষ্টাব্দ নাগাদ রবার ব্যবহারের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু বিশেষ সাফল্যলাভ করা সম্ভব হয় নি। কারণ এই রবারের তৈরি জিনিষগুলি গরমে নরম ও আঠা-আঠা হয়ে যেত এবং ঠাণ্ডায় শক্ত ও ভঙ্গুর হয়ে পড়তো। ফলে এই সমস্ত জিনিষ বেশীদিন ব্যবহার করা সহজ হতো না। চার্লস গুডইয়ার (Charles Goodyear) এই রবার নিয়ে কাজ করছিলেন। কিন্তু দারিদ্র্য ও অসুস্থতার জন্মে তিনি সাফল্যলাভে ব্যর্থ হচ্ছিলেন। শেষে 1839 সালে তিনি আবিষ্কার করেন যে, রবারকে গন্ধক ও কিছু ধাতব অক্সাইডের সঙ্গে উত্তপ্ত করলে এটি গরম ও ঠাণ্ডায় অপরিবর্তিত থাকে। এই প্রক্রিয়াকে ভালক্যানাইজেসন (Vulcanisation) বলে। পরে জানা যায়

যে, গন্ধক ছাড়া আরও নানা রকম রাসায়নিক, যেমন—জৈব পারঅক্সাইড, নাইট্রোজেন যৌগ ইত্যাদিও একই কাজ করে। এই প্রক্রিয়ায় সম্ভবতঃ গন্ধক রবার অণুর মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারীর কাজ করে। মিশ্রিত গন্ধকের পরিমাণের উপর রবারের গুণাগুণ নির্ভর করে। যদি শতকরা 1.6 ভাগ গন্ধক মেশানো হয়, তবে এটি সাধারণ নরম রবার হয়, যদি 25-30 ভাগ মেশানো হয়, তবে তা শক্ত রবার হয়।

ভালক্যানাইজেসন প্রক্রিয়ায় দস্তার উপস্থিতিতে লিথার্জ চুন, ম্যাগ্নেশিয়াম প্রভৃতি প্রক্রিয়ার সময় সংক্ষেপ করে। এই রবারের সঙ্গে কিছু পূরক, রং ইত্যাদি মেশানো হয়। কার্বন ব্ল্যাক, জিঙ্ক অক্সাইড প্রভৃতি পূরকের কাজ করে। পেট্রোলিয়াম, রেজিন প্রভৃতি মিশালে রবার নরম হয়। অজৈব রঙীন রং, যেমন—লৌহ অক্সাইড, ক্রোমিয়াম অক্সাইড ইত্যাদির চেয়ে জৈব রংই বেশী ব্যবহৃত হয়। এই সমস্ত জিনিষ রবারের গুণাবলীর নানাভাবে উন্নতি সাধন করে।

বর্তমানে অবশ্য কৃত্রিম রবারের ব্যবহারই বেশী, তথাপি প্রাকৃতিক রবারেরও বিশেষ প্রয়োজন আছে।

শ্রীমলয় সরকার

পারদর্শিতার পরীক্ষা

ভূ-বিজ্ঞানে তোমার পারদর্শিতা কেমন, তা বোঝবার জন্যে নীচে 5টি প্রশ্ন দেওয়া হলো। প্রতিটি প্রশ্নে 20 নম্বর আছে। এক একটি প্রশ্নে যতগুলি ভাগ আছে, তাদের প্রত্যেকটিতেই সমান নম্বর। প্রশ্নের সঙ্গে যে উত্তরগুলি দেওয়া আছে, সেগুলির মধ্যে কোন্‌টি সঠিক বলতে হবে। উত্তর দেবার জন্যে মোট সময় 5 মিনিট। এই সময়ের মধ্যে তুমি যত নম্বর পাবে, সেই অনুযায়ী ভূ-বিজ্ঞানে তোমার পারদর্শিতা সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করতে পারবে।

1. (ক) পৃথিবীর ভর কত ?

6×10^{12} কিলোগ্র্যাম

6×10^{18} কিলোগ্র্যাম

6×10^{24} কিলোগ্র্যাম

(খ) পৃথিবীর গড় ঘনত্ব কত ?

প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে 0·55 গ্র্যাম

প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে 5·5 গ্র্যাম

প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে 55 গ্র্যাম

2. (ক) ভূপৃষ্ঠে সর্বোচ্চ স্থানের উচ্চতা হচ্ছে—

884 মিটার

8844 মিটার

88444 মিটার

(খ) পৃথিবীর সমুদ্রগর্ভে গভীরতম স্থানটির গভীরতা হলো—

10900 মিটার

19000 মিটার

91000 মিটার

3. (ক) পৃথিবীর আহ্নিক গতির ফলে বিষুবরেখাস্থিত যে কোন বিন্দু এক ঘণ্টায় কতখানি পথ আবর্তিত হয় ?

17 কিলোমিটার

170 কিলোমিটার

1700 কিলোমিটার

(খ) পৃথিবীর বার্ষিক গতির ফলে এক ঘণ্টায় পৃথিবী গড়ে কতখানি দূরত্ব অতিক্রম করে ?

1060 কিলোমিটার

10600 কিলোমিটার

106000 কিলোমিটার

4. (ক) সূর্য থেকে পৃথিবীতে যে তাপ এসে পৌঁছয় এবং সূর্য থেকে নির্গত যে মোট তাপ, তাদের অনুপাত হচ্ছে—

$1:2\times10^5$

$1:2\times10^9$ ✓

$1:2\times10^{13}$

(খ) পৃথিবী যদি সম্পূর্ণরূপে মসৃণ একটি গোলক হতো (অর্থাৎ পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র-গহ্বর ইত্যাদি বর্তমান না থেকে ভূপৃষ্ঠের সব স্থানই যদি ভূকেন্দ্র থেকে সমদূরবর্তী হতো), তবে পৃথিবীতে সঞ্চিত জলরাশি সমগ্র ভূপৃষ্ঠকে আবৃত করে রাখতো। সেক্ষেত্রে ঐ জলরাশির গভীরতা হতো—

36·6 মিটার

366 মিটার

3660 মিটার ✓

5. এক ঘন কিলোমিটার সমুদ্রের জলে

(ক) সোনার পরিমাণ :

0 4 কিলোগ্র্যাম

4 কিলোগ্র্যাম

40 কিলোগ্র্যাম

(খ) রূপার পরিমাণ :

3·4 কিলোগ্র্যাম

34 কিলোগ্র্যাম

340 কিলোগ্র্যাম

(গ) লোহার পরিমাণ :

116 কিলোগ্র্যাম

1160 কিলোগ্র্যাম

11600 কিলোগ্র্যাম

(ঘ) পারদের পরিমাণ :

30 কিলোগ্র্যাম

300 কিলোগ্র্যাম

3000 কিলোগ্র্যাম

(ঙ) থোরিয়ামের পরিমাণ :

8·1 কিলোগ্র্যাম

81 কিলোগ্র্যাম

810 কিলোগ্র্যাম

(উত্তরের জন্যে 250নং পৃষ্ঠা দেখ)

ব্রহ্মানন্দ দাশগুপ্ত ও জয়ন্ত বসু*

* সাহা ইনষ্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-9

ঈল ও কয়েকটি বৈদ্যুতিক মাছ

1856 সালে প্রকৃতি-বিজ্ঞানী ডক্টর ক্যাম্পের জালে ধরা পড়লো একটি অদ্ভুত প্রাণী। অনেকটা লরেল পাতার মত দেখতে—চ্যাপ্টা ও স্বচ্ছ। লম্বায় দু-ইঞ্চির বেশী নয়। ডক্টর ক্যাম্প এর নাম দিলেন Leptosephalus brevirostris। তারপর গ্রেসি, ক্যালাড্রুসিও, স্মিড প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের ব্যাপক গবেষণার ফলে জানা গেল—এই লেপ্‌টো-সেফালি ঈল মাছেরই কিছুটা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বাচ্চা বা লার্ভা। প্রাথমিক লার্ভা থেকে পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় পৌঁছতে এদের দেহের আকার আটবার পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তনের রহস্য আজও অজানা।

পূর্ণাঙ্গ ঈল কিন্তু দেখতে অনেকটা সাপের মত। দেহটি সাপের মতই মসৃণ, কিন্তু পিচ্ছিল। কিন্তু ঈলের পাখ্‌না আছে, সাপের যা নেই। পিঠের দিক থেকে সুরু করে একেবারে লেজ পর্যন্ত একটি অবিচ্ছিন্ন পাখ্‌না। প্রাগৈতিহাসিক মাছের অনেক বৈশিষ্ট্যই এদের মধ্যে বর্তমান। এর একটি হলো স্থলভাগের উপর দিয়ে চলবার ক্ষমতা, বিশেষ করে হ্রদ বা পুকুরে যাদের বাস। ডিম পাড়বার সময়ে তারা স্থলভাগ ছেড়ে নদীতে নামে—তারপর নদী থেকে সমুদ্রে যায়।

সাধারণতঃ ঈল মাছ তিন থেকে পাঁচ ফুট লম্বা হয়ে থাকে। ছয়-সাত ফুট দীর্ঘ ঈলও দেখা যায়। এরা হলো সমুদ্রবাসী কঙ্গার ঈল। আর ঈল-মাছের মধ্যে যারা দৈত্যবিশেষ, অর্থাৎ সামুদ্রিক মোরে—লম্বায় তারা দশ ফুটের কাছাকাছি।

আমাদের পরিচিত বাণ মাছের মত ঈল একধরণের মাছ, সাপ নয়। যদিও এক সময় লোকের সে রকমেরই ধারণা ছিল। গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল্‌ মনে করতেন, সমুদ্রের আবর্জনা থেকেই ঈলের উদ্ভব হয়। কিছুদিন আগেও এরকম একটা প্রবাদ ছিল যে, জলে ঘোড়ার লেজের চুল পড়লে সেগুলি ঈল মাছে রূপান্তরিত হয়। সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলে এইসব উদ্ভট ধারণা হয়তো আজও আছে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের মনে।

ঈলের জন্ম হয় গভীর সমুদ্রে। এদের বসবাস প্রধানতঃ ইউরোপ, আমেরিকা আর আইসল্যাণ্ডের মিঠা জলে। পূর্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকা, পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, উত্তর অষ্ট্রেলিয়া—এমন কি, ভারতবর্ষেও ঈল দেখা যায়। সাধারণতঃ নদী বা হ্রদে—অনেক সময় পুকুরেও এরা বাস করে। আবার কিছু কিছু ঈল আছে, যেমন—কঙ্গার বা মোরে, যারা স্থায়ীভাবেই সমুদ্রের বাসিন্দা।

ভারী অদ্ভুত এইসব ঈল মাছ। ইউরোপের নদী আর হ্রদ অঞ্চল থেকে ওরা ডিম পাড়তে আসে বারমুডার গভীর অ্যাটলান্টিকে—একটানা তিন হাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়ে। আমেরিকান ঈলদের যাত্রাপথ কিছুটা কম। হাজার মাইলের মত। ভারত,

আফ্রিকা এবং অষ্ট্রেলিয়াবাসী ঈলদের ডিম ছাড়বার জায়গা হলো ভারত মহাসাগর। গভীর সমুদ্রে কিছু কিছু সমুদ্র-গুল্মের প্রাচুর্য এবং নোনা জলে ডিম ফোটবার উপযুক্ত পরিবেশ—এই দুটি কারণে ডিম পাড়বার জন্যে ঈলকে হাজার হাজার মাইল পথ পাড়ি দিতে হয়।

ডিম ফুটে প্রথমে বেরোয় শূক—দৈর্ঘ্যে এক ইঞ্চিরও কম। তারপর শূক থেকে লেপ্টোসেফালি এবং তা থেকে দুটি স্তর পেরিয়ে এল্‌ভার বা গ্লাস-ঈল। তখনও শরীরটা বেশ চ্যাপ্টা এবং আধা স্বচ্ছ। এই অবস্থায় পৌঁছুতে সময় লাগে প্রায় দু-মাস। এই দু-মাস ওরা সমুদ্রের তলায় চুপ করে বসে থাকে। এলভার অবস্থাতেই ওরা প্রথম সাঁতার দিতে শেখে। তারপর হয় যাত্রা সুরু—নোনা জল থেকে এবার মিঠা জলের দিকে। আর এই যাত্রাপথেই ঘটে যায় জীবনের বাকী পরিবর্তনগুলি। ক্রমশঃ চ্যাপ্টা থেকে সরু। আধা স্বচ্ছ থেকে প্রায়-অস্বচ্ছ তারপর পুরাপুরি অস্বচ্ছ। পরিশেষে মিঠা জলে পৌঁছে পূর্ণাঙ্গ লাভ করে। গবেষকের জালে কখনো কখনো ধরা পড়েছে এই সব বিভিন্ন জীবন-স্তরের ঈল এবং তার ফলেই ঈল মাছের জীবন-রহস্য কিছু কিছু জানা গেছে। তবে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, দীর্ঘ এই অভিযানে পূর্ণবয়স্ক ঈল কখনো ধরা পড়ে নি। বিশেষজ্ঞদের তাই ধারণা, গভীর সমুদ্রে ডিম ছাড়বার পরেই ওদের মৃত্যু ঘটে।

যৌন-পূর্ণতায় পৌঁছুতে স্ত্রী-ঈলের প্রায় আট বছর সময় লাগে। তারপর গভীর সমুদ্রে গিয়ে প্রসব ও মৃত্যু। এরা কুড়ি বছর পর্যন্ত বাঁচে। ঈল মাছের খাদ্য প্রধানতঃ সমুদ্র-গুল্ম এবং অন্যান্য জলজ প্রাণী। বৃহদাকার মোরে ঈল অনায়াসেই ছোট ছোট অক্টোপাস ধরে খায়।

ঈল শুধু খাদকই নয়, খাদ্য হিসেবেও অত্যন্ত সুস্বাদু এবং পুষ্টিকর মাছ। স্রোতের মুখে ওরা যখন সমুদ্রে যাত্রা করে, ফাঁদ পেতে বা জালের সাহায্যে ঈল শিকার তখন অনেক অঞ্চলেই একটি ভাল স্পোর্ট।

বৈদ্যুতিক মাছ

বৈদ্যুতিক ঈলের কথা তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। ঈল মাছের শরীরে কি সত্যসত্যই বিদ্যুৎ সঞ্চিত থাকে? ব্রেজিল এবং গায়নার নদী ও সমুদ্রে যারা ঘুরে বেড়ায়, অনেকটা ঈল মাছের মতই দেখতে, মারাত্মক বিদ্যুৎভরা সেই সব সর্পাকৃতির প্রাণী আসলে ঈল নয়। জাতি, ধর্মে ঈল থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এক আশ্চর্য মাছ। ঈল-সদৃশ আকৃতির জন্যে এবং শরীরে বিদ্যুৎশক্তি সৃষ্টি করতে পারে বলেই এদের বলা হয় ইলেকট্রিক ঈল। তা ছাড়া ক্যাট-ফিস এবং ইলেকট্রিক-রে বা টরপেডো মাছ নিজের দেহের মধ্যেও বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে। ক্যাটফিস প্রধানতঃ দেখা যায় আরব দেশে। আর উষ্ণ সমুদ্রাঞ্চলের প্রায় সর্বত্রই টরপেডো মাছ ঘোরাফেরা করে।

এদের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতায় ইলেকট্রিক ঈল সবাইকে হার মানায়। ছয় ফুট লম্বা একটি বৈদ্যুতিক ঈল তড়িৎ-স্পর্শে একটি ঘোড়াকে অনায়াসেই অবশ করে দিতে পারে।

এদের তড়িৎশক্তির মাত্রা কয়েক-শ ভোল্ট। এর তুলনায় টরপেডো এবং ক্যাটফিসের তড়িৎশক্তি অনেক কম—ত্রিশ চল্লিশ ভোল্ট মাত্র।

প্রধানতঃ শিকার ধরবার কাজেই ওরা নিজেদের বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহার করে। ক্যাটফিস বিদ্যুতের স্পর্শ লাগিয়ে আহাররত অন্য কোন মাছকে অবশ করে দিয়ে তার খাবারটা আত্মসাৎ করে। টরপেডো মাছের স্বভাব হলো বালির মধ্যে আত্মগোপন করে থাকা এবং শিকার কাছে আসামাত্র হঠাৎ বেরিয়ে এসে তাকে কাবু করে ফেলা। আর ইলেকট্রিক ঈল তার বিপুল শক্তিকে সরাসরি কাজে লাগায়।

বৈদ্যুতিক মাছের শরীরে বিদ্যুৎ সৃষ্টির মূল রহস্যটি কি? জীব-বিজ্ঞানীরা বলেন, এদের শরীরের লেজের দিকে আছে পরিবর্ধিত পেশীনির্মিত এক ধরণের বৈদ্যুতিক কোষ। এগুলি কিন্তু সাধারণ রাসায়নিক ব্যাটারী বা ড্রাই সেলের মত নয়। প্রতিটি ব্যাটারী বা তড়িৎ-উৎপাদক যন্ত্র বহু কেন্দ্রকযুক্ত (Multinucleate) সজীব পেশী-কোষ বা মাস্‌ল-সেল দিয়ে তৈরি কতকগুলি চাকৃতির সমন্বয়। এগুলিকে বলা হয় ইলেকট্রোপ্লাক্স। যে কোন দুটি চাকৃতির মাঝখানে রয়েছে সংযোজক-তন্তুর দ্বারা গঠিত বিভেদ-প্রাচীর এবং প্রতিটি চাকৃতির মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ স্থাপন করে তড়িৎ সঞ্চয় ও ক্ষরণের ব্যাপারটিকে নিয়ন্ত্রিত করছে কতকগুলি মোটর নার্ভ। ইলেকট্রিক টরপেডোর লেজে উল্লম্বভাবে সজ্জিত এরকম কুড়ি হাজার চাকৃতি থাকে। ইলেকট্রিক ঈলের ক্ষেত্রে চাকৃতির সংখ্যা অনেক বেশী এবং সেগুলি অনুভূমিকভাবে সজ্জিত।

মানুষের জানা আদিমতম তড়িৎ-যন্ত্র হলো এসব বৈদ্যুতিক মাছ। অনেক ক্ষেত্রে মানুষ এদেরকে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করেছে। এই ধরণের কম্পনশীল সঙ্কেত-বার্তা (Vibro message) সৃষ্টির ব্যাপারে একসময় টরপেডোকে কাজে লাগানো হতো। এমন কি বাতের রোগীকে এই মাছের উপরে খালি পায়ে দাঁড় করিয়ে মৃদু 'শক্' নেবার চিকিৎসা-পদ্ধতিও কোন কোন স্থানে চালু ছিল।

বিমল বসু

উত্তর

(পারদর্শিতার পরীক্ষা)

1. (ক) 6×10^{24} কিলোগ্রাম

(খ) প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে 5·5 গ্রাম

2. (ক) 8844 মিটার

[বলা বাহুল্য, সর্বোচ্চ স্থানটি হলো মাউণ্ট এভারেষ্ট।]

(খ) 10900 মিটার

[সমুদ্রগর্ভে গভীরতম স্থানটি প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম ভাগে অবস্থিত। স্থানটির নাম 'ম্যারিয়ানা ট্রেঞ্চ'।]

3. (ক) 1700 কিলোমিটার

[24 ঘন্টায় বিন্দুটির আবর্তন-পথের মোট পরিমাণ হচ্ছে $2\pi r$, যেখানে r হলো পৃথিবীর ব্যাসার্ধ। এথেকে সহজেই ঘন্টায় আবর্তনের বেগ হিসাব করা যায়।]

(খ) 106000 কিলোমিটার

[পৃথিবীর কক্ষপথকে বৃত্তাকার ধরে নিলে ঐ বৃত্তের পরিধি হচ্ছে $2\pi r$, যেখানে r হচ্ছে সূর্য থেকে পৃথিবীর গড় দূরত্ব। পৃথিবী এক বছরে এই পরিধি একবার অতিক্রম করে। সুতরাং পৃথিবী ঘন্টায় কতটা পথ অতিক্রম করে, তা সহজেই হিসাব করা যায়।]

4. (ক) $1 : 2 \times 10^9$

(খ) 3660 মিটার

5. (ক) 4 কিলোগ্রাম

(খ) 340 কিলোগ্রাম

(গ) 1160 কিলোগ্রাম

(ঘ) 30 কিলোগ্রাম

(ঙ) 810 কিলোগ্রাম

[সমুদ্রের জলে হাইড্রোজেন, অক্সিজেন এবং লবণের সোডিয়াম ও ক্লোরিন ছাড়াও সোনা, রূপা, লোহা, অ্যালুমিনিয়াম, দস্তা, সীসা, টিন, তামা, কোবাল্ট, নিকেল, পারদ, থোরিয়াম প্রভৃতি বহু প্রকার পদার্থ থাকে।]

অন্ধদের সহায়ক টেলিভিসন-ক্যামেরা

পৃথিবীতে দৃষ্টিহীনদের সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। তাছাড়া আরও আছেন, যারা চশমা নিয়েও দিন-দিন অন্ধত্বের পথে পা বাড়াচ্ছেন।

অন্ধদের নতুন নতুন সুযোগ-সুবিধা দেবার জন্যে চেষ্টা চলছে পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশে। আজকে বিজ্ঞানের এই উন্নতির দিনে দৃষ্টিহীনেরা যাতে পড়াশুনার জন্যে আরও সহজ উপায়ে যন্ত্রের সাহায্য নিতে পারেন, সেই আশাই করেছেন সবাই।

বিজ্ঞানীদের চেষ্টার ফলে টেলিভিসন-ক্যামেরা তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। এই টেলিভিসন-ক্যামেরা দৃষ্টিহীনদের পক্ষে খুব সহায়ক হবে।

আসলে এই সম্পর্কে গবেষণা হয়েছিল অনেক দিন আগেই। 1958 সালে ডক্টর

বার্টনের একটা পরীক্ষা সবার মনে সাড়া জাগাতে পেরেছিল। আমেরিকার স্নায়ু-তত্ত্ববিদ্ ডক্টর বার্টন একটি অন্ধ মেয়ের মস্তিষ্কের মধ্যে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ প্রবাহিত করে তাঁকে পৃথিবীর আলোর অনুভূতি দিয়েছিলেন।

রেডারের সাহায্যে ডক্টর বার্টন পরীক্ষাটি করেছিলেন। তাঁর মতে, অন্ধদের মস্তিষ্কের কোষগুলিকে নির্জীব মনে করবার কোন কারণ নেই। বৈদ্যুতিক তরঙ্গের সাহায্যে ঐ কোষগুলিকে আবার সজীব করা যায়। তিনি আরও জানিয়েছিলেন, ভবিষ্যতে অন্ধেরা তাঁর পরীক্ষার ফলে দেখতে সক্ষম হবেন। 1958 সালে অনেক বিখ্যাত পত্রিকায় তাঁর এই পরীক্ষার কথা প্রকাশিত হয়েছিল।

এটা বলা যেতে পারে যে, ডক্টর বার্টনের এই সুত্রটির উপর নির্ভর করে পরবর্তী কালে দৃষ্টিহীনদের বর্ণ পরিচয়ের জন্যে টেলিভিসন-ক্যামেরা তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

1970 সালের 22শে জুলাই বৃটিশ চিকিৎসা গবেষণা পর্ষদ পার্লামেণ্টে তাঁদের বার্ষিক রিপোর্ট পাঠিয়ে এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের কথা জানিয়েছেন। এই সংবাদে সমস্ত পৃথিবীতে আজ সাড়া পড়ে গেছে।

মস্তিষ্কের যে অংশটি সাধারণ মানুষকে কোন কিছু 'দেখিয়ে থাকে', একজন দৃষ্টিহীনের মাথার সে অংশটিতে ছোট ছোট বৈদ্যুতিক তারের সাহায্যে তাঁকে 'আলোর চিহ্ন' দিতে বিজ্ঞানীরা সক্ষম হয়েছেন বলে জানিয়েছেন।

বেতারের সহায়তায় এই পরীক্ষাটিতে তাঁর মস্তিষ্কে অক্ষরের ছাপ দিয়ে এবং টেলিভিসন-ক্যামেরার সাহায্যে সেই বিশেষ অংশটিতে ছাপা অক্ষরের ছবি পাঠিয়ে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন—দৃষ্টিহীন লোকটি তা পড়তে পেরেছেন। বৃটিশ বিজ্ঞানীরা এই ধরণের নতুন টেলিভিসন-ক্যামেরা তৈরি করে সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন।

মস্তিষ্কের বিশেষ অংশটি সম্বন্ধে যা জানা গেছে, তা হলো মানুষের মস্তিষ্কের একটি বিশেষ স্থানে দৃষ্টিশক্তির কেন্দ্র অবস্থিত। দৃষ্টিহীনদের ক্ষেত্রে এই কেন্দ্রটি সাধারণতঃ নীরব থাকলেও বৈদ্যুতিক-তরঙ্গের সাহায্যে সে কেন্দ্রে সাড়া জাগানো সম্ভব। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই তত্ত্ব সাফল্যের সঙ্গে প্রমাণ করা হয়েছে। আমেরিকার স্নায়ু-তত্ত্ববিদ্ ডক্টর বার্টন ও বৃটিশ চিকিৎসা গবেষণা পর্ষদ তাঁদের পরীক্ষায় ঐ দৃষ্টিশক্তির কেন্দ্রে সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

1958 সালের পত্রিকার সংবাদে ডক্টর বার্টনের পরীক্ষার কথা জানানো হয়েছিল। ডক্টর বার্টন 18 বছরের অন্ধ মেয়েটির মাথায় খুলির মধ্যে গর্ত করে খুব সরু একটি বৈদ্যুতিক তার লাগিয়ে দিয়েছিলেন। বাইরের একটি কোট ইলেকট্রিক সেলের অ্যাম্প্লিফায়ারের সাহায্যে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ পরিবর্ধিত অবস্থায় দৃষ্টিশক্তির কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছিল। মস্তিষ্কে অবস্থিত দৃষ্টিশক্তির কেন্দ্রে সাড়া জাগাবার ফলে অন্ধ মেয়েটি

বাইরের পৃথিবীর আলো দেখতে পেরেছিল। এতে প্রমাণ হলো, মস্তিষ্কের কোষগুলি কখনও নষ্ট হয়ে যায় না—তাকে আবার সজীব করা যায়।

আর বৃটিশ বিজ্ঞানীরা বেতারের সাহায্যে মস্তিষ্কের দৃষ্টিশক্তির কেন্দ্রে অক্ষরের ছাপ দিয়েছেন। টেলিভিসন-ক্যামেরার সাহায্যে সেই অংশে ছাপা অক্ষরের ছবি পাঠিয়েছেন। ফলে দৃষ্টিহীন লোকটি দৃষ্টিশক্তির মূল কেন্দ্রে সাড়া পাবার ফলে ঐ লেখা পড়তে পেরেছেন। লক্ষণীয় যে, এই দ্বিতীয় পরীক্ষাটির সাফল্য প্রথম পরীক্ষার উপর বেশ কিছুটা নির্ভরশীল ও প্রথমটির পরিপূরক।

এই টেলিভিসন-ক্যামেরা তৈরি করে বৃটিশ বিজ্ঞানীরা ডক্টর বার্টনের পরীক্ষাটির সফল স্তরে পা দিতে পেরেছেন। এই যন্ত্রটি যে দৃষ্টিহীনদের কাছে আজ নতুন আশা নিয়ে এসেছে, সে সম্পর্কে কোন দ্বিমত নেই।

বিজ্ঞানের নতুন দিগন্ত খুলে গিয়েছে এই আবিষ্কারকে কেন্দ্র করে। দৃষ্টিহীনেরা এই ক্যামেরার সহায়তায় আরো সহজে ছাপার অক্ষর পড়তে পারবেন বলে বিজ্ঞানীরা আশা করছেন।

অজয় গুপ্ত

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন 1. : সৌর আলোকমণ্ডলের ফেকুলাস ও ফ্লোকিউলাস সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই।

সোমা ও ঝুমা চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা-12

প্রশ্ন 2. : হোলোগ্রাফ কি ?

সুখেন চক্রবর্তী, মুর্শিদাবাদ
রাজেন্দ্রনাথ পোদ্দার, দার্জিলিং

উত্তর 1. : সূর্যের আলোকমণ্ডলের উপর স্থানে স্থানে কোন কোন সময় উজ্জ্বল মেঘের মত অংশ দেখা যায়। এগুলি সূর্যের বায়ুমণ্ডলের তুলনায় উচ্চ তাপমাত্রা বিশিষ্ট। এগুলিকেই ফেকুলাস বলা হয়। সূর্যের গোলক প্রান্তের বাইরে অপেক্ষাকৃত শীতল স্তরগুলিতে ফেকুলাস দৃষ্ট হয়। এদের উৎপত্তি আলোকমণ্ডলের উচ্চতর স্থান-সমূহে। এদের তাপমাত্রা বাইরের দিকের তুলনায় ভিতরের দিকে বেশী। এখানের পরমাণু আলোকমণ্ডলের পরমাণুর তুলনায় বেশী উত্তেজিত। ফেকুলাস থেকে অধিক-মাত্রার অতিবেগুনী রশ্মি বিকিরিত হয়—যা পরমাণুতে অধিক উত্তেজনা সৃষ্টি করে

বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। আলোকমণ্ডলের তুলনায় ফেকুলাসে ক্যালসিয়াম আয়নের পরিমাণ কম থাকে। সে কারণে ফেকুলাসের বর্ণালী বিশ্লেষণে ক্যালসিয়াম আয়নের রেখা স্পষ্ট ধরা যায় না।

ফেকুলাস যখন বর্ণমণ্ডলে সম্প্রসারিত হয়, তখন তাকে ফ্লোকিউলাস বলা হয়। সৌর বায়ুমণ্ডলের তুলনায় ফ্লোকিউলাসের তাপমাত্রা যথেষ্ট বেশী হয়ে থাকে। কাজেই এখানের পরমাণু অপেক্ষাকৃত বেশী উত্তেজিত। সৌর-সক্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে ফ্লোকিউলাসের ক্ষেত্রফল ও তীব্রতা বাড়ে। এদের আকৃতিও সূর্যের পর্যায়কালের সঙ্গে পরিবর্তনশীল। ফ্লোকিউলাস সূর্যের সমগ্র গোলকেই দেখা যায়।

উত্তর 2. : এক নতুন পদ্ধতির আলোকচিত্রকে হোলোগ্রাফ বলা হয়। এই পদ্ধতিতে দৃশ্য বস্তুর আকৃতিকে আলোক-তরঙ্গের ব্যতিকরণ ও অপবর্তন ধর্মের সাহায্যে বিশেষ সঙ্কেতে আবদ্ধ করে রাখা হয় এবং প্রয়োজনমত বিশেষ ব্যবস্থায় আবদ্ধ সঙ্কেত থেকে মূল বস্তুর সঠিক প্রতিকৃতি নির্ণয় করা হয়ে থাকে—যা চোখে দেখা বাস্তব আকৃতির ঠিক অনুরূপ। দেখবার দিক পরিবর্তন করে দৃশ্য বস্তুর আকৃতির বিভিন্ন অংশ দেখা যেতে পারে। হোলোগ্রাফে পাওয়া প্রতিকৃতিতেও একই সুবিধা পাওয়া যায়। আলোকচিত্রে বস্তুর প্রতিকৃতি আসলটির অনুরূপ হয় না। সেখানে তিনমাত্রার (দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতা) মধ্যে মাত্র দুটি মাত্রাই প্রকাশিত হয়—তাই চিত্রের মৌলিকত্ব নষ্ট হয়ে যায়। ত্রিমাত্রিক চলচ্চিত্রেও আসল বস্তুর বোধ পুরাপুরি প্রকাশ পায় না। হোলোগ্রাফের সাহায্যে আমরা এই সব অভাব কাটিয়ে উঠতে পারি। যার জন্যে এই নতুন কায়দার আলোকচিত্র ব্যাপকভাবে সমাদৃত হচ্ছে।

1949 সালে বিজ্ঞানী গ্যাবর (D. Gabor) প্রথম এই হোলোগ্রাফীয় পদ্ধতির তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রবর্তন করেন। আলোকের অপবর্তন ও ব্যতিকরণ ধর্মের গাণিতিক তত্ত্বের সাহায্যে হোলোগ্রাফীয় ব্যবস্থার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। সুসঙ্গত এবং জোরালো রশ্মি—লেসার রশ্মি—আবিষ্কৃত হবার পর 1963 সালে গ্যাবর তত্ত্বের ব্যবহারিক প্রয়োগ হিসাবে প্রথম তৈরি হোলোগ্রাফ থেকে বিজ্ঞানীরা মূল বস্তুর প্রতিকৃতি প্রদর্শন করেন।

বর্তমানে হোলোগ্রাফ পদ্ধতির সাহায্যে চলচ্চিত্র নির্মাণের চেষ্টা করা হচ্ছে। জীববিদ্যা, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে হোলোগ্রাফের প্রয়োগ বিরাট সম্ভাবনা এনে দিয়েছে।

শ্যামসুন্দর দে*

*ইনষ্টিটিউট অব রেডিও-ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা 9

বিবিধ

মাতৃভাষায় বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ ও প্রসার সম্পর্কে আলোচনা-সভা

গত 23শে ফেব্রুয়ারী কলকাতায় বিজ্ঞান কংগ্রেসের 59তম বার্ষিক অধিবেশনের শেষ দিনে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ও ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের যৌথ উদ্যোগে মাতৃভাষায় বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ ও প্রসার সম্পর্কে বসু বিজ্ঞান মন্দিরে একটি আলোচনা-সভার আয়োজন করা হয়। জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু এই সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং বাংলাদেশ থেকে আগত কয়েকজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

বাংলাদেশের বিজ্ঞানী-দলের নেতা বিশিষ্ট রসায়নবিদ্ ডক্টর কুদরাত ই খুদা বলেন, মাতৃভাষায় শিক্ষা পেলেই তবে ছাত্রদের প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব। এই ব্যাপারে বাংলাদেশে এতদিন তেমন একটা চেষ্টা হয় নি। বাংলাদেশ প্রাণ দিয়ে মাতৃভাষার মান রেখেছে। মাতৃভাষায় শিক্ষার দাবী তাই নতুন করে প্রাণ পেয়েছে। আর দেরী না করে এখনই মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করবার জন্যে সকলকে সচেষ্ট হতে আহ্বান জানাই। একাজে অসুবিধা আছে ঠিকই, কিন্তু তা অনতিক্রম্য নয়। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা চালু হলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শিক্ষার মান কমে যাবে বলে সাধারণ ভাবে যে মত প্রকাশ করা হয়ে থাকে, আমি তার সঙ্গে একমত নই। বাংলাভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা মোটেই অসম্ভব নয়।

ব্যক্তিগত জীবনের কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করে ডক্টর খুদা বলেন, ছাত্র জীবনে ইংরেজীতেই পড়াশোনা করতে হয়েছে। অধ্যাপনার সময়েও ইংরেজীতে পড়াতে হয়েছে, মনে মনে এর জন্যে বেদনা ছিল। অবসর পাওয়ার পর তাই জৈব রসায়নের চারটি শাখার বাংলা বই লিখেছি। আদর্শ বই লেখা নয়, ছোটদের জন্যে বাংলাভাষায় বই লেখায় অন্যদের উৎসাহিত করাই ছিল এর একমাত্র উদ্দেশ্য। বাংলাভাষায় বিজ্ঞান ও অন্যান্য পাঠ্য বই রচনার জন্যে তরুণ লেখকদের আমি আহ্বান জানাই। বিজ্ঞানের বই লেখার সময় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রচলিত পরিভাষা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কেন্দ্রের প্রধান ডক্টর শামসের আলি বলেন, শিক্ষায় মাতৃভাষা চালু করতে হলে আগে আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন প্রয়োজন। যে ভাষায় কথা বলি, চিন্তা করি, স্বপ্ন দেখি, সে ভাষায় সব কিছুই করা যায়—এই বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন। বাংলায় বিজ্ঞান চর্চা সহজসাধ্য বলেই আমি মনে করি। ইংরেজী ভাষার চাপে অনেক প্রতিভা চাপা পড়ে থাকে, বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায় না। কেবল বহিঃসংযোগের জন্যে ঐচ্ছিক ভাষা হিসাবে ইংরেজী আমরা শিখব।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক ডক্টর শামসুল ইসলাম বলেন বাংলাভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা সম্ভব কিনা, সে ব্যাপারে 1969 সালের আগে পর্যন্ত আমার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। আজ তা কেটে গেছে। বাংলাদেশের ছাত্রেরা আজ সাফ বলে দিয়েছেন, যে শিক্ষক ইংরেজীতে পড়াবেন, আমরা তাঁর ক্লাশ করব না। এতে

অনেক ভাল ফল দেখা যাচ্ছে। রাশিয়ায় গিয়ে দেখলাম, পি-এইচ-ডি-র থিসিস পর্যন্ত মাতৃভাষায় লেখা হচ্ছে। আমি মনে করি, একটা ভাষা ভাল জানলে অন্য ভাষা শেখাও শক্ত হয় না। সুতরাং প্রয়োজনে ইংরেজী আয়ত্ত করবার কোন অসুবিধা হবে না।

কলকাতার বিড়লা শিল্প সংগ্রহশালার অধিকর্তা ডক্টর অমলেন্দু বসু দেশের জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান প্রসারের জন্যে তাঁরা যেসব কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন, তার বিবরণ দেন। এর ফলে গ্রামাঞ্চলেও সাধারণ লোকের মধ্যে বিজ্ঞান সম্পর্কে ক্রমশঃ আগ্রহ বাড়ছে।

'দেশ' পত্রিকার শ্রীসমরজিৎ কর আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে বলেন, যাদের জন্যে আমরা লিখি তাদের মাঝে মাঝে বৈঠক ডেকে মতামত জানা দরকার। তা হলে আমরা বুঝতে পারব, কি ভাবে অগ্রসর হলে আমরা সুফল পাব।

আলোচনার দ্বিতীয় পর্যায়ের যোহানেস কেপ্লারের চতুঃশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন খড়্গপুরের আই. আই. টির অধ্যাপক ডক্টর গগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং যাদবপুরের ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সেন। ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় কেপ্লারের জীবনকথা ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাঁর অবদানের বিষয় আলোচনা করেন। আর শ্রী সেন পদার্থবিদ্যায় কেপ্লারের অবদানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।

সভাপতি অধ্যাপক বসু আলোচনাপ্রসঙ্গে দেশের সাধারণ লোকের মধ্যে বিজ্ঞান-চেতনা জাগিয়ে তোলবার জন্যে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের 25 বছর ব্যাপী নানা কর্মপ্রয়াসের কথা উল্লেখ করেন। আজকাল বিজ্ঞান সম্পর্কে সাধারণ লোকেরা যে ক্রমশঃ আগ্রহ প্রকাশ করছে, তাতে তিনি আনন্দিত। এই ব্যাপারে তরুণদের এগিয়ে আসতে তিনি আহ্বান জানান এবং বিজ্ঞান প্রসারের কাজে জনসাধারণের সহযোগিতা কামনা করেন।

ডক্টর বি. পি. পাল এফ-আর-এস নির্বাচিত

নয়া দিল্লী থেকে 21শে মার্চ পি. টি. আই কর্তৃক প্রচারিত সংবাদে প্রকাশ—ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চ-এর প্রথম ডিরেক্টর-জেনারেল ডক্টর বি. পি. পাল লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটির ফেলো (এফ-আর-এস) নির্বাচিত হয়েছেন।

প্রধান সম্পাদক —শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ 37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

রজত জয়ন্তী বর্ষ | মে, 1972 | পঞ্চম সংখ্যা

বর্তমান ভারতে রাসায়নিক শিল্প

বাংলা দেশকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ভারতের জয়লাভ আমাদের সকলের কাছে বিশেষ গৌরব ও গর্বের বিষয়। এর ফলে আমাদের আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতা যেভাবে জেগে উঠেছে, তা এর আগে আর কখনও তেমন-ভাবে প্রকাশ পায় নি। একদিন ছিল যখন খাদ্য, রাসায়নিক দ্রব্য, যন্ত্রপাতি, প্রতিরক্ষার অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদির জন্যে বিদেশের উপর আমাদের একান্ত-ভাবে নির্ভর করে থাকতো হতো। কিন্তু আজ অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। আজ আমরা সে পরনির্ভরতা অনেকখানি দূর করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারছি। খাদ্যের ক্ষেত্রে আজ আমরা স্বয়ম্ভর হতে পেরেছি—একথা বলা চলে। অন্যান্য ক্ষেত্রে আজ আমরা স্বনির্ভর হতে না পারলেও পরনির্ভরতা ক্রমশঃ কমে আসছে।

তিরিশ বছর আগে এই দেশে সালফিউরিক অ্যাসিড, নাইট্রিক অ্যাসিড, ফটকিরি, ন্যাপথা-লিন ইত্যাদি অল্প কয়েকটি রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত হতো। কিন্তু আজ আমাদের দেশে নানা রকম রাসায়নিক দ্রব্য, যেমন—সার, ভেষজ, কীটঘ্ন, অতিকায় অণুঘটিত পদার্থ (প্লাস্টিক), কৃত্রিম তন্তু, রঞ্জন দ্রব্য প্রভৃতি প্রস্তুত হচ্ছে। বর্তমানে আমাদের দেশে রাসায়নিক শিল্পের মোট মূলধন হচ্ছে 16,00 কোটি টাকা। এই দেশে বর্তমানে বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে রাসায়নিক শিল্পের স্থান হচ্ছে চতুর্থ—তন্তু, লৌহ ও ইস্পাত

এবং যন্ত্রশিল্পের পর তার স্থান। দশ বছর আগে উৎপাদিত রাসায়নিক দ্রব্যের মূল্য ছিল 200 কোটি টাকা, কিন্তু আজ রাসায়নিক দ্রব্যের মূল্যমান দাঁড়িয়েছে 700 কোটি টাকা। শুধু মূল্যমান বৃদ্ধি নয়, রাসায়নিক শিল্পের বৈচিত্র্যেরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে প্রভূতভাবে।

রাসায়নিক শিল্পের এই শ্রীবৃদ্ধি ও প্রসারের বহু উল্লেখযোগ্য দিক আছে। তার মধ্যে দুটি হচ্ছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। একটি হচ্ছে খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জনে রাসায়নিক সার ও কীটঘ্ন পদার্থের গুরুত্বপূর্ণ অবদান। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে ভেষজ দ্রব্যের মাধ্যমে জাতীয় স্বাস্থ্য উন্নয়নে অবদান। আজ প্রায় প্রতিটি গৃহে প্লাস্টিকের তৈরি জিনিসপত্র স্থান করে নিয়েছে। কৃত্রিম তন্তুর ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়। এভাবে রাসায়নিক শিল্পের উৎপাদিত জিনিষগুলি আজ প্রতিটি গৃহে প্রত্যেক মানুষের সদ্ব্যবহারে লাগছে।

তবে একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, জৈব রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতের ক্ষেত্রে আজও আমরা অনেকখানি পিছিয়ে আছি। আর এই জৈব রাসায়নিক দ্রব্যগুলিই হচ্ছে আধুনিক প্লাস্টিক্স, রঞ্জন দ্রব্য ও ভেষজ দ্রব্য প্রস্তুতের মূল উপকরণ। উন্নত দেশগুলিতে আজ রাসায়নিক শিল্পের মূল উপকরণের অধিকাংশ পেট্রো-কেমিক্যাল উৎস থেকে আহরিত হয়ে থাকে। পেট্রো-কেমিক্যালের সর্বপ্রথম উদ্ভব হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, কারণ সেখানে গৃহস্থালীর প্রয়োজনে গ্যাসোলিনের (Gasoline) চাহিদা ছিল অত্যধিক। পশ্চিম জার্মেনীতে 1939 সালে রাসায়নিক মূল উপকরণের শতকরা মাত্র 10 ভাগ পাওয়া যেত পেট্রো-কেমিক্যাল উৎস থেকে। কিন্তু আজ তা শতকরা 50 ভাগেরও বেশী হয়ে দাঁড়িয়েছে। পেট্রো-কেমিক্যালের ক্ষেত্রে ইটালী এবং জাপানও আজ অনেক উন্নতি লাভ করছে। ভারতে আজ পেট্রো-কেমিক্যাল থেকে রাসায়নিক মূল উপকরণ উৎপাদনের প্রধান বাধা হচ্ছে কারিগরী জ্ঞানের অভাব ও উপযুক্ত অর্থ বিনিয়োগের অপ্রতুলতা। আর্থিক ভিত্তিতে পেট্রো-কেমিক্যালের সদ্ব্যবহার করতে হলে এই জটিল রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতের কারখানা বৃহদাকার হওয়া প্রয়োজন এবং এই পদ্ধতিতে যেসব রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদিত হবে, এদেশে সেগুলির প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার হওয়া প্রয়োজন, নইলে আর্থিক ক্ষতি হবার সম্ভাবনা।

পেট্রো-কেমিক্যাল উৎস থেকে বিবিধ জৈব রাসায়নিক দ্রব্য ও তাদের উপজাত দ্রব্যগুলি যথোপযুক্ত পরিমাণে উৎপাদন ভারত নীতিগতভাবে গ্রহণ করেছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পেট্রো-কেমিক্যাল প্রকল্প গড়ে তোলবার জন্যে বিগত কয়েক বছরে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার নানাবিধ বিচার-বিবেচনা করেছেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত এই বিষয়ে যা অগ্রগতি হয়েছে, তাকে মন্থরই বলা চলে; কারণ পেট্রো-কেমিক্যাল উৎস থেকে উপজাত গ্যাসোলিন জাতীয় কতকগুলি দ্রব্যের চাহিদা এখন আর তেমন দেখা যাচ্ছে না। এসব দ্রব্যের সদ্ব্যবহারের জন্যে বিদেশ থেকে যথোপযুক্ত কারিগরী জ্ঞান আহরণের প্রশ্ন দেখা দেয়। এক্ষেত্রে আর একটি জটিল বিষয় হচ্ছে, বিদেশ থেকে আমদানীকৃত অপরিশুদ্ধ তেলের ক্রমবর্ধমান দাম। এসব অসুবিধার দরুণ ভারতে পেট্রো-কেমিক্যাল শিল্পের উন্নতি ব্যাহত হচ্ছে। মহারাষ্ট্রে ভারত সরকার যে নিজস্ব প্রকল্প চালু করেছেন, তার অগ্রগতিও সীমিত।

পশ্চিম বাংলায় তমলুকের কাছে হলদিয়ায় একটি পেট্রো-কেমিক্যাল প্রকল্প চালু করবার প্রস্তাব হয়েছে। এর সমর্থনে নানা মহল থেকে যুক্তিও পেশ করা হয়েছে। একটা কথা বলা দরকার, বিদেশ থেকে অপরিশুদ্ধ তেল আমদানী করেও আর্থিক ভিত্তিতে পেট্রো-কেমিক্যাল শিল্প গড়ে

তোলা যায়। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে জাপান। জাপানে পেট্রো-কেমিক্যাল শিল্প বিদেশ থেকে আমদানীকৃত তেলের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। তা সত্ত্বেও জাপান আজ পেট্রো-কেমিক্যাল শিল্পের ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি লাভ করেছে। কারণ জাপানে এই জটিল রাসায়নিক দ্রব্যগুলি যেমন প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন হয়, তেমনি তাদের চাহিদাও আছে প্রচুর। হলদিয়ার পেট্রো-কেমিক্যাল শিল্প গড়ে উঠলে পশ্চিম বাংলা উৎপাদিত রাসায়নিক দ্রব্যগুলির একটা মোটা অংশের সদ্ব্যবহার করতে পারে—সেটা রং ও ভার্নিস প্রস্তুতের জন্যে হোক বা প্লাস্টিকের জিনিষপত্র তৈরির জন্যে হোক। বস্তুতঃ আসাম, বিহার (বারৌনি) ও পশ্চিম বাংলাকে (হলদিয়া) নিয়ে গঠিত পূর্বাঞ্চলের পেট্রো-কেমিক্যাল শিল্প উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াবে হলদিয়ার প্রকল্প।

রাসায়নিক সার ও কীটঘ্ন প্রস্তুতের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল চিত্র দেখতে পাই। এই ক্ষেত্রেই সম্ভবতঃ রাসায়নিক শিল্পের সবচেয়ে বড় অবদান। ভারতের জনসংখ্যার প্রায় 70% কৃষির উপর নির্ভরশীল এবং তাদের কাছে রাসায়নিক সার ও কীটঘ্ন পদার্থ হচ্ছে অতি প্রয়োজনীয় উপকরণ। আজ যে আমরা খাদ্যের ক্ষেত্রে স্বয়ম্ভর হতে পেরেছি, তার মূলে রয়েছে রাসায়নিক শিল্পের অনেকখানি অবদান। রাসায়নিক সার ও কীটঘ্ন পদার্থ এদেশে প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত না হলে খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জন করা সম্ভব হতো না।

ভেষজ দ্রব্য হচ্ছে রাসায়নিক শিল্পের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এদেশে ভেষজ দ্রব্য বহুকাল থেকেই প্রস্তুত হচ্ছে, কিন্তু 1960 সালের পর থেকে এক্ষেত্রে প্রকৃত অগ্রগতি দেখা গেছে। 1947 সালে এদেশে 10 কোটি টাকার মত ভেষজ দ্রব্য বছরে প্রস্তুত হতো। ক্রমোন্নতির ফলে আজ এদেশে প্রস্তুত ভেষজ দ্রব্যের মূল্যমান হচ্ছে বছরে 200 কোটি টাকারও বেশী। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে, 20 বছর পূর্বে বিদেশ থেকে আমদানীকৃত উপকরণ দিয়ে ভেষজ দ্রব্য প্রস্তুত হতো। কিন্তু আজ বিবিধ ভেষজ প্রস্তুতের নানাবিধ মূল উপকরণ এদেশে প্রস্তুত হচ্ছে। বর্তমানে উৎপন্ন মূল উপকরণের পরিমাণ হচ্ছে বছরে 20 কোটি টাকার মত।

জাতীয় অর্থনীতিতে ভেষজ দ্রব্যাদি আজ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। সমাজের সর্বস্তরে কল্যাণকর কার্যক্রমের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে উন্নততর ভেষজ অধিক পরিমাণে উৎপাদনের চেষ্টা চলছে।

প্লাস্টিক শিল্পও আজ এদেশে একটি উল্লেখযোগ্য রাসায়নিক শিল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে এই শিল্পের দ্রুত উন্নতি ঘটেছে। ধাতব জিনিষপত্রের তুলনায় প্লাস্টিকের জিনিষপত্র অর্থনৈতিক দিক থেকে বেশী সুবিধাজনক। সে কারণে আজ টিন, তামা, পিতল ও অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি জিনিষপত্রের পরিবর্তে প্লাস্টিকের তৈরি জিনিষপত্র অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে।

প্লাস্টিক্স যেমন অতিকায় অণুঘটিত রাসায়নিক পদার্থ, নাইলন টেরিলিন ইত্যাদি কৃত্রিম তন্তুও তেমনি সমগোত্রীয় রাসায়নিক পদার্থ।

সাম্প্রতিক কালে ব্যাপক আন্তর্জাতিক রাসায়নিক গবেষণার ফলে এই জাতীয় কৃত্রিম তন্তুর প্রভূত উন্নতি ও প্রসার ঘটেছে। আমাদের দেশেও সরকার কৃত্রিম তন্তু উৎপাদন সম্প্রসারণের কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন এবং আগামী পাঁচ বছরে নাইলন, অ্যাক্রাইলিক, পলিএস্টারজাতীয় তন্তুর উৎপাদন প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে। কৃত্রিম রাবার প্রস্তুতের একটি কারখানা স্থাপনের কাজও আমাদের দেশে এগিয়ে চলেছে। বর্তমানে এদেশে প্রস্তুত প্লাস্টিকের মূল উপকরণের মূল্যমান হচ্ছে আনুমানিক 40 কোটি টাকা।

সংশ্লেষিত জৈব রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুতের ক্ষেত্রে বর্তমানে এদেশে যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এক সময় ছিল যখন আমাদের দেশে সংশ্লেষিত জৈব রাসায়নিক পদার্থ বলতে বিশেষ কিছু প্রস্তুত হতো না। কিন্তু আজ পলিইথিলিন, পলিভিনাইল ক্লোরাইড (PVC), পলিস্টেরিন, ইউরিয়া-ফরম্যালডিহাইড, আই. এন. এইচ (INH), ডি. ডি. টি, হর্মোন, ভিটামিন-সি ইত্যাদি নানা প্রকার জৈব রাসায়নিক দ্রব্য এদেশে সংশ্লেষণ পদ্ধতিতে প্রস্তুত হচ্ছে। তবে এখনও অনেক জৈব রাসায়নিক পদার্থ এদেশে সংশ্লেষণ করবার অবকাশ রয়েছে।

এভাবে বর্তমানে আমাদের দেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাসায়নিক শিল্পের অগ্রগতি বিশেষ আশাপ্রদ। এক সময় আমাদের রাসায়নিক শিল্পের কারিগরী জ্ঞানের জন্যে বিদেশের দ্বারস্থ হতে হতো এবং উন্নত দেশগুলির মানের সমপর্যায়ে আসবার জন্যে আজও কয়েকটি ক্ষেত্রে আমাদের বিদেশী কারিগরী জ্ঞানের সাহায্য নিতে হচ্ছে। কিন্তু সেই সঙ্গে আমরা নিজেরাও রাসায়নিক শিল্পের বহু ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কারিগরী পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছি এবং অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলিকে আমাদের আহরিত কারিগরী জ্ঞান দিয়ে সাহায্য করছি। আমাদের বিভিন্ন জাতীয় গবেষণাগার নতুন নতুন কারিগরী পদ্ধতি উদ্ভাবন করে এই বিষয়ে অনেকখানি সাহায্য করেছে ও করছে। তবে রাসায়নিক শিল্পের ক্ষেত্রে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের জন্যে আমাদের দেশে রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে গবেষণার প্রতি আরও গুরুত্ব আরোপ করা একান্ত প্রয়োজন।

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্ভাব্যতাবাদের গোড়ার কথা

কল্যনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

তাস-পাশা খেলাকে আমাদের দেশে আজও সম্মানের চোখে দেখা হয় না। তাস-পাশা বা লুডো নিয়ে খেলতে দেখলে আমরা প্রায়ই বলে বসি—ছেলেটার আর কিছু হলো না। তাস-পাশায় যখন মন গেছে, তখন ছেলেটার বারোটা বেজে গেছে। কিন্তু শুনে হয়তো আশ্চর্য লাগবে যে, এই তাস-পাশাকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছে সম্ভাব্যতাবাদ বা Theory of Probability, যার প্রয়োজন আজ বিজ্ঞান-জগতে অপরিহার্য। এটি গণিতের এক শাখা রাশিবিজ্ঞানের (Statistics) একটি অংশ।

আমরা প্রায়ই বলে থাকি—অমুক ছেলেটার পরীক্ষায় পাস করবার 'নাইন্টি পারসেন্ট চান্স' বা অমুক প্রশ্নটি পরীক্ষায় পড়ার 'নাইন্টি নাইন পারসেন্ট চান্স', তখন কিন্তু আমরা আমাদের অজ্ঞাতসারে এই সম্ভাব্যতাবাদের কথাই বলি।

সম্ভাব্যতাবাদে কোন একটি ঘটনা ঘটবার সম্ভাবনা কত, তাই নিয়েই আলোচনা করা হয়। সেখানে নিশ্চয়তার কোন কথা নেই। কোন একটি ঘটনা কতবার ঘটতে পারে, সেই সম্ভাব্যতার কথাই সম্ভাব্যতাবাদ থেকে আমরা শুধু জানতে পারি। কিন্তু কোন একটি মুহূর্তে ঠিক সেই ঘটনাটি ঘটবে কিনা, তা বলা যায় না। উদাহরণের সাহায্যে ব্যাপারটা বোঝানো যেতে পারে। মনে করুন, ক্রিকেট বা ফুটবল খেলায় ক আর খ বাবু টস্ করতে নেমেছেন। এখন

টস্ করলে হয় হেড, নয় টেল হবে। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে হেড হবে, না টেল হবে, তা বলা মুস্কিল। কিন্তু হেড বা টেল পড়বার সম্ভাবনা সমান সমান। কারণ ঐ দুটির মধ্যে যে কোন একটি হতে পারে অর্থাৎ তাদের সম্ভাবনা শতকরা 50 বা $\frac{1}{2}$, কাজেই দু-বার টস্ করলে হেড পড়বার কথা একবার, টেল অন্যবার। সম্ভাবনা সে শুধু সম্ভাবনাই—তার কোন নিশ্চয়তা নেই; অর্থাৎ দু-বার টস্ করলে আপনি দেখবেন যে, দু-বারই হেড হলো বা দু-বারই টেল হলো। এর ফলে হয়তো আপনার মনে সংশয় দেখা দেবে যে, সম্ভাব্যতাবাদ তাহলে সত্য হলো কি করে? কিন্তু না, সম্ভাব্যতাবাদের কথাগুলি সত্য কিনা—তা দেখতে হলে আপনাকে টসের সংখ্যা বাড়াতে হবে। টসের পরিমাণ যত বাড়াবেন, ততই সম্ভাব্যতাবাদের সিদ্ধান্ত নির্ভুল হবে। কাজেই টসের সংখ্যা যদি এক লক্ষ করা যায়, তবে হেড-টেল দুইয়েরই সংখ্যা নিশ্চিতভাবে পঞ্চাশ হাজারের কাছাকাছি হবে। এথেকে আমরা কোন একটি ঘটনা ঘটবার সম্ভাব্যতাকে এইভাবে লিখতে পারি—

কোন একটি ঘটনা ঘটবার সম্ভাব্যতা $= \dfrac{\text{ঘটনাটি যথার্থ যতবার ঘটে}}{\text{মোট ঘটবার সংখ্যা}}$

অর্থাৎ ঘটনাটি যথার্থ যতবার ঘটে $=$ ঘটনাটি ঘটবার সম্ভাব্যতা $\times$ মোট ঘটনার সংখ্যা

এটা তখনই ঘটবে, যখন ঘটনার সংখ্যা খুব বেশী এবং প্রত্যেকটি ঘটনা স্বাধীন (Independent)।

যেমন ধরুন, লুডো খেলবার সময় সবাই ছক্কা পড়ুক—এটাই চায়। লুডো খেলার ঘুঁটিতে ছয়টা পিঠ, এক থেকে ছয়। এখন ছয়বার লুডোর ঘুঁটি চাললে এক থেকে ছয় পর্যন্ত সব ঘরের চাল একবার করে পাওয়া যেতে পারে—গাণিতিক দিক দিয়ে এমন কথা বলা যায়। কাজেই ছয়বার চাললে ছক্কা একবার পড়তে পারে। কাজেই ঘটনার সংখ্যা যখন ছয়, তখন ছক্কা পড়বে একবার অর্থাৎ ছক্কা পড়বার সম্ভাব্যতা হচ্ছে $\frac{1}{6}$। 6 বার চাল দিলেই যে ছক্কা একবার পড়বেই—একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। কিন্তু চালের সংখ্যা যদি খুব বেশী হয়—যেমন ধরুন 6,00,000 বার, তবে ছক্কা প্রায় 1,00,000 বারের কাছাকাছি পড়বে। তেমনি লটারীর টিকিট কেটে অনেকে প্রথম পুরস্কার পাবার আশায় সুখস্বপ্ন রচনা করে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, আপনার মত আরও দশ লক্ষ লোক টিকিট কেটে আপনার মতই স্বপ্নজাল পেতেছে। কিন্তু প্রথম পুরস্কার ঐ দশ লক্ষ লোকের মধ্যে যে কেউ পেতে পারে। কাজেই প্রত্যেকের প্রথম পুরস্কার পাবার সম্ভাব্যতা $\dfrac{1}{10,00,000}$; অর্থাৎ খুবই কম! কিন্তু যদি ঐ দশ লক্ষের মধ্যে পাঁচ লক্ষ আপনি কিনতেন, তবে আপনার সম্ভাব্যতা নিশ্চয়ই হতো $\dfrac{1}{10,00,000} \times 5,00,000 = \frac{1}{2}$; অর্থাৎ আপনার পুরস্কার পাবার সম্ভাব্যতা শতকরা 50 ভাগ, অর্থাৎ উজ্জ্বল সম্ভাব্যতা! আর সব টিকিটই যদি আপনার কেনা থাকতো, তবে তো আপনার প্রথম পুরস্কার পাবার সম্ভাব্যতা শতকরা 100 ভাগ। তার অর্থ—আপনি সব পুরস্কার পেয়ে বসে আছেন।

এতক্ষণ আমরা কোন একটি ঘটনা ঘটবার সম্ভাব্যতা কত, তা নিয়ে আলোচনা করলাম। এবার আসুন কোন একটি মিশ্রিত ঘটনা (Composite event) ঘটবার সম্ভাব্যতা বের করা যাক।

মনে করুন, আপনার কাছে দু-রকম মুদ্রা আছে এবং প্রত্যেকটিকে অনেকবার টস্ করলেন। এখন প্রথম মুদ্রার হেড হবার সম্ভাব্যতা $\frac{1}{2}$ এবং

দ্বিতীয় মুদ্রার হেড হবার সম্ভাব্যতা $\frac{1}{2}$। এখন একই সঙ্গে দুটি মুদ্রাকে টস্ করলে উভয় ক্ষেত্রেই হেড হবার সম্ভাব্যতা কত বলতে পারেন? সব-সমেত সম্ভাব্যতা কয়টি? প্রথমটির হেড দ্বিতীয়টির টেল কিংবা প্রথমটির টেল দ্বিতীয়টির হেড—এই হলো দুই বা দুটিই হেড হতে পারে কিংবা দুটিই টেল, এই বাকী দুই। তাহলে, এই চারটি সম্ভাব্যতার মধ্যে দুটিই হেড হবার সম্ভাব্যতা $\frac{1}{4}$ বা $\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}$; অর্থাৎ কোন একটি মিশ্রণের ঘটনা ঘটবার সম্ভাব্যতা হবে ঐ মিশ্রিত ঘটনা যতগুলি স্বাধীন ঘটনার দ্বারা গঠিত (এক্ষেত্রে দুটি ঘটনা), তাদের প্রত্যেকের সম্ভাব্যতার গুণফলের সমান।

মিশ্রণের ঘটনার আর একটি উদাহরণ লেখা যেতে পারে। ধরুন কোন পিতামাতা দুটি মাত্র সন্তান চান এবং সে দুটি সন্তানের মধ্যে প্রথমটি পুত্র হোক এবং দ্বিতীয়টি কন্যা হোক, এই তাঁরা চান। তাহলে তার সম্ভাব্যতা কত? এটি একটি মিশ্রিত ঘটনা, যা দুটি স্বাধীন ঘটনার মিশ্রণে গঠিত। দুটি সন্তানের মধ্যে প্রথমটি পুত্র হবার সম্ভাব্যতা $\frac{1}{2}$ এবং দুটি সন্তানের মধ্যে দ্বিতীয়টি কন্যা হবার সম্ভাব্যতাও $\frac{1}{2}$। তা হলে দুটি সন্তানের প্রথমটি পুত্র ও দ্বিতীয়টি কন্যা হবার সম্ভাব্যতা $=\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$। আবার ধরুন, পাঁচটি ছেলে ক, খ, গ, ঘ, ঙ রয়েছে। তাদের দিকে একটি লাল বল এবং একটি সাদা বল এমনভাবে ছোঁড়া হচ্ছে যে, তাদের বল দুটি পাবার সম্ভাব্যতা সমান। এখন ক-এর লাল বলটি পাবার সম্ভাব্যতা $\frac{1}{5}$। আর ক-এর সাদা বলটি পাবার সম্ভাব্যতাও $\frac{1}{5}$। কিন্তু দুটি বলই ক-এর একই সঙ্গে পাবার সম্ভাব্যতা নিশ্চয়ই কম এবং সেই সম্ভাব্যতা হচ্ছে $\frac{1}{5}\times\frac{1}{5}=\frac{1}{25}$। কারণ এটি নিঃসন্দেহে একটি মিশ্রিত ঘটনা।

সম্ভাব্যতাবাদের এটি গোড়ার কথা। কিন্তু সম্ভাব্যতাবাদ আজ গণিতের একটা বড় অংশ দখল করে আছে। এর প্রয়োজন আজ সর্বত্র। এর বহু বিচিত্র ব্যবহারিক দিকের মধ্যে কয়েকটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

বিজ্ঞানের ছাত্রমাত্রেই π (পাই) নামক গ্রীক অক্ষরটির সঙ্গে পরিচিত। গণিতে সাধারণতঃ কোন বৃত্তের পরিধি এবং ব্যাসের অনুপাতকে π-দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। π-এর স্থূল মান $\frac{22}{7}$ এবং চার দশমিক স্থান পর্যন্ত এর আসন্ন মান 3.1416। সম্ভাব্যতাবাদের সাহায্যে π-এর প্রায় সঠিক মান নির্ণয় সম্ভাব্যতাবাদের নির্ভুলতাই শুধু প্রমাণ করে না—বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর বহুল ব্যবহারের কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়। মনে করুন, একটি সমতলের উপর সমান a দূরত্বে কতকগুলি সরলরেখা টানা হলো এবং l দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট (যেখানে l, a অপেক্ষা ছোট) একটি কাঠি যদি ঐ সমতলে ফেলা হয়, তবে অঙ্ক কষে দেখানো যেতে পারে যে, কাঠিটির ঐ সরলরেখাগুলির যে কোন একটির উপর পড়বার সম্ভাব্যতা $\frac{2l}{\pi a}$। এখন যদি কয়েক হাজার বার ঐ কাঠিটি ঐ সমতলের উপর ফেলা যায়, তবে ঐ ঘটনাটি যতবার ঘটবে এবং মোট যতবার কাঠিটি ফেলা হবে, তার অনুপাত প্রায় ঐ ভগ্নাংশের সমান হবে এবং l ও a-এর মান জানা থাকায়, এখান থেকে সহজেই π-এর মান নির্ণয় করা যাবে। 1855 সালে এ. স্মিথ 3204 বার পরীক্ষার ফলে π-এর যে মান নির্ণয় করেন, তা হলো 3.1553। অধ্যাপক মরগ্যানের এক ছাত্র 600 বার পরীক্ষার দ্বারা π-এর মান বের করেন 3.137। 1864 সালে π-এর আসন্ন মান নির্ণয় করেন 3.1419—যা আশ্চর্যভাবে π-এর সঠিক মানের প্রায় সমান।

সম্ভাব্যতাবাদের সাহায্যে π-এর প্রায় কাছাকাছি মান নির্ণয়ের আরও অনেক পদ্ধতির মধ্যে নিম্নোক্ত পদ্ধতিটি বেশ আকর্ষণীয়।

এটা জানা গেছে যে, যদি যেমন খুশী তেমনি

দুটি সংখ্যা লেখা যায়, তবে ঐ সংখ্যা দুটির পরস্পরের মৌলিক (Prime) হবার সম্ভাব্যতা $6/\pi^2$। একটি পরীক্ষার সাহায্যে নিম্নলিখিত ফল পাওয়া যায়।

50 জন ছাত্রের প্রত্যেকে যেমন খুশী তেমনি 5 জোড়া সংখ্যা লেখে এবং তার মধ্যে দেখা যায় যে, 154 জোড়া সংখ্যা পরস্পর মৌলিক। তার ফলে আমরা লিখতে পারি,

$$\frac{6}{\pi^2}=\frac{154}{250}$$

অর্থাৎ $\pi = 3{\cdot}12$

সত্যই অদ্ভুত! খেয়ালখুশীমত যা কিছু লেখাটা বেনিয়ম হতে পারে, কিন্তু সেই বেনিয়মের মধ্যেও লুকিয়ে আছে নিয়মের কঠিন বন্ধন।

আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানে সম্ভাব্যতাবাদের প্রচুর ব্যবহার রয়েছে। কারণ আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানে যেখানে বেনিয়ম ঘটেছে—যার খেয়াল-খুশীর হদিশ পাওয়া বিজ্ঞানীদের কাছে দুঃসাধ্য মনে হয়েছে, সেখানেই তারা সম্ভাব্যতাবাদের শরণাপন্ন হয়েছেন। বেনিয়মের মধ্যে লুকিয়ে আছে নিয়মের যে প্রচ্ছন্ন বন্ধন, তাকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানীদের মতে ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন প্রভৃতি বিশ্বের মৌলিক কণাসমূহের (Fundamental particles) ব্যষ্টিগত অনুসন্ধান অসম্ভব। কেবলমাত্র সমষ্টিগতভাবেই প্রাথমিক উপাদান কণাগুলির মর্ম গ্রহণ করা সম্ভব। এই সমষ্টিগত বিচারে বিজ্ঞানী আজ সম্ভাব্যতাবাদকে মেনে নিয়েছেন।

বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইন কোন তরলে ভাসমান সূক্ষ্ম পদার্থের ব্রাউনীয় গতিবৈচিত্র্য (Brownian movement) নিরূপণে এই সম্ভাব্যতাবাদের সাহায্য নিয়েছিলেন।

গ্যাসের কাইনেটিক তত্ত্বে (Kinetic theory of gases) গ্যাসের অণুগুলির ভিতর গতিবেগ বন্টনের সূত্র (The law of distribution of velocities) নির্ণয়ে সম্ভাব্যতাবাদের সাহায্য নেওয়া হয়।

পদার্থ-বিজ্ঞানের একটি বিশিষ্ট শাখা থার্মো-ডিনামিক্স (Thermodynamics) আলোচনা বর্তমানে সম্ভাব্যতাবাদের সাহায্যে করা হচ্ছে এবং অনেক নতুন তথ্য এই সঙ্গে উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে।

কাজেই একথা আজ নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সম্ভাব্যতাবাদ গণিতবিদ্যা ও পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় প্রভূত পরিমাণে ব্যবহৃত হয়ে বিশ্বের রহস্য-সন্ধানে বিজ্ঞানের প্রচেষ্টার পূর্ণ সাফল্যের সম্ভাব্যতাকে বাড়িয়ে দিয়েছে।

সেচের বৈজ্ঞানিক নীতি ও পদ্ধতি

বিমলেন্দু গাঙ্গুলী*

পশ্চিমবঙ্গে সেচ দিয়ে যে সব ফসলের চাষ করা হয়, তার মধ্যে সর্বপ্রধান হলো ধান। সেচপ্রাপ্ত প্রায় ছেচল্লিশ লক্ষ একরের শতকরা যাটভাগ জমিতেই আউস বা আমন ধানের চাষ হয়। সেচপ্রাপ্ত জমির পরিমাণের দিক থেকে অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ফসল হলো—গম, বোরো ধান, আলু, সব্জি এবং আখ। মোট যত জমি সেচের জল পায়, তার দুই-তৃতীয়াংশ জমিই জল পায় বর্ষায় বা প্রাক্‌-বর্ষার মরসুমে আর রবিখন্দে সেচের ব্যবস্থা আছে বাকী এক-তৃতীয়াংশ জমিতে।

জলাভাবে ফসল যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সে জন্যে সেচের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু অনিয়ন্ত্রিত সেচের দ্বারা ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনাও কম নয়। জলের অপচয় ছাড়াও মাঠে জল জমলে ফসলের বৃদ্ধি ও উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে। জলের সঙ্গে উদ্ভিদের খাদ্যোপাদান ধুয়ে যায় এবং কালক্রমে মাটিরও যথেষ্ট ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে। অতএব সেচের জল ব্যবহারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার—যেন জলের সম্যক সদ্ব্যবহার হয় এবং প্রয়োজনের বেশী জল ফসল বা মাটির কোনও ক্ষতির কারণ না হয়। সেচের জলের সম্যক সদ্ব্যবহার করতে হলে মাটির সঙ্গে জলের এবং ফসলের সঙ্গে মাটি, জল ও আবহাওয়ার সম্পর্ক কি—সে বিষয়ে মোটামুটি অবহিত হওয়া দরকার।

মাটি, জল ও ফসলের পারস্পরিক সম্বন্ধ

জীবনধারণের প্রয়োজনে উদ্ভিদ শিকড়ের সাহায্যে মাটি থেকে জল টেনে নেয়। যে পরিমাণ জল এভাবে উদ্ভিদ মাটি থেকে গ্রহণ করে, তার অতি সামান্য অংশ সে নিজের দেহে সঞ্চিত রেখে বাকী প্রায় সবটাই বাষ্পাকারে ছেড়ে দেয়। উদ্ভিদের স্বাভাবিক জীবনযাপনের জন্যে এই বাষ্পমোচন অত্যাবশ্যক। উদ্ভিদ বাষ্পাকারে যে জল বাতাসে ছেড়ে দেয়, তার পরিমাণ প্রধানতঃ নির্ভর করে উদ্ভিদের চতুর্দিকের বাতাসের প্রকৃতির উপর। তাছাড়া মাটিতে জলের পরিমাণ এবং উদ্ভিদের বয়স ও অন্যান্য চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যও এই প্রক্রিয়াকে কিছুটা প্রভাবিত করে। তবে মাটিতে জলাভাব না হলে কোনও বিস্তীর্ণ সবুজ শস্যক্ষেত্র থেকে যে বাষ্পমোচন হয়, তা একান্তভাবেই আবহাওয়ার উপর নির্ভরশীল। কড়া রোদ, শুকনো ও গরম আবহাওয়ায় জলের প্রয়োজন বেশী হয়, আর স্যাঁৎসেতে, ঠাণ্ডা আবহাওয়া ও মেঘলা দিনে জলের প্রয়োজন হয় কম। কাজেই ফসলের জলের প্রয়োজন হিসেব করতে গেলে মাটির জলধারণ ক্ষমতা, আবহাওয়ার অবস্থা, উদ্ভিদের বয়স ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য এবং এগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক বিশদভাবে জানা প্রয়োজন।

কোনও নির্দিষ্ট পরিমাণ মাটি উপযুক্তভাবে ভিজিয়ে দিতে কতটা জলের দরকার, তা নির্ভর করে ঐ মাটির জলধারণ-ক্ষমতার উপর এবং এই জলধারণ-ক্ষমতা ঐ মাটির প্রকৃতি ও গঠনের উপর নির্ভরশীল। আবার মাটি যতটা জল ধরে রাখতে পারে, তার সবটাই উদ্ভিদ কাজে লাগাতে পারে না। মাটির রসের যে অংশ উদ্ভিদের কাজে লাগাতে পারে, তাকে ব্যবহারযোগ্য জল বলা হয়। একটি ভারী সেচ বা বৃষ্টির দু-দিন পরে

* গ্রামসেবক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, চুঁচুড়া, হুগলী।

সম্পূর্ণ জল নিষ্কাশন হয়ে গেলে মাটিতে যে জল থাকে, তাকে ঐ মাটির ব্যবহারযোগ্য জলধারণ-ক্ষমতার উর্ধ্বসীমা ধরা হয়। জলাভাবে উদ্ভিদ যখন শুকিয়ে যায়, তখন ঐ মাটিতে যে জল থাকে, তাকে ব্যবহারযোগ্য জলধারণ-ক্ষমতার নিম্নসীমা ধরা হয়। সাধারণ বেলে, দোঁয়াশ এবং এঁটেল মাটির ব্যবহারযোগ্য জলধারণ-ক্ষমতা মোটামুটি নিম্নোক্তরূপ :—

মাটির প্রকৃতি	মাটির প্রতি 10 সেণ্টিমিটার গভীরতার জন্মে ফসলের ব্যবহারযোগ্য জলের পরিমাণ (সেণ্টিমিটার)*
বেলে	0·4—1·2
দোঁয়াশ	1·2—1·6
এঁটেল	1·6—1·9

ফসলে সেচের রীতি ও পদ্ধতি

সেচ দেবার সময় স্বভাবতঃই তিনটি প্রশ্ন মনে আসে :—(1) কোন্ সময়ে সেচ দেওয়া উচিত; (2) প্রতিটি সেচে কি পরিমাণ জল দেওয়া যুক্তিযুক্ত এবং (3) জলের অপচয় কমিয়ে কি পদ্ধতিতে মাঠের সর্বত্র সমানভাবে ভিজিয়ে দেওয়া যায়? এই তিনটি প্রশ্ন নিয়ে কিছু আলোচনা করলে সেচ সম্পর্কে আধুনিক রীতি-নীতি অনেকটা স্পষ্ট হবে আশা করা যায়।

(1) সেচের সময় নির্ধারণ

উদ্ভিদের শিকড় মাটির যে স্তরে বিস্তৃত থাকে, সে স্তরে যখন উদ্ভিদের ব্যবহারযোগ্য জলের পরিমাণ এমন পর্যায়ে কমে যায় যে, উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও পরিণামে ফলন ব্যাহত হতে পারে—তার আগেই সেচের ব্যবস্থা করা দরকার। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে, মাটিতে ব্যবহারযোগ্য জলের অর্ধেক পরিমাণ খরচ হবার পর ফসলের বৃদ্ধি বিশেষভাবে ব্যাহত হতে সুরু করে।

মাটির জলধারণ-ক্ষমতার তারতম্যের ফলে প্রথমে বেলে মাটিতে পরে ক্রমান্বয়ে দোঁয়াশ ও এঁটেল মাটিতে সেচের প্রয়োজন দেখা দেয়। বিভিন্ন ফসল এবং একই ফসলের বিভিন্ন বয়সে শিকড় মাটির যে গভীরতায় প্রবেশ করে, তার তারতম্য হয়। চারা গাছের শিকড় মাটির মধ্যে কম গভীরতায় যায়—কাজেই চারা গাছে বড় গাছের চেয়ে ঘন ঘন হাল্কা সেচ দেওয়া প্রয়োজন। বিভিন্ন ফসলের অধিকাংশ শিকড়ই মাটির প্রথম স্তরের 30 সেণ্টিমিটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। সাধারণ মেঠো ফসলের ক্ষেত্রে 90 সেণ্টিমিটারের বেশী গভীরতায় খুব কম শিকড়ই পৌঁছায়। অধিকাংশ শিকড় মাটির প্রথম স্তরে সীমাবদ্ধ থাকায় উদ্ভিদ এই স্তর থেকেই বেশী পরিমাণে জল আহরণ করে

* সাধারণতঃ সেচের জল বা মাটির জলের পরিমাণ মাপা হয় সেণ্টিমিটার বা ইঞ্চিতে। কোনও নির্দিষ্ট আয়তনের জমিতে এক সেণ্টিমিটার গভীর একটি জলের স্তর দাঁড়ালে যে পরিমাণ জল হয়, তা সচরাচর এক সেণ্টিমিটার জল বলে প্রকাশ করা হয়। অনুরূপভাবে কোনও জমির 10 সেণ্টিমিটার গভীর মাটির স্তরে ফসলের ব্যবহারযোগ্য যে জল থাকে, তা সংগ্রহ করে জমির উপরে জমা করলে যদি এক সেণ্টিমিটার গভীর একটি জলের স্তর হয়, তবে ঐ পরিমাণ জলকেও এক সেণ্টিমিটার জল বলে প্রকাশ করা হয়।

এবং তার ফলে এই স্তরটাই তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। এই কারণে মাটির উপর থেকে 22 সেন্টিমিটার (আধ হাত) গভীরতায় মাটিতে ব্যবহারযোগ্য জলের পরিমাণ যাচাই করে সেচের সময় নির্ধারণ করা হয়। মাটিতে রসের পরিমাণ নির্ধারণের জন্যে পশ্চিমবঙ্গের চাষীদের পক্ষে সহজ পন্থা হলো:—জমির আধ হাত গভীরতায় কিছু মাটি মুঠা করে ধরে মাটির চেহারা দেখে সঙ্গের সারণী থেকে ঐ মাটিতে ফসলের ব্যবহারযোগ্য জল কতটা থাকতে পারে, তার একটা হিসাব করা। মাটিতে ব্যবহারযোগ্য জলের পরিমাণ শতকরা পঞ্চাশ ভাগে পৌঁছাবার আগেই সেচ দেওয়া দরকার।

প্রসঙ্গতঃ আর একটি বিবেচ্য বিষয় হলো—দুটি সেচের ব্যবধান। সব মাটিতেই উদ্ভিদের অধিকাংশ শিকড় মাটির উপর দিককার স্তরে সীমাবদ্ধ থাকায় সাধারণভাবে বলা যায় যে, মাটির প্রকৃতি যাই হোক না কেন, অনেক দিনের ব্যবধানে একটা ভারী সেচ দেবার চেয়ে ঐ সময়ে অল্প দিনের ব্যবধানে একাধিক হাল্কা সেচ ফসলের পক্ষে বেশী উপকারী।

জমিতে সেচ দেওয়া অনেক সহজ হতো যদি সময়মত প্রয়োজনীয় জল পাওয়া যেত, কিন্তু অনেক সময়েই তা পাওয়া যায় না। আবার উদ্ভিদ-জীবনের সকল পর্যায়েই সেচ ফলন বাড়াতে সমান কার্যকরী নয়। এজন্যে কোন্ ফসল তার জীবনের কোন্ কোন্ পর্যায়ে কতটা খড়া সহ্য করতে পারবে—সে বিষয়ে একটা সুস্পষ্ট ধারণা থাকলে সেচের জলের অধিকতর সদ্ব্যবহার হতে পারে। অন্যভাবে বলা যায় যে, উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও ফলনের জন্যে সব সময়েই মাটিতে ব্যবহারযোগ্য জলের অর্ধেকের বেশী থাকা উচিত। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় জলের যোগান কম হলে ফসলের জীবনের কোন্ কোন্ পর্যায়ে সেচের প্রয়োজন বেশী, তা জানা থাকলে ঐ সীমিত জল থেকে সম্ভাব্য সর্বাধিক ফলন পাওয়া যেতে পারে। যেমন—কোনও ফসলে যদি পাঁচটি সেচের প্রয়োজন থাকে আর জল থাকে দুটি সেচের উপযোগী, তবে ঐ সেচ দুটি কোন্ সময়ে দিলে ফসল সবচেয়ে বেশী উপকৃত হবে, তা জানা প্রয়োজন।

হাতে একমুঠো মাটি নিয়ে জোড়ে মুঠো করলে মাটির তালের চেহারা বা স্পর্শের সঙ্গে মাটিতে রসের পরিমাণের সাধারণ সম্পর্ক (সারণী ১।

ব্যবহার যোগ্য জলের শতকরা কত ভাগ মাটিতে আছে	মুঠোর মাটি দেখতে বা অনুভব করতে কেমন হবে			
	কাঁকুড়ে মাটি	বেলে মাটি	দোঁয়াশ মাটি	এঁটেল মাটি
0	শুকনো ঝুরঝুরে, মাটির দানাগুলি আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যায়।	শুকনো ও ঝুরঝুরে; আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যায়।	শুকনো, কখনো চটাবাঁধা, কিন্তু চটা সহজে ভেঙে গুঁড়া হয়ে যায়।	শক্ত, ডেলা, কখনও ফাটল থাকে, জমির উপরে গুঁড়া মাটি থাকতে পারে।
50 বা কম	শুকনো, চাপ দিয়েও তাল তৈরি হবে না।	শুকনো, চাপ দিয়েও তাল তৈরি হবে না।	খানিকটা ঝুরঝুরে, কিন্তু চাপ দিলে পরস্পর লেগে থাকে।	কিছুটা মোলায়েম, চাপ দিয়ে তাল করা যায়।
50 থেকে 75	শুকনো, চাপ দিয়েও তাল করা যাবে না।	চাপ দিয়ে তাল হলেও সহজেই তালটি ভেঙে যায়।	তাল তৈরি হবে, চেষ্টা করলে মাটিকে একটা নির্দিষ্ট আকার দেওয়া যায়, চাপ দিয়ে কিছুটা মসৃণ ও চকচকে করা যায়।	তাল তৈরি করা যাবে, বুড়ো আঙুল ও তর্জনীর সাহায্যে দড়ির মত লম্বা করা যাবে।
75 থেকে জলধারণ ক্ষমতার ঊর্ধ্বসীমা পর্যন্ত	মাটির দানাগুলি পরস্পর লেগে থাকতে চায়, চাপ দিয়ে তাল করা যায়, কিন্তু তা আপনা থেকেই ভেঙে যায়।	তাল করা যায়, কিন্তু তা সহজে ভেঙে যায়, মসৃণ ও চকচকে করা যায় না।	তাল তৈরি হবে, মাটি বেশ মোলায়েম, কাদার ভাগ একটু বেশী থাকলে সহজেই মসৃণ ও চকচকে করা যাবে।	মসৃণ ও চকচকে হবে, আঙুল দিয়ে সহজেই দড়ির মত লম্বা করা যাবে।
জলধারণ ক্ষমতার ঊর্ধ্বসীমায়	চাপ দিলেও মাটি থেকে জল বেরিয়ে আসে না, কিন্তু মাটির তালের গোল ভিজা দাগ হাতে থাকে	কাঁকুড়ে মাটির মত।	কাঁকুড়ে মাটির মত।	কাঁকুড়ে মাটির মত।
জলধারণ ক্ষমতার চেয়ে বেশী জল থাকলে	মুঠো করে চাপ দিলে জল আলাদা হয়ে আসে	ঘাঁটলে মাটি থেকে জল আলাদা হবে।	চাপ দিয়ে জল বের করা যাবে।	মাটি ঘাঁটলে কাদা হয় এবং থিতিয়ে গেলে উপরে জল দাঁড়িয়ে যায়।

(2) প্রতিটি সেচে কত জল দিতে হবে—

মাটির ভিতরে উদ্ভিদের শিকড় যতদূর গেছে, প্রতিবার সেচে ততদূর মাটির জলধারণ-ক্ষমতার উর্ধ্ব সীমা পর্যন্ত পূর্ণ করে জল দেওয়া প্রয়োজন।

মাটির ভিতরে শিকড়ের বিস্তার 90 সেন্টি-মিটার (দু-হাত) গভীর পর্যন্ত হতে পারে। পূর্বোক্ত হিসাব অনুযায়ী বিভিন্ন ধরণের মাটির ঐ স্তরের ব্যবহারযোগ্য জলধারণ-ক্ষমতা :—বেলে—3·6 থেকে 10·8 সেঃ মিঃ, দোঁয়াশ—10·8 থেকে 14·4 সেঃ মিঃ এবং এঁটেল—14·4 থেকে 17·1 সেঃ মিঃ। ব্যবহারযোগ্য জলের অর্ধেক পরিমাণ খরচ হতেই পুনরায় সেচ দেওয়া হলে—বেলে, দোঁয়াশ এবং এঁটেল মাটির উপর দিককার 90 সেঃ মিঃ স্তর উপযুক্তভাবে ভিজিয়ে দিতে যথাক্রমে 1·8 থেকে 5·4, 5·4 থেকে 7·2 এবং 7·2 থেকে 8·6 সেঃ মিঃ জল প্রতিটি সেচে দেওয়া দরকার। এই হিসাব থেকে বোঝা যায় যে, প্রধানতঃ মাটির ব্যবহারযোগ্য জলধারণ-ক্ষমতা এবং শিকড়ের বিস্তার বিবেচনা করে প্রতিটি সেচে মোটামুটি দুই সেঃ মিঃ থেকে আট সেঃ মিঃ পর্যন্ত জল প্রয়োগ করবার প্রয়োজন হতে পারে। চারাগাছের শিকড় সাধারণতঃ 90 সেঃ মিঃ গভীরে যায় না, তাই সে ক্ষেত্রে কম জল দেওয়া উচিত। মোটা দানার বেলে মাটিতে সবচেয়ে কম জল লাগবে, আর মাটির দানা যত মিহি হবে, মাটিতে কাদার ভাগ যত বাড়বে, প্রতি সেচে দেয় জলের পরিমাণ সেই অনুপাতে বাড়বে। এই জন্যে এঁটেল মাটিতে সবচেয়ে বেশী জল দিতে হয়।

এই হিসাবে ধরা হয়েছে যে, সেচ ছাড়া অন্য কোনও সূত্রে শিকড়ের আয়ত্তের মধ্যে জল আসছে না। বস্তুতঃ বৃষ্টিপাত বাদ দিলেও পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ চাষের জমিতে মাটির ভিতর থেকে যথেষ্ট রস শিকড়ের আয়ত্তের মধ্যে চুঁইয়ে উঠে আসে। মাটি খুঁড়লে যে গভীরতায় জল পাওয়া যায়, মাটির প্রকৃতি ও গঠন অনুযায়ী ঐ স্তর থেকে দেড় কি দু-হাত পর্যন্ত বেশ কিছুটা রস চুঁইয়ে উঠে আসে। এভাবে যখন ফসলের জলের প্রয়োজন খানিকটা মেটে, তখন পূর্বোক্ত হিসাব অপেক্ষা কম জলেই সেচের প্রয়োজন মিটে যাওয়া উচিত। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে অনেক সময় কিছুটা বেশী জল প্রয়োগ করতে হয়; কারণ সেচ দেবার সময় যে অপচয় অনিবার্য, তা পূরণ করা ছাড়া অন্য উপায় থাকে না।

(3) ফসলে সেচ দেবার পদ্ধতি

পূর্ববর্তী আলোচনার ধারানুযায়ী অল্প কথায় বলা যায় যে, সেচ দিয়ে একদিকে যেমন নির্দিষ্ট স্তরের মাটির জলধারণ-ক্ষমতার উর্ধ্ব সীমা পর্যন্ত পূর্ণ করে দিতে হবে, সেই সঙ্গে আবার লক্ষ্য রাখতে হবে যে, শিকড়ের আয়ত্তের বাইরে যেন জল বিশেষ না যায়, অর্থাৎ অপচয় যথাসম্ভব কম হয়। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে মাটির প্রকৃতি, গড়ন, ফসলের প্রয়োজন এবং জলের পরিমাণ প্রভৃতি বিবেচনা করে মাঠে সেচ দেবার বিভিন্ন পদ্ধতি প্রচলিত আছে। ফসলে সেচ দেবার ঐ সকল বিভিন্ন পদ্ধতিকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়—(ক) মাটির উপর দিয়ে জল গড়িয়ে নিয়ে গিয়ে সেচ দেওয়া; (খ) মাটির তলায় বসানো পাইপের সাহায্যে শিকড়ের কাছে জল পৌঁছে দেওয়া; (গ) মাঠের উপরে পাতা সচ্ছিদ্র পাইপ থেকে বৃষ্টিধারার মত জল ছিটিয়ে দেওয়া। এদের মধ্যে প্রথম ধারাটিই পশ্চিমবঙ্গের চাষীরা অবলম্বন করেন। অন্য দুটি ধারা আর্থিক ও প্রযুক্তিগত কারণে এই রাজ্যে অপ্রচলিত।

এক কথায়, পশ্চিমবঙ্গের জমি সমতল। এই রাজ্যে চাষীরা সেচের জল মাঠের উপর দিয়ে গড়িয়ে প্রয়োগ করেন। সেচের পদ্ধতি হিসেবে এটি কম খরচসাপেক্ষ সন্দেহ নেই, কিন্তু এভাবে মাঠের সর্বত্র সমানভাবে ভিজিয়ে দেওয়া যায় না, কারণ মাঠের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে

প্রয়োজনীয় জল পৌঁছানোর মধ্যে প্রথম অংশের মাটিতে অতিরিক্ত পরিমাণ জল ঢুকে পড়ে। চেষ্টা করে এতে অপচয়ের পরিমাণ কিছুটা কমানো যেতে পারে, কিন্তু সম্পূর্ণ বন্ধ করা সম্ভব নয়। কাজেই সেচের ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে অতিরিক্ত জল নিকাশনের উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা উচিত, যাতে ফসল বা মাটির ক্ষতি না হয়।

মাঠের উপর দিয়ে গড়িয়ে জল দেবারও নানা রকম প্রথা প্রচলিত আছে। সেচের পদ্ধতি হিসাবে এসব বিভিন্ন প্রথার সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনা করা দরকার। পশ্চিম বাংলার সাধারণ চাষীদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য কয়েকটি পদ্ধতির বিষয় এখানে আলোচনা করা হলো।

ফসলে সেচ দেবার কম খরচ ও সবচেয়ে সহজ উপায় হলো—বন্যার জলের মত সম্পূর্ণ অনিয়ন্ত্রিত ধারায় মাঠে জল ঢুকিয়ে দেওয়া। যে ক্ষেত্রে কম খরচে প্রচুর জল পাওয়া যায় এবং আর্থিক লাভের বিশেষ সম্ভাবনা না থাকায় সেচের জন্যে বেশী খরচ পোষায় না—সে সব ক্ষেত্রে সাধারণতঃ এভাবে জল দেওয়া হয়। এই পদ্ধতিতে জমি সমান করবার বালাই নেই এবং তার ফলে জলের যথেষ্ট অপচয় হয়। আজকের দিনের সেচ ব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য হলো সেচের জল থেকে সর্বাধিক ফসল উৎপাদন। এই ধরণের অনিয়ন্ত্রিত সেচের দ্বারা সে উদ্দেশ্য সাধন সম্ভব নয়।

বিজ্ঞানসম্মত সেচ-পদ্ধতি অবলম্বন করে জলের অনেক বেশী সদ্ব্যবহার হতে পারে। জমিটিকে একটা নির্দিষ্ট দিকে অল্প ঢালু রেখে, ঐ ঢালু বরাবর সাত-আট আঙ্গুল উঁচু কয়েকটি ছোট আল দিয়ে জমিটাকে কয়েকটি লম্বা ফালিতে ভাগ করে নিতে হবে। প্রতিটি ফালির উপর দিক থেকে জল ছাড়তে হবে, যেন দুটি আলের মধ্যবর্তী জমি ভিজিয়ে জল সহজেই ঢালুর দিকে গড়িয়ে যায়। মাটির প্রকৃতি ও জলের স্রোতের আকার অনুযায়ী এই ফালিগুলি ছোট বড় হতে পারে। সাধারণতঃ তিন থেকে দু-হাত চওড়া ও ত্রিশ থেকে ষাট হাত লম্বা ফালি করা সুবিধাজনক। বেলে মাটির ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত ছোট এবং এঁটেল মাটির জমিতে প্রয়োজন-বোধে এর চেয়ে বড় খণ্ডেও জমিকে ভাগ করা যেতে পারে। ঘন করে বোনা ফসল—যেমন, ছিটিয়ে বা সারিতে বোনা ধান, গম ইত্যাদির জন্যে এই পদ্ধতি বেশ কার্যকরী। এই পদ্ধতিতে কম খরচে এবং কম পরিশ্রমে সেচ দেওয়া হয় এবং বোনার পরবর্তী ফসল পরিচর্যার কাজও সহজেই সম্পন্ন করা যায়। জমিতে সামান্য ঢাল থাকায় সেচের অতিরিক্ত জল বা বৃষ্টির জল সহজে বেরিয়ে যেতে পারে। এটি এই রাজ্যের চাষীদের গ্রহণযোগ্য একটি উন্নত সেচপদ্ধতি।

একটি বড় জমিকে সেচের সুবিধার জন্যে অন্যভাবেও ছোট ছোট খণ্ডে ভাগ করা চলে। এজন্যে তিন থেকে ছয় হাত চওড়া এবং ছয় থেকে বারো হাত লম্বা ছোট ছোট খণ্ডে জমিটিকে ভাগ করে জল ধরে রাখবার জন্যে প্রতি খণ্ডের চারধারে আল দিয়ে একটির পর একটি খণ্ড নালা থেকে জলে ভরে দিতে হবে। যখন জমি মোটামুটি সমান, কোনও দিকে বিশেষ ঢাল নেই এবং জলের স্রোত এক-একটি খণ্ডকে তাড়াতাড়ি ভরে দেবার উপযোগী—সে সব ক্ষেত্রে জলের সদ্ব্যবহারের জন্যে এই পদ্ধতি খুব কার্যকরী। এজন্যে বিভিন্ন সেচ পদ্ধতির মধ্যে এটি একটি বহুল প্রচলিত পদ্ধতি। জলের স্রোত বড় হলে খণ্ডগুলি 400 থেকে 600 বর্গমিটার (পাঁচ-সাত কাঠা) আয়তনের পর্যন্ত হতে পারে। ধান, গম, ভুট্টা, আখ, পেঁয়াজ, তামাক, বিভিন্ন সব্জি প্রভৃতি ফসলের জন্যে এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হলে। তবে পূর্বোক্ত পদ্ধতির তুলনায় এভাবে সেচ দিলে নালা ও আলের জন্যে অপেক্ষাকৃত বেশী জমি ছাড়তে হয়।

পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত সেচ-পদ্ধতিগুলির মধ্যে জলের সদ্ব্যবহারের দিক থেকে সবচেয়ে যুক্তি-সম্মত—আলুতে যেভাবে দুই ভেলির মধ্যে নালায় জল দেওয়া হয়। যে সব ফসল সারি করে চাষ করা হয় এবং দুই সারির মধ্যে নালা করা হয়, যেমন—আলু, বেগুন, টোম্যাটো, শীতের সব্জি, আখ ইত্যাদির ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি খুবই কার্যকরী। এই পদ্ধতিতে ছোট বড় সকল ধরণের জলস্রোতকেই এক বা একাধিক নালায় বাহিত করে ব্যবহার করা চলে। মোটামুটি সমতল বা অল্প গড়ানে জমির পক্ষে এই পদ্ধতি খুবই উপযুক্ত। যে দিকে জল ছাড়া হবে, সে দিকে নালাগুলি একটু চালু রাখা সুবিধাজনক। সাধারণতঃ নালার দৈর্ঘ্য 20-25 হাত হয়, তবে এঁটেল মাটিতে, বিশেষ করে আখের জমিতে এর চেয়ে লম্বা নালাও ব্যবহার করা হয়। এখানে আলোচিত বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে এই পদ্ধতিতে জলের অপচয় সবচেয়ে কম হয় এবং উদ্ভিদের গোড়ায় জল বসে যাওয়ার সম্ভাবনাও কম। তবে এই ক্ষেত্রে জমি তৈরি এবং ফসলের অন্তর্বর্তী পরিচর্যা ব্যয়সাপেক্ষ।

সেচের জন্যে প্রস্তুতি

ফসলে সেচ দিতে হলে জমি তৈরির সময় থেকেই যথাযথ প্রস্তুতির প্রয়োজন। ফসল নির্বাচনের সময় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে কখন কি পরিমাণ সেচের জল পাওয়া যাবে, তাও বিবেচনা করা দরকার—বিশেষতঃ ক্যানেলের জলে সেচ দিতে হলে। মাটির প্রকৃতি, মাঠের গড়ান, ফসলের জলের প্রয়োজন এবং জলের স্রোত কত বড়—প্রভৃতি বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে বীজ বোনবার আগেই উপযুক্ত সেচ-পদ্ধতি বেছে নেওয়া প্রয়োজন এবং তদনুযায়ী চাষের সময় বা সুযোগমত তার পরে সেচের জন্যে জমি তৈরি করে নেওয়া দরকার। এই কাজে প্রাথমিক প্রয়োজন জমিটিকে নিখুঁতভাবে সমান করা, যাতে জলের বিস্তারে কোনও অসুবিধা না হয় এবং সেচের পরে মাঠের মধ্যে এখানে-সেখানে জল দাঁড়িয়ে না যায়। জমিটিকে সুবিধামত একদিকে ঢালু রাখা উচিত—যাতে সেচের জল নিয়ন্ত্রিত পথে সহজে বাহিত করা যায়। বাঁধ, নালা ইত্যাদিতে চাষের জমি যত কম নষ্ট হয়, তার চেষ্টা করা আবশ্যক।

পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি প্রধান ফসলে সেচের ব্যবহার

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ফসলের মধ্যে তণ্ডুল-জাতীয় ফসল, যথা—ধান ও গমই প্রধান। এই জাতীয় ফসলের জীবনে বিয়ান বের হবার সময়, ফুল আসবার সময় এবং দানা পুষ্ট হবার সময় জলাভাব হলে ফসল ভয়ানকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই ঐ সময়গুলিতে উপযুক্ত পরিমাণে জলের যোগান দেওয়া একান্ত আবশ্যক। আবহাওয়া এবং মাটির পার্থক্য অনুযায়ী বিভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন সময়ে একই ফসলের সেচের প্রয়োজনে পার্থক্য দেখা দিতে পারে। কাজেই কোনও ফসলে এতদিন বাদে এই পরিমাণ জল দেওয়া উচিত—সর্বত্র প্রযোজ্য এমন কোনও সূত্র নির্ধারণ করা বিজ্ঞানসম্মত নয়।

ধান—জমিতে জল দাঁড়ালে ধান গাছ সহ্য করতে পারে। এজন্যে ধানে অতিরিক্ত জল দেওয়া হয় এবং ফলে প্রচুর জলের অপচয় হয় বলে বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন। এই অপচয় কমানো সম্ভব হলে বিভিন্ন সেচ প্রকল্প আরও লাভজনক হতে পারে।

বিয়ান বেরোবার সময়, শীষ বেরোবার একমাস আগে থেকে শীষ বেরোবার সময় এবং দানায় দুধ থাকা অবস্থায় জমিতে জলাভাব হলে ধানের ফসল অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ধানের জীবনের অন্যান্য পর্যায়ে সাময়িক খরা হলেও

ফসল তেমন ব্যাহত হয় না। ধানের জমিতে সব সময় সামান্য জল থাকা বাঞ্ছনীয়, যেন মাটি কখনও না ফাটে। জল স্থির থাকবার চেয়ে ধীরে প্রবাহমান হলে ভাল হয়। জমির জলে প্রতিফলিত আলো সম্ভবতঃ ধানের ফলন বাড়াতেও সাহায্য করে। অন্যদিকে পাঁচ সেন্টিমিটারের বেশী দাঁড়ানো জল ধানের জন্যে অপ্রয়োজনীয় তো বটেই, বেঁটে জাতের ধানের পক্ষে বোধ হয় ক্ষতিকারকও।

গম—কয়েক বছর আগেও পশ্চিমবঙ্গে গম চাষের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হতো না। উচ্চ ফলনক্ষম বেঁটে জাতের গমের প্রচলন হবার পর থেকে গমের চাষ এই রাজ্যে দ্রুত বেড়ে চলেছে। ভাল ফলন পেতে হলে গমে সেচ দেওয়া দরকার। ভারতীয় কৃষি গবেষণা-গারে, পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, গমের জীবনের সকল পর্যায়ে সেচ সমান কার্যকরী নয়। দিল্লীতে একটি চার বা সাড়ে চার মাসের বেঁটে জাতের গমের ফসলে সর্বোত্তম ফলনের জন্যে বোনবার আগে একটি এবং অঙ্কুরোদ্গমের পরে পাঁচটি—মোট ছয়টি সেচের দরকার। উক্ত পরীক্ষার ভিত্তিতে সেচের জলের যোগান অনুযায়ী ঐ পাঁচটি সেচ নিম্নোক্ত প্রয়োগসূচী অনুযায়ী ব্যবহার করলে জলের সর্বোত্তম ব্যবহার হতে পারে।

সেচের জলের যোগান (সেচের সংখ্যার হিসাবে)			সর্বোত্তম ফলনের জন্যে সেচ দেবার সময় (দিনের হিসাবে ফসলের বয়স)
এক	...	..	25
দুই	...	...	25, 65
তিন	...	...	25, 65, 105
চার	...	...	25, 45, 65, 105
পাঁচ	...	...	25, 45, 65, 85, 105

অর্থাৎ অঙ্কুরোদ্গমের পরে মাত্র দুটি সেচ দেবার মত জল পাওয়া গেলে, ঐ সেচ দুটির প্রথমটি ফসলের 25 দিন বয়সে এবং দ্বিতীয়টি 65 দিন বয়সে দিলে সবচেয়ে ভাল ফলন আশা করা যায়।

গমে সেচ দেবার এই ধরণের কোনও সময়-সূচী পশ্চিমবঙ্গের জন্যে তৈরি হয় নি। এই রাজ্যে শীত স্বল্পস্থায়ী হওয়ায় গম সাধারণতঃ সাড়ে তিন মাসের ফসল। বিয়ান বেরোবার সময়, থোড় আসবার সময় এবং দানা পুষ্টির সময়—মোটামুটি তিনবার সেচ দিয়েই এই রাজ্যে গমের ভাল ফলন আশা করা যায়।

আলু—অন্যান্য ফসলের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম সময়ে আলু অনেক বেশী শর্করাজাতীয় উপাদান সঞ্চয় করে। একজন্যে আগাগোড়াই এই ফসলে জল সহজলভ্য হওয়া দরকার। আবার আলুর জমিতে জল বসে গেলেও ফলন ক্ষতি-গ্রস্ত হবার সম্ভাবনা। পরীক্ষায় দেখা গেছে—আলুর জমির 15 সেন্টিমিটার গভীরতায় মাটিতে ব্যবহারযোগ্য জলের মোটামুটি দুই-তৃতীয়াংশ থাকতেই আবার সেচের প্রয়োজন। একজন্যে আলুর জমিতে অল্পদিনের ব্যবধানে হাল্কা ধরণের সেচ দেওয়া যুক্তিযুক্ত। 20-40 দিন বয়সে জলাভাব হলে আলুর ফলন সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেখা গেছে।

আখ—দশ, বারো মাসের এই ফসল এই রাজ্যে সাধারণতঃ ফাল্গুন মাসে লাগানো হয় এবং পৌষ-মাঘে কাটা হয়। পশ্চিমবঙ্গে মুড়ি আখেরও যথেষ্ট চাষ হয়। বর্ষা সুরু হলে আখের বিশেষ জলাভাব হয় না। বর্ষার পরে আখ ক্রমে পাকবার দিকে যায়—এই সময়ে মাটিতে যথেষ্ট রস থাকায় গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে সাধারণতঃ সেচের প্রয়োজন দেখা যায় না। লাগাবার পর থেকে বর্ষা সুরু হওয়া পর্যন্ত (ফাল্গুন থেকে জ্যৈষ্ঠ) চারা আখের যথেষ্ট জলের দরকার। এই সময় জলাভাবে ফসলের বৃদ্ধি ও বিয়ান বেরোনো ব্যাহত

হলে শেষ পর্যন্ত আশানুরূপ ফলন পাওয়া যায় না। ভাল ফলন পেতে হলে এই প্রাক্-মৌসুমী সময়ে আখের জমির 22 সেন্টিমিটার (আধ হাত) গভীরতায় ব্যবহারযোগ্য জলের পরিমাণ শতকরা পঞ্চাশ ভাগের নীচে যাওয়া উচিত নয়।

অন্যান্য ফসল—শীতের সব্জি, যথা—ফুলকপি, বাঁধাকপি ইত্যাদি ফসলে ব্যাপকভাবে সেচের ব্যবহার হয়। মোটামুটিভাবে এদের সেচের প্রয়োজন আলুর মতই। টোম্যাটো অপেক্ষাকৃত বেশী খরা সহ্য করতে পারে।

ভুট্টা গাছের মাথায় ফুল আসবার সময় থেকে দানায় দুধ থাকা পর্যন্ত জলাভাব খুবই ক্ষতিকারক। আবার ভুট্টা গাছের গোড়ায় জল দাঁড়িয়ে গেলেও ফলন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভুট্টা ক্ষেতের আধ হাত গভীরতায় ব্যবহারযোগ্য জলের অর্ধেক খরচ হবার আগেই সেচের ব্যবস্থা করা দরকার।

রবিখন্দে ডালজাতীয় ফসল সাধারণতঃ মাটিতে সঞ্চিত রসের উপরে নির্ভর করেই চাষ করা হয়। ফুল ও ফল ধারণের সময় ডালের জমিতে জলাভাব দেখা দিলে প্রয়োজনমত একবার সেচ দিয়ে ভাল ফলন আশা করা যায়।

আজকাল কোথাও কোথাও প্রয়োজনবোধে পাটেও সেচ দেওয়া হয়। পাট ক্ষেতের ত্রিশ সেন্টিমিটার গভীরতায় ব্যবহারযোগ্য জলের অর্ধেক থাকতেই সেচ দেওয়া প্রয়োজন।

সেচের জল ব্যবহারে উৎকর্ষ সাধনের প্রধানতঃ দুটি পন্থা—সম্ভাব্য সকল প্রকারে জলের অপচয় বন্ধ করা এবং সেচের জল থেকে সর্বাধিক ফসল উৎপাদন। উৎপাদন বাড়াবার জন্যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সেচের সঙ্গে উন্নত বীজ ও পর্যাপ্ত সার ব্যবহার, উপযুক্তভাবে রোগ, পোকা ও আগাছা দমন এবং নিবিড় চাষ পদ্ধতি অবলম্বন করা প্রয়োজন।

পর্যায়সারণীতে ইউরেনিয়ামপূর্ব শূন্যস্থান পূরণকারী মৌলসমূহ

ললিতা কুণ্ডু*

একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিককে সম্মানার্ঘ্য-রূপে একটি অ্যালুমিনিয়ামের ফুলদানী উপহার দেবার ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত মনে হলেও সত্য সত্যই তা ঘটেছিল। ইংল্যাণ্ডের বিজ্ঞানীরা এই উপহার দিয়েছিলেন তৎকালীন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডি. মেণ্ডেলিয়েভকে। এক-শ' বছর আগে অ্যালুমিনিয়ামের যা দাম ছিল, তা এখন অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে। মেণ্ডেলিয়েভের বিজ্ঞান-সাধনার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্যে ইংরেজ বিজ্ঞানীরা তাঁকে যে উপহারটি দিয়েছিলেন, সেটি অর্থাৎ অ্যালুমিনিয়ামের ফুলদানীটি তখন শুধু শ্রদ্ধার্ঘ্য বলে নয়, আর্থিক মূল্যের বিচারেও অত্যন্ত মূল্যবান বিবেচনা করা হতো। বিগত শতকে অ্যালুমিনিয়াম আকর থেকে অ্যালুমিনিয়াম প্রচুর পরিমাণে সস্তায় নিষ্কাশন করবার পদ্ধতি জানা ছিল না, কাজেই স্বল্পতাহেতু অ্যালুমিনিয়াম তখন অন্যতম মূল্যবান ধাতু হিসাবে গণ্য হতো। এক-শ' বছর আগের এই মূল্যবান ধাতুটি এখন বহুল ব্যবহৃত একটি সস্তা ধাতু, কিন্তু মেণ্ডেলিয়েভ-আবিষ্কৃত পর্যায়সারণী বহুল ব্যবহৃত হওয়া সত্ত্বেও আজও তা অমূল্য। তিনি আবিষ্কৃত মৌলগুলিকে পর্যায়সারণীতে সাজিয়ে এবং অনাবিষ্কৃত কতকগুলি মৌলের ভৌত ও

* রসায়ন বিভাগ, বিদ্যাসাগর মহিলা কলেজ, কলিকাতা-6

রাসায়নিক ধর্মাবলীর পূর্বাভাস দিয়ে বিজ্ঞান-জগতে এক আলোড়ন সৃষ্টি করেন। তাঁর এই কাজের ফলে রসায়নশাস্ত্র একটি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বিজ্ঞান-জগতে রসায়নশাস্ত্রের দ্রুত প্রগতি সূচিত হয়।

পর্যায়সারণীতে প্রত্যেকটি মৌলের পরমাণু-ক্রমাঙ্ক চিহ্নিত ঘর আছে এবং প্রত্যেক মৌল তার নির্দিষ্ট পরমাণুক্রমাঙ্কচিহ্নিত ঘরে বসে। 1930 সাল পর্যন্ত আবিষ্কৃত মৌলগুলিকে পর্যায়সারণীতে সাজাতে গিয়ে দেখা গেল, চারটি ঘরের অধিকারী মৌলগুলি তখনো পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত এবং এদের পরমাণুক্রমাঙ্ক যথাক্রমে 43, 61, 85 এবং 87। এই সকল মৌলের কেন্দ্রকগুলির যেসব সম্ভাব্য গঠন হতে পারে, তাদের তত্ত্বগত দিক বিচার করে অনুমান করা হয়েছিল যে, এদের সকলেই তেজস্ক্রিয়, বেশ অস্থায়ী এবং এজন্যেই প্রকৃতিতে এদের দেখা যায় নি। 1932 সালে পরমাণুর অন্যতম আদিকণা নিউট্রন আবিষ্কৃত হয়। এই নিউট্রন এবং অন্যান্য কণাগুলি দিয়ে বিভিন্ন পরমাণুর কেন্দ্রকগুলিকে আঘাত করবার ফলে যে মৌলগুলি পাওয়া যায়, তার অনেকগুলিই 1930-এর পূর্বে অদৃষ্ট ছিল। 43, 61, 85 এবং 87 পরমাণুক্রমাঙ্কচিহ্নিত মৌলগুলি এভাবে বিভিন্ন আঘাতকারী কণা দিয়ে বিশেষ কয়েকটি মৌলের পরমাণুর কেন্দ্রককে আঘাত করবার ফলে পাওয়া যায়। আঘাতক্রিয়ালব্ধ মৌলটির পর্যায়-সারণীস্থিত প্রতিবেশী মৌলের পরমাণুর কেন্দ্রক আঘাত করবার জন্যে নির্দিষ্ট করা হয় এবং তাত্ত্বিক বিচারে যে কণার দ্বারা আঘাতের ফলে ঈপ্সিত মৌলটি পাওয়া যেতে পারে, তাকে আঘাতকারী কণা হিসাবে পছন্দ করা হয়। সাধারণতঃ আলফা কণা (α), ডয়টেরন, নিউট্রন, প্রোটন ইত্যাদি আঘাতকারী কণারূপে ব্যবহৃত হয়। 43, 61, 85 এবং 87 মৌলগুলি কিভাবে পাওয়া যায়, তা সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে।

1. বাঞ্ছিত মৌল (Z—পরমাণুক্রমাঙ্ক—43): মলিবডেনাম (Z=42) মৌলের পরমাণুর কেন্দ্রককে ডয়টেরন কণার দ্বারা আঘাত করবার ফলে টেকনেশিয়াম (Z=43) নামে পরিচিত মৌলটি পাওয়া যায়। এই কেন্দ্রাঘাতন ক্রিয়াটি ডি, এন (d, n) ক্রিয়ারূপে পরিচিত।

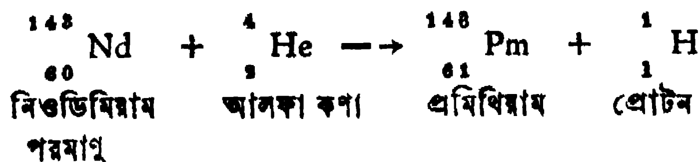
$$ {}^{95}_{42}\mathrm{Mo} + {}^{2}_{1}\mathrm{H} \longrightarrow \left({}^{97}_{43}\mathrm{Tc} \right) \longrightarrow {}^{96}_{43}\mathrm{Tc} + {}^{1}_{0}\mathrm{n} $$

মলিবডেনাম পরমাণু ডয়টেরন টেকনেশিয়ামের অতি-অস্থায়ী সমস্থানিক টেকনেশিয়াম নিউট্রন

অন্যান্য কেন্দ্রাঘাতন ক্রিয়ার দ্বারা টেকনেশিয়ামের বিভিন্ন সমস্থানিক পাওয়া গেছে। দেখা গেছে, টেকনেশিয়ামের সমস্ত সমস্থানিক তেজস্ক্রিয়। গ্রীক শব্দ টেকনেটস (Technetos) মানে কৃত্রিম এবং মানুষ কর্তৃক কৃত্রিম উপায়ে 43-মৌলটি প্রথম আবিষ্কৃত হয় বলেই এর নাম দেওয়া হয়েছিল টেকনেশিয়াম। মন্থরগতি নিউট্রনের দ্বারা ইউরেনিয়াম কেন্দ্রক বিভাজন প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রকীয় ক্রিয়াধারে (নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টর) কিলোগ্রাম পরিমাণ টেকনেশিয়াম তৈরি করা এখন কিছুমাত্র দুঃসাধ্য নয়। পর্যায়সারণীতে অবস্থান বিচারে টেকনেশিয়াম ম্যাঙ্গানিজ ও রেনিয়ামের সমবর্গী (বর্গ VII-A)। ম্যাঙ্গানিজ টেকনেশিয়ামের পূর্বসূরী এবং রেনিয়াম উত্তরসূরী। সমবর্গী হবার দরুণ ম্যাঙ্গানিজ, টেকনেশিয়াম এবং রেনিয়ামের কিছু কিছু ধর্মে সাদৃশ্য দেখা যায়।

2. বাঞ্ছিত মৌল (Z—61): নিওডিমিয়াম (Z=60) মৌলের পরমাণুর কেন্দ্রককে আলফা

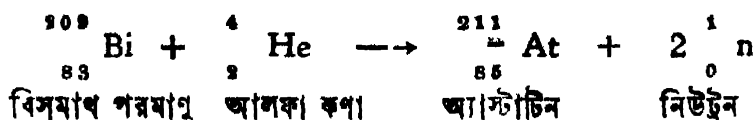
কণার দ্বারা আঘাত করবার ফলে প্রমিথিয়াম (Z= 61) নামে পরিচিত মৌলটি পাওয়া যায়। এই কেন্দ্রাঘাতন ক্রিয়াটি আলফা, প্রোটন (α,n) ক্রিয়ারূপে পরিচিত।



$$^{143}_{60}\mathrm{Nd} + {}^{4}_{2}\mathrm{He} \longrightarrow {}^{146}_{61}\mathrm{Pm} + {}^{1}_{1}\mathrm{H}$$

পূর্বে প্রমিথিয়ামের নাম ছিল। ইলিনিয়াম প্রমিথিয়াম তেজস্ক্রিয় এবং এরও বিভিন্ন সমস্থানিক আছে। এটি বিরলমৃত্তিক (Rare earth) মৌলশ্রেণীর অন্তর্গত। খুব ছোট ছোট ব্যাটারী তৈরি করতে প্রমিথিয়াম ব্যবহার করা হচ্ছে। খুব ভাল রাসায়নিক ব্যাটারীও ছয় মাসের বেশী চলে না, কিন্তু প্রমিথিয়াম-পরমাণুব্যাটারী পাঁচ বছর সমানে কাজ করে এবং শ্রবণযন্ত্র থেকে শুরু করে রকেট নিয়ন্ত্রণেও এটি ব্যবহৃত হয়। গ্রীক পুরাণের বীর প্রমিথিয়ুসের নামানুসারে এই মৌলের নাম দেওয়া হয়েছে প্রমিথিয়াম।

3. বাঞ্ছিত মৌল (Z=85): বিসমাথ (Z=83) মৌলের পরমাণুর কেন্দ্রককে আলফা কণার দ্বারা আঘাত করবার ফলে বর্তমানে অ্যাস্টাটিন নামে পরিচিত (Z=85) মৌলটি পাওয়া যায়। এটি আলফা, দ্বিনিউট্রন (α, 2n) কেন্দ্রাঘাতন ক্রিয়া। কর্সন, ম্যাকেন্‌জি এবং সেগ্‌রে এই ক্রিয়ার দ্বারা অ্যাস্টাটিন আবিষ্কার করেন।



$$^{209}_{83}\mathrm{Bi} + {}^{4}_{2}\mathrm{He} \longrightarrow {}^{211}_{85}\mathrm{At} + 2\,{}^{1}_{0}\mathrm{n}$$

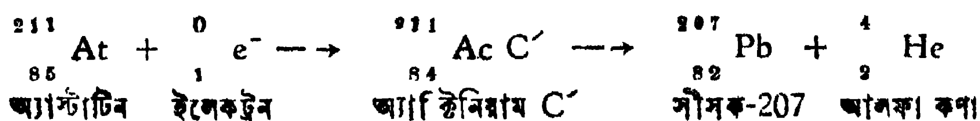
অ্যাস্টাটিনের এই সমস্থানিকটি তেজস্ক্রিয় এবং এর অর্ধায়ুকাল 7·5 ঘণ্টা। এটি আলফা কণা নির্গমনের ফলে বিসমাথের অন্য একটি সমস্থানিকে রূপান্তরিত হয়।



$$^{211}_{85}\mathrm{At} \longrightarrow {}^{207}_{83}\mathrm{Bi} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$$

207

ইলেকট্রন অধিকার করবার ফলে অ্যাস্টাটিন অ্যাক্টিনিয়াম C′ মৌলে রূপান্তরিত হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, অ্যাক্টিনিয়াম C′ মৌলটি অ্যাক্টিনিয়াম তেজস্ক্রিয় মৌলসারির অন্তর্গত এবং এটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে সীসায় পরিণত হয়।



$$^{211}_{85}\mathrm{At} + {}^{0}_{1}e^{-} \longrightarrow {}^{211}_{84}\mathrm{Ac\,C'} \longrightarrow {}^{207}_{82}\mathrm{Pb} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$$

পর্যায়সারণীতে অ্যাস্টাটিন আয়োডিনের সমবর্গী এবং উত্তরসূরী হবার দরুণ আয়োডিনের ধর্মাবলীর সঙ্গে এর ধর্মাবলীর তুলনামূলক বিচারে কিছু কিছু সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। অ্যাস্টাটিন কিছুটা ধাতব গুণসম্পন্ন এবং পর্যায়সারণীতে এর অবস্থিতি বিচারে এটাই প্রত্যাশিত, কারণ অ্যাস্টাটিন হ্যালোজেন বর্গের (বর্গ-VII-B) গুরুতম মৌল। থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডের অসুখে চিকিৎসকেরা অ্যাস্টাটিন ব্যবহার করবার চেষ্টা করছেন। এই অসুখে থাইরয়েডে আয়োডিন জমা হতে থাকে। অ্যাস্টাটিন আয়োডিনের সমবর্গী হওয়ায় যখন অ্যাস্টাটিন প্রয়োগ করা

হয়, তখন অ্যাস্টাটিনও থাইরয়েডে জমা হয় এবং অ্যাস্টাটিনের তেজস্ক্রিয় ধর্মাবলী রোগ নিরাময়ে অন্যান্য সাহায্য করে থাকে।

4. আকাঙ্ক্ষিত মৌল ($Z=87$): 1939 সালে মাদমোয়াজেল এম. পেরে (Perey) এটিকে অ্যাক্টিনিয়াম তেজস্ক্রিয় মৌল সারির অন্তর্গত অ্যাক্টিনিয়াম-K নামে চিহ্নিত করেন। বর্তমানে এটি ফ্রান্সিয়াম ($Z=87$) নামে পরিচিত।

$$^{227}_{89}Ac \longrightarrow {}^{223}_{87}Ac\text{-}K + {}^{4}_{2}He$$

অ্যাক্টিনিয়াম-227 অ্যাক্টিনিয়াম K আলফা কণা

(ফ্রান্সিয়াম-223)

$$\downarrow$$

$$Ac\text{-}X + {}^{0}_{-1}e$$

অ্যাক্টিনিয়াম-X

ফ্রান্সিয়াম-223 বিটা কণা নির্গমনের ফলে অ্যাক্টিনিয়াম-X-এ রূপান্তরিত হয়। বিভিন্ন কেন্দ্রকীয় ক্রিয়ায় ফ্রান্সিয়ামের অন্যান্য সমস্থানিক পরে আবিষ্কৃত হয়।

$$^{226}_{91}Pa \xrightarrow{-\alpha} {}^{222}_{89}Ac \xrightarrow{-\alpha} {}^{218}_{87}Fr \xrightarrow{-\alpha} {}^{214}_{85}At$$

প্রোট্যাক্টিনিয়াম অ্যাক্টিনিয়াম-222 ফ্রান্সিয়াম-218 অ্যাস্টাটিন-214

$$\downarrow -\alpha$$

ইউরেনিয়াম তেজস্ক্রিয় মৌলসারির ন্যায় পরবর্তী ক্রিয়াগুলি $\longleftarrow$ $^{210}_{83}Ra\text{-}E$

ফ্রান্সিয়াম প্রথম বর্গের গুরুতম মৌল। অতএব এটি প্রথম বর্গস্থিত ক্ষার ধাতুগুলির সমধর্মী হবে, এটি প্রত্যাশিত ছিল এবং বাস্তবে দেখা গেছে, এটিই সর্বাপেক্ষা সক্রিয় ধাতু (ক্ষার ধাতুর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো তীব্র মাত্রায় রাসায়নিক সক্রিয়তা)। ক্ষার ধাতুর অন্যান্য ধর্মের সঙ্গেও ফ্রান্সিয়ামের নানা সাদৃশ্য আছে।

মেণ্ডেলিয়েভের পূর্বাভাস অনুযায়ী অনেকগুলি আবিষ্কৃত মৌল 1925 সালের মধ্যেই আবিষ্কৃত হয়ে যায়, কিন্তু টেকনেশিয়াম, প্রমিথিয়াম, অ্যাস্টাটিন এবং ফ্রান্সিয়াম তখনো পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত ছিল। এই চারটি মৌল বাদে অন্য যে সব মৌল মেণ্ডেলিয়েভের পূর্বাভাস অনুযায়ী সত্বর খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল, সেগুলি হলো—স্ক্যাণ্ডিয়াম (স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার নামানুসারে), জার্মেনিয়াম (জার্মেনীর নামানুসারে) পোলোনিয়াম (পোল্যাণ্ডের নামানুসারে), হাফ্‌নিয়াম (কোপেনহেগেন থেকে), রেনিয়াম, রেডিয়াম, অ্যাক্টিনিয়াম এবং প্রোট্যাক্টিনিয়াম। মেণ্ডেলিয়েভ এসব মৌলের ধর্মাবলী সম্পর্কে পূর্বাভাস দিয়েছিলেন। পরীক্ষালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে, সেগুলি আশ্চর্য রকম সফল ভবিষ্যদ্বাণী ছিল।

43, 61, 85 এবং 87 পরমাণুক্রমাঙ্কচিহ্নিত ঘরগুলির অধিকারী চারটি মৌল আবিষ্কৃত হবার পর পর্যায়সারণীতে ইউরেনিয়ামপূর্ব আর কোন শূন্য ঘর রইলো না।

ভারতে নৃ-বিজ্ঞান অধ্যয়নের পঞ্চাশ বছর

রেবতীমোহন সরকার*

একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে ভারতে নৃ-বিজ্ঞানের পঠন-পাঠনের অর্ধ শতাব্দীকাল ইতিমধ্যেই অতিক্রম করেছে। পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনার ক্ষেত্রে নৃ-বিজ্ঞানের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা স্বীকৃত হলেও সাধারণ্যে এর প্রচার বিশেষভাবে সীমিত, অথচ ভারতে এক সময় নৃ-বিজ্ঞানের চর্চা এবং সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের বিভিন্ন ফল প্রয়োগ অত্যাবশ্যকীয় হয়ে উঠেছিল। বৃটিশ শাসক, খৃষ্টধর্ম প্রচারক এবং পরিব্রাজকের দল এদেশে নৃ-বিজ্ঞানের আলোচনায় অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ভারতের বুকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হলে তদানীন্তন বৃটিশ সরকার সুষ্ঠু দেশ শাসনের জন্যে ভারতের মত বিচিত্র জনগোষ্ঠীঅধ্যুষিত দেশে ধর্ম, সমাজ ও আচার-ব্যবহারের এক সার্বিক আলোচনা ও বিশ্লেষণের প্রয়োজন অনুভব করলো। পরিকল্পনামত ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে নৃ-বিজ্ঞানে শিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশাসনিক আধিকারিকদের নিযুক্ত করা হয়। এদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ভারতের নানা জাতি-উপজাতির উপর বিবরণী রচিত হতে থাকে। পূর্ব ভারতে রিসলে (Risley), ডাল্টন (Dalton) এবং ওম্যালি (O' Malley), মধ্য ভারতে রাসেল (Russel), উত্তর ভারতে ক্রুক (Crooke) এবং দক্ষিণ ভারতে থার্স্টন (Thurston) নানা সমাজ ও সম্প্রদায়ের প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানের ভিত্তিতে সামগ্রিক তালিকা এবং রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহারের বিস্তারিত তথ্য লিপিবদ্ধ করেন। এই সমস্ত তথ্যাবলীর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, বিদেশী শাসকদের ভারতের সমাজ ও সম্প্রদায়ের বিভিন্ন বিষয়ে অবহিত করা। কিন্তু এই সকল বিবরণী যখন প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত বলে বিবেচিত হলো, তখন সুরু হলো এককভাবে উপজাতীয় গোষ্ঠীগুলির অনুসন্ধান। উপজাতীয়দের বিচিত্র জীবনযাত্রাপ্রণালী এবং সমাজব্যবস্থার ধারা বিদেশীয় শাসকদের পদে পদে অসুবিধার সৃষ্টি করছিল। সেজন্যেই নৃ-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষণপ্রাপ্ত শাসকদের উপজাতীয় গোষ্ঠীসমূহের জীবনধারা অনুসন্ধানে নিয়োগ করা হলো। প্রতিটি উপজাতিকে কেন্দ্র করে প্রকরণ-গ্রন্থ রচনা সুরু হয়ে গেল। এই সমস্ত গ্রন্থে নৃ-বিজ্ঞানের বিভিন্ন পর্যায়ের আলোচনা, যথা—শারীরিক নৃ-বিজ্ঞান, সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, ধর্ম, ভাষা, লোকসংস্কৃতি প্রভৃতির উপর যথেষ্ট নজর দেওয়া হয়। এছাড়া কতিপয় খৃষ্টধর্ম প্রচারক, যেমন—বডিং (Bodding), হফম্যান (Hoffman) প্রভৃতি উপজাতীয়দের জীবনধারার নানা দিকে আলোক সম্পাতে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করেছিলেন।

ভারতীয় পণ্ডিতেরা এই সামগ্রিক অনুসন্ধানমালায় বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এর প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে ভারতীয় নৃ-বিজ্ঞানী শরৎচন্দ্র রায় এবং এল, কে, অনন্তকৃষ্ণ আয়ারের যথাক্রমে ছোটনাগপুর এবং দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন জাতি-উপজাতির উপর গ্রন্থ রচিত হয়। এঁরা প্রত্যেকেই বৃটিশ নৃ-বিজ্ঞানীদের নিকট অনুসন্ধান বিষয়ে প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন এবং ফলতঃ এঁদের কাজ মোটামুটিভাবে বৃটিশ নৃ-বিজ্ঞান চর্চার আদর্শে রূপায়িত হয়েছিল। সার এডওয়ার্ড

* নৃ-বিজ্ঞান বিভাগ, বঙ্গবাসী কলেজ; কলিকাতা-9

গেটের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় বিহারে নৃ-বিজ্ঞান চর্চার এক বিশেষ পরিবেশ গড়ে উঠেছিল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে শরৎচন্দ্র রায় পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে 1920 খৃষ্টাব্দে নৃ-বিজ্ঞানে বক্তৃতাদানে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। এই বক্তৃতামালাই (Principles and Methods of Physical Anthropology) বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ভারতে নৃ-বিজ্ঞানে সর্বপ্রথম এবং সর্বাঙ্গীণ স্বীকৃতি। এই সময় থেকেই ভারতে শাসনসংক্রান্ত মহল থেকে অধিবিদ্য মণ্ডলে নৃ-বিজ্ঞানের আগমন বার্তা সূচিত হয়েছিল। আমাদের দেশে নৃ-বিজ্ঞানকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে স্বাতন্ত্র্য বিধানের পথিকৃৎ হলেন সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। 1920 খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বপ্রথম নৃ-বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর বিভাগ যুক্ত হয় এবং সেখানে শারীরিক নৃ-বিজ্ঞান, সাংস্কৃতিক এবং প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ত্ব—এই তিনটি বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ সর্বপ্রথম এই নৃ-বিজ্ঞান বিভাগের পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে অনন্তকৃষ্ণ আয়ার দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন জাতি-উপজাতির উপর প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র গবেষণার ভিত্তিতে মৌলিক রচনা প্রকাশ করে দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানী মহলে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তাঁর পাণ্ডিত্য এবং জ্ঞানের গভীরতা তদানীন্তন বৃটিশ নৃ-বিজ্ঞানী টাইলর (Tylor), রিভার্স (Rivers), হ্যাডন (Haddan), ম্যারেট (Marett) প্রভৃতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তাঁরা অনন্তকৃষ্ণ আয়ারকে অভিনন্দন জানান। 1914 খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে অনন্তকৃষ্ণ আয়ার জাতিতত্ত্ব শাখার (Section of Ethnology) বিভাগীয় সভাপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন। সেই অধিবেশনের মূল সভাপতি হিসাবে সার আশুতোষের দৃষ্টি অনন্তকৃষ্ণ আয়ারের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তাঁকে নবগঠিত নৃ-বিজ্ঞান বিভাগের পূর্ণ দায়িত্বভার অর্পণের সিদ্ধান্ত তিনি গ্রহণ করেন।

অনন্তকৃষ্ণ আয়ার তখন কোচিন এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের একজন বিদ্যালয় পরিদর্শক। পরে তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী, সংগঠন ক্ষমতা এবং জনজীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তদানীন্তন প্রাদেশিক সরকার তাঁকে ত্রিচুরস্থিত প্রাদেশিক সংগ্রহশালার অধ্যক্ষ এবং পশুশালার অধীক্ষক নিযুক্ত করেন। এছাড়া তিনি জাতিতত্ত্ব বিষয়ের অধীক্ষকও ছিলেন। এমন সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁকে নৃ-বিজ্ঞান বিভাগে অধ্যাপনার ভার গ্রহণে আমন্ত্রণ জানান। পূর্ব কথামত অনন্তকৃষ্ণ আয়ার রাজী হলেন। এদিকে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় সমাজতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ হিসাবে যোগদান করতে তাঁকে অনুরোধ জানায়। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অপেক্ষা অনেক বেশী বেতনদানের অঙ্গীকার করে। কিন্তু অনন্তকৃষ্ণ আয়ার সার আশুতোষকে জানালেন যে, তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েই যোগদান করবেন, কারণ এই বিষয়ে তিনি ইতিমধ্যেই কথা দিয়েছেন। সুতরাং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃ-বিজ্ঞান বিভাগের কাজ স্বার্থত্যাগের এক মহৎ দৃষ্টান্তের মধ্যে দিয়ে সূচিত হলো। অনন্তকৃষ্ণ আয়ার নিজের ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্যের চেয়ে নৃ-বিজ্ঞানকে অত্যধিক ভালবাসতেন এবং অচিরেই নৃ-বিজ্ঞান বিভাগকে এক সুব্যবস্থিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে তোলেন। এখানে তাঁর 12 বছরের কর্মজীবনে তিনি নৃ-বিজ্ঞান পঠন-পাঠনের উন্নতিকল্পে বহু উল্লেখযোগ্য কাজ করেছিলেন। তার সহকর্মী হিসাবে তিনি রায় বাহাদুর বি. এ. গুপ্তে, শরৎচন্দ্র মিত্র, পঞ্চানন মিত্র, বি. সি. মজুমদার, এ. এন. চাটার্জী প্রমুখ জ্ঞানীগুণীদের পূর্ণ

সমর্থন লাভ করেছিলেন। অনন্তকৃষ্ণ আয়ারের বিবিধ কর্মপদ্ধতির মধ্যে একটি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য বিষয় হলো নৃ-বিজ্ঞানকে স্নাতক শ্রেণীতে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্তির প্রচেষ্টা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্মানিক স্নাতক শ্রেণীতে নৃ-বিজ্ঞান পাঠের ব্যবস্থায় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় মহলে সাড়া পড়ে যায়। নৃ-বিজ্ঞানের তদানীন্তন সরকারী কর্মসূচী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচার-চেষ্টায় অনুপ্রাণিত হয়ে বঙ্গবাসী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যক্ষ আচার্য গিরিশচন্দ্র বসু 1936 খৃষ্টাব্দে কলেজের মাধ্যমিক শ্রেণীতে নৃ-বিজ্ঞান পঠনের ব্যবস্থা করেন। এর বেশ কিছুদিন পরে 1948 খৃষ্টাব্দে নৃ-বিজ্ঞান ঐ কলেজে স্নাতক শ্রেণীর পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্তি লাভ করে। স্নাতকোত্তর ও স্নাতক-শ্রেণীতে নৃ-বিজ্ঞান পঠন-পাঠনের প্রচেষ্টায় যথাক্রমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গবাসী কলেজ ভারতে তাই পথিকৃৎ হিসাবে পরিগণিত। ইতিমধ্যে ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি, রাজনীতি, বিজ্ঞান, দর্শনশাস্ত্র, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ের পাঠ্য-নির্ঘণ্টে আংশিকভাবে নৃ-বিজ্ঞানের সংযোজন পরিলক্ষিত হয়। স্বাধীনতার পরে নতুন চিন্তাধারা এবং বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্প্রসারণের কার্যক্রমের পটভূমিকায় নৃ-বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে। 1947 খৃষ্টাব্দে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়, 1950 খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় এবং 1952 খৃষ্টাব্দে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকোত্তর পর্যায়ে নৃ-বিজ্ঞান পাঠের ব্যবস্থা করে। তারপর ধীরে ধীরে সৌগড়, মাদ্রাজ, পুনা, রাঁচি, ডিব্রুগড়, উৎকল রবিশঙ্কর, ধারওয়ার, কর্ণাটক বিশ্ববিদ্যালয়ে একের পর এক নৃ-বিজ্ঞানের পঠন-পাঠন শুরু হয় এবং আজকের ভারতে 15-16টি বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃ-বিজ্ঞান স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে পাঠ্য-তালিকাভুক্তি লাভের মর্যাদা অর্জন করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরের বাইরে নৃ-বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যেও কিছু কর্মপন্থা গ্রহণ করা হয়। 1945 খৃষ্টাব্দে ভারত সরকারের 'ভারতের নৃ-তাত্ত্বিক সমীক্ষা' (Anthropological Survey of India) নামে একটি পরিপূর্ণ গবেষণা সংস্থার প্রতিষ্ঠা এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। ঐ সংস্থার প্রথম পরিচালক নিযুক্ত হন প্রখ্যাত নৃ-বিজ্ঞানী ডক্টর বিরজাশঙ্কর গুহ। কলিকাতায় এই সংস্থার প্রধান কার্যালয় ছাড়াও বর্তমানে উত্তর, মধ্য, দক্ষিণ, পূর্ব ভারতে এবং আন্দামান দ্বীপে এর শাখা কার্যালয় রয়েছে। এই সংস্থা ভারতের সভ্যতা সংস্কৃতির রূপরেখা, অধিবাসীদের দৈহিক গঠন বৈচিত্র্য, রক্তদল (Blood group) ও বিভিন্ন প্রাগৈতিহাসিক ক্ষেত্রের খননকার্য ও তাদের সুব্যবস্থিত আলোচনায় যত্নবান। এখানে শারীরিক ও সাংস্কৃতিক নৃ-বিজ্ঞান—এই দুই শাখারই বিভিন্ন কর্মপন্থা রূপায়িত হবার ব্যবস্থা রয়েছে। 'ভারতের নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষা' আজ একটি প্রকৃত সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করে চলেছে। তাছাড়া কলিকাতাস্থিত ভারতীয় পরিসংখ্যানিক সংস্থায় (Indian Statistical Institute) এবং তার অধীনস্থ কার্যালয়গুলিতেও নৃ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের গবেষণা ও শিক্ষণকার্য পরিচালিত হয়ে থাকে। বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার তাদের পরিচালিত উপজাতি গবেষণা কেন্দ্রে অথবা তদ্রূপ সংস্থাগুলিতে নৃ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা এবং বিভিন্ন কর্ম পরিচালনার জন্যে নৃ-বিজ্ঞানে শিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নিয়োগ করা হয়ে থাকে।

পত্র-পত্রিকার নিয়মিত প্রকাশনা কোন বিষয়ের পঠন-পাঠনের প্রত্যক্ষ সাহায্য করে, কারণ বিভিন্ন মত ও পথের সন্ধান এবং বিনিময় এই সকল সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠায় সংঘটিত হয়ে থাকে। নৃ-বিজ্ঞানের বিভিন্ন সুচিন্তিত প্রবন্ধাবলী পূর্বে Journal of the Asiatic Society of Bengal (1784), Calcutta Review (1843),

Indian Antiquary (1872), Journal of the Anthropological Society of Bombay (1886), Modern Review (1907), Journal of Bihar and Orissa Research Society (1915) পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও শরৎচন্দ্র রায় কর্তৃক 1921 খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'Man in India' পুরাপুরিভাবে নৃ-বিজ্ঞানভিত্তিক পত্রিকা হিসাবে দেশ-বিদেশে স্বীকৃতি লাভ করে। এর 26 বছর পরে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. এন. মজুমদার The Eastern Anthropologist নামে অপর একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ সুরু করেন। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় পরবর্তী কালে Anthropologist নামে একটি ষাণ্মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করে। সাম্প্রতিক-কালে Indian Anthropological Association অপর একটি ষাণ্মাসিক পত্রিকা প্রখ্যাত নৃ-বিজ্ঞানী শরৎচন্দ্র রায়ের জন্মশতবার্ষিকী (1971 খৃঃ) উৎসব উপলক্ষে প্রকাশ করে। এই পত্রিকাটির নাম Indian Anthropologist। তাছাড়া তদানীন্তন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত Anthropology Club (পরে Indian Anthropological Society) বিভিন্ন আলোচনা বৈঠক এবং পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে নৃ-বিজ্ঞান আলোচনার এক সুস্থ পরিবেশ গড়ে তোলবার চেষ্টা করে।

একথা অনস্বীকার্য যে, শারীরিক এবং সাংস্কৃতিক নৃ-বিজ্ঞানের উভয় শাখারই গবেষণা প্রধানতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডীর মধ্যে বিকাশ লাভ করে, যদিও প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ সুরু হয় প্রশাসনের স্বার্থে এবং সর্বদেশীয় জনগণনার পরিপ্রেক্ষিতে। শারীরিক নৃ-বিজ্ঞানের পঠন-পাঠনের কর্মধারাকে মোটামুটি তিনটি স্তরে ভাগ করা যায়—(1) ব্যুৎপত্তিগত পর্যায়, (2) বর্ণনা-মূলক পর্যায় এবং (3) অভিসারী পর্যায়। প্রথম পর্যায় রিসলে কর্তৃক 1915 খৃষ্টাব্দে জনগণনার সময় শারীরিক মাপজোক এবং দৈহিক গঠনের অবলোকনের মধ্য দিয়ে সুরু হয়। এরপর সারগি, হাডন, হাটন কর্তৃক ভারতীয় জনগণের শারীরিক গঠন ও আকৃতি অনুযায়ী শ্রেণীবিন্যাস সংক্রান্ত বিভিন্ন আলোচনায় সূত্রপাত করে। এঁদেরই কর্মপন্থা অনুসরণ করে নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গীতে ডক্টর বিরজাশঙ্কর গুহ ভারতীয় জনগণের শ্রেণীবিন্যাস করেন এবং এই অভিমত প্রদান করেন যে, আদি ভারতীয় জনগণ জাতি (Race) হিসাবে ছিল মূলতঃ নিগ্রো গোষ্ঠীভুক্ত। 1935 খৃষ্টাব্দে এই বিবরণটি প্রকাশিত হয়। সেই সময় থেকেই বিভিন্ন রকমের বিশ্লেষণাত্মক কর্মধারা রচিত হয় এবং ডক্টর গুহ কর্তৃক সমীক্ষার উপর আক্রমণাত্মক ভূমিকা রচিত হয়। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এবং হারাণচন্দ্র চাকলাদার তাঁদের ভারতীয় জাতিতত্ত্বের মৌলিক রচনাবলীর সাহায্যে গুহ কর্তৃক প্রদত্ত যুক্তি খণ্ডনের চেষ্টা করেন। এই পর্যায়ে জাতিতত্ত্বের শ্রেণীবিন্যাস ছাড়াও রক্তদল (Blood-group) এবং হস্তপদরেখাবলীর (Dermatoglyphics) উপর যথেষ্ট আলোকসম্পাত করা হয় এবং স্বাভাবিকভাবেই শারীরিক নৃ-বিজ্ঞান আলোচনায় প্রজননসম্পর্কিত পদ্ধতির (Genetical method) সূত্রপাত হয়। এই বিশেষ পদ্ধতির সাহায্যে সারা দেশব্যাপী বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির জাতিতত্ত্বমূলক প্রাক্তন তথ্যাবলীর নবীকরণ করা হয়।

1950 খৃষ্টাব্দ থেকেই সুরু হয় অভিসারী পর্যায়। এই পর্যায়ে নৃ-বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন সূচিত হয়। মানুষের প্রজনন বিদ্যার (Genetics) আলোচনায় ব্যাপক হারে জৈব পরিসংখ্যান সাধনার (Bio-statistical tool) ব্যবহার এই পর্যায়টিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। তাছাড়া এই পর্যায়ে মানুষের বৃদ্ধি, বিকাশ, পুষ্টি এবং প্রজননজনিত বিভিন্ন

বিষয়ের উপর মৌলিক আলোকপাত করা হয়। ভারতীয় জাতিতত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণ ভারতের বহু বিতর্কিত কাদার উপজাতির নিগ্রোয়ড প্রত্যক্ষ গবেষণার ভিত্তিতে ডক্টর শশাঙ্ক শেখর সরকার আলোচনা করে পুরাপুরিভাবে বাতিল করেন। বিভিন্ন প্রাগৈতিহাসিক ক্ষেত্র গবেষণায় প্রাপ্ত নরকঙ্কাল ও করোটির মাপজোখ এবং সর্বভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে তাদের অবদানের বিষয় আলোচিত হয়। ব্যুৎপত্তিগত পর্যায়ের জাতিতত্ত্বের অধিকাংশ আলোচনা এই পর্যায়ে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে মূল্যায়িত হয়।

আমাদের এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে শারীরিক নৃ-বিজ্ঞানের সার্বজনীন ব্যবহারের দিকে সামান্য আলোকপাত প্রয়োজন, কারণ মানব কল্যাণে বিজ্ঞানের এই বিশেষ শাখাটির সত্যই কোন ভূমিকা আছে কিনা, তা অবহিত হওয়া অত্যাবশ্যক। পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহে শারীরিক নৃ-বিজ্ঞানের গবেষণালব্ধ ফলাফল ভেষজবিদ্যা, দন্তচিকিৎসা, রোগনিরূপণবিদ্যা প্রভৃতিতে ব্যাপকভাবে কাজে লাগানো হয়। চিকিৎসকেরা রোগীর সামগ্রিক বৃদ্ধি, অস্থির গঠন, মাংসপেশীর প্রকৃতি প্রভৃতির উপর যথাযথ জ্ঞানের প্রয়োজন অনুভব করেন। শারীরিক নৃ-বিজ্ঞানভিত্তিক মাপজোখের প্রত্যক্ষ সাহায্য এসব ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য। স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞগণের সন্তান-সম্ভবা মহিলাদের শ্রোণীচক্রের বিস্তার এবং গর্ভস্থিত সন্তানের মস্তক পরিধির আনুপাতিক জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক। তাছাড়া অস্থিসম্পর্কিত শল্য চিকিৎসায় দেহের বিভিন্ন অস্থির নৃ-বিজ্ঞানভিত্তিক মাপজোখের প্রাথমিক জ্ঞান চিকিৎসকদের প্রভূত সাহায্য করে। হস্ত ও পদরেখশৈলী, রক্তদল (Blood group) প্রভৃতি আদালত ও বিচারকার্যের বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া মানুষের শারীরিক গঠন এবং প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নিরূপণের কাজও হয়েছে। প্রখ্যাত নৃ-বিজ্ঞানী হুটন (Hooton) আমেরিকায় ট্রেনযাত্রীদের বসবার স্থানসংক্রান্ত বিষয়ে নৃ-বিজ্ঞানভিত্তিক মাপ-জোখের প্রচলন করেছিলেন। ঐ দেশের Bureau of Home Economics-এর তৈরী পোষাক-পরিচ্ছদের উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে উক্ত মাপজোখের সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছিল। সেনাবিভাগে নৃ-বিজ্ঞানের বিশেষ ব্যবহার এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। সৈন্যদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিমাপের কাজে নৃ-বিজ্ঞানভিত্তিক মাপ-জোখের প্রয়োগ অত্যধিক ফলপ্রদ বলে বিবেচিত হয়েছে। বিমান বাহিনীর নানা কাজে, বিশেষ করে বায়ুযানগুলিতে শারীরিক বিস্তৃতি অনুযায়ী বসবার স্থান এবং যথোপযুক্ত পোষাক-পরিচ্ছদ পরিকল্পনায় নৃ-বিজ্ঞানের দান অপরিসীম। 1943 খৃষ্টাব্দে যুক্তরাজ্যের জাতীয় সংগ্রহশালায় ফলিত শারীরিক নৃ-বিজ্ঞানের এক বিশেষ আলোচনা-চক্র অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং তাতে যুদ্ধে মৃত সৈনিকদের সনাক্তকরণ, সৈনিকদের পোষাক-পরিচ্ছদ এবং সামরিক নৃ-বিজ্ঞানের অন্যান্য নানাদিকের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছিল। বর্তমানে খেলা-ধূলার জগতেও নৃতাত্ত্বিক মাপজোখের ব্যবহার সুরু হয়েছে। টার্নার (Tarner) অলিম্পিক খেলোয়াড়দের শারীরিক গঠন পর্যালোচনায় নৃ-তাত্ত্বিক মাপজোখের প্রচলন করে এই ব্যাপারে এক নব দিগন্তের সন্ধান দিয়েছিলেন

ভারতে ফলিত শারীরিক নৃ বিজ্ঞানের এবম্বিধ ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয় নি, যদিও জন-জীবনের বিভিন্ন পদক্ষেপে এর প্রয়োজন অনুভূত হয়। সম্প্রতি দক্ষিণ রেলপথে স্টেশন মাষ্টারদের ঢিলে-ঢালা পোষাক (Uniform) সরবরাহের প্রতিবাদে কর্মবিরতি পালিত হয়। পাইকারীহারে পোষাক-পরিচ্ছদ সরবরাহের ব্যাপারে নৃতাত্ত্বিক মাপজোকের এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। রেল-পথের অধিকাংশ তৃতীয় শ্রেণীর শয়নযানগুলির পার্শ্বস্থিত শয়নস্থানসমূহে সাধারণ দৈর্ঘ্যের যাত্রীদের শয়নে অত্যধিক অসুবিধা হয়, কারণ

দৈর্ঘ্যে এগুলি ছোট। কাজেই এক বিশেষ এলাকায় মানুষের গড় সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য নির্ণয় করে তার পরিপ্রেক্ষিতে শয়নস্থানগুলির পরিকল্পনা করা অতীব প্রয়োজন। ভারতের মত বিচিত্র পরিবেশ এবং বিচিত্র ভৌগোলিক পরিস্থিতিপূর্ণ দেশে সামরিক ক্ষেত্রে নৃ-বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ ব্যবহার জরুরী প্রয়োজন। খেলাধূলাতেও ভারত আজ পিছিয়ে নেই। খেলোয়াড়দের শারীরিক মান মূল্যায়নে এবং সমতা রক্ষায় নৃতাত্ত্বিক মাপজোখের প্রয়োজন অনুভূত হয়।

অপর পক্ষে সামাজিক নৃ বিজ্ঞানের পঠন-পাঠনের কার্যাবলীকেও মোটামুটি তিনটি বিভাগে ভাগ করা যায়—(1) বুৎপত্তিগত পর্যায়, (2) গঠনমূলক পর্যায় এবং (3) বিশ্লেষণমূলক পর্যায়। ভারতে সামাজিক নৃ-বিজ্ঞানের আলোচনা সুরু হয় প্রকৃতপক্ষে 1774 খৃষ্টাব্দে Asiatic Society of Bengal-এর প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই। এই সময় থেকে 1919 খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ কাল সামাজিক নৃ-বিজ্ঞানের বুৎপত্তিগত পর্যায়ভুক্ত। এই পর্যায়ের কর্মপদ্ধতিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়—(1) সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন সুচিন্তিত প্রবন্ধ, (2) সরকারী বিবরণী এবং জাতি-উপজাতি গোষ্ঠীর সারগ্রন্থ, (3) নির্বাচিত জাতি-উপজাতির প্রকরণ গ্রন্থ। এই সমস্ত রচনায় অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশই বিদেশী, একথা ইতিপূর্বেই আলোচিত হয়েছে। 1920 খৃষ্টাব্দ থেকে নৃ-বিজ্ঞানের পেশাদারী ভূমিকা সূচিত হয় এবং এই সময় থেকেই ভারতীয় পণ্ডিতদের নৃ-বিজ্ঞানের বিভিন্ন আলোচনার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই পর্যায়ে অন্যান্য সদৃশ এবং বিসদৃশ বিষয় থেকে বিভিন্ন পণ্ডিতদের নৃ-বিজ্ঞানের চত্বরে আগমনের বিষয় উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন ভারতীয় নৃ-বিজ্ঞানী ও সমাজ-বিজ্ঞানী ভারতীয় সমাজের নানা দিকের প্রতি আলোকসম্পাত করেন। এঁদের মধ্যে জি. এস. ঘুরে, কে. পি. চট্টোপাধ্যায়, এন. কে. বসু, এম. এন. শ্রীনিবাস, ডি. এন. মজুমদার এবং ইরাবতী কার্ভের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পরে ভেরিয়র এল্যুইনের মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যার উপজাতি গোষ্ঠীর উপর প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র গবেষণাভিত্তিক রচনা এই পর্যায়ের কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত নৃ-বিজ্ঞানের সমস্ত গবেষণা ও রচনা বৃটিশ নৃ-বিজ্ঞানীদের নির্দেশিত পথে পরিচালিত হয়েছিল এবং এখানের বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনে তদানীন্তন কেম্ব্রিজ, অক্সফোর্ড ও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যক্ষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

1950 খৃষ্টাব্দের সুরু থেকেই সামাজিক নৃ-বিজ্ঞানের পঠন-পাঠন ও গবেষণার ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন লক্ষিত হয়। এই সময় ভারতীয় নৃ-বিজ্ঞান বিভিন্ন আমেরিকান পণ্ডিতের চিন্তাধারা ও কর্মধারার প্রভাবে বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। অপ্‌লার (Oplér), লিউইস (Lewis), ম্যাণ্ডেলবাম (Mandelbaum) প্রমুখ নৃ-বিজ্ঞানীরা গবেষকদল নিয়ে বিভিন্ন সময়ে ভারতে এসে এখানকার গ্রাম, সমাজ ও গ্রামীন অর্থনীতি বিষয়ে অনুসন্ধানকার্য পরিচালনা করেছিলেন। তাছাড়া রেডফিল্ড (Redfield) এবং সিঙ্গারের (Singer) অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁদের গবেষণা ভারতীয় সামাজিক নৃ-বিজ্ঞানে এক নতুন দিগন্তের সন্ধানই শুধু দেয় নি, ভারতীয় সমষ্টি উন্নয়ন কার্যক্রম রূপায়ণে যথেষ্ট সাহায্যও করেছিল। এঁদেরই কর্মপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে নবীন ও প্রবীন ভারতীয় নৃ-বিজ্ঞানীরা গতানুগতিক উপজাতি ও আদিম জীবনযাত্রা প্রণালীর অনুসন্ধান ত্যাগ করে গ্রামীন সমাজ এবং জটিল সমাজ ব্যবস্থার বিভিন্ন দিকের প্রতি আলোকপাতে প্রবৃত্ত হন। এই সময় ভারতের গ্রাম সমীক্ষা, জাতি, ধর্ম, ক্ষমতা সংবৃতি এবং নেতৃত্ব, নগর সমীক্ষা প্রভৃতির প্রচুর তথ্য সংগৃহীত

হয়েছিল। নৃ-বিজ্ঞান গবেষণার এই সময়টি তাই বিশ্লেষণমূলক পর্যায় নামে পরিচিত।

ফলিত সামাজিক নৃ-বিজ্ঞান আজ দেশের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ফলপ্রদ বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে। তদানীন্তন বৃটিশ শাসকগণের পৃষ্ঠ-পোষকতায় সামাজিক নৃ-বিজ্ঞানের চর্চা এবং জাতি-উপজাতিদের জীবনধারা ও সমস্যাবলী সমাধানের চেষ্টা ব্যাপকভাবে করা হয়েছিল। এই বিষয়ের যথেষ্ট নজির রয়েছে। স্বাধীনোত্তর ভারতে এদিকে বিশেষ দৃষ্টিপাতের উদ্যোগপর্ব অনুষ্ঠিত হয়। 1949 খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত The Eastern Anthropologist-এর বিশেষ 'উপজাতি সংখ্যায়' সর্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে বিভিন্ন উপজাতির নানা সমস্যাবলীর আলোচনার সঙ্গে ঐ সকল বিষয়ের সমাধানে নৃ-বিজ্ঞানের ভূমিকার কথা উল্লেখ করা হয়। এর পর উপজাতির জীবনবিষয়ক সমস্যা-বলীর আলোচনায় এল্যুইনের নাম উল্লেখযোগ্য। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত প্রদেশের নানা উপজাতির জীবনধারার নৃ-বিজ্ঞান ভিত্তিক মূল্যায়নে তিনি পথপ্রদর্শক। তাঁর রচিত পুস্তক 'A Philosophy for NEFA' উপজাতি সমস্যার একটি গণ-তান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীপূর্ণ আলোচনা। বিভিন্ন উপজাতির সংস্কৃতির প্রতি যথাযোগ্য স্বীকৃতি এই আলোচনা-ধারার মূল লক্ষ্য ছিল। বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার পরিচালিত উপজাতি কল্যাণ সংস্থাগুলির মুখপত্রে উপজাতির সংস্কৃতির প্রকৃতি ও বৈচিত্র্য এবং তাদের জীবনের বিভিন্ন সমস্যাবলীর আলোচনা হয়ে থাকে। অধিকাংশ সময়েই আলোচনার ফলাফল উপজাতিজীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিকল্পে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। উপজাতি জীবনভিত্তিক আলোচনা ব্যতীত সামাজিক নৃ-বিজ্ঞানকে বিভিন্ন গ্রাম-সমীক্ষার কাজে লাগানো হয়েছে। স্বাধীনোত্তর ভারতে ব্যাপকহারে সমষ্টি উন্নয়ন কার্যক্রম রূপায়ণে পল্লীজীবনের রূপরেখার পূর্ব আলোচনা অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠে। ভারতীয় লোকগণনা বিভাগ পরিচালিত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে নৃ-বিজ্ঞানভিত্তিক গ্রাম-সমীক্ষার কথাও এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

সামাজিক নৃ-বিজ্ঞানকে ব্যাপকভাবে নানা সমাজের কল্যাণে নিয়োজিত করবার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। যদিও আমাদের দেশে এদিকে যথাযোগ্য নজর দেওয়া হয় নি। আমেরিকায় যুদ্ধকালীন অবস্থায় বিভিন্ন সামরিক সংস্থাগুলিতে তথ্য, অনুসন্ধান, বুদ্ধিমত্তা ও সমীক্ষা প্রভৃতিতে নৃ-বিজ্ঞানীদের কর্মপদ্ধতির এক সুন্দর নিদর্শন রয়েছে। যুদ্ধকালে বেসামরিক জনতার মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখতে এবং দেশের জরুরী অবস্থায় পারস্পরিক প্রীতি ও সহযোগিতা রক্ষা করে চলতে নৃ-বিজ্ঞানীদের অবদানের নজির রয়েছে। এছাড়া ব্যাপকহারে প্রযুক্তিবিজ্ঞানের প্রসারের জন্যে মানব সমাজের যে সমস্যাবলীর উদ্ভব হয়েছে বা প্রতিদিন হচ্ছে, তার সুষ্ঠু আলোচনায় নৃ-বিজ্ঞানীরা অংশগ্রহণ করে থাকেন। শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক, বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্পর্ক প্রভৃতির অনুশীলন পারস্পরিক দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের মূল উৎপাটনে প্রত্যক্ষ সাহায্য করে। জাতীয় চরিত্রের অনুসন্ধান নৃ-বিজ্ঞানের একটি বিশেষ অবদান। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় প্রখ্যাত নৃ-বিজ্ঞানী রুথ বেনিডিক্ট (Ruth Benedict) জাপানীদের জাতীয় চরিত্রের বিভিন্ন বিষয় সঙ্কলন করেছিলেন। তিনি এই বিষয়ে আমেরিকাবাসী জাপানীদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যগুলির উপর সুসমঞ্জস আলোক-পাত করেছিলেন। কোন জাতির ও দেশের এই বৈশিষ্ট্যগুলি জানা থাকলে সেই জাতির যুদ্ধ এবং শান্তিকালীন কর্মপদ্ধতির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ উদ্ঘাটনে সহায়তা করবে। ভারতের মত বৈচিত্র্য এবং সমস্যাপূর্ণ দেশে সামাজিক নৃ-বিজ্ঞানীর যথেষ্ট করণীয় রয়েছে। বিভিন্ন ধরণের উন্নয়নমূলক কর্ম-পন্থা রূপায়ণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট অঞ্চল ও জনগণের

সামগ্রিক সমীক্ষা হওয়া প্রয়োজন। কোন সম্প্রদায়ের উন্নয়ন প্রকল্প পরিকল্পনার প্রাক্কালে সেই বিশেষ সম্প্রদায়ের ধ্যান-ধারণা, জীবনযাত্রা প্রণালী এবং মনোবৃত্তির বিজ্ঞানভিত্তিক সমীক্ষা জাতীয় অর্থ, শ্রম ও সময়ের অপচয়রোধে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করে। বর্তমানে পাশ্চাত্য দেশে বিভিন্ন স্থানে অনেক নামজাদা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তাদের উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী জনসাধারণের ব্যবহার এবং ক্রয়ের মনোবৃত্তির উপর ব্যাপক সমীক্ষা চালাবার ব্যবস্থা করেছে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে একথা সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, নৃ-বিজ্ঞান বিশেষভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং মানুষ ও তার সমাজব্যবস্থায় দৈনন্দিন ক্রিয়াকাণ্ডে এর অবদান অনস্বীকার্য। ভারতে এর চর্চা এবং শাসনসংক্রান্ত বিষয়ে এর ব্যবহার বহু দিন থেকেই চলেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, অর্ধশত বছর অতিক্রম করেও নৃ-বিজ্ঞানের পঠন-পাঠনের সুযোগের সীমারেখা প্রায় পূর্ববৎই থেকে গেছে। নৃ-বিজ্ঞান পঠন-পাঠন পরিচালনায় ব্যাপারে পথিকৃৎ এই কলিকাতায় এখনও পর্যন্ত নৃ-বিজ্ঞান পাঠের সুযোগ বিশ্ববিদ্যালয় এবং বঙ্গবাসী কলেজের সীমা অতিক্রম করে নি। সাম্প্রতিককালে কলিকাতার বাইরে মাত্র চা:টি কলেজে স্নাতক শ্রেণীতে নৃ-বিজ্ঞান একটি পাঠ্য বিষয় হিসাবে অন্তর্ভুক্তি লাভ করেছে। নানা ধরণের প্রত্যাশা থাকা সত্ত্বেও নৃ-বিজ্ঞানের জনপ্রিয়তা অর্জন না করবার পিছনে বহুবিধ কারণ রয়েছে। কলিকাতায় নৃ-বিজ্ঞানের দিগন্তে পাণ্ডিত্যের কোন অভাব নেই এবং এখানের নৃ-বিজ্ঞানীদের নিরলস কর্মসাধনা সার্থকতায় পর্যবসিত হয়েছে—এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এঁদের গবেষণার ফলাফল পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও দুরূহ পত্র-পত্রিকায় সীমাবদ্ধ থেকে গেছে। সাধারণের জন্যে সাধারণভাবে নৃ-বিজ্ঞানের কথা বলবার প্রচেষ্টা খুব বেশী হয় নি। নবীন ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে সহজবোধ্যভাবে নৃ-বিজ্ঞানের পরিচয় দানের কোন ব্যবস্থাই হয় নি। নৃ-বিজ্ঞান পাঠের পঞ্চাশৎ বর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে বিভিন্ন পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনার আসর বসেছে—বহু দুরূহ ও তথ্যপূর্ণ বিষয়ের চুলচেরা বিচার হয়েছে. কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, নৃ-বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসারের কোন বাস্তব প্রস্তাব গ্রহণের প্রবণতা দেখা যায় নি। এমতাবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই নৃ-বিজ্ঞান জনমানস থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দিনাতিপাত করে চলেছে। তাই জিজ্ঞাসু সাধারণ মানুষ যখন তার প্রশ্নের জবাবে শুনতে পান যে, তাঁর পার্শ্বোপবিষ্ট মানুষটি নৃ-বিজ্ঞান পাঠে অথবা অধ্যাপনায় নিযুক্ত, তখন স্বাভাবিকভাবেই তিনি মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আলোচনার ইতি করতে চান। কারণ বিষয়টির নাম পর্যন্তও ইতিপূর্বে তার কর্ণগোচর হয় নি। নানা পাণ্ডিত্যপূর্ণ অনুসন্ধান এবং অবদান সত্ত্বেও নৃ-বিজ্ঞানের মত একটি চিত্তাকর্ষক বিষয় আজও ভারতে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয় নি। এই অবস্থার অচিরেই অবসান হওয়া প্রয়োজন। বিজ্ঞানের অনুশীলন গবেষণাগার, পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা বৈঠক এবং পণ্ডিতদের দুরূহ ও জটিল তর্ক-বিতর্কের গণ্ডী অতিক্রম করে সহজবোধ্য ও সুচারুভাবে জনগণের গোচরীভূত না হলে সেই বিষয় সামগ্রিক জনপ্রিয়তা লাভে বিশেষভাবে বঞ্চিত হয়। দেশের সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অধিবাসীদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটে এবং সেই সঙ্গে তাল রেখে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যনির্ঘণ্টের পরিবর্তন অতীব প্রয়োজন। পূর্বোক্ত আলোচনায় আমরা দেখেছি, ভারতে যুগে যুগে নৃ-বিজ্ঞান চর্চার দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত হয়েছে—পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে সমাজের নানা সমস্যার সমাধানে নৃ-বিজ্ঞানকে কাজে লাগানো হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, এখানের পাঠ্যনির্ঘণ্ট এখনও

সেই আগুকালের প্রভাবে প্রভাবিত। যুগের পরিবর্তনের ছাঁচে এটিকে ঢেলে সাজাবার সার্থক প্রবণতা দেখা যায় না। সরকারী মহলের উপজাতি উন্নয়ন সংস্থাগুলিতে নৃ-বিজ্ঞানে শিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্য এবং সহযোগিতা গ্রহণ করা হলেও প্রশাসনের অন্যান্য বিভাগে নৃ-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের প্রয়োগ লক্ষিত হয় না; যদিও এর যথেষ্ট প্রয়োজন অনুভূত হয়। এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় উদ্যম ও বাস্তব কর্মপন্থা রূপায়ণের উদাসীনতা সামগ্রিকভাবে নৃ-বিজ্ঞান শাখাটির প্রকৃত প্রতিষ্ঠা এবং মূল্যায়নে বিরোধিতা করেছে। আজকের এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে নৃ-বিজ্ঞান শাখাটির সমগ্র ভারতীয় পটভূমিতে এবং পরিবর্তনের স্রোতধারার পশ্চাৎপটে নবীকরণ অত্যাবশ্যক হয়ে উঠেছে। নৃ-বিজ্ঞানের শুদ্ধ জ্ঞানের সঙ্গে ফলিত জ্ঞানের যোগসূত্র স্থাপনে ভারতের মত এমন বিচিত্র পটভূমি পৃথিবীর আর কোথাও নেই। এই দুই জ্ঞানরাজ্যের সেতুবন্ধনে নৃ-বিজ্ঞানী এবং সরকারী প্রশাসনিক আধিকারিকগণের যুগপৎ পারস্পরিক সহযোগিতা প্রয়োজন। বিভিন্নধর্মী সমস্যা এবং নানান পরিকল্পনা রূপায়ণে উদ্যোগী ভারতের নৃ-বিজ্ঞান চর্চা বিশেষ সাহায্যে আসতে পারে এবং তা অতি স্বাভাবিকভাবেই নৃ-বিজ্ঞানের সঙ্কীর্ণ দিগন্তকে প্রসারিত করে যথাযথ মর্যাদার আসন দান করবে।

সঞ্চয়ন

শস্যোৎপাদনের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অগ্রগতি

পৃথিবীর জনসংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্যে যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য উৎপাদনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশেষভাবে তৎপর হয়েছে এবং দক্ষিণ এশিয়া ও মধ্য প্রাচ্যাঞ্চলের বিভিন্ন রাষ্ট্র তাতে সহযোগিতা করছে। এজন্যে তাদের সর্বদাই সচেতন থাকতে হচ্ছে, ফসলের পক্ষে ক্ষতিকর, বিভিন্ন ভাইরাস, নানা ধরণের কীট-পতঙ্গের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে হচ্ছে যার ফলে ফসলের সমূহ ক্ষতি হয়ে থাকে। আবহাওয়াকে কিভাবে কলুষমুক্ত করা যেতে পারে, সে বিষয়ে নানা কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হচ্ছে।

এই সকল প্রতিকূল পরিস্থিতি ও অবস্থার মধ্যে টিকে থাকতে পারে এরকম ধান, গম ও ভুট্টা গাছের সৃষ্টি করাই এই ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি সংক্রান্ত কর্মসূচীর লক্ষ্য। এজন্যে উন্নত ধরণের বীজ উৎপাদনের জন্যে তাঁরা উদ্যোগী হয়েছেন। এই ধরণের বীজের প্রাণরসের জার্মপ্লাজমের সঙ্গে অন্য ধরণের গাছের বীজের প্রাণরসের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে তারা নূতন ধরণের বীজ সৃষ্টি করছেন। এই সকল বীজ থেকে যে গাছ জন্মায়, তাতে ফসল ফলে অনেক বেশী, রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতাও এদের বেশী হয়ে থাকে। চারাগাছের বৃদ্ধির সময় সাধারণতঃ যে সকল বাধা বিপদ দেখা যায়, এরা সে সকল কাটিয়ে উঠতে পারে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা নানা জাতের নানা ধরণের বীজ নিয়ে সঙ্কর শস্য উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, মিশর ইথিওপিয়া, ইরাক, ইজরায়েল, সৌদী আরব, সুদান, তুরস্ক, সিকিম, ভুটান প্রভৃতি বিভিন্ন দেশ থেকে ধান, গম, ভুট্টা প্রভৃতি খাদ্যশস্য নানা

জাতীয় শাকসজী এবং নানা রকম তৈল বীজ সংগ্রহ করেছেন।

মার্কিন বিজ্ঞানীদের এই সকল গবেষণার সুফল পৃথিবীর সকল দেশই পাচ্ছে, সকল দেশের সঙ্গেই তথ্য এবং গবেষণার ফলাফলের অবাধ বিনিময় হচ্ছে। আমেরিকা সুদীর্ঘ কালের তথ্যানুসন্ধান ও গবেষণার ফলে এই ক্ষেত্রে যে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান সঞ্চয় করেছে, বিশেষ করে ভারত খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধিতে তার সাহায্য নিয়েছে।

মার্কিন কৃষিদপ্তরের বিশেষ বীজ বিভাগ খোলা হয় 1898 সালে। তারপর থেকে এই বিভাগ সমগ্র পৃথিবীতে বীজসংগ্রহ ও চারাগাছ সম্পর্কে 150 বার অভিযান চালিয়েছে। এর ফলে মানুষ ও পশুর নূতন ধরণের খাদ্য, প্রাকৃতিক কীটঘ্ন গাছগাছড়া এবং ভেষজের সন্ধান করবার জন্যে সাড়ে তিন লক্ষেরও বেশী নানা ধরণের গাছ, ফসল ও সব্জি প্রভৃতির বীজ সংগৃহীত হয়েছে।

আমেরিকার কলোরেডোর ফোর্টকলিন্সের জাতীয় বীজ সংরক্ষণাগারেই নানা স্থান থেকে সংগৃহীত সকল বীজ জমা করা হয়। এই গবেষণাগারে হিমায়নের বিশেষ সাজসরঞ্জাম, বীজ অঙ্কুরিত করবার নানা ব্যবস্থা ও সুযোগ, সুবিধা রয়েছে। প্রতিটি বীজের বৈশিষ্ট্য এক-একটি কার্ডে লেখা থাকে এবং কোন বিশেষ বীজ সম্পর্কে কোন কিছু জানতে হলে কম্পিউটার যন্ত্রের সাহায্যে সেই বীজের কার্ডটি চাইবামাত্রই পাওয়া যায়।

বীজ সংগ্রহের ব্যাপারটি নূতন নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বীজ সংগ্রহ সুরু হয়েছে 1819 সালে কৃষিদপ্তর খোলবারও বেশ কয়েক দশক থেকে। গাছগাছড়া ও বীজ সংগ্রহের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, খৃষ্টের জন্মের দেড় হাজার বছর আগে মিশরের রাণী হাতশেপসুত পূর্ব আফ্রিকায় ধূপগাছ সংগ্রহ করবার জন্যে জাহাজ পাঠিয়েছিলেন।

বর্তমানে নূতন ধরণের ফসল উৎপাদনের উদ্দেশ্যেই বীজ সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। সাম্প্রতিক কালে এই ক্ষেত্রে একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। উন্নতিশীল রাষ্ট্রে যে সকল উচ্চ ফলনশীল শস্যবীজ রোপণ করা হয়, সে সকল দেশে প্রধানতঃ সেই সকল শস্যের চাষ হয়ে থাকে এবং এতকাল যে সকল সুপ্রাচীন শস্যের চাষ হয়ে আসছিল, তাদের স্থান এই নূতন ধরণের শস্য গ্রহণ করছে। ফলে প্রাচীন জাতের শস্য ও বীজসমূহ নিশ্চিহ্ন হতে বসেছে। বিজ্ঞানীরা এই বিষয়ে সমস্যায় পড়েছেন। কারণ ঐ সকল শস্যের বীজের সঙ্গে অন্য বীজের মিশ্রণ ঘটিয়ে রোগ প্রতিরোধক নূতন ধরণের চারাগাছ তারা উৎপাদন করতে পারতেন। পুরনো শস্যের বীজ গবেষণার দিক থেকে অতি মূল্যবান বস্তু। কিন্তু উন্নত ধরনের বীজ প্রবর্তিত হওয়ায় পুরাতন বীজ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং সে সকল আর পাওয়া যাচ্ছে না।

এজন্যে মার্কিন কৃষি বিভাগ বিশ্বের নানা দেশে উন্নত ধরণের শস্যের জন্যে পুরাতন বীজ সংগ্রহাগার ও গবেষণাগার গড়ে তোলবার জরুরী প্রয়োজনীয়তার কথা বিশেষভাবে বলছেন। তাছাড়া ঐ বিভাগ বিভিন্ন কেন্দ্রের মধ্যে দ্রুত তথ্য বিনিময়ের ব্যবস্থা গড়ে তোলবার জন্যেও সুপারিশ করেছেন।

বীজ সম্পর্কে গবেষণাগার স্থাপন করা যে কত প্রয়োজন, তা আমেরিকায় উচ্চ ফলনশীল ও রোগ প্রতিরোধক বীজ উৎপাদনের দিক থেকে যে সাফল্য অর্জিত হয়েছে, সে দিকে তাকালেই উপলব্ধি করা যায়।

আলফালফা নামে এক ধরণের ঘাস গবাদি পশুর খাদ্য। গুবরে পোকার মত এক প্রকার কীট ঐ ঘাস ও শস্যের বিশেষ ক্ষতি করে থাকে। মার্কিন কৃষি দপ্তরের গবেষণা কর্তৃক ভারত, সৌদী আরব, আফগানিস্তান, ইজরায়েল ও ইউরোপের কয়েকটি দেশ থেকে আনা বীজের

সঙ্গে মিশ্রণ ঘটিয়ে এক নূতন ধরণের ঘাস উৎপাদন করেছেন। ঐ সকল কীট এই নূতন ধরণের ঘাসের কোন ক্ষতি করতে পারে না।

স্পিনিজ নামে এক প্রকার শাকে ছত্রাক জন্মাতো। ফলে এই শাক চাষ করাই কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। ভারত, ইরান, তুরস্ক, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশ থেকে এই জাতীয় শাকের বীজ আনিয়ে তাদের সঙ্গে মিশ্রণ ঘটিয়ে নূতন ধরণের স্পিনিজ সৃষ্টি করে এই সমস্যার সমাধান করা হয়েছে।

ভূমধ্যসাগরীয় বিভিন্ন দেশ থেকে আনা মটর থেকে নূতন ধরণের রোগ প্রতিরোধক একপ্রকার মটর সৃষ্টি করা হয়েছে। গবেষণার ফলে লোধ্র ফুলের একপ্রকার বীজও সৃষ্টি করা হয়েছে। এই সকল বীজ থেকে জলপাইয়ের তৈলের মত এক প্রকার তৈল উৎপাদন করা হয় এবং রান্নায় ঐ তৈল ব্যবহৃত হয়। ইজরায়েল থেকে লেটুস এবং ইরান থেকে আনা ক্যানটালুপ নামে আর এক প্রকার শাকের বীজ মিশিয়ে উন্নত ধরণের শাক তৈরি করা হয়েছে। বহু নূতন ধরণের শাকসব্জী, ডাল, শস্য ইতিমধ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে, তার মাত্র কয়েকটির কথা এখানে উল্লেখ করা হলো।

বিবর্তন বা জীবের চরম নিয়তি

রামচন্দ্র অধিকারী

বিবর্তন শব্দটি আজ আমাদের সকলের কাছেই সুপরিচিত, বিশেষতঃ ইংরেজীতে Evolution বলিলে অনেকেই সহজে বুঝিতে পারেন। সূক্ষ্ম বস্তু ক্রমপরিবর্তনে, কোনও বিশিষ্ট দেশস্থানে, কালধর্মে বিচিত্র ও বহুল হইয়াছে—অবশ্য এক দিনে নয়, এক বৎসরেও নয়, কালের গতিতে। এই বিবর্তন দৃষ্ট হয় বা বুঝান হয়, শুধু যে জীবজগৎ সম্পর্কেই তাহা নহে, সামাজিক ব্যবস্থা এবং নিখিল বিশ্ব ব্যাপারেও। একের বিবর্তনেই বহুত্ব—যাহা সূক্ষ্ম ও সরল ছিল, এখন বা আজ তাহাকে দেখিতেছি জটিল বৈচিত্র্যপূর্ণ। এই বিবর্তন কিরূপে ঘটে, কাহার প্রেরণায় কিংবা বিবর্তনের উদ্দেশ্য কি—সে বিষয় বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিই নির্ণয় করিতে প্রয়াসী। বিবর্তন শব্দটির অধিকতর প্রচলন হইয়াছে চার্লস ডারুইনের মতবাদ হইতে।

তৎপূর্বে লামার্ক (Lamarck—1774-1829 খৃঃ অঃ) এই মতের পোষকতা করিয়াছিলেন। এই দুই জন জীববিজ্ঞানী জীবজগতে বিবর্তনবাদ প্রচার ও প্রতিষ্ঠার দ্বারা বিদ্বজ্জনসমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। অবশ্য তাঁহাদের পরে আজ পর্যন্ত বিবর্তন সম্বন্ধে আরও অনেক প্রকার মতবাদের আবির্ভাব হইয়াছে। সংক্ষেপে—জীববিজ্ঞানীরা মনে করেন, অতি ক্ষুদ্র, অণু পরিমাণ প্রাণবন্ত জীবকণা (যাহা খালি চোখে দেখা যায় না, কেবলমাত্র অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দৃশ্য) কালে ও দেশে ক্রমবিবর্তনের ফলে পূর্ণাঙ্গ মানবদেহে পরিণত হইয়াছে। জীববিজ্ঞানীদের মতবাদ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মহলে কোন ভিন্ন মত নাই। কিন্তু তাঁহারা শুধু প্রাণীদেহের বিবর্তন লইয়াই ব্যাপৃত ছিলেন এবং প্রাণীর দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রমবিকাশ বা ক্রমবিবর্তন লক্ষ্য করিয়াছেন। প্রস্তরীভূত কঙ্কাল আবিষ্কারে প্রমাণিত হইয়াছে, অনেক অতিকায় জীব

জীবন-সংগ্রামে পরাভূত হইয়া ভূপৃষ্ঠ হইতে চিরতরে লুপ্ত হইয়াছে, প্রত্নতাত্ত্বিকের অনুসন্ধানের ফলে তাহাদের একদা অস্তিত্ব সর্বথা বিশ্বাসযোগ্য। মাতৃগর্ভে পিতৃরেতঃ মাতৃশোণিত সমবায়ে ভ্রূণ ও অতিসূক্ষ্ম জীবকণা 230 দিনে মাতৃগর্ভেই পূর্ণাঙ্গ জীবদেহ ধারণ করিয়া ভূমিষ্ঠ হয়, যে জীবদেহ সমগ্র জীবজগতে সংগঠিত হইয়াছে দীর্ঘকালে অন্ততঃ বহু কোটি বৎসরে। মানুষের সৃষ্টি কিরূপে হইয়াছে, সে সম্বন্ধে পূর্বকালীন বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ্‌গণের ধারণা আজ উপহাসের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিখ্যাত পদার্থ-বিজ্ঞানী লর্ড কেল্‌ভিন মনে করিতেন, পরমেশ্বর প্রতিটি জীবের বীজ আকাশ হইতে ভূপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করেন। বাইবেলের পুরাতন টেষ্টামেণ্টে আছে—বিরাট প্লাবনের ফলে যখন পৃথিবী জলমগ্ন হয়, তখন প্রতিটি জীবের একটি করিয়া প্রতিনিধি নোয়ার নৌকায় বহন করা হয়। প্রতিটি জীব বিভিন্ন, তাদেরই অখণ্ডন সন্তান বর্তমান বিশাল জীবজগৎ। পরমেশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেন সর্বশেষে ষষ্ঠ দিনে, সপ্তম দিনে তিনি বিশ্রাম করেন। মানুষেরই আত্মা আছে; অন্য জীবের সৃষ্টি শুধু মানুষের দাসত্ব বা গোলামী করিবার জন্যই। সপ্তদশ শতাব্দীতে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মযাজক অধ্যাপক লাইটফুট (Dr. Lightfoot) সিদ্ধান্ত করেন, ঈশ্বর 4004 খৃষ্টপূর্বাব্দে 23শে নভেম্বর সকাল নয়টায় মনুষ্য সৃষ্টি করিয়াছেন। আজ সেইরূপ ছেলেভুলানো গল্পগাথায় কেহ কর্ণপাত করে না।

সমস্ত জীবের পূর্বে একটিমাত্র অতি সূক্ষ্ম জীবকণাই বর্তমান ছিল। তাহাই ক্রমপরিবর্তনে অথবা বৈজ্ঞানিক পরিভাষায়—ক্রমবিবর্তনে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। প্রাণ একক তত্ত্ব; তাহারই ঊর্ধ্বগতি, কালপ্রভাবে ক্ষরণ, বিকার বা দেহবিশেষ হইতে আকৃতি, কিন্তু প্রাণপ্রবাহ সমভাবেই চলিয়াছে। তাহার শেষ গন্তব্যস্থল কোথায়, এই বিবর্তনের উদ্দেশ্য ও নৈতিক মূল্য কি, কাহার প্রেরণায় ইহা চলিয়াছে—এই সকল প্রশ্ন জীববিজ্ঞানীর আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়াছে।

বৈজ্ঞানিক তাঁহার গবেষণাগারে আত্মা ও ঈশ্বর সপ্রমাণ করিতে পারেন নাই। এইজন্য সেই সকল আলোচনায় তিনি প্রবৃত্তও হন না। নিরপেক্ষ নৈর্ব্যক্তিক দার্শনিক কিন্তু এই সকল বিষয় পর্যালোচনা করেন। কিন্তু দার্শনিকেরা একমত কোন দিনই ছিলেন না, এখনও নহেন। 'নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্'।

আমরা বিবর্তন প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি যে, দেশ ও কালে প্রাণিজগতে অভিনবত্ব আবির্ভূত হয়। কিন্তু সেই কারণে দেশ ও কালকে নিত্য, চিরন্তন বলিয়াই মানিয়া লইতে হয়। ভারতীয় দর্শনে বৈশেষিক মতবাদ, জৈন শাসন কালও দেশকে নিত্য স্বীকার করিয়াই বিচার আরম্ভ করিয়াছে। ভগবান বুদ্ধদেব বুদ্ধির ঊর্ধ্বে বোধিদর্শনে নিশ্চয় করিয়াছিলেন—সবকিছু অসৎ, অস্তিত্বহীন অবস্থা হইতে উদ্ভূত। যতক্ষণ স্থায়ী হয়, ততক্ষণের জন্য পুনরায় অসতে বিলীন হয়। পাশ্চাত্য দার্শনিক ও বিজ্ঞানবিদ্ বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলেন, কালের অস্তিত্ব আছে বটে, কিন্তু কোনও ঘটনার জন্য কাল দায়ী নহে, কালের সৃজনী শক্তি তিনি মানেন না; সকল বিচার স্থলে কালের দাসত্ব যেন আমরা স্বীকার না করি—এই তাঁহার অভিমত।

দেশ ও কাল বর্তমানে বৈজ্ঞানিক মহলে এবং বিভিন্ন দেশে দার্শনিকগণের মধ্যে আলোচনার বিষয়ীভূত। জড় জগতে আমরা মানুষ নিক্ষিপ্ত হইয়াছি, জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই জড় জগতের সঙ্গে আমাদের নিবিড় সম্পর্ক। এই জড় বা প্রাণহীন অনাত্ম তত্ত্বের প্রকৃত রূপ কি? ইহাও আজ প্রচণ্ড বিতণ্ডার সৃষ্টি করিয়াছে।

জীব ও জড় একান্তই বিলক্ষণ, সম্পূর্ণতঃ

বিভিন্ন দুই তত্ত্ব। প্রাণের আবির্ভাব প্রথম কোথায়, ডারুইন সেই সম্বন্ধে কোন আলোচনাই করেন নাই। জড়দেহের ক্রমবিবর্তনে মনুষ্যস্তরে উন্নীত হইয়াছি, এই সিদ্ধান্তের পরবর্তী কোনও আলোচনা তাঁহার পুস্তকে নাই।

মানব স্তর হইতে অতিমানব পর্বে আরোহণ এই দেহে, এই দেশেই কালের গণ্ডীর মধ্যেই সম্ভব। এই সকল আলোচনা সম্প্রতি সুরু হইয়াছে। নিশ্চয় কোন অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে এই বিশ্ব-ব্যাপার, এই দেহ-মন-বুদ্ধির জন্ম—ইহা অনস্বীকার্য। কিন্তু এই শক্তি কাহার বা এই শক্তির স্বরূপ কি, এই বিষয়ে বিজ্ঞানী নীরব।

আরও অনেক অনেক অমীমাংসিত দৃষ্ট ঘটনার সমাধান এখন পর্যন্ত সর্ববাদীসম্মত হয় নাই। উর্বরা ভূমিতে শস্য জন্মায়, বালুকায় তাহা সম্ভব নহে। বিচিত্র বর্ণসম্ভারে সমৃদ্ধ ময়ূরপুচ্ছ ময়ূরীর অন্তরসেই থাকে। অন্য পাখীর ডিমে তাহা নাই। এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য জীববিজ্ঞানে আরেক অভিনব হৃদয়গ্রাহী শাখাবিজ্ঞান প্রবর্তিত হইয়াছে—Genetics। প্রতি জীবকোষে অসংখ্য জীন (Gene) আছে। তাহারা স্বতন্ত্র, কিন্তু পরস্পর মিলিত হইতে পারে; জীনের রাসায়নিক গুণাগুণ একান্তই স্বতন্ত্র। এই সকলই নিম্নস্তর হইতে উর্ধ্বস্তরে অবলোকন। এমনও অকাট্য সত্য থাকিতে পারে, কাল ও দেশের উর্ধ্বে কোনও মহাশক্তি অবতীর্ণ হইয়া কাল রাজ্যে দেশ সংস্থানে বিবর্তন ঘটায়। শক্তির অনন্ত রূপ, কিন্তু মূলে শক্তি একই বা একা এবং জগতে শক্তিই আছে, আর কিছুই নাই। যেমন ভারতবর্ষে চণ্ডীগ্রন্থে বলা হইয়াছে "একৈকাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া মমাপরা"। শক্তি একই এবং শক্তি ব্যতীত দ্বিতীয় কোনও তত্ত্বই নাই।

দেশ ও কাল সম্বন্ধে ধারণার আমূল পরিবর্তন বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে আজ স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। দেশ অর্থে Space আকাশ বা মহাকাশ। আকাশ শব্দের ব্যাকরণগত ব্যুৎপত্তি—যাহা বস্তুনিচয়কে অবস্থানের জন্য অবকাশ দেয়। যাহা কিছু আছে সকলই আকাশে বা দেশে। আইনস্টাইনের যুগান্তকারী আপেক্ষিকতাবাদ দেশ ও কালের ভিন্নতার দৃষ্টিভঙ্গীতে কুঠারাঘাত করিয়াছে। তিনি বলেন, দেশ ও কাল স্বতন্ত্র নহে। শব্দটি ব্যবহৃত হইবে দেশ-কাল মানে Time and Space নহে; প্রকৃত শব্দ Space-Time উভয়েরই আপেক্ষিক (Relative) অস্তিত্ব। কাল দেশেরই একটি Dimension বা মাত্রিক মাত্র। বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডিংটনের উক্তি, সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নীহারিকাসমেত কোন সুদূরে ত্বরগতিতে প্রয়াণ করিতেছে। Space বা দেশ, কাল বা Time উভয়ই পশ্চাতে পড়িয়া আছে। এতাবৎ যে সকল ধারণা পোষিত হইত, এখন দেখা যাইতেছে, তাহার উর্ধ্বে সাধারণ চিন্তাধারা অতিক্রম করিয়া দুর্বার গতিতে বিশ্বজগৎ ধাবমান হইতেছে। কোথায়, কি উদ্দেশ্যে, কি তাহার পরিণতি, মানুষের মন তাহা ধারণা করিতে অক্ষম।

আমরা বিবর্তন ও সৃষ্টি সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে অনেক অচিন্তিতপূর্ব বিষয়ের অবতারণা করিতে বাধ্য হইয়াছি।

ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন যুগেও সৃষ্টিরহস্য কি, তাহা লইয়া ভূয়সী আলোচনা হইয়াছিল। [মানুষের সৃষ্টি কোন দিনই হয় নাই, মানুষ চিরদিনই আছে। গ্রীক দার্শনিক পিথাগোরাস, প্লেটো, আরিস্ততল ইহা মনে করিতেন। তাঁহাদের যুক্তি—বীজ হইতে অঙ্কুর, তাহা হইতে মহীরুহ এবং তাহার ফলমধ্যে পুনরায় বীজ সৃষ্টির কারণ নিহিত। এই 'বীজাঙ্কুর ন্যায়ে' সৃষ্টিতত্ত্ব অতি সহজে বুঝিতে পারা যায়।]

শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদ্ কিন্তু সৃষ্টির মূলে ঈশ্বর ও যোনি বা প্রকৃতি মানিয়া লইয়াছেন।

সেই উপনিষদের শ্লোকে দৃষ্ট হয়—"কিং কারণং

ব্রহ্ম কুতঃ স্ম জাতা কেন চ সম্প্রতিষ্ঠা। অধিষ্ঠিতাঃ কেন সুখেতরেষু বর্তামহে ব্রহ্মবিদো ব্যবস্থাম্॥ কালঃ স্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছা ভূতানি যোনি :—পুরুষ ইতি চিন্ত্যম। সংযোগ এষাং ন তু আত্মভাবাৎ আত্মাপ্যনীশ সুখদুঃখহেতোঃ"॥ সৃষ্টির কারণ কি ব্রহ্ম? কোথা হইতে আমাদের জন্ম? আমরা কিসের উপর নির্ভর করিয়া জীবিত থাকি। যাবতীয় সাংসারিক সুখ-দুঃখের হেতুই বা কি? কালবাদ (Temporalism) স্বভাববাদ (Naturalism), নিয়তিবাদ (Necessity), যদৃচ্ছা (Chance)? সবকিছুর জননী কি মূলা প্রকৃতি (Primordial nature)? জীব কি স্বাধীন অথবা নিজের কর্মবশে বদ্ধ বা মুক্ত? বিভিন্ন মতবাদ আছে, সেগুলির বিস্তৃত আলোচনাও ভারতীয় দর্শনে বিবৃত। সৃষ্টিতত্ত্ব বিচারে পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিক, দার্শনিকের নিকটে সেইগুলি উপেক্ষার বস্তু নহে, সে সকলের আলোচনা আদৌ অবান্তর নহে।

আমরা সংক্ষেপে কয়েকটি মতবাদের বিবরণ দিবার চেষ্টা করিব।

স্বভাববাদ

সবকিছু স্বভাববশে ঘটে, অন্য কোন কারণ অন্বেষণ করিবার আবশ্যক নাই। নৈসর্গিক ঘটনাই এইরূপ, এই উত্তরই পর্যাপ্ত। অন্য কোন অনৈসর্গিক অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের আলোচনা নিষ্ফল, সময়ের অপব্যবহার মাত্র।

এইরূপ মতবাদের পোষকতা কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত আদৌ নহে। স্বভাববাদ মানিয়া সন্তুষ্ট থাকিলে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারের দ্বার রোধ করা হইবে। প্রাচীন ভারতে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন, যাঁহারা ঈশ্বর বা আত্মা কিছুই মানিতেন না। প্রচার করিতেন—এই জন্মই প্রথম এবং এই জন্মই শেষ। সৃষ্টিকর্তা কেহ নাই এবং সৃষ্টির কারণও কিছু নাই। সব কিছু স্বভাববশে ঘটে। তাহাদের একটি শ্লোক আছে—কঃ কণ্টকানাং প্রকরোতি তৈক্ষ্ণ্যং বিচিত্রভাবান্ মৃগ পক্ষিণাম। মাধুর্য্যং ইক্ষোঃকটুতাং চ নিম্বে—স্বভাবতঃ সর্বমিদং প্রবৃত্তম"।

ইঁহারা শুধু বিতণ্ডা লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন। প্রমাণ যত কিছু আছে, তন্মধ্যে প্রত্যক্ষ বাহ্যেন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণই একমাত্র। ভূত চতুষ্টয় বা জড়ই একমাত্র তত্ত্ব। আত্মা বা ঈশ্বর বলিয়া কিছুই নাই। ইঁহাদের পূর্বে লোকায়তিক বলা হইত, পরে চার্বাক সম্প্রদায় নামে তাঁহারা অভিহিত হন। ভগবান বুদ্ধদেবের পূর্বেই তাঁহাদের বিভিন্ন দল বা সম্প্রদায় ছিল। শাক্যমুনি ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণকে তাঁহাদের মত শুনিতে নিষেধ করিয়াছেন। জৈনাচার্যগণও তাঁহাদের অবজ্ঞা করিতেন, ভগবতীসূত্রে তাহার বিবরণ আছে। লক্ষ্য করিবার বিষয়, ভগবান বুদ্ধদেব তাঁর উপদেশে আত্মা বা ঈশ্বর আছেন বা নাই, তাহার উল্লেখ করেন নাই। জৈনমতে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর স্বীকৃত না হইলেও প্রতি জীবে স্বতন্ত্র আত্মা বিরাজমান, নিষ্কলুষ আত্মা কেবলী হইয়া স্বতন্ত্র ঈশ্বরত্বে পর্যবসিত হন। তথাচ বিজ্ঞান বিরোধী চার্বাকগণকে ভারতবর্ষে কোন ধর্মমত শ্রদ্ধার চোখে দেখিতেন না।

কালবাদ বা Temporalism

কালবাদ প্রতিপন্ন করিয়াছে—সবকিছুর মূলে আছে কাল বা Time। সৃষ্টিকর্তাই কাল বা সময়। পরবর্তী যুগে কাল বা মহাকাল গণনাকারী বলিয়া গণিত হইয়াছে। গীতার দশম অধ্যায়ে "কালঃ কলয়তামহং"। কলন অর্থ গণনা। উজ্জয়িনীতে জ্যোতির্বিদগণ বলেন—মহাকাল গণনা করেন এবং উজ্জয়িনী ভারতবর্ষের গ্রীনউইচ।

যদৃচ্ছাবাদ বা Chance

এই মতবাদ কোন গভীর আলোচনার বিমুখ। ঘট মৃত্তিকা হইতেই হয়, সূত্র হইতে হয় না।

সূত্রে পট হয়, এইগুলির কারণ যদৃচ্ছা বা খেয়াল। এই মত অবৈজ্ঞানিক, অনুসন্ধান-পরিপন্থী, ভারতবর্ষে গৃহীত নহে।

কাল বা আকাশ সম্বন্ধে আইনষ্টাইনের অভিমত। শরীরের অবস্থানেই দর্শকের এই দুইটি তত্ত্বের আপেক্ষিকত্ব নির্ভর করে। মনের বিচার দেশ কাল নির্ণয়ে নিষ্প্রয়োজন বা অক্ষম। ইংরেজ দার্শনিক হোয়াইটহেড বলিয়াছেন: "It is the observer's body that we want and not his mind. Even the body is useful as an example of a familiar form of apparatus"—শরীরই কাল আকাশ নির্ধারণে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রবিশেষ। মানসিক পর্যালোচনার অবকাশ এই দুইটি বিষয়ে নিরর্থক।

পরিবর্তন সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ

কিন্তু পরিবর্তন জগতে নিত্যদৃষ্ট ঘটনা। পরিবর্তনের দার্শনিক আলোচনাও অপ্রাসঙ্গিক নহে। যদিও জগতে এবং জাগতিক সকল অবয়বের মধ্যে পরিবর্তন সর্বদাই দৃষ্টিগোচর এবং সাধারণ বুদ্ধিতে প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না, তত্রাচ পৃথিবীর বিভিন্ন দার্শনিকের মধ্যে পরিবর্তন সম্বন্ধে মতভেদ আছে—ইহাও এক রহস্য। গ্রীস দেশের শীর্ষস্থানীয় দার্শনিক প্লেটো পরিবর্তন স্বীকারই করেন না। তিনি বলিয়াছেন, পরম তত্ত্ব একটি পরম ভাব, কদাচ তাহার পরিবর্তন হয় না। এই পরম ভাবকে তাঁহার পরিভাষায় Idea বলা হইয়াছে। ভাবতত্ত্ব যাহা হন, যে অবস্থায় পরিণত হন, তিনি যাহা হইয়াছেন অর্থাৎ 'ভূত' (ভূ ধাতু ক্ত প্রত্যয়)—তাহাও তিনি।

এই বিষয়ে ভারতবর্ষে গীতায় পুরুষ বা একতত্ত্ব ক্ষরণে (By mutation) ভূত হইয়াছেন। "ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি"। মূলতঃ পরমার্থতঃ তত্ত্ব একটিই; তাঁহারই দুইটি বিভাব (Aspect)—একটি অক্ষর অপরটি ক্ষরণশীল। প্লেটো কিন্তু ভবন বা হওয়ার অবস্থাকে শুধু কায়াহীন ছায়ামাত্র গণনা করিয়াছেন (Realm of Shadows)।

শঙ্করাচার্যদর্শনে পরিবর্তনশীল জগৎকে অনিত্য বা মিথ্যা বলা হইয়াছে। মিথ্যা অর্থে অস্তিত্ববিহীন বা অলীক নহে; যাহা সত্য বা সৎ বলিয়া প্রতীত হয়। কোনও পারমেশ্বরী অঘটন ঘটনপটিয়সী শক্তির (মায়ার) প্রভাবে। মায়ার উর্ধ্বে কোন পরিবর্তন নাই, কোন ক্ষরণ বা ব্যয় নাই—একই তত্ত্ব যাহার বিবর্তন, পরিবর্তন, ক্ষরণ ব্যয় নাই এবং তদ্‌ব্যতীত অপর যাহা কিছু, তাহা আমরা মায়াশক্তির প্রভাবে দেখি বা অনুভব করি।

জার্মান দার্শনিক হেগেল কিন্তু স্থায়িত্ব ও অস্থায়িত্ব উভয় অবস্থাই সমগ্রসীভূত বর্ণনা করিয়াছেন। শুধু কালের অপরিমেয় শক্তি প্রভাবে, নিত্যসনাতন পরমতত্ত্ব সেইরূপে পরিদৃষ্ট ও অনুভূত হন, কিন্তু তিনি দেশকাল ও পরিবর্তনের উর্ধ্বে চিরন্তন বিদ্যমান।

প্রাচীন পালি সাহিত্যের স্থবিরবাদ—বৌদ্ধমতে সব কিছু নিত্য পরিবর্তনশীল, স্থায়ী কিছুই নহে। গঙ্গার জলকণা নিত্য সরিয়া যাইতেছে, নিত্য যাহা, তাহা প্রবাহ মাত্র কিন্তু দীপ প্রতিক্ষণে নিজেকে ধ্বংস করিতেছে, সকলই অনিত্য এবং শূন্যমাত্র।

ঈশোপনিষদ অতি প্রাচীন উপনিষৎ—জগতে সব কিছুই গতিশীল কিন্তু গতিমান জগতের (জগত্যাং জগৎ) ঈশ্বর এবং তিনি সকলই (সর্বং ইদং)। তিনি সব কিছুই হইয়াছেন, এমন উক্তিও সেই শাস্ত্রে আছে—আত্মা অভূৎ সর্বভূতানি।

ফরাসী দার্শনিক বার্গসঁর মতে, সব কিছুই প্রাণগতির নিত্য চলনশীল তরঙ্গ, সর্বদাই পরিবর্তনের মাধ্যমে অনন্তের দিকে চলিয়াছে। তাঁহার মতে যে শক্তি প্রভাবে এরূপ সংঘটন হয়, তাহা নিত্য এবং প্রাণশক্তি। তিনি সংক্ষেপে বলিয়াছেন,

"অস্তিত্বের অর্থই পরিবর্তন; পরিবর্তনেই সব কিছু সুপক্ক হয় (To change is to mature)। সৃষ্টি নিরন্তর পরিবর্তনের মধ্য দিয়াই অলক্ষ্যের পথে চলিতেছে। এই পরিবর্তনের সম্ভাব্যতা জাগতিক বস্তুনিচয়ের অভ্যন্তরেই আছে।

বিবর্তনের প্রেরণা

বিবর্তনের প্রেরণা কোথা হইতে আসিল—বৈজ্ঞানিকেরা তাহা লইয়া আলোচনা করেন নাই। তাঁহারা শুধু রূপের পরিবর্তন এবং তাহার বাহ্য রূপের পরিবর্তনের তথ্য প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। এই বিবর্তন জীববিজ্ঞানীর বিচারে কালরাজ্যে শুধু প্রাণেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ। প্রাণ প্রথমে কোথা হইতে আসিল—তাহার একটি উত্তর দেওয়া হইয়াছে। প্রাগৈতিহাসিক কোন এক যুগে (Cambrean Epoch) যখন সমুদ্র-তরঙ্গ ভূপৃষ্ঠ হইতে দূরে সরিয়া গেল, তখন যে শৈবালবৎ জড়পদার্থ পড়িয়া রহিল, তাহাতেই প্রাণের সঞ্চার হইয়াছিল। জীব-বিজ্ঞানীর পরিধিতে প্রাণ ব্যক্তির বা ব্যষ্টির প্রাণ নহে, সমষ্টির প্রাণ (Cosmic life)। যাহার উর্দ্ধগতি মানবত্বেই পর্যবসান ঘটিয়াছে। মানুষের উপরে যদি কিছু থাকে, বিজ্ঞানী তাহাকে গণনার মধ্যে আনেন না।

কিন্তু ব্যক্তিগত প্রাণও একেবারে আলোচনার বহির্ভূত করিলে চলে না। আমার অস্তিত্ব চিরতরে লুপ্ত হইবে, এই চিন্তা দুঃসহ। বিশ্ব কবির ভাষায় "নহি আমি বিধির বৃহৎ পরিহাস, অসীম ঐশ্বর্য্য দিয়ে রচিত মহৎ সর্বনাশ"। কোরাণেও একস্থানে আছে—ঈশ্বর বলিতেছেন, স্বর্গ ও মর্ত্য আমি সৃষ্টি করিয়াছি, কিন্তু অন্তর্বর্তী স্থান এবং উপহাসের জন্যই কি সৃষ্টি করিয়াছি? ব্যক্তিগত বিবর্তন স্বতন্ত্র বিষয়, তাহাতে প্রতিটি জীবের অন্তর্গূঢ় আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয় এবং সেই সঙ্গে বুঝিতে হয়, আত্মার গতাগতি আছে। মৃত্যু বা দেহপতনের সমকালেই সব কিছু ফুরাইয়া যায় না। ভবিষ্যৎ নিছক অন্ধতমসাবৃত, এই কথা মানিয়া লইতে পারি না।

সুতরাং স্বতঃই মনে জাগে, দেহপাতের পরে আর কোনও অবস্থা আছে। যে সকল ধর্ম ও দর্শন পুনর্জন্ম স্বীকার করে না, তাহারাও বলে, মৃত্যুর পরে আত্মার গতি হয় অক্ষয় স্বর্গালোকে, না হয় চিরন্তন নরকে দুর্ভোগ। অথচ আত্মা সুখ দুঃখ বোধ করে কিনা; তথাকথিত দুঃখকষ্ট জড়দেহেরই, আত্মা অমর, অজর, সুখ-দুঃখাতীত—এই সকল আলোচনাও অবশ্যম্ভাবী হইয়া ওঠে। এই প্রসঙ্গে মানুষের কর্মের সহিত তাহার ভবিষ্যৎ অবস্থা বা সংস্থানের প্রশ্ন নিবিড়ভাবে জড়িত। সংক্ষেপে কর্মবাদ ও পুনর্জন্মবাদ প্রসঙ্গ অত্যাবশ্যক হয়। এই বিষয়ে আলোচনা বিস্তৃত হইয়াছে। আমরা শুধু অল্প কথায় বিবর্তনবাদ ও বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে সৃষ্টিরহস্যের কথঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম।

[৪ই এপ্রিল '72 বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত সভায় প্রদত্ত ভাষণের সারাংশ]

কৃষি-সংবাদ

নারকেল-চাষে নারকেল-ছোবড়ার ব্যবহার

নারকেলের মত নারকেলের ছোবড়াও যে একটি মূল্যবান বস্তু—একথা সকলেই জানেন। গরীবের জ্বালানীর কাজে ছাড়াও শিল্পে নারকেল-ছোবড়ার বহুল ব্যবহার সম্বন্ধে সকলেই অবহিত আছেন। এই ছোবড়া থেকে দড়ি, কার্পেট, পাপোশ ইত্যাদি নানা রকম জিনিষ তৈরি হয়। তাছাড়া চাষের কাজেও যে এই ছোবড়া ব্যবহার করা যেতে পারে, একথা জেনেও অনেকে হয়তো এর সদ্ব্যবহার করেন না।

এক হাজারটি নারকেল থেকে প্রায় 82 কেজি ছোবড়া পাওয়া যায়। ভারতে মোট উৎপাদিত নারকেলের পরিমাণ প্রায় 5,450 লক্ষ এবং মাত্র 1,200 লক্ষ নারকেলের ছোবড়া শিল্পে ব্যবহৃত হয়। অবশিষ্ট ছোবড়া প্রধানতঃ জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা হয়। আবার শিল্পে ছোবড়ার ব্যবহার বেশীর ভাগ কেরালা রাজ্যেই হয়ে থাকে, কারণ ভারতে সবচেয়ে বেশী পরিমাণ নারকেল ওখানেই জন্মায়। বাংলা দেশে শিল্পে এর ব্যবহারের পরিমাণ খুব বেশী নয়।

নারকেল ছোবড়ার মধ্যে শতকরা 15 ভাগ পটাস পাওয়া যায়, নারকেল চাষের জন্যে একটি অতি প্রয়োজনীয় সার। ছোবড়া পোড়ানো ছাইয়ের পরিমাণ 20 থেকে 25 শতাংশ। তাহলেই দেখা যাচ্ছে, এক লক্ষ নারকেল থেকে প্রায় 1 টন পরিমাণ পটাশ পাওয়া যেতে পারে এবং এই হিসেবে 4,250 লক্ষ ছোবড়া যা জ্বালানী হিসাবে প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়, তাথেকে প্রায় 4,250 লক্ষ টন পটাশ নষ্ট হয়। নারকেল ছোবড়ার এই পটাশ আবার দ্রবণীয় অবস্থায় থাকে, যা গাছ সরাসরি গ্রহণ করতে পারে। দেখা গেছে 2 মাস ভিজিয়ে রাখলে ছোবড়ার 50 শতাংশ পটাস জলে বেরিয়ে আসে। কাজেই এই ছোবড়া গাছের আশেপাশে মাটিতে পুঁতে বৃষ্টির জলে ভিজবার পর মাটি চাপা দিলে অথবা ছোবড়া-পোড়ানো ছাই গাছের গোড়ায় দিলে খুব ভাল সারের কাজ করবে। নারকেলের চাষেই প্রধানতঃ এই সার ব্যবহার করা যেতে পারে।

নারকেলের ছোবড়া পোড়াবার জন্যে মাটিতে একটি বড় গর্ত করতে হবে। গর্তটির মেজে এবং দেয়াল শক্ত হওয়া দরকার; কেন না ছোবড়া-পোড়ানো ছাইয়ের সঙ্গে মাটি মিশে গেলে ডেলা পাকিয়ে যায়। শুকনো ছোবড়া অল্প আঁচে আস্তে আস্তে পোড়াতে হয়, খুব তেজী আগুনে পোড়ালে কিছু পরিমাণ পটাস উড়ে যেতে পারে। এই ছাই কখনও জলে ভেজা থাকবে না, কারণ তাহলে এর দ্রবণীয় পটাস বেরিয়ে যাবে। খুব জোর হাওয়ার সময়ও একাজ করা উচিত নয়, কারণ অনেক পরিমাণ ছাই হাওয়ার সঙ্গে উড়ে যেতে পারে। ছোবড়া-পোড়ানো ছাই কোন নাইট্রোজেনঘটিত সারের সঙ্গে ব্যবহার করা চলবে না, কারণ এতে রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে সারের নাইট্রোজেন অ্যামোনিয়া আকারে উড়ে যেতে পারে। এরূপ পরিস্থিতিতে অন্য সার প্রয়োগের অন্ততঃ 15 দিন আগে পরে ছোবড়ার ছাই প্রয়োগ করতে হবে।

সার ছাড়াও নারিকেল-ছোবড়ার একটি বিশিষ্ট গুণ হচ্ছে জলধারণের শক্তি। একটি ছোবড়া তার ওজনের ছয়গুণ জল ধরে রাখতে পারে। কাজেই যে সব জায়গায় সেচের ভাল সুযোগ নেই, সেই সব নারকেল-বাগানে মাটির নীচে ছোবড়া সারি সারি করে বসিয়ে বর্ষার বৃষ্টিতে ভেজার পর মাটি চাপা দিয়ে দিলে নারকেল-বাগানের জলের চাহিদা অনেক পরিমাণে মিটতে

পারে। আমাদের দেশে নারকেলের চাষ সাধারণতঃ বিনা সেচেই করা হয়। অথচ দেখা গেছে যে, উপযুক্ত সেচ প্রয়োগে প্রতি গাছে বছরে অন্ততঃ 20টি বেশী নারকেল পাওয়া যেতে পারে। বাংলাদেশের বর্ষাকাল অতি সংক্ষিপ্ত—বছরে 2-3 মাস। বাকী প্রায় সমস্ত বছরই জমি বৃষ্টিশূন্য অবস্থায় থাকে। এরূপ পরিস্থিতিতে নারকেল-ছোব্‌ড়া মাটিতে পুঁতে অন্ততঃ কিছু পরিমাণে জলের অভাব দূর হতে পারে এবং এই পদ্ধতিতে সার প্রয়োগের কাজও হয়ে থাকে।

[ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ, ('কৃষি-ভবন' নয়া দিল্লী) কর্তৃক প্রকাশিত]

করোনারি থ্রম্বোসিস-প্রতিরোধ

হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

করোনারি থ্রম্বোসিস (Coronary Thrombosis) নামটির সঙ্গে আজকাল সকলেই পরিচিত। এটি দুরারোগ্য মারাত্মক ব্যধিগুলির অন্যতম প্রধান। একদিকে যেমন নানা মারাত্মক ব্যাধির নির্দিষ্ট এবং বিশেষ ফলপ্রদ ওষুধ আবিষ্কৃত হচ্ছে, তেমনি অন্যদিকে কয়েকটি দুরারোগ্য ব্যাধির প্রকোপ বেড়েই চলেছে। নানা দেশের পরিসংখ্যান থেকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, করোনারি থ্রম্বোসিস এবং তার আক্রমণে মৃত্যুর হার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। আরও লক্ষ্যের বিষয়, সম্পত্তিশালী পাশ্চাত্য দেশেই করোনারি থ্রম্বোসিসের প্রাদুর্ভাব অপেক্ষাকৃত অধিক। অবশ্য ভারতবর্ষও এই প্রতিযোগিতায় বিশেষ পিছনে পড়ে নেই।

একটি প্রবাদে আছে—'নিরাময় অপেক্ষা প্রতিষেধ ফলপ্রদ' (Prevention is better than cure)। করোনারি থ্রম্বোসিস রোগেও এই উক্তিটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। শুধু দুরারোগ্য বলে নয়, রোগটি এতই আকস্মিকভাবে প্রকাশ পায় এবং এর প্রকোপে এতই দ্রুত প্রাণনাশ হয় যে, কখনও কখনও কোন চিকিৎসা প্রয়োগ করবার সুযোগ পাওয়া যায় না।

পূর্বে ধারণা ছিল যে, করোনারি থ্রম্বোসিস প্রাচীন বয়সের ব্যাধি। কিন্তু সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে, অপেক্ষাকৃত তরুণেরাও এই রোগের আক্রমণ থেকে অব্যাহতি পায় না।

হৃদ্‌রোগ-বিশেষজ্ঞদের মতে, আমাদের দেশে ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়স্ক ব্যক্তিদের করোনারি থ্রম্বোসিস হতে দেখা যায়। সুতরাং এটি 'বয়সের' অসুখ মনে করে নিশ্চিন্ত থাকা সঙ্গত নয়। এই সব কারণে করোনারি থ্রম্বোসিস রোগে আক্রান্ত হবার পূর্বেই তাকে প্রতিরোধ করা যায় কিনা, তা চিন্তা করা উচিত। অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে সুপরিকল্পিতভাবে যদি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়, তাহলে করোনারি থ্রম্বোসিস রোগকে দূরে সরিয়ে রাখা অসম্ভব নয়।

প্রতিষেধক ব্যবস্থাগুলি জানবার আগে কিভাবে এই রোগের উৎপত্তি হয়, সেইগুলি পর্যালোচনা করা প্রয়োজন, তাহলে প্রতিষেধের উপায়গুলি সহজ বোধগম্য হবে।

যদি কোন কারণে হৃদ্‌যন্ত্রের কোন অংশে রক্তপ্রবাহ ব্যাহত হয়, তাহলে এই রোগের উৎপত্তি হয়। হৃদ্‌যন্ত্র এতই স্পর্শকাতর যে, এর সামান্যতম অংশেও যদি রক্তপ্রবাহ ক্ষীণ অথবা বন্ধ হয়ে যায় তৎক্ষণাৎ ব্যক্তিবিশেষ অসুস্থ হয়ে পড়বেন। বুকের মাঝখানে অত্যধিক যন্ত্রণা, তার সঙ্গে অত্যধিক অসুস্থতাবোধ এবং

অস্বাভাবিক অস্থিরতা, শরীরে ঘাম দেওয়া প্রভৃতি এই রোগের কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ। এই লক্ষণগুলি দেখলে যথাসম্ভব শীঘ্র ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। কিন্তু এর দু-একটি লক্ষণ দেখা গেলেই অকারণ উদ্বিগ্ন হবার কোন কারণ নেই।

হৃদ্‌যন্ত্রের রক্তপ্রবাহ ব্যাহত হবার কারণ (1) সাময়িকভাবে ধমনীর আকুঞ্চন, এর ফলে যন্ত্রণাও হয় সাময়িক—যাকে বলা হয় অ্যানজাইনা পেক্‌টোরিস (Angina pectoris), (2) অথবা ধমনীর ছেদ বা অবকাশ (Lumen) সঙ্কীর্ণতর অথবা সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ হওয়া—করোনারি অক্লুশন (Coronary occlusion)। এর ফলে হৃদ্‌যন্ত্রের অংশবিশেষের রক্তশূন্যতাই করোনারী থ্রম্বোসিস বলে অভিহিত হয়। ধমনীর অবকাশ সঙ্কীর্ণতর অথবা অবরুদ্ধ হতে পারে একাধিক কারণে। করোনারি থ্রম্বোসিস হলো অন্যতম প্রধান কারণ। ধমনীর দেয়ালের (Arterial wall) কোন অংশে স্বাভাবিক উপাদানের পরিবর্তনে ঐ অংশ অপেক্ষাকৃত স্থূল হয়ে পড়ে (Metabolic disturbances in the wall→arteriosclerosis)

ঐ স্থূলতা ক্রমান্বয়ে এত বৃদ্ধি পায় যে, ধমনীর ভিতর দিয়ে রক্তপ্রবাহ রুদ্ধ করে দেয় আবার কখনো কখনো ধমনীর ঐ অসুস্থ অংশ (Thrombus) আপন অবস্থান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রক্তপ্রবাহের সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে সূক্ষ্মতর কোন ধমনীতে আটকে পড়ে। ফলে সেখানে রক্তপ্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। একেই থ্রম্বোসিস বলা হয়। উপাদানের পরিবর্তনজনিত ধমনীর এই বৈকল্যের প্রধান কারণ হলো, ধমনীর দেয়ালের অংশবিশেষের পুষ্টিগত উপাদানের বৈষম্য ও ক্রমশঃ স্বাভাবিক উপাদানের সম্পূর্ণ রূপান্তর ও বিকৃতি। এই বিকৃতির কারণ হলো রক্তে কোলেষ্টেরল (Cholesterol) জাতীয় স্নেহ-পদার্থের আধিক্য। এই কোলেষ্টেরল সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী ধমনীতে সঞ্চিত হয়ে স্ফীতি বা স্ফোটকের মত হয়ে থাকে। হৃদ্‌যন্ত্রের ধমনীতে অস্বাভাবিকভাবে কোলেষ্টেরলের অবস্থানের সুনির্দিষ্ট হেতু (Etiology) আজ অবধি নিরূপিত হয় নি। কিন্তু ধমনীর বৈকল্যঘটিত হৃদ্‌রোগীদের পরিসংখ্যানের মাধ্যমে কয়েকটি বিশেষ ধরণের কার্য-কারণ এবং পরিবেশ পরিলক্ষিত হয়, যেগুলিকে এই রোগের অতিরিক্ত উৎপাদক-কারণ (Factors) বলা যেতে পারে। নিম্নে অতিরিক্ত উৎপাদক-কারণ বিবৃত হলো।

3 : 1 অনুপাতে পুরুষেরাই এই রোগে বেশী আক্রান্ত হয়। মধ্যউচ্চতা এবং মধ্যবয়স্ক পুরুষদের মধ্যেই এর প্রবণতা বেশী লক্ষ্য করা যায়। জন্মজনিত প্রবণতা কোন কোন ক্ষেত্রে দায়ী থাকে।

(1) শরীরে মেদবাহুল্য—স্থূলকায় ব্যক্তিদের ধমনী বৈকল্যের সম্ভাবনা বেশী। শরীরের স্থূলত্বের সঙ্গে ভোজনবিলাসের কিছু সম্বন্ধ থাকে এবং অধিক ভোজনের সঙ্গে ধমনী-বৈকল্যের নিকট সম্বন্ধ।

(2) কায়িক পরিশ্রমের অভাব—যাদের কায়িক পরিশ্রম করতে হয় না এবং ঘরে বসেই কাজকর্ম করতে হয়, তাদের ধমনীতে পুষ্টিগত বৈকল্য ঘটে। অঙ্গচালনার অভাবে শরীরের মেদ বৃদ্ধিরও সম্ভাবনা অধিক।

(3) উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তাজনিত উদ্বেগ—যে সকল লোককে ক্রমাগত দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটাতে হয়, তাঁদের মধ্যে এই রোগের আধিক্য দেখা যায়।

(4) ধূমপান—যাঁরা অত্যধিক ধূমপান করেন, তাঁদের মধ্যে এই রোগের প্রাদুর্ভাব এবং মৃত্যুর হার বেশী। ধূমপানের ফলে হৃদ্‌যন্ত্রের ধমনীর উপর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে—যার ফলে ধমনী বৈকল্য ঘটে। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলে রাখা ভাল। চা-পানেও হৃদ্‌যন্ত্রের ধমনীর উপর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। চা-পান ও ধূমপানের

প্রতিক্রিয়া বিপরীতধর্মী। চা-পান ও ধূমপান একসঙ্গে জমে ভাল, কিন্তু এটা স্বাস্থ্যকর অভ্যাস নয়।

তাছাড়া কয়েকটি বিশেষ ধরণের রোগ শরীরে বর্তমান থাকলে ধমনীর বৈকল্য ঘটবার সম্ভাবনা প্রবল থাকে; যেমন—অস্বাভাবিক উচ্চ রক্তচাপ (High blood-pressure), শর্করাধিক্য-বশতঃ বহুমূত্র (Diabetes Mellitus), রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের (Uric acid) আধিক্য (Uricoemia)।

এবার হৃদ্‌যন্ত্রের ধমনী বৈকল্য প্রতিরোধের বিষয় আলোচনা করা যাক। যেহেতু ওষুধ সেবনে এই রোগ প্রতিরোধ করা যায় না, সেহেতু উৎপাদক কারণগুলি যথাসম্ভব বর্জন করতে পারলে সমধিক ফল লাভের আশা থাকে। এই প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। আগেই বলা হয়েছে, করোনারি থ্রম্বোসিস প্রৌঢ় বা বৃদ্ধদের রোগ হলেও তরুণেরাও নিরাপদ নয়। তাছাড়া যে সকল কারণ এই রোগ ঘটাতে সাহায্য করে, সেই কারণগুলি বহুদিন শরীরে বর্তমান থাকলে তবে এই রোগের সৃষ্টি হয়। তাহলে এই রোগ প্রতিরোধ করতে হলে রোগ আবির্ভাবের বহু পূর্ব থেকেই তার প্রতিরোধের সূচনা করতে হবে। সুতরাং তরুণ বয়স থেকে এই রোগ প্রতিরোধ করতে সচেষ্ট হওয়া অবশ্যই প্রয়োজনীয়।

প্রতিরোধ ব্যবস্থা

(1) নিয়মিত ব্যায়াম—বিশেষ করে যাদের পেশা বা কর্মব্যপদেশে অঙ্গ চালনার অবকাশ কম, তাঁদের কোন না কোন উপায়ে কিছু ব্যায়াম করা বিশেষ প্রয়োজন। সকাল-সন্ধ্যায় কিছুক্ষণ খালি হাতে ব্যায়াম (Free hand exercise), একস্থানে দাঁড়িয়ে দৌড়ানোর অনুকরণ, যোগাসন প্রভৃতি নিয়মিত অভ্যাস করা উচিত। বয়স্কদের জন্যে প্রত্যহ আধ ঘন্টা থেকে এক ঘন্টা কিছু দ্রুতভাবে হাঁটা প্রশস্ত।

(2) শরীরের ওজন সীমিত রাখা—স্ত্রী-পুরুষ ভেদে বয়স ও উচ্চতা অনুপাতে যে ওজনের তালিকা পাওয়া যায়, সেই অনুযায়ী শরীরের ওজন সীমিত রাখবার জন্যে চেষ্টা করা উচিত। নির্ধারিত ওজনের চেয়ে 10 শতাংশের বেশী বাড়তে দেওয়া উচিত নয়। এটি খাদ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

(3) খাদ্য—খাদ্যের বিচারে দুটি জিনিষ লক্ষ্য রাখতে হবে—খাদ্যের পরিমাণ ও উপাদান সম্পর্কে সতর্কতা। শরীরে যাতে মেদ বৃদ্ধি না হয়, সেজন্যে খাদ্যের পরিমাণ যেন প্রয়োজনীয় ক্যালরির মাত্রা ছাড়িয়ে না যায়। শর্করাজাতীয় খাদ্যও মেদবৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারে. সেজন্যে ভাত, রুটি, চিনি, আলু প্রভৃতি খাদ্যের পরিমাণ সীমিত রাখা প্রয়োজন।

স্নেহজাতীয় খাদ্যের বিষয়ে একটু বিশেষ বিবেচনার কথা আছে। হৃদ্‌যন্ত্রে ধমনীতে যে কোলেস্টেরলজাতীয় পদার্থ পলি পড়বার (Deposit) মত সঞ্চিত হয়, সেটি রক্তে আহৃত হয় স্নেহজাতীয় খাদ্য থেকে। আমরা দু-ভাবে স্নেহজাতীয় খাদ্য খাই—সরাসরি খাদ্য হিসাবে এবং ব্যঞ্জন তৈরির সাহায্যকারী হিসাবে। এর মধ্যে যেগুলিতে স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড (Saturated fatty acid) অধিক পরিমাণে আছে, সেগুলি সীমিত অথবা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বর্জনীয়। কারণ অধিক পরিমাণে স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড খেলে রক্তে কোলেস্টেরলের আধিক্য হবার সম্ভাবনা। যে সকল স্নেহজাতীয় খাদ্যে পলি আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডের (Poly unsaturated fatty acid) পরিমাণ বেশী, সেগুলি খাওয়া নিরাপদ। শুধু নিরাপদ নয়, শেষোক্ত স্নেহজাতীয় খাদ্য খেলে রক্তে কোলেস্টেরলের উৎপাদন হ্রাস পেতেও পারে। যে সব খাদ্যে স্যাচুরেটেড ফ্যাটি

অ্যাসিড অধিক, সেগুলি হলো—দুধ, ঘি, মাখন, পনীর, ডিমের কুসুম, চর্বিবহুল মাংস, মেটে প্রভৃতি। এগুলি বর্জন আবশ্যিক নয়, কিন্তু সীমিত রাখতে হবে। ব্যঞ্জন তৈরিতে বা ভাজার জন্যে যেগুলি ব্যবহার করা হয়, সেগুলির মধ্যে উভয়বিধ ফ্যাটি অ্যাসিডের হার নিম্নে দেওয়া হলো:

	স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড	পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড
ঘৃত—	64.2	×
সরিষার তেল—	5.5	18.1
তিল ,, —	13.00	31.7
নারিকেল ,, —	90.00	2.5
বনস্পতি (ডালদা প্রভৃতি—	25.3	1.9
বাদাম তেল—	19.00	21.0
সয়াসিম তেল—	10.15	55.0

এতদসত্ত্বেও স্নেহজাতীয় খাদ্যের বিষয়ে অহেতুক আতঙ্কিত হবার প্রয়োজন নেই। সীমিত পরিমাণে গ্রহণ করলে ভয়ের কোন কারণ নেই; যেমন—দৈনিক একটি করে ডিম খাওয়া অযৌক্তিক নয়। সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী বয়স্কদের একসঙ্গে অল্প পরিমাণে এবং বারে বারে আহার গ্রহণ প্রশস্ত। ব্যঞ্জন ছাড়া বাড়তি লবণ পরিহার করা বাঞ্ছনীয়।

(4) ধূমপান ও সুরাপান—অত্যধিক সুরাপান সর্বদাই ক্ষতিকর। অল্প পরিমাণে সুরাপান ক্ষতিকর না হলেও উত্তরোত্তর মাত্রা বৃদ্ধি এবং আসক্তি উৎপন্ন হবার সমধিক সম্ভাবনা থাকায় একেবারে পরিহার করাই যুক্তিসঙ্গত।

সুরাপানের মত ধূমপানও বর্জন করাই উচিত। সংযমীর পক্ষে প্রত্যহ চার-পাঁচটি সিগারেট খাওয়া ক্ষতিকর না হতে পারে।

(5) মানসিক উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা—নানা কারণে আধুনিক কালে মানুষের জীবনযাপন প্রণালী জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। শহর-বাসীদের পক্ষে এটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এতদ্ব্যতীত কোন কোন পেশায় বা চাকুরী জীবনে কর্মীদের উপর অত্যধিক মানসিক চাপ পড়ে। এভাবে ক্রমাগত সমস্যাসঙ্কুল জীবনযাপন করবার দরুণ ধমনী বৈকল্য ঘটবার সাহায্য করে। এসব কারণেই উন্নত এবং প্রগতিসম্পন্ন দেশে এই রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। সুতরাং বিশেষ করে বয়স্কদের মনের ভারসাম্য ও সন্তোষের মনোভাব বজায় রাখবার জন্যে সর্বদা সচেষ্ট হওয়া উচিত। কায়িক পরিশ্রমের পর যেমন দৈহিক বিশ্রাম দরকার হয়, তেমনি মানসিক পরিশ্রমের পর মানসিক বিশ্রাম প্রয়োজন। সুনিদ্রা মানসিক বিশ্রামের একটি উপায়। দৈনিক আধ ঘণ্টা নিদ্রা স্বাস্থ্যকর। তাছাড়া সপ্তাহে একদিন এবং বছরে একমাসের মত ছুটি উপভোগ করা উচিত। ছুটির দিন পছন্দমতভাবে অবসর বিনোদন করা উচিত। এই সময় শারীরিক বিশ্রাম বড় কথা নয়। যিনি যে কাজ করেন তিনি সেই কাজ ছাড়া অন্য কাজে ব্যাপৃত থাকলেও মানসিক বিশ্রাম হয়।

নিত্যকার কাজেও সর্বদাই একটা সন্তোষের ভাব এবং জীবনযাত্রাকে একটা সহজ এবং হাল্কাভাবে নেবার চেষ্টা করা উচিত। সবসময় তাড়াহুড়া বা অনাবশ্যক ক্ষিপ্রতায় প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। রুচিভেদে কিছু সময় পূজা বা উপাসনায় আশ্রয় নেওয়া ফলপ্রসূ অভ্যাস।

মোট কথা—হৃদ্‌রোগের আক্রমণ থেকে অব্যাহতি পেতে হলে সরল শান্তভাবে জীবন-যাপন, মাঝে মাঝে শান্ত পরিবেশে দিন যাপন করতে হবে। এর সঙ্গে পরিমিত আহার, বিশেষ করে, স্নেহজাতীয় খাদ্যের বিষয়, ধূমপান ও সুরাপান বর্জন এবং যতদূর সম্ভব উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা থেকে দূরে সরে থাকা দীর্ঘায়ু হবার সহায়ক।

বিজ্ঞান-সংবাদ

অগ্নি-প্রতিরোধক উপাদান

অগ্নি-প্রতিরোধক একপ্রকার অভিনব রাসায়নিক উপাদান সম্প্রতি উদ্ভাবিত হয়েছে। বাড়ীঘর, কলকারখানা প্রভৃতিকে অগ্নিকাণ্ড থেকে রক্ষা করবার পক্ষে এই বস্তুটি বিশেষ উপযোগী। সাধারণতঃ যে পরিমাণ তাপে বাড়ীঘর বা কলকারখানায় আগুন ধরে যায়, সেগুলির উপর ঐ বস্তুর আস্তরণ থাকলে তার দ্বিগুণ পরিমাণ তাপেও তাতে আগুন ধরে না।

1967 সালের 27শে ডিসেম্বর ফ্লোরিডার কেপ কেনেডীতে অ্যাপোলো মহাকাশযানে আগুন ধরে যায়। তখন তাতে ছিলেন মহাকাশচারী গ্রীসম, এডওয়ার্ড হোয়াইট এবং রজার শাফে। এঁদের তিন জনেরই ঐ অগ্নিকাণ্ডের ফলে মৃত্যু ঘটে। এই দুর্ঘটনার পরেই আমেরিকার জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা অগ্নি থেকে মহাকাশচারীদের রক্ষা করবার উপায় উদ্ভাবনে ব্রতী হয়। তাদের গবেষণা ও চেষ্টার ফলেই ফ্লোরেল নামে একটি বস্তু উদ্ভাবিত হয়। 1967 সালের মে মাসের প্রথম দিকে টেক্সাস রাজ্যের হিউস্টনে মনুষ্যবাহী মহাকাশ কেন্দ্রে ঐ বস্তুটি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করা হয়।

মহাকাশ সংস্থার নিরাপত্তা বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর ফিলিপ বলগার এই প্রসঙ্গে বলেন যে, দু-রকমের ফ্লোরাইড দিয়ে এই বস্তুটি তৈরি করা হয়েছে। কোন বস্তুর তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এর তাপরোধক ক্ষমতা বেড়ে যায়। বর্তমানে এর দাম খুবই বেশী। ভবিষ্যতে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হলে এবং ব্যবহার বেড়ে গেলে বস্তুটি সস্তায় পাওয়া যেতে পারে। বর্তমানে দক্ষিণ ক্যারোলাইনার নর্থ চার্লস্টনের জেনারেল অ্যাসবেস্টস অ্যাণ্ড রবার ডিভিশন রেবেস্টাস ম্যানহাটন কোম্পানীর কারখানায় এই অগ্নিনিরোধক উপাদান তৈরি হচ্ছে। এর নামকরণ করা হয়েছে 'রেকমেট এল 3203 6'।

মিঃ বলগার এই প্রসঙ্গে আরও বলেন যে, ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটে ত্রুটির ফলে অনেক সময় আগুন লাগে। ঐ সকল তারের উপর ঐ ফ্লোরাইডের প্রলেপ থাকলে এই ভয় থাকবে না। তাছাড়া মোটর গাড়ী প্রভৃতিতেও ঐ জিনিষটি ব্যবহার করা যেতে পারে। তাছাড়া নানা প্রকার বিমান, বিমানের কামরা, কম্পিউটার কারখানা, জেট-ইঞ্জিনচালিত বিমানে আগুন লাগবার আশঙ্কা খুবই বেশী থাকে।

ফেনা, পেস্ট প্রভৃতি নানা আকারেই ঐ বস্তুটি পাওয়া যায়। এমন কি, 2200 ডিগ্রী ফারেনহাইট তাপ এবং আবহাওয়ায় শতকরা 100 ভাগ অক্সিজেন থাকলেও ফ্লোরাইডের আস্তরণ যে কোন বস্তুকেই অগ্নির কবল থেকে রক্ষা করবে। সাধারণতঃ আবহাওয়ায় থাকে শতকরা 20 ভাগ অক্সিজেন। ঐ আবহাওয়ায় কাগজ 800 ডিগ্রী, চামড়া 850 ডিগ্রী, প্লাইউড 900 ডিগ্রী এবং ক্যানভাস 100 ডিগ্রী ফারেনহাইটে দগ্ধ হয়।

মস্তিষ্কের রোগে একোলোকেটর

মস্তিষ্কের রোগের প্রকৃতি নিরূপণের জন্যে ডাক্তারেরা অনেক দিন থেকেই একটা পদ্ধতি প্রয়োগ করে আসছেন। এর নাম অ্যাঞ্জিয়োগ্রাফি। একটি বিপরীতধর্মী বস্তু রোগীর ক্যারোটিড ধমনীতে ইনজেকশন করে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। সেই বস্তুটি ধমনীর মধ্যে ছড়িয়ে

পড়ে। তার ফলে রঞ্জেন রশ্মির ফটোতে গুরু-মস্তিষ্কের আকৃতির একটি স্পষ্ট ও বিশদ চিত্র পাওয়া সম্ভব হয়।

কিন্তু অ্যাঞ্জিয়োগ্রাফি প্রয়োগ করা সর্বদা সম্ভব হয় না। যাঁরা অত্যধিক উত্তেজনার রোগে ভোগেন, তাঁদের পক্ষে অ্যাঞ্জিয়োগ্রাফি খুবই ক্ষতিকর। তাছাড়া অ্যাঞ্জিয়োগ্রাফি পদ্ধতি প্রয়োগের ফল রোগীর উপর খুবই বেদনাদায়ক হয়।

খুব বেশী দিনের আগের কথা নয়, মানুষের মস্তিষ্ক পরীক্ষার একটি নতুন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। সোভিয়েট রাশিয়ায় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি নির্মাণের যে সারা ইউনিয়ন গবেষণা সংস্থা আছে, সেই গবেষণা সংস্থায় একটি যন্ত্র নির্মিত হয়েছে। তার নাম একো-11। এই যন্ত্রের সাহায্যে গুরুমস্তিষ্কের গঠন এবং তার জৈব আকৃতি প্রত্যক্ষ করা যায়। এই যন্ত্রটি উচ্চবেগসম্পন্ন স্পন্দনের সৃষ্টি করে এবং তাকে মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে ঢোকায়। তার ফলে মস্তিষ্কের অন্তরতম অংশ প্রতিফলিত আলোকে পর্দার উপরে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মস্তিষ্কের ভিতরে টিউমার আছে কিনা, রক্তক্ষরণ হয়েছে কিনা অথবা কোন রকম ফোড়া আছে কিনা—এই চিত্র থেকে ডাক্তারেরা তা জানতেপারেন। যদি থাকে, তবে তাদের অবস্থান এবং আয়তন সম্পর্কেও ডাক্তারেরা জানতে পারেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে রোগীদের পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, রোগ নিরূপণে এই যন্ত্রের ক্ষমতা অপরিসীম আর এই যন্ত্রের ব্যবহার ক্ষতিকর বা বেদনাদায়ক নয়। এই যন্ত্র নিউরোলজিক্যাল, নিউরোসার্জিক্যাল এবং ট্রমাটোলজিক্যাল ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

এই যন্ত্রের কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, এই যন্ত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রকে অনেকখানি বিস্তৃত করা যায়। ফার্স্ট এড এবং অ্যাম্বুলেন্সের ক্ষেত্রেও এই যন্ত্র ব্যবহার করা যায়, কিন্তু তার জন্যে চাই একটি হাল্কা ধরণের মেশিন। গবেষণা সংস্থাটি এই সমস্যারও সমাধান করেছে।

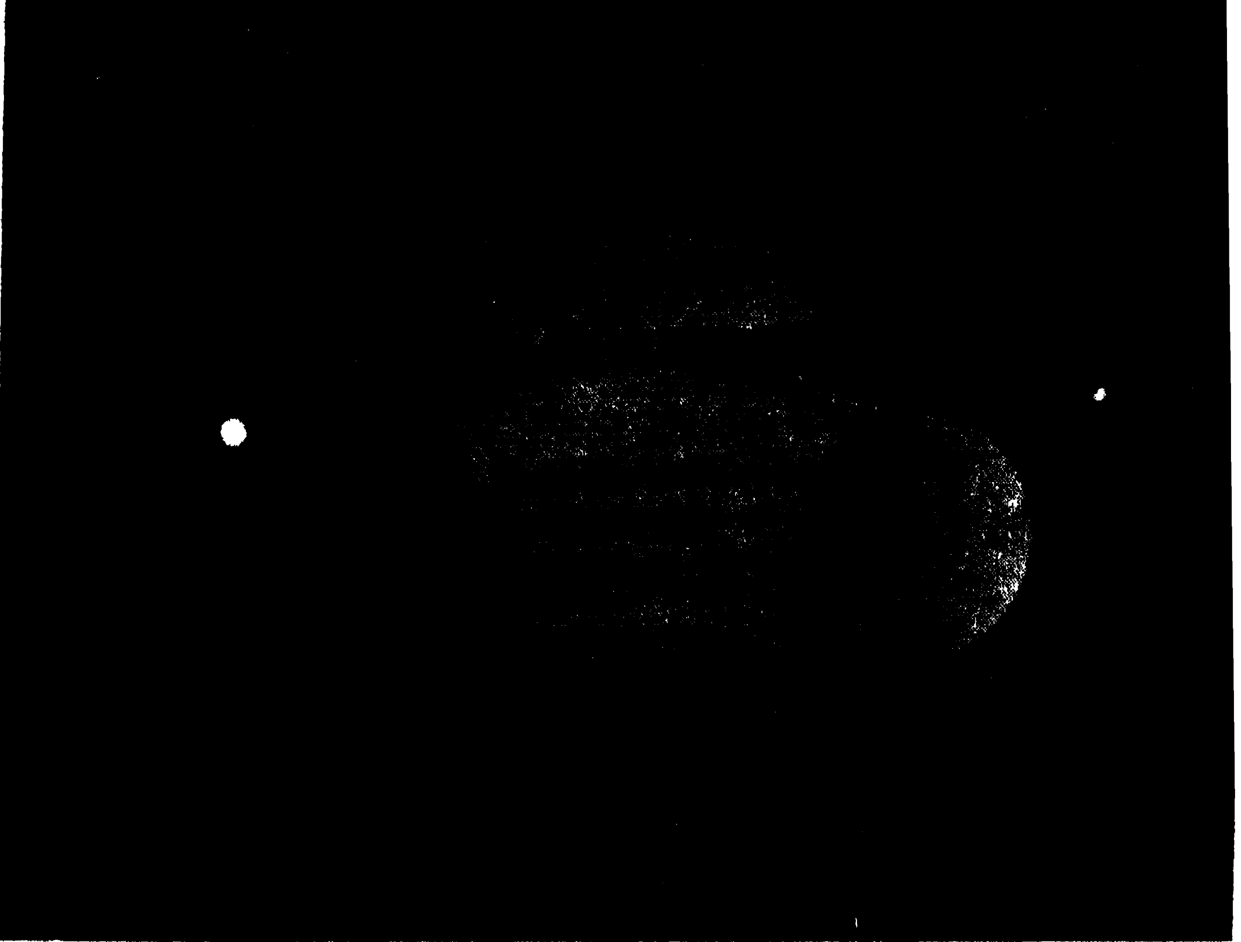
একো-12 নির্মাণে সেমিকণ্ডাক্টর শ্রেণীর উপাদান ব্যবহৃত হয়। একো-12 একটি ছোট ধরণের নির্ভরযোগ্য যন্ত্র। এর ওজন 10 কিলোগ্র্যাম। মস্তিষ্কের রোগ নিরূপণে এই যন্ত্র খুবই সহায়ক হবে। কোন্ রোগীকে হাসপাতালে পাঠাতে হবে—এই যন্ত্রের সাহায্যে ডাক্তারেরা সে সম্পর্কে তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। তাছাড়া অচেতন অবস্থায় রোগীর রোগ-নির্ণয়েও এই যন্ত্র খুবই সহায়ক।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

মে — 1972

রজত জয়ন্তী বর্ষ : পঞ্চম সংখ্যা



পায়োনিয়ার স্পেস-ক্র্যাফ্‌টের অভিযানের লক্ষ্যস্থল বৃহস্পতিগ্রহকে তার চারটি উপগ্রহসহ (বাম দিক থেকে—ক্যালিষ্টো, ইউরোপা, আইয়ো, গ্যানিমিড) ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

প্ল্যাটিপাস

কত অদ্ভুত ধরণের জীবজন্তুই না দেখা যায় এই পৃথিবীতে—যাদের আকৃতি, স্বভাব, জীবনযাত্রাপ্রণালী আর গতিবিধির কথা শুনলে অবাক্ হয়ে যেতে হয়। প্ল্যাটিপাস বা হংসচঞ্চু এই রকমেরই এক বিচিত্র ধরণের প্রাণী। এই প্রাণীকে নির্দিষ্ট শ্রেণীভুক্ত করতে বিজ্ঞানীরা পর্যন্ত হিমসিম খেয়ে গেলেন।

আমরা জানি, জীববিজ্ঞানীরা প্রাণী-জগৎকে মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী—এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন। মেরুদণ্ডী প্রাণীরা আবার পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত—(1) মাছ, (2) উভচর, (3) সরীসৃপ, (4) পাখী এবং (5) স্তন্যপায়ী। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হলো—এদের দেহত্বক কম-বেশী লোম দিয়ে আবৃত। এদের দাঁত আছে, যার সাহায্যে এরা খাবার চিবিয়ে খায়। স্তন্যপায়ী প্রাণীরা বাচ্চা প্রসব করে এবং জন্মের পর ঐ বাচ্চা মায়ের স্তন্যদুগ্ধ পান করে পুষ্ট হয়। তাছাড়া স্তন্যপায়ীরা সমোষ্ণশোণিত প্রাণী, অর্থাৎ এদের দেহের উত্তাপ শীত-গ্রীষ্ম নির্বিশেষে সব ঋতুতে প্রায় একই থাকে।

কিন্তু প্ল্যাটিপাস নামের প্রাণীটিতে যে কেবলমাত্র স্তন্যপায়ীদের বৈশিষ্ট্যই আছে তা নয়, এতে পাখী এবং সরীসৃপজাতীয় প্রাণীদের বৈশিষ্ট্যও কম-বেশী বিদ্যমান। তবুও জীববিজ্ঞানীরা একে স্তন্যপায়ী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

প্ল্যাটিপাসের ঠোঁট হাঁসের ঠোঁটের মতই চ্যাপ্টা বলে এদের হংসচঞ্চু বলা হয়। জীববিজ্ঞানীরা এদের যে বৈজ্ঞানিক নাম দিয়েছেন, তা হলো অর্নিথোরিঙ্কাস (Ornithoryncus)—যার অর্থ হলো, স্তন্যপায়ী শ্রেণীভুক্ত হাঁসের মত ডিম্বজ প্রাণী।

অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ ও তার দক্ষিণে অবস্থিত টাসমানিয়া দ্বীপেই কেবলমাত্র এই জীবটিকে দেখা যায়। আকৃতিতে এরা খুব বড় নয়। পূর্ণাঙ্গ প্ল্যাটিপাস প্রায় দেড় ফুট লম্বা। এদের দেহ গাঢ় বাদামী রঙের ছোট ছোট লোমে আবৃত। এদের চারটি পা ও একটি নাতিদীর্ঘ লেজ আছে। বিবরবাসী প্রাণীদের মত এদেরও সব পায়েই ধারালো বাঁকা নখ আছে। এই নখের সাহায্যে এরা বসবাসের জন্যে নদীর তীরে সুড়ঙ্গ কাটতে পারে এবং প্রয়োজনবোধে আত্মরক্ষার জন্যে আক্রমণও করতে পারে। প্ল্যাটিপাস আসলে জলচর। সাঁতার কাটবার সুবিধার জন্যে এদের সামনের পায়ের নখের মধ্যবর্তী ফাঁকগুলি হাঁসের পায়ের মত পাত্‌লা চামড়া দিয়ে জোড়া। এই দুটি পায়ের সাহায্যে এরা দ্রুতগতিতে সাঁতার কাটতে পারে।

স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মত এদের দাঁত নেই, তার বদলে আছে পাত্‌লা চামড়া দিয়ে ঢাকা চওড়া শক্ত ঠোঁট। এরা হ্রদ বা নদীর ধারের কর্দমাক্ত স্থানে ঠোঁট ঢুকিয়ে

খাবার সংগ্রহ করে। সংগৃহীত খাদ্য কিন্তু এরা সঙ্গে সঙ্গেই গিলে ফেলে না। এদের গলার দু-পাশে দুটি থলি আছে। প্রয়োজনমত খাবার জন্যে এই থলিতে এরা খাবার জমিয়ে রাখে।

কিন্তু এদের সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব হলো এই যে, এরা সরীসৃপ ও পাখীর মত ডিম পাড়ে। আবার ডিম ফুটে যে বাচ্চা বেরোয়, তারা স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মত মায়ের দুধ খেয়ে পুষ্ট হয়। স্ত্রী-প্ল্যাটিপাস সাধারণতঃ আধ ইঞ্চি থেকে এক ইঞ্চি লম্বা দুটি বা তিনটি সাদা ডিম পাড়ে। ডিম ফোটাবার জন্যে স্ত্রী-প্ল্যাটিপাস ডিমে বসে তা দেয়। ডিম ফুটে যে বাচ্চা বেরোয়, তার দেহে পালক বা লোম থাকে না, চোখও বন্ধ থাকে। তখন এদের ঠোঁট ছোট আর নরম থাকে। এই ঠোঁটের সাহায্যে মায়ের দুধ খাওয়া সম্ভব নয় বলে বাচ্চা প্ল্যাটিপাসের গালের দু-ধারে দু-সারি ছোট ছোট দাঁত থাকে। বাচ্চা বড় হলে এই দাঁত পড়ে যায়।

স্ত্রী-প্ল্যাটিপাসের বুকের উপরে জামার পকেটের মত একটা থলি থাকে। ডিম থেকে যে বাচ্চা বেরোয়, তা খুব অপুষ্ট থাকে বলে স্ত্রী-প্ল্যাটিপাস বাচ্চাকে ঐ থলিতে পুরে রাখে। যতদিন না বাচ্চাগুলি শক্ত-সমর্থ হয়ে ওঠে, ততদিন ওরা ঐ থলিতে থাকে। এই সময় বৃদ্ধির জন্যে প্রয়োজনীয় তাপ এরা নিরবচ্ছিন্নভাবে পেয়ে থাকে মায়ের দেহ থেকে।

স্ত্রী-প্ল্যাটিপাসের বুকে স্তন বা স্তনের বোঁটা বলে কিছুই থাকে না। এদের বুকে যে থলিটি থাকে, তার ভিতরের গাত্রত্বকে কতকগুলি দুগ্ধ-গ্রন্থি থাকে। বাচ্চাগুলি থলিতে অবস্থানকালে তাদের ছোট ছোট অস্থায়ী দাঁত দিয়ে দুগ্ধ-গ্রন্থির মুখের কাছে ত্বক কামড়ে ধরে দুধ চুষে খায়।

অস্ট্রেলিয়া ও টাসমানিয়া ছাড়া পৃথিবীর আর কোন দেশে এই অদ্ভুত প্রাণীটিকে দেখা যায় না। বন্দী করে অন্য দেশে নিয়ে গেলে বেশীদিন বাঁচে না। জীববিজ্ঞানীদের মতে, একমাত্র অস্ট্রেলিয়ার আবহাওয়াই এদের জীবনধারণের পক্ষে উপযুক্ত। এখন এই প্রাণীটির জীবনযাত্রাপ্রণালী এবং অন্য কোথাও এদের অস্তিত্ব আছে কি না, সে বিষয়ে ব্যাপক অনুসন্ধান চালানো হচ্ছে।

শ্রীশঙ্করলাল সাহা

গুণের নতুন নিয়ম

ছেলেবেলায় মা-বাবার কাছে বসে একটা ধারাপাত নিয়ে শরীর দুলিয়ে সুর করে—একে একে এক, এক দুগুণে দুই, এক তিনে তিন—এভাবে পঁচিশের ঘর পর্যন্ত নামতা মুখস্থ করেছি। তাতে ছোট-বড় যে কোনও রকমের গুণ বা ভাগ করতে অসুবিধা হতো না। এই তো সেদিন ছোটদের আসরে অমুদা 15-কে 13 দিয়ে গুণ করতে দিলেন। আমরা সবাই সাধারণভাবে যা শিখেছি, তাই প্রয়োগ করে গুণফল বের করলাম।

$$\begin{array}{r} 15 \\ 13 \\ \hline 45 \\ 15\times \\ \hline 195 \end{array}$$

যদি বল, সাধারণভাবে বলছি কেন? এর উত্তর কিছুক্ষণের মধ্যেই অমুদার শেখানো নিয়মগুলির মধ্যে পাবে। এতে এমনও নিয়ম আছে, যাতে দুয়ের ঘরের নামতা জানলেই যথেষ্ট। শুনে অবাক হচ্ছো নিশ্চয়ই! অবাক তো হবারই কথা। আর মনে মনে ভাবছ, ছেলেবেলায় ঐ দাদা যদি আসতেন, তাহলে পঁচিশের ঘর পর্যন্ত নামতা মুখস্থের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যেত। এখন একটু স্থির হয়ে ভালভাবে লক্ষ্য করে যাও, নতুন নিয়মগুলি কিভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

উপরে যে দুটি সংখ্যা দেওয়া হয়েছিল অর্থাৎ 15 ও 13, ঐ দুটির একক হলো যথাক্রমে 5 ও 3। আর দশক সংখ্যা দুটির ক্ষেত্রেই 1। গুণফল বের করবার আগে একক ও দশক কাজে লাগবে বলে এই দুয়ের সঙ্গে পরিচয় থাকা ভাল। এখন 15-এর সঙ্গে 13-এর, কিংবা 13-এর সঙ্গে 15-এর একক যোগ কর। যোগফল—$15+3=18$ অথবা $13+5=18$। এবার 18-কে 10 দিয়ে গুণ করতে হবে। এই গুণফলের অর্থাৎ 180-এর সঙ্গে দুই এককের গুণফল ($5\times3=15$) যোগ করলেই 15 ও 13-এর গুণফল 195-এর সমান হয়। এই নিয়মে 18×19, 10×19, 11×18 প্রভৃতির গুণফল বের করা যাবে। এই নিয়মটাকে প্রথম নিয়ম বলা যাক। প্রথম বললাম এই কারণে যে, এর পরে আরও নিয়ম আছে। অন্য নিয়মে আসবার সার্থকতা এই যে, এই নিয়ম দিয়ে সব গুণ করা যায় না। যেমন ধরা যাক, $45\times48=$ কত? প্রথম নিয়ম দিয়ে এই গুণ করলে গুণফল ভুল বেরোবে। তাহলে কি প্রথম নিয়ম

ভুল? তা মোটেও না। প্রথম নিয়ম দিয়ে কেবলমাত্র 10 ও 20-এর মধ্যে যে কোনও সংখ্যাকে যে কোন সংখ্যা দিয়ে গুণ করা যায়।

এখন 45 ও 48-এর গুণফল নির্ণয়ের জন্যে অন্য নিয়ম দরকার। এই নিয়মটার নাম দেওয়া যাক দ্বিতীয় নিয়ম। এই নিয়মের সঙ্গে প্রথম নিয়মের কিছুটা মিল পাওয়া যাবে। এখানে দুটির একক সংখ্যা যথাক্রমে 5 ও 8। দশক সংখ্যা 4। এখন 45-এর সঙ্গে 8, কিংবা 48-এর সঙ্গে 5-এর যোগফল দাঁড়ায় 53 (45+8=53, 48+5=53)। এই যোগফলকে দশক সংখ্যা 4 দিয়ে গুণ করলে গুণফল দাঁড়ায় 53×4=212। এই 212-কে 10 দিয়ে গুণ করলে হয় 2120। এর সঙ্গে দুই এককের গুণফল 5×8=40 যোগ করে দিলে—2120+40=2160—45 ও 48-এর গুণফল বেরিয়ে যায়।

এবার একটা গুণ দিচ্ছি। বল দেখি, কোন্ নিয়মে হবে? সংখ্যা দুটি হলো—91×98। এটাও দ্বিতীয় নিয়ম দিয়ে করলেই ঠিক উত্তর পাবে।

কিন্তু দ্বিতায় নিয়মে না করে অন্য এক নিয়মে এর নির্ধারিত গুণফল পাওয়া যাবে। এর নাম দেওয়া যাক তৃতীয় নিয়ম। এই নিয়ম করবার আগে যেটা বিশেষ করে জানা দরকার, সেটা হলো দ্বিতীয় আর তৃতীয় নিয়মের মধ্যে পার্থক্য নেই বললেই চলে। তবে কোন্টা তৃতীয় নিয়মে করলে সুবিধা হবে বলে দিচ্ছি। যদি দেখা যায় দুটি সংখ্যাই 9-এর ঘরে (এখানে যেমন 91 ও 98), তাহলে তৃতীয় নিয়ম দিয়ে করলে সুবিধা।

এখন দেখা যাচ্ছে 100 থেকে 91 ও 98-এর সঙ্গে যথাক্রমে 9 ও 2 পার্থক্য থাকছে। এই 9 আর 2 গুণ করলে গুণফল দাঁড়ায় 18। এই 18-কে ছেড়ে 91 আর 98-এর দিকে তাকানো যাক। এবার 91 থেকে 9 বিয়োগ না করে 100 ও 98-এর বিয়োগফল 2 বিয়োগ করলে দাঁড়ায়—91−2=89। অথবা 98 থেকে 2-এর বদলে 100 ও 91-এর বিয়োগফল 9 বিয়োগ করে বিয়োগফল হবে 89। এই 89-এর সঙ্গে 100 গুণ কর। গুণফল হবে 89×100=8900। এর সঙ্গে আগের গুণফল 18 যোগ করলে যে 8918 হয়, সেটাই 91 ও 98-এর গুণফল।

আবার যদি গুণ করতে গিয়ে দেখ যে, দুটির মধ্যে একটা 9-এর ঘরে অর্থাৎ ধর 93, আর অপরটি হলো 5-এর ঘরে অর্থাৎ ধর 53, তাহলে ঐ তিনটি নিয়মের কোনটিই খাটবে না। মনে নিশ্চয়ই সন্দেহ জাগছে—কেন খাটবে না? দেখ—প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় নিয়ম দিয়ে যে গুণগুলি করা হলো, সেগুলির মধ্যে প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, প্রত্যেকটিতে দুটি দশক সংখ্যার মিল আছে। প্রথমে 1−1 (15 ও 13), দ্বিতীয়ে 4−4 (45 ও 48) ও তৃতীয়ে 9−9 (91 ও 98)। কিন্তু এখানে 93 ও 53-তে কি দুই দশকের মিল আছে? মিল আছে যাতে, সে হলো এককের (3−3)। তাই

হোক, দুই দশকের যখন মিল নেই, তখন এর গুণফল অন্য এক নিয়মে করতে হবে। এর নাম দাও চতুর্থ নিয়ম।

এই নিয়মে 9-কে 5 দিয়ে গুণ করে যে গুণফল হবে (9×5=45), তাকে আবার 100 দিয়ে গুণ করলে হয় 4500। এবার 9 আর 5 যোগ করলে 14 হয় যোগফল। এই 14-এর সঙ্গে যে কোন একটির একক (এখানে 3) দিয়ে গুণ করলে যে গুণফল হয় (14×3=42), তাকে আবার 10 দিয়ে গুণ করলে সংখ্যা দাঁড়ায় 420। এখন এই 420-এর সঙ্গে আগের 4500 যোগ করে ফল দাঁড়ায় 4920। এর সঙ্গে দুই এককের গুণফল (3×3=9) যোগ করলে যে সংখ্যা 4929 দাঁড়ায়, তাই ঐ সংখ্যা দুটির গুণফল।

একই নিয়মে অর্থাৎ চতুর্থ নিয়ম দিয়ে 35 ও 75-এর গুণফল বের করা যায়। এটা অন্য নিয়ম দিয়েও করা যায়। এই নিয়মটা নিয়ে পঞ্চম নিয়ম হলো। এই নিয়মের পরিধিতে সেটাই পড়বে, যাদের দুটি এককই 5। এই সংখ্যা অর্থাৎ 5 ভিন্ন অন্য কিছু সংখ্যা হলে এই নিয়ম খাটবে না। তাহলে চতুর্থ নিয়ম দিয়ে করা যাবে। এখন পঞ্চম নিয়ম প্রয়োগ করে দেখা যাক।

এতে প্রথমে দশক দুটির গুণফল (এখানে 3×7=21) বের করে তাকে আবার 100 দিয়ে গুণ করতে হবে। তাতে গুণফল দাঁড়ায় 2100। এবার দশক দুটিকে (3 ও 7) যোগ করে, তাদের যোগফলকে (3+7=10) 2 দিয়ে ভাগ কর— 10÷2=5। এই 5-কে 100 দিয়ে গুণ করলে গুণফল দাঁড়ায় 100×5=500। এখন এই 500 আর আগের 2100 যোগ করে (2100+500=2600) তার সঙ্গে দুই এককের গুণফল 5×5=25 যোগ করে দিলে সংখ্যাটি দাঁড়ায় 2625। এটাই হলো 35 ও 75-এর গুণফল।

এই নিয়মের আর একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। ধর, দেওয়া হলো 35-কে 65 দিয়ে গুণ করতে। প্রথমে দুই দশকের অর্থাৎ 3 আর 6 গুণ করে তাকে আবার 100 দিয়ে গুণ করলে গুণফল দাঁড়ায় 1800। এবার দশক দুটিকে যোগ করে 2 দিয়ে ভাগ করলে হয়—3+6=9, 9÷2=4½। এতে ভগ্নাংশ কিছু থেকে যায়। এখন এই ভগ্নাংশটা ফেলে রেখে পূর্ণসংখ্যা নিয়ে কাজ করতে হবে। পূর্ণসংখ্যা 4-কে 100 দিয়ে গুণ করলে দাঁড়ায় 400 গুণফল। এই 400 আর আগের 1800 যোগ করলে হয় 2200। এই সংখ্যাকে 25 দিয়ে যোগ না করে 75 দিয়ে যোগ কর। তাহলে পূর্ণসংখ্যা হয় 2275। এই 75 যোগ করতে হবে তখনই, যখন 2 দিয়ে ভাগ করলে ভাগ মেলে না। তবে অন্য সব জায়গায় এই নিয়মে 25 যোগ করতে হবে।

যাহোক পাঁচ-পাঁচটা নিয়ম শেখানো হলেও ঐ দিয়ে সব রকমের গুণ

করা যাচ্ছে না। তাই অন্য এক নিয়ম আছে, যা দিয়ে মোটামুটি সব রকমের গুণ করা যেতে পারে। এটি হলো ষষ্ঠ নিয়ম। এই নিয়মে 2 দিয়ে গুণ করা আর 2 দিয়ে ভাগ করা শিখলেই যথেষ্ট। এখন 13 ও 14-এর গুণফল নির্ণয় করতে দেওয়া হলো।

প্রথমে 13 আর 14-এর যে কোন একটাকে 2 দিয়ে পর পর ভাগ করে যেতে হবে, যতক্ষণ না ভাগফল 1 হয়। আর অন্য সংখ্যাকে 2 দিয়ে গুণ করে যেতে হবে। ভাগের সময় যদি কিছু ভাগশেষ থাকে, তাহলে কেবল পূর্ণসংখ্যাটাই ধরতে হবে।

এখন 13-কে 2 দিয়ে ভাগ করতে বলা হলে, 14-কে 2 দিয়ে গুণ করে যেতে হবে। ফলাফলগুলি পর পর লিখে যাও—

13		14
6	($6\frac{1}{2}$-এর পরিবর্তে	28
3		56
1	($1\frac{1}{2}$-এর পরিবর্তে)	112

এবার বাঁ-দিকে যে যুগ্মসংখ্যাগুলি (এখানে কেবল 6), সেগুলি ফেলে রেখে বাদবাকী সব যথারীতি রেখে দিতে হবে এবং বাঁ-দিকের যুগ্মসংখ্যা বাদ দেবার সঙ্গে সঙ্গে ডানদিকের ওরই সমান্তরালবর্তী সংখ্যাটা সরিয়ে নাও। এখানে 6-এর সঙ্গে 28 কেটে নাও, পড়ে থাকবে কেবল—

13	14
3	56
1	112

এখন ডানদিকের সংখ্যাগুলি যোগ করলে 13 ও 14-এর গুণফল পাওয়া যাবে।

অনেক রকম তো হলো। এবার যে জিনিষটা আসছে, তা আরও মজার। এটি কিন্তু শেষ নিয়ম। এর পর অমুদা আর বিরক্ত করেন নি। যদি 695-কে 327 দিয়ে গুণ করতে বলে, তাহলে সাধারণভাবে 695-কে প্রথমে 7 দিয়ে, পরে 2 ও সবশেষে 3 দিয়ে গুণ করে একটা নীচে রেখা টেনে ঐগুলি যোগ করলে বেরিয়ে যায়। কিন্তু এই নিয়মে অত কিছু না করে সহজে এক লাইনে গুণফল বের করা যাবে। দেখা যাক 695×327-এর গুণফল এই নিয়মে কি রকম ভাবে আসে।

প্রথমে 5-কে 7 দিয়ে গুণ কর। গুণফল দাঁড়ালো 35। এর 5 লিখলে হাতে থাকে 3। এর পর উপরে শেষের ছুটি সংখ্যাকে নীচের শেষ ছুটি সংখ্যা দিয়ে কোণাকুণিভাবে গুণ করে তাদের যোগফল বের করতে হবে অর্থাৎ $9 \times 7 + 5 \times 2 = 63 + 10 = 73$। এই 73-এর সঙ্গে হাতের 3 যোগ দিলে হয় 76। এখন শুধু 6 বসালে হাতে থাকে 7।

এখানে উপরের তিনটি সংখ্যাকে নীচের তিনটি সংখ্যা দিয়ে কোণাকুণি গুণ দিয়ে যোগফল বের করা যাক। $7\times6+2\times9+3\times5=75$। এর সঙ্গে হাতের 7 যোগ করলে হয় 82। এই 82-এর 2 বসালে হাতে থাকে 8।

এখন ডান দিকে একটা করে সংখ্যা বাদ দিয়ে গুণ করতে হবে; অর্থাৎ প্রথমে উপরে ও নীচে বাঁ-দিকের দুটি করে সংখ্যা নিয়ে গুণ করতে হবে। গুণ করলে 6×2 আর 9×3 হয়। ঐ দুটির যোগফল 39-এর সঙ্গে হাতের 8 যোগ করলে হয় 47। 47-এর 7 বসে হাতে 4 থাকবে।

ডানদিকের আরও একটা সংখ্যা কমিয়ে দিয়ে শুধু 6 ও 3 গুণ করে হাতের 4 যোগ দাও। তাতে হয় 22। এবার গোটাটা লিখলে এরকম দাঁড়াবে—

$$\begin{array}{r} 695 \\ 327 \\ \hline 227,265 \\ \hline \end{array}$$

এখন এই নিয়ম দিয়ে একটা বড় গুণ করে দেওয়া চলে। যেমন—

$$\begin{array}{r} 238,756 \\ 12,321 \\ \hline \text{কত ?} \\ \hline \end{array}$$

এতে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, নীচের সারিতে বাঁ-দিকে একটি ঘর ফাঁকা। তাতে শূন্য বসিয়ে দিলে আকারটা দাঁড়ায় এরকম :—

$$\begin{array}{r} 238,756 \\ 012,321 \\ \hline \end{array}$$

এবার গুণ করা যাক—

$$\begin{array}{rl}
(1\times6)= & 6 \\
(5\times1)+(6\times2)= & 17 \\
(7\times1)+(5\times2)+(6\times3)= & 35 \\
(8\times1)+(6\times2)+(7\times2)+(5\times3)= & 49 \\
(3\times1)+(6\times1)+(8\times2)+(5\times2)+(7\times3)= & 56 \\
(2\times1)+(6\times0)+(3\times2)+(5\times1)+(8\times3)+(7\times2)= & 51 \\
(2\times2)+(5\times0)+(3\times3)+(7\times1)+(8\times2)= & 36 \\
(2\times3)+(7\times0)+(8\times1+(3\times2)= & 20 \\
(2\times2)+(8\times0)+(3\times1)= & 7 \\
(21\times)+(3\times0)= & 2 \\
(2\times0)= & 0 \\
\hline
 & 02941712676
\end{array}$$

এভাবে যদি গুণটা মুখে মুখে সেরে নিয়ে উত্তরটা কেবল লিখে যাই, তাতে সকলকে অবাক করে দেওয়া যায় বৈকি। দেখ, বাড়ীতে বসে ভালভাবে অভ্যাস করে যদি সকলের সামনে দেখাও, তাহলে তুমি রাতারাতি বেশ নাম করে ফেলবে।

শ্রীঅমিতাভ চক্রবর্তী

যান্ত্রিক গরু

না—যান্ত্রিক মানুষ বা রবোটের মত যান্ত্রিক গরু নয় কিংবা দম-দেওয়া কলের পুতুলের মত গরুর আকৃতি দেওয়া কোন খেলনা পুতুলও নয়; বৃটেনের খাদ্যশিল্প সংস্থার অন্যতম পরামর্শদাতা খ্যাতনামা জৈব রসায়ন-বিজ্ঞানী ডক্টর হুগ ফ্রাঙ্কলিন কৃত্রিম উপায়ে গরুর দুধ সংশ্লেষণের জন্যে যা ভেবেছিলেন, তা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং অভিনবও বটে।

ডক্টর ফ্রাঙ্কলিন ভেবেছিলেন—গরু ঘাস, খড়, খোল, ভুষি, চুনি ইত্যাদি খায় এবং খাদ্যদ্রব্যগুলি থেকে তাদের দেহাভ্যন্তরে পরিপাক ক্রিয়ার মাধ্যমে দুধের সকল প্রকার উপাদান সংগ্রহ করে থাকে। তাহলে গরুর খাবার সমস্ত দ্রব্যকে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করে তা থেকে দুধের উপাদানগুলি সংগ্রহের দ্বারা কেন দুধের সমগুণসম্পন্ন তরল পদার্থ সংশ্লেষণ করা যাবে না? ডক্টর ফ্রাঙ্কলিন বছর সাতেক এই নিয়ে একনিষ্ঠ গবেষণা করেছেন এবং সম্প্রতি তাঁর পরিপূর্ণ সাফল্যের কথা ঘোষণা করে বিশ্বের বিজ্ঞানীমহলে আলোড়নের সৃষ্টি করেছেন।

তিনি কয়েক টন গরুর আহার্য ঘাস, খড়, ভুষি, বিভিন্ন শাকসব্জি ইত্যাদিকে তাঁর নিজের আবিষ্কৃত জটিল যান্ত্রিক পদ্ধতিতে কয়েক গ্যালন দুধে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছেন। গরুর দুধ থেকে পার্থক্য বোঝাবার জন্যে ডক্টর ফ্রাঙ্কলিন কর্তৃক আবিষ্কৃত কৃত্রিম দুধের নাম উদ্ভিজ্জ দুধ দেওয়া হয়েছে। মানুষের দেহাভ্যন্তরের মতই গরুর দেহাভ্যন্তরেও রয়েছে বিভিন্ন জটিল সব যান্ত্রিক ব্যবস্থা। সম্ভবতঃ ডক্টর ফ্রাঙ্কলিন পরিপাকক্রিয়া প্রভৃতি দেহাভ্যন্তরীণ ক্রিয়াগুলি তাঁর নবাবিষ্কৃত যন্ত্রে কৃত্রিম উপায়ে সংঘটিত করেছেন। ডক্টর ফ্রাঙ্কলিন তাঁর যন্ত্রের জটিল গঠন-প্রণালী গোপন রেখেছেন, শুধু পদ্ধতিটির বর্ণনা দিয়েছেন।

... যান্ত্রিক গরুর সাহায্যে উদ্ভিজ্জ দুধ প্রস্তুতির বিবরণ দেবার আগে গরুর দুধের বিভিন্ন উপাদান এবং সেগুলি কৃত্রিম উপায়ে কিরূপভাবে তৈরি করা যায়, ত

সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক। গরুর দুধের মুখ্য উপাদান হলো ল্যাক্টোজ বা শর্করাসমৃদ্ধ স্নেহজাতীয় এবং প্রোটিন-সমৃদ্ধ পদার্থ। তাছাড়া এতে আছে বিভিন্ন খনিজ লবণ ও বিভিন্ন ভিটামিনযুক্ত পদার্থ। খাঁটি গরুর দুধের প্রতি এক-শত ভাগে 87 ভাগ জল, 3·3 ভাগ প্রোটিন, 3·6 ভাগ স্নেহজাতীয় পদার্থ, 4·8 ভাগ ল্যাক্টোজ, 0·7 ভাগ বিভিন্ন খনিজ লবণ এবং 0·6 ভাগ বিভিন্ন ভিটামিন (এ, বি, সি, ডি ও ই)। এখন যদি কোনভাবে উল্লিখিত সমস্ত উপাদানগুলি আমরা নির্দিষ্ট পরিমাণে মিশ্রিত করি, তাহলেই আমরা গরুর দুধের সদৃশ সমান পুষ্টিকর এবং স্বাদবিশিষ্ট কৃত্রিম দুধ পেতে পারি। ডক্টর ফ্রাঙ্কলিন ভাবতে থাকেন—ঘাস, খড়, খোল, শাকসব্জি প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য থেকে প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করে গরু যদি তার দেহের অভ্যন্তরে দুধ সৃষ্টি করতে পারে, তাহলে ঐ বস্তুগুলি থেকেই গরুর মাধ্যম ছাড়া কৃত্রিম উপায়ে দুধ কেন সংশ্লেষণ করা যাবে না? প্রথম দিকে তিনি সয়াবীন নিয়ে চেষ্টা করেন এবং কৃত্রিম উপায়ে সয়াবীনের দুধ প্রস্তুত করতে সক্ষম হন।

ডক্টর ফ্রাঙ্কলিন ছয়জন সহকারী নিয়ে ব্যাপক গবেষণা সুরু করেন। এই শ্রমসাধ্য গবেষণায় একদিন তিনি সাফল্য লাভ করলেন। তাঁর উদ্ভাবিত যান্ত্রিক গরুতে তিনি প্রথমে 15 গ্যালন উদ্ভিজ্জ দুধ প্রস্তুত করেছিলেন, যা পরীক্ষা করে পুষ্টি-বিজ্ঞানীরা রায় দেন যে, তা গরুর দুধের মতই সুস্বাদু এবং সমান পুষ্টিকর। এরপর ডক্টর ফ্রাঙ্কলিন আরো কিছুদিন গবেষণা করে দুধের গুণবৃদ্ধি ও পদ্ধতিটির উন্নতিসাধন করেন। বর্তমানে ডক্টর ফ্রাঙ্কলিন তাঁর যান্ত্রিক গরুর যে মডেলটি প্রস্তুত করেছেন, তার এক-প্রান্তে এক টন গো-খাদ্য (ঘাস, খড়, খোল, শাকসব্জি ইত্যাদি) প্রবেশ করিয়ে যন্ত্রটি চালু করলে কিছুক্ষণের মধ্যেই অপর প্রান্ত থেকে 200 গ্যালন উদ্ভিজ্জ দুধ পাওয়া যাবে। গরুও সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় ঐ পরিমাণ খাদ্য খেয়ে প্রায় ঐ পরিমাণ দুধই দিয়ে থাকে তবে একবারে বা একদিনে নয়।

ডক্টর ফ্রাঙ্কলিন কর্তৃক উদ্ভাবিত যন্ত্রে বিভিন্ন গো-খাদ্য কেটে টুক্‌রা করবার জন্যে দ্রুত আবর্তনশীল (মিনিটে 3,000 বার) একটি ধারালো ছুরি রয়েছে। ছোট ছোট টুক্‌রা-গুলি এরপর জলমিশ্রিত হয়ে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে আর একটি যান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে এসে পড়ে, যেখানে গো-খাদ্যের বিভিন্ন অংশ থেকে ক্লোরোফিলজাতীয় পদার্থ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় দূরীভূত করা হয়। এবার ক্লোরোফিলমুক্ত অর্ধতরল খাদ্যপিণ্ডের সঙ্গে বিভিন্ন স্নেহ ও শর্করাজাতীয় দ্রব্য মেশানো হয়। সমস্ত দ্রব্যগুলি এরপর যান্ত্রিক উপায়ে আলোড়িত হয়ে তৈলাক্ত এক প্রকার তরল পদার্থে পরিণত হয়; আইরিশ-মস নামে একজাতের বাদামী সামুদ্রিক আগাছার সাহায্যে তরলটিকে সুস্থিত (Stable) করা হয়। সর্বশেষে যান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিশোধন-ক্রিয়ার পর অপর প্রান্তের নির্গমন-নল দিয়ে বেরিয়ে আসে কৃত্রিম উদ্ভিজ্জ দুধ।

ডক্টর ফ্রাঙ্কলিন কর্তৃক উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে প্রতিদিন প্রতিটি যান্ত্রিক গরু থেকে 200 গ্যালন উদ্ভিজ্জ দুধ পাওয়া যাচ্ছে। গরুর দুধের মত এই কৃত্রিম দুধের কোন প্রকার পাস্তুরাইজেসনের প্রয়োজন নেই। পাস্তুরাইজেসন হলো পাস্তুর কর্তৃক নির্দেশিত পন্থায় দুধকে জীবাণুমুক্ত করা। সাধারণতঃ 65 ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় গরুর দুধকে 30 মিনিট-কাল উত্তপ্ত করলে দুধের সকল রকম ক্ষতিকর জীবাণু ধ্বংস হয় অর্থাৎ দুধ পাস্তুরাইজ্‌ড্‌ হয়ে থাকে। ডক্টর ফ্রাঙ্কলিন বলেছেন, কোন রকম বিশোধন-প্রক্রিয়া ছাড়াই এই কৃত্রিম দুধকে কয়েক মাস অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষিত রাখা যায়, এতে এর পুষ্টি-মূল্যও অপরিবর্তিত থাকে।

এই উদ্ভিজ্জ দুধের প্রতি আউন্সে 10 মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম, 0·18 মিলিগ্রাম ভিটামিন বি$_2$, 0·01 মাইক্রোগ্রাম ভিটামিন-বি$_{12}$, 250 আন্তর্জাতিক একক ভিটামিন-এ, 20 আন্তর্জাতিক একক ভিটামিন-ডি আছে। গরুর দুধের তুলনায় এই দুধ কোন অংশে নিকৃষ্ট নয়। ফুটিয়ে না নিলে গরুর দুধ থেকে বোভাইন টিউবারকিউলোসিস বা যক্ষ্মারোগ সংক্রমণের (যদি গরুটি যক্ষ্মারোগাক্রান্ত হয়ে থাকে) যে সম্ভাবনা থাকে, এই উদ্ভিজ্জ দুধ থেকে সে রকম কোন সংক্রমণের বিন্দুমাত্র ভয় নেই। ল্যাক্‌টোজ পরিপাকের গোলযোগের জন্যে যে সকল শিশুরা মায়ের বুকের দুধ বা গরুর দুধ হজম করতে পারে না, তাদের পক্ষে এই উদ্ভিজ্জ দুধ সহজপাচ্য হবে বলে চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা মনে করেন।

শ্রীজ্যোতির্ময় দুই

পারদর্শিতার পরীক্ষা

গণিতে তোমার পারদর্শিতা কেমন, তা বোঝবার জন্যে আজ প্রথমে তোমাদের গণিতের একটি বিষয় সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলবো এবং তারপর 5টি প্রশ্ন দেব। প্রতিটি প্রশ্নের নম্বর হলো 20। প্রশ্নে দুটি ভাগ থাকলে প্রত্যেক ভাগে 10 নম্বর। প্রশ্নের সঙ্গে যে উত্তরগুলি দেওয়া আছে, সেগুলির মধ্যে কোন্‌টি সঠিক বলতে হবে। উত্তর দেবার জন্যে মোট সময় 5 মিনিট। এই সময়ের মধ্যে তুমি যত নম্বর পাবে, সেই অনুযায়ী গণিতে তোমার পারদর্শিতা সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করতে পারবে।

আমরা সাধারণতঃ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ও 9, এই দশটি digit বা অঙ্কের সাহায্যে দশগুণোত্তর পদ্ধতিতে যে কোন সংখ্যা প্রকাশ করে থাকি (বহুকাল আগে এই পদ্ধতিটি ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম প্রচলিত হয়েছিল)। যখন আমরা লিখি 9068, তখন আমরা বোঝাই $8 \times 10^0 + 6 \times 10^1 + 0 \times 10^2 + 9 \times 10^3$। তবে দশটির বদলে

দুটি, তিনটি ইত্যাদি অঙ্কের সাহায্যেও যে কোন সংখ্যাকে প্রকাশ করা যেতে পারে। যে পদ্ধতিতে কেবলমাত্র দুটি অঙ্ক 0 ও 1 ব্যবহার করা হয়, তাকে বলে দ্বিগুণোত্তর পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে যদি আমরা লিখি 1011, তাহলে বোঝানো হবে $1\times2^0+1\times2^1+0\times2^2+1\times2^3$। সুতরাং বুঝতেই পারছো, দ্বিগুণোত্তর পদ্ধতিতে 0 হচ্ছে 0, 1 হচ্ছে 1, 2 হচ্ছে 10, 3 হচ্ছে 11, 4 হচ্ছে 100 ইত্যাদি।

দ্বিগুণোত্তর পদ্ধতিতে ভগ্নাংশও প্রকাশ করা যায়। দশগুণোত্তর প্রণালীতে যখন আমরা লিখি 7.523, তখন আমরা বোঝাই $7\times10^0+5\times10^{-1}+2\times10^{-2}+3\times10^{-3}$। অনুরূপভাবে দ্বিগুণোত্তর পদ্ধতিতে যদি লেখা হয় 1.101, তাহলে তা বোঝাবে $1\times2^0+1\times2^{-1}+0\times2^{-2}+1\times2^{-3}$।

প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি, সংখ্যাত্মক (digital) কম্পিউটারের ভাষায় দ্বিগুণোত্তর পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় বলে এর সমধিক গুরুত্ব রয়েছে। যাহোক, এবার প্রশ্নের পালা।

1. (ক) যে সংখ্যা দ্বিগুণোত্তর পদ্ধতিতে 110110, দশগুণোত্তর পদ্ধতিতে তা হচ্ছে

54

55

56

(খ) যে সংখ্যা দশগুণোত্তর পদ্ধতিতে 100, দ্বিগুণোত্তর পদ্ধতিতে তা হচ্ছে

1100111

1100101

1100100

2. (ক) দ্বিগুণোত্তর পদ্ধতিতে 111011 + 101101 হল

1011000

1001000

1101000

(খ) ঐ পদ্ধতিতে 111011 − 101101 হলো

1110

1010

10110

3. দ্বিগুণোত্তর পদ্ধতিতে 1011 × 101 হচ্ছে

101111

110111

111011

4, (ক) যে সংখ্যা দ্বিগুণোত্তর পদ্ধতিতে 1.1011, দশগুণোত্তর পদ্ধতিতে তা হলো

1.8765

1.7865

1.6875

(খ) যে সংখ্যা দশগুণোত্তর পদ্ধতিতে 0.8125, দ্বিগুণোত্তর পদ্ধতিতে তা হলো

0.1011

0.1101

0.1111

5. যে সংখ্যা দ্বিগুণোত্তর পদ্ধতিতে 1001001, সপ্তগুণোত্তর পদ্ধতিতে তা হলো

123

133

143

(উত্তরের জন্যে 316নং পৃষ্ঠা দেখ)

ব্রহ্মানন্দ দাশগুপ্ত ও জয়ন্ত বসু*

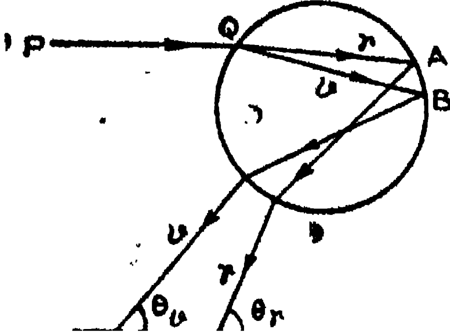
* সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-9

রামধনু

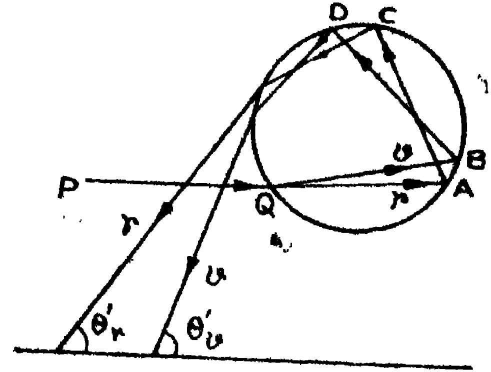
সূর্যালোকিত দিনে সকালের দিকে বা বিকালের দিকে যখন আকাশের একপ্রান্তে বৃষ্টি পড়ে, তখন রামধনুর সৃষ্টি হয়, তাহা আমরা সকলেই দেখিয়াছি। ইহা আর কিছুই নয়, আকাশের গায়ে ধনুকের ন্যায় বাঁকানো বিভিন্ন বর্ণের সারি। যখন সূর্য হইতে সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ বাতাসে ভাসমান জলকণার উপর আপতিত হয়, তখন রশ্মিগুচ্ছ বিচ্যুত (Deviated) ও বিচ্ছুরিত (Dispersed) হয় এবং রামধনু (Rainbow) গঠন করে। এই রামধনুর সৃষ্টি সাদা আলোকের বিচ্ছুরণের জন্য হইয়া থাকে।

সূর্যরশ্মি জলকণার উপর আপতিত হইলে বিচ্যুত ও বিচ্ছুরিত হয়। একবার ও দুইবার আভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের সময় আপতিত ও নির্গত রশ্মির মধ্যাস্থিত সূক্ষ্ম কোণের মান 1 নং ও 2 নং চিত্রে দেখানো হইয়াছে। একবার আভ্যন্তরীণ প্রতিফলন হইলে লাল বর্ণের রশ্মির ন্যূনতম চ্যুতির জন্য সূক্ষ্ম কোণ ($\theta_r = 42°$) বেগুনী বর্ণের রশ্মির ন্যূনতম চ্যুতির জন্য সূক্ষ্ম কোণের ($\theta_v = 40°$) চেয়ে বেশী (1নং চিত্র)। 2নং চিত্রে দেখানো হইয়াছে

দুইবার আভ্যন্তরীণ প্রতিফলন হইলে লাল বর্ণের রশ্মির ন্যূনতম চ্যুতির জন্য সূক্ষ্ম কোণ ($\theta'_r = 51°$) বেগুনী বর্ণের রশ্মির ন্যূনতম চ্যুতির জন্য সূক্ষ্ম কোণের ($\theta'_v = 54°$) চেয়ে কম।



1নং চিত্র



2নং চিত্র

সুতরাং একবার আভ্যন্তরীণ প্রতিফলন হইলে লাল বর্ণের রশ্মির ন্যূনতম চ্যুতিকোণ $= 180° - 42° = 138°$ ও বেগুনী বর্ণের রশ্মির ন্যূনতম চ্যুতিকোণ $= 180° - 40° = 140°$।

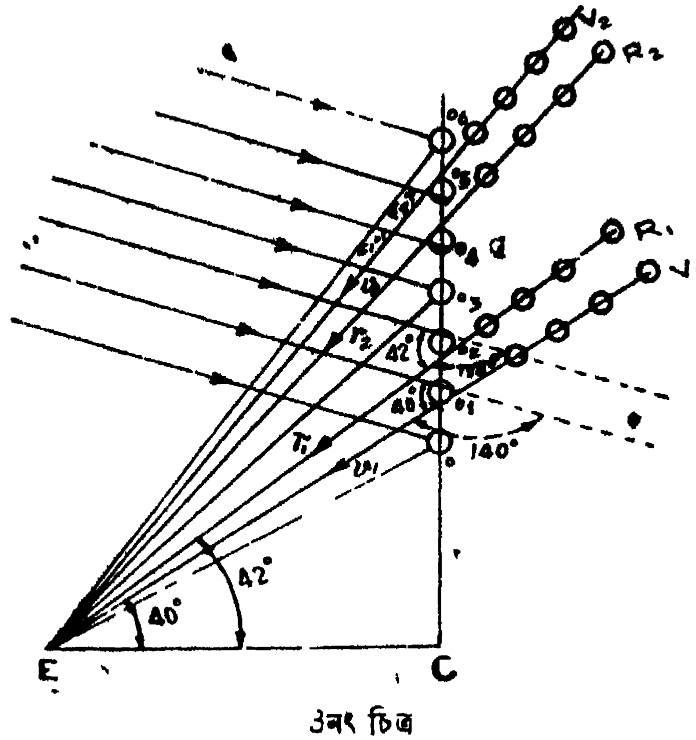
দুইবার আভ্যন্তরীণ প্রতিফলন হইলে লাল বর্ণের রশ্মির ন্যূনতম চ্যুতিকোণ $= 180° + 51° = 231°$ ও বেগুনী বর্ণের রশ্মির ন্যূনতম চ্যুতিকোণ $= 180° + 54° = 234°$।

সময়ে সময়ে আকাশে দুইটি রামধনু একত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা প্রাথমিক ও গৌণ রামধনু নামে পরিচিত। জলকণার উপর আলোক রশ্মির একমাত্র আভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের ফলে প্রাথমিক রামধনু গঠিত হয় এবং দুইবার প্রতিফলনের ফলে গৌণ রামধনুর সৃষ্টি হয়।

(3) নং চিত্রে E দর্শকের চক্ষু এবং $O, O_1, O_2, O_3 \cdots\cdots O_6$ হইলে একই উলম্ব-রেখায় জলকণার অবস্থান। EC হইল জলকণার উপর আপতিত সূর্যরশ্মির সমান্তরাল সরলরেখা।

যদি $\angle O_1EC = 40°$ হয়, তবে O_1 জলকণা হইতে বেগুনী বর্ণের রশ্মি ন্যূনতম চ্যুতি লইয়া নির্গত হইবে এবং E বিন্দুতে অবস্থিত চোখে প্রবল অনুভূতির সৃষ্টি করিবে। O_2 জলকণা এমন স্থানে অবস্থিত যে, EO_2 যেন EC-র সহিত 42° কোণে আছে। সুতরাং ঐ স্থানে অবস্থিত জলবিন্দুগুলি দর্শকের নিকট লাল বলিয়া প্রতিভাত হইবে। O ও O_3 জলকণা এমন স্থানে অবস্থিত যে, EO ও EO_3 যেন EC-এর সঙ্গে যথাক্রমে 40° অপেক্ষা কম ও 42° অপেক্ষা বেশী কোণে আছে। ফলে একবার আভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের ফলে EO ও EO বরাবর কোন নির্গত রশ্মি থাকিবে না। সুতরাং সূর্যের দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইলে এবং E বিন্দুতে চক্ষু থাকিলে এককেন্দ্রিক বৃত্তাকার চাপের রঙের সারি (Series of concentric coloured arcs) দেখা যাইবে, যাহার মধ্যে বেগুনী বর্ণ ভিতরে ও লাল বর্ণ

বাহিরে থাকিবে এবং 40° হইতে 42° কৌণিক ব্যাসার্ধের (Angular radius) মধ্যে অন্যান্য রংগুলি থাকিবে; অর্থাৎ আকাশের গায়ে এমন একটি বৃত্তের চাপ, যে চাপের উপর অবস্থিত জলবিন্দুর দ্বারা সূর্যরশ্মি 138° চ্যুতিকোণে দর্শকের চোখে পৌঁছাইলে ঐ জলবিন্দুগুলি

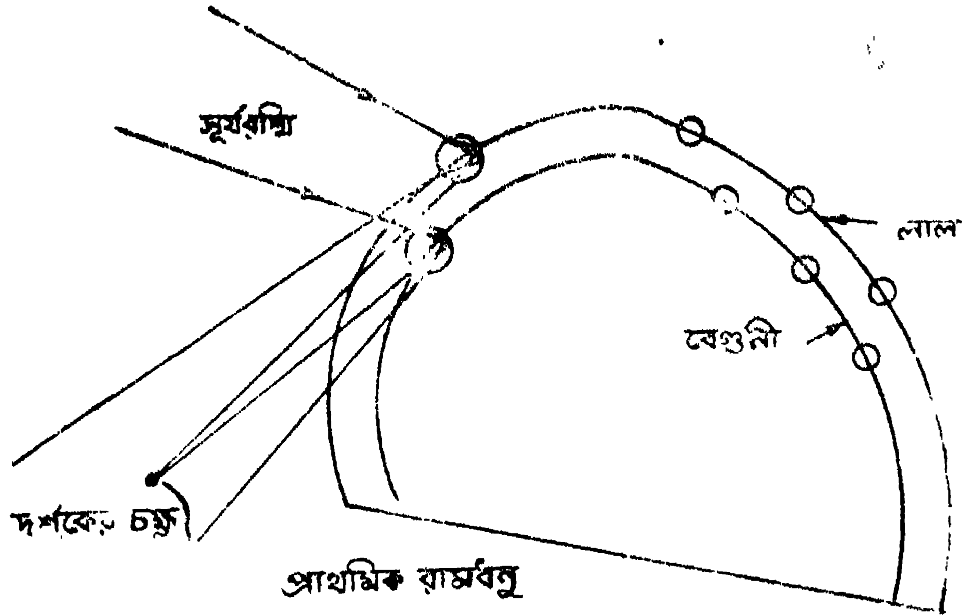


3নং চিত্র

দর্শকের নিকট লাল বলিয়া প্রতিভাত হইবে এবং দর্শক একটি লাল রঙের ধনুকের মত বাঁকানো বৃত্তাংশ দেখিতে পাইবে (4নং চিত্র)। ঐ জলকণাগুলি অন্য কোন রঙের রশ্মি দর্শকের চোখে পাঠাইবে না, কারণ অন্য রঙের রশ্মির ন্যূনতম চ্যুতিকোণ 138° নয়। তেমনি যদি আর একটি বৃত্তের চাপ কল্পনা করা যায়, যে চাপের উপর অবস্থিত জলবিন্দুগুলির দ্বারা সূর্যরশ্মি 140° চ্যুতিকোণে দর্শকের চোখে পৌঁছায়, তবে দর্শক ঐ বৃত্তাংশকে বেগুনী বর্ণের দেখিবে। এইভাবে অন্যান্য রঙের বৃত্তাংশও দর্শকের চোখে প্রতিভাত হইবে। ইহাকে প্রাথমিক রামধনু বলে।

সময়ে সময়ে প্রাথমিক রামধনুর উপরে আর একটি অস্পষ্ট রামধনু দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে গৌণ রামধনু (Secondary Rainbow) বলে। জলকণা বেশী উপরে অবস্থিত থাকিলে, যেমন O_4, এবং EO_4 যদি EC-র সহিত 51° কোণ উৎপন্ন করে, তবে দুইবার আভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের ফলে নির্গত রশ্মি চোখে লাল রঙের অনুভূতির সৃষ্টি করিবে এবং যখন এই কোণ 54° হইবে, তখন চোখে বেগুনী রঙের অনুভূতির সৃষ্টি করিবে। সুতরাং গৌণ রামধনুতে লাল বর্ণ নীচে ও বেগুনী বর্ণ উপরে থাকিবে এবং অন্যান্য বর্ণ 51° হইতে

54° কৌণিক ব্যাসার্ধের মধ্যে থাকিবে; অর্থাৎ গৌণ রামধনুতে রঙের সজ্জা মুখ্য রামধনুর বিপরীত।



4নং চিত্র

তিন বার ও চার বার আভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের ফলে উৎপন্ন রামধনুর আলোর তীব্রতা অত্যন্ত হ্রাস পাওয়ায় উহা সাধারণতঃ চোখে দেখা যায় না।

বিজ্ঞানী মিলার (Millar) কৃত্রিমভাবে রামধনু তৈয়ার করিয়াছিলেন। তিনি উলম্বভাবে পতিত সূক্ষ্ম জলধারার (ব্যাস = ·022 ইঞ্চি) উপর সূর্যরশ্মি নিক্ষেপ করিয়া প্রাথমিক ও গৌণ রামধনু উৎপন্ন করিয়াছিলেন।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী ঘোড়ই

টুয়াটারা

প্রাণী-জগতে টুয়াটারা এক বিরাট বিস্ময়। সরীসৃপ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত লেপিডো-সউরিয়া (Lepidosauria) উপশ্রেণীর মধ্যে রিন্‌কোসেফালিয়া (Rhynchocephalia) বর্গের প্রাণী টুয়াটারা। এদের বৈজ্ঞানিক নাম স্ফেনোডন পাঙ্কটেটাস (Sphenodon punctatus)। এই বর্গভুক্ত সমস্ত প্রাণী আজ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু কোটি কোটি বছর আগে আবির্ভূত টুয়াটারা আজও টিকে আছে পৃথিবীর বুকে। প্রায় 17 কোটি বছর আগে যাদের আবির্ভাব বলে অনুমিত, তারা শুধু টিকে থাকা নয়—তাদের দেহে বা জীবনধারায় প্রায় কোন পরিবর্তনের ছোঁওয়া লাগে নি। টুয়াটারা যেন বর্তমান যুগে পুরাকালের সাক্ষী। তাই টুয়াটারাকে বলা হয় জীবন্ত জীবাশ্ম।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এরা যখন আবিষ্কৃত হয়, তখন তাদের লিজার্ড বা টিকটিকি-গিরগিটি জাতের প্রাণী বলে বর্ণনা করা হয়। 1867 সালে আলবার্ট গান্থার টুয়াটারাকে একটি পৃথক বর্গ রিন্‌কোসেফালিয়ার অন্তর্ভুক্ত করেন।

টুয়াটারা দেখতে অনেকটা প্রায় টিকটিকি-গিরগিটি জাতের প্রাণীদের মত। মাওরী ভাষায় টুয়াটারা কথাটির অর্থ হচ্ছে কণ্টকধারী। দু-ফুট-আড়াই ফুট লম্বা টুয়াটারার পৃষ্ঠদেশের মধ্যভাগে মাথার পিছন থেকে লেজের প্রায় শেষ পর্যন্ত এক সারি কাঁটা দেখা যায়। দেহের উপরিভাগে এদের থাকে ক্ষুদ্রকায় আঁশ আর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হলদে বিন্দু। নিম্নভাগে তুলনায় বড় চৌকা প্লেট। দেহের বর্ণ অনুজ্জ্বল সবুজ বা কাল্‌চে বাদামী। এদের লেজ মোটা ও চ্যাপ্টা। স্ফেনোডন কথাটির অর্থ হলো কিলকাকার দাঁত। উপর ও নীচের চোয়ালের অনেকটা বাটালীর মত দাঁতের গড়ন থেকে কথাটার উৎপত্তি। চার পায়ে থাকে ধারালো নখরযুক্ত পাঁচটা করে আঙ্গুল। টুয়াটারা সময় সময় অনেকটা ব্যাঙের মত শব্দ করে থাকে। এদের টিকটিকির মত লেজ খসে যেতে পারে ও সেখান থেকে অপুষ্টভাবে আবার তার পুনরুৎপত্তি ঘটে। পুরুষ টুয়াটারার কোন জননেন্দ্রিয় দৃষ্টিগোচর হয় না, যা সরীসৃপদের মধ্যে একমাত্র এদেরই বৈশিষ্ট্য। টুয়াটারার আর একটি মজার জিনিষ হচ্ছে—তার তৃতীয় চোখ, মাথার উপর দুটি চোখের মাঝামাঝি চামড়ায় ঢাকা। তবে এই চোখ কার্যক্ষম নয়।

টুয়াটারার স্বভাব বেশ ঠাণ্ডা। তবে আত্মরক্ষা করবার জন্যে এরা আঁচড়াতে ও কামড়াতে ছাড়ে না। এরা খুবই অলস। পেটের দায় না থাকলে বা খুব দরকার না হলে নড়াচড়া করতে চায় না। সাধারণতঃ এরা মন্থর গতিতে চলে। তবে প্রয়োজন হলে অল্প দূর পর্যন্ত দ্রুত-গতিতে দৌড়ুতে পারে। টিকটিকি জাতের প্রাণী, কচ্ছপ—এমন কি ব্যাঙের চেয়ে একই তুলনীয় তাপে এদের বিপাকীয় ক্রিয়াকলাপ অতি অল্প। কর্মরত অবস্থায় এরা সাত সেকেণ্ডে এক-বার করে শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়। এরা এক ঘণ্টা পর্যন্ত শ্বাসগ্রহণ না করে থাকতে পারে।

অন্য সরীসৃপদের তুলনায় টুয়াটারার ঠাণ্ডা সহ্য করবার শক্তি অনেক বেশী। এদের দেহের তাপমাত্রা প্রায় 43° ফাঃ—যা অপর সরীসৃপদের প্রায় অচল করে দেয়। এই জন্যেই বোধ হয় নিউজিল্যাণ্ডের মত ঠাণ্ডা দেশে তারা টিকে আছে। আর অত ঠাণ্ডায় অন্য বড় জাতের সরীসৃপদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয় না। তাছাড়া স্তন্যপায়ীদের সঙ্গেও ওখানে তাদের জীবনযুদ্ধে নামতে হয় নি। অবশ্য পরে স্তন্যপায়ীদের সেখানে মানুষই এনে বসিয়েছে।

টুয়াটারা মাংসাশী প্রাণী। নানা রকম পতঙ্গ, মাকড়সা, শামুক প্রভৃতি তারা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। পাখীর ডিম, ছানা প্রভৃতিও তারা খেয়ে থাকে। এরা সাধারণতঃ নিশাচর। দিনের বেলায় তাদের বাসায় কাটায়, রাতে বেরোয় খাদ্যের সন্ধানে। অবশ্য মাঝে মাঝে চলে আসে গর্তের মুখে রোদ পোহাতে। এরা মাটিতে

গর্ত করে বাস করে। দরকার পড়লে যে কোন জায়গায় আশ্রয় নিতে দ্বিধা করে না। সুবিধা পেলে পাখীর ডিম, ছোট বাচ্চা—এমন কি, পাখাদেরও এরা শিকার করে খায়। তবে দেখা গেছে যে, যে অঞ্চলে পাখাদের বাস সেখানেই টুয়াটারা থাকে। পাখা নেই এমন দ্বীপে টুয়াটারার অস্তিত্ব নেই। এর কারণ সম্বন্ধে সঠিক উত্তর পাওয়া যায় না।

স্ত্রী-টুয়াটারা ডিম পাড়ে প্রায় 8 থেকে 15টি প্রায় 5 ইঞ্চি গভীর গর্তের মধ্যে। ডিম পাড়া হয়ে গেলে মাটি লতাপাতা দিয়ে ডিমগুলি চাপা দিয়ে দেয়। ডিমগুলি প্রায় এক ইঞ্চির মত। ডিম ফুটে বাচ্চা বেরুতে সময় লাগে এক বছরেরও বেশী—প্রায় 15 মাস। সরীসৃপদের মধ্যে ডিম ফুটতে এত সময় আর কারো লাগে না। মনে হয় শীতের সময় ডিমের বৃদ্ধি হ্রাস পায়। টুয়াটারার ডিম ফুটে বাচ্চা বেরুতে যেমন সময় লাগে—তেমনি বাচ্চাদের বাড়তেও সময় লাগে অনেক। টুয়াটারা প্রায় কুড়ি বছর না হলে সাবালক হয় না। যাহোক, টুয়াটারা বাড়ে প্রায় 50 বছর পর্যন্ত, আর তারা বেঁচে থাকতে পারে প্রায় 100 বছর পর্যন্ত।

এ তো গেল টুয়াটারার জীবনধারার কথা। মাওরী পুরাণ কাহিনীতেও এদের এক বিশিষ্ট স্থান ছিল। মাওরীদের সভাকক্ষে এরা ও সমজাতীয় প্রাণীরা স্থান পেত কাঠের অলঙ্করণে। টুয়াটারা ও সমজাতীয় প্রাণীদের ভাবা হতো ভয়াবহ দুর্ভাগ্যের অগ্রদূত হিসাবে।

এককালে নিউজিল্যাণ্ডের মূল ভূখণ্ডে টুয়াটারাদের দেখা মিলতো প্রচুর। সেখানে ছিল তাদের অবাধ রাজত্ব। কিন্তু সেদিন তাদের রইলো না চিরকাল। সংখ্যা কমতে কমতে একেবারে অবলুপ্তির প্রান্তে দাঁড় করিয়ে দিল। কিন্তু কেন, তার সঠিক হদিস মেলা ভার। তবে তাদের বংশধারা একেবারে লোপ পায় নি—অস্তিত্ব তাদের টিকে ছিল, কোন রকমে আজও আছে। মূল ভূখণ্ডের উত্তরে কয়েকটি দ্বীপেই তাদের দেখা যায়।

নিউজিল্যাণ্ড ছাড়া টুয়াটারার আর কোথাও বসবাস নেই। তাও আবার নিউ-জিল্যাণ্ড ভূখণ্ডের কাছে প্রায় 20টি দ্বীপেই তাদের দেখা পাওয়া যায়। তাই নিউজিল্যাণ্ডের সর্বত্র টুয়াটারারা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছে সে দেশের সরকার। সেখানে এদের হত্যা এবং বিদেশে চালান দেওয়া নিষিদ্ধ—একমাত্র শিক্ষাক্ষেত্র, গবেষণা ইত্যাদির ব্যাপার ছাড়া। সরকারের বিধিনিষেধ অমান্য করলে সেটা দণ্ডনীয় অপরাধ। সে জন্যেই আজ প্রায় বিলুপ্তির শেষ প্রান্ত থেকে তারা অব্যাহতি পেয়েছে এবং সংখ্যাও নাকি বেড়ে গেছে। যাহোক, আমাদের আশা, ভবিষ্যতেও তারা বেঁচে থাকবে পুরাকালের সাক্ষী হয়ে।

শ্রীবিশ্বনাথ মিত্র*

* প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

উত্তর

(পারদর্শিতার পরীক্ষা)

1. (ক) 54

$[\,110110 = 0\times 2^0 + 1\times 2^1 + 1\times 2^2 + 0\times 2^3 + 1\times 2^4 + 1\times 2^5$
$= 0+2+4+0+16+32$
$= 54\,]$

(খ) 1100100

[(খ)-এর প্রশ্নের সঙ্গে যে 3টি উত্তর দেওয়া আছে, সেগুলির কোন্‌টি দশগুণোত্তর পদ্ধতিতে 100-এ রূপান্তরিত হচ্ছে, তা লক্ষ্য করে সঠিক উত্তরটি নির্ণয় করা যেতে পারে। তবে দশগুণোত্তর পদ্ধতিতে লিখিত কোন সংখ্যাকে সরাসরি দ্বিগুণোত্তর পদ্ধতিতে রূপান্তরিত করতে হলে সংখ্যাটিকে 2 দিয়ে পর পর ভাগ করে ভাগশেষগুলি স্থির করা দরকার। এক্ষেত্রে—

2	100	
2	50	0
2	25	0
2	12	1
2	6	0
2	3	0
2	1	1
	0	1

ভাগশেষগুলিকে নীচে থেকে উপর পর্যন্ত পর পর লিখলে দাঁড়ালো : 1100100 — এটাই হলো দ্বিগুণোত্তর পদ্ধতিতে ঈপ্সিত সংখ্যা।]

2. (ক) 1101000

(খ) 1110

[দ্বিগুণোত্তর পদ্ধতিতে যোগের মূল নিয়মগুলি হলো : $0+0=0$, $0+1=1$, $1+0=1$, $1+1=10$ (অর্থাৎ 2)। এই থেকে বিয়োগের নিয়মও সহজেই বুঝতে পারা যায়।]

3. 110111

[দ্বিগুণোত্তর পদ্ধতিতে গুণের মূল নিয়মগুলি হলো : $0\times 0=0$, $0\times 1=0$, $1\times 0=0$, $1\times 1=1$। এক্ষেত্রে

```
   1011
    101
 ------
   1011
  0000×
 1011××
 ------
 110111
```

4. (ক) 1.6875

$[1.1011 = 1\times2^0+1\times2^{-1}+0\times2^{-2}+1\times2^{-3}+1\times2^{-4}$

$= 1+0.5+0+0.125+0.0625$

$= 1.6875]$

(খ) 0.1101

$[0.8125 = 0+0.5+0.25+0+0.0625$

$= 0\times2^0+1\times2^{-1}+1\times2^{-2}+0\times2^{-3}+1\times2^{-4}$

$= 0.1101]$

5. 133

$[1001001 = 73$

$= 1\times7^2+3\times7^1+3\times7^0$

সুতরাং সপ্তগুণোত্তর পদ্ধতিতে সংখ্যাটি হবে 133। 73-কে 7 দিয়ে পর পর ভাগ করে ভাগশেষগুলি নীচ থেকে উপর পর্যন্ত নিয়েও এই সংখ্যাটি নির্ণয় করা যেতে পারে।]

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন 1. : ডাব এবং নারকেলের জলের রাসায়নিক উপাদান সম্বন্ধে কিছু বলুন।

সনৎকুমার কুণ্ডু, কলিকাতা-34 ও
বলাইচাঁদ তলাপাত্র, মুর্শিদাবাদ

প্রশ্ন 2. : সমুদ্রজলের মধ্যে সাধারণতঃ কি কি উপাদান থাকে?

শোভন ভট্টাচার্য, শান্তশ্রী ভট্টাচার্য ; খিদিরপুর

উত্তর 1. : ডাবের জল বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, এর মধ্যে অল্পমাত্রায় প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ইক্ষুশর্করা, গ্লুকোজ, ফস্ফেট, কিছু কঠিন পদার্থ এবং শতকরা প্রায় নব্বই ভাগ জল থাকে। ডাবের জল অম্লযুক্ত।

নারকেলের জলের উপাদানও প্রায় এক, তবে উপাদানের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণগত পার্থক্য লক্ষিত হয়। গ্লুকোজ ও জলীয় অংশের পরিমাণ ডাবের জলের তুলনায় নারকেলের জলে অনেক কমে যায়। ডাব অবস্থার বেশীর ভাগ গ্লুকোজই নারকেল অবস্থায় ইক্ষুশর্করায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। নারকেল জলে অম্লতার পরিমাণও বেশী। তবে নারকেলের বয়স অনুযায়ী এই সকল উপাদানের মধ্যে পরিমাণগত পার্থক্য দেখা যায়।

উত্তর 2. : সমুদ্রের জলে সাধারণতঃ সোডিয়াম ক্লোরাইড, ম্যাগ্নেসিয়াম ক্লোরাইড, পটাসিয়াম ক্লোরাইড, ক্যালসিয়াম কার্বোনেট, ম্যাগ্নেসিয়াম সালফেট, ক্যালসিয়াম সালফেট প্রভৃতি ধাতব লবণ থাকে। এদের মধ্যে সোডিয়াম ক্লোরাইডই পরিমাণে সবচেয়ে বেশী। তাছাড়া সমুদ্রের জলে সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগ্নেসিয়াম প্রভৃতির ব্রোমাইড পাওয়া যায়। সমুদ্রের জলে আয়োডিনও পাওয়া যায়। এর কারণ হিসাবে বিজ্ঞানীরা সামুদ্রিক গুল্ম, সামুদ্রিক প্রাণীর মধ্যেকার আয়োডিন যৌগকেই আয়োডিনের উৎস বলে মনে করেন। তাছাড়া সমুদ্রের নীচের বিভিন্ন পদার্থও জলের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। তবে এসব উপাদানের পরিমাণ বিভিন্ন জায়গার জলে বিভিন্ন হয়ে থাকে।

শ্যামসুন্দর দে*

* ইনষ্টিটিউট অব রেডিও-ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স, বিজ্ঞান কলেজ ; কলিকাতা-9

শোক-সংবাদ

পরলোকে শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ভারতীয় স্থাপত্য বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা, স্থাপত্য বিশারদ শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গত 24 জানুয়ারী 82 বছর বয়সে পরলোক গমন করেছেন।

শ্রীশচন্দ্র শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ থেকে পাশ করে আট বছর কলকাতায় সরকারী চাকুরি করেন। তারপরে তিনি রাজস্থানের বিকানীরে স্টেট ইঞ্জিনীয়াররূপে কাজ করেন। গান্ধীজীর আহ্বানে তিনি সরকারী চাকুরি ছেড়ে দিয়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। তারপর থেকে ভারতীয় স্থাপত্য সম্পর্কে দেশের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে আমৃত্যু তিনি চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। ভারতের বহু মন্দির ও বাসগৃহের নির্মাণ পরিকল্পনায় তাঁর স্থাপত্য বিদ্যার স্বাক্ষর আজও বিদ্যমান। দিল্লীর বিড়লা মন্দির, লছমনঝোলার সমীপবর্তী গীতাভবন, বারাণসী, ত্রিবাঙ্কুর, বিকানীর প্রভৃতি জায়গায় তাঁর স্থাপত্যের নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। তাঁর চেষ্টার ফলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় স্থাপত্য বিষয়ে ডিগ্রী কোর্স চালু হয়। তিনি কিছুকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য বিভাগেও শিক্ষকতা করেন। তিনি ভারতের সর্বত্র এবং আমেরিকার নিউ-ইয়র্ক ও অন্যান্য স্থানে ভারতীয় স্থাপত্যবিদ্যার প্রচার করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য সৃষ্টিকর্ম হচ্ছে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 'দেবায়তন ও ভারতীয় সভ্যতা', 'মগধের স্থাপত্য ও কৃষ্টি', 'ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড নিউ অর্ডার' প্রভৃতি গ্রন্থ।

তিনি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের কর্মপ্রচেষ্টায় সাহায্যকল্পে দেড় হাজার টাকা দান করেন। আমরা তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

বিবিধ

বিজ্ঞানবিষয়ক লোকরঞ্জক বক্তৃতা

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে গত 8ই এপ্রিল, '72 তারিখে পরিষদ ভবনে 'কুমার প্রমথনাথ রায় বক্তৃতা-কক্ষে' ডাঃ রামচন্দ্র অধিকারী 'সৃষ্টি-রহস্য ও ক্রমবিবর্তনবাদ' শীর্ষক একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা প্রদান করেন। এই সভার সভাপতিত্ব করেন বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ভবনের সম্প্রসারণকল্পে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ সাহায্য

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাবিভাগ বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ভবনের সম্প্রসারণকল্পে এক লক্ষ টাকা অর্থসাহায্য মঞ্জুর করেছেন। বিজ্ঞান পরিষদের কর্মপ্রচেষ্টার প্রতি এই সহযোগিতার জন্যে উক্ত শিক্ষা বিভাগ পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

অ্যাপোলো-16 মহাকাশচারীদের সফল চন্দ্রাভিযান

অ্যাপোলো-16 মহাকাশযানের যাত্রী জন ইয়ং ও চার্লস ডিউককে নিয়ে অ্যাপোলো-16-র চন্দ্রযান ওরাইয়ন 21শে এপ্রিল সকালে চাঁদে অবতরণ করেন। অবতরণের অল্পক্ষণ পরে জন ইয়ং ওরাইয়ন থেকে বেরিয়ে আসেন ও চাঁদের উচ্চভূমিতে পদচারণা সুরু করেন। চাঁদের বুকে পৃথিবীর যে কয়জন মানুষ এপর্যন্ত পদার্পণ করেছেন ইয়ং তাঁদের মধ্যে নবম; কিন্তু চাঁদের পার্বত্য অঞ্চলে তিনিই প্রথম ভ্রমণকারী। ইয়ং-এর চাঁদে পদার্পণের কয়েক মিনিট বাদে চার্লস ডিউকও সেখানে পদার্পণ করেন। তাঁরা চাঁদের পাথর ও মাটি সংগ্রহ করেন। অ্যাপোলো-16 মূলযান ক্যাস্পার-এর পরিচালক ছিলেন কেন ম্যাটিংলি।

27শে এপ্রিল অ্যাপোলো-16 মহাকাশ যানের তিন যাত্রী কেন ম্যাটিংলী, জন ইয়ং, চার্লস ডিউক প্রশান্তমহাসাগরে নিরাপদে অবতরণ করেন। তাঁরা 16ই এপ্রিল চন্দ্রাভিযানে যাত্রা করেছিলেন।

সংক্রামক ব্যাধি দূরীকরণে ভারতের প্রগতি

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রকের বার্ষিক বিবরণী থেকে জানা যায়, 1970-71 সালে ভারতে সংক্রামক ব্যাধি দূরীকরণে এক উল্লেখ-যোগ্য প্রগতি পরিলক্ষিত হয়েছে। 1970 সালে ভারতে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল সবচেয়ে কম এবং চারটি রাজ্য ও আটটি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল হয়েছে কলেরা রোগ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

1969 সালে যেখানে বসন্ত রোগে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে 19, 120 ও 4.54, 1970 সালে তা দাঁড়ায় 10, 055 ও 1805। 1970 সালের 31শে মার্চ পর্যন্ত 15.89 কোটি লোককে প্রথমবার এবং 67.43 লোককে দ্বিতীয়বার টিকা দেওয়া হয়।

বর্তমানে এদেশে 52.7 কোটি লোকের জন্যে 393টি ম্যালেরিয়া দূরীকরণ কেন্দ্র কাজ করছে। বাকী 1.5 কোটি লোক এমন সব অঞ্চলে বাস করে, যা সম্পূর্ণরূপে ম্যালেরিয়ামুক্ত।

আলোচ্য বছরে জাতীয় ফাইলেরিয়া নিয়ন্ত্রণ-পরিকল্পনার জন্যে একটি কেন্দ্রীয় সমীক্ষক দল গঠিত হয়েছে। মধ্যপ্রদেশের পান্না ও কাটনিতে দুটি নতুন ফাইলেরিয়া নিয়ন্ত্রণ-কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। বর্তমানে সারা দেশে 69টি ফাইলেরিয়া নিয়ন্ত্রণ-কেন্দ্র আছে।

বর্তমানে এদেশে 52টি যক্ষ্মারোগ নিরাময়-কেন্দ্র কাজ করছে। বিভিন্ন স্বাস্থ্যবাস, হাসপাতাল ও যক্ষ্মারোগ চিকিৎসা-কেন্দ্রে প্রায় 35,000টি শয্যা যক্ষ্মারোগীদের জন্যে রয়েছে।

আলোচ্য বর্ষে পনেরোটি বি. সি. জি. দল সংযোজিত হওয়ায় সারা দেশে বি. সি. জি. দলের মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 247। 1949 সালে পোলিও প্রতিরোধ অভিযান সুরু হবার পর থেকে 1970 সালের ডিসেম্বর 13.76 কোটি লোককে বি. সি জি. টিকা দেওয়া হয়েছে।

যে চারটি রাজ্য এবং আটটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল কলেরা রোগ মুক্ত, সেগুলি হচ্ছে হরিয়ানা, জম্মু ও কাশ্মীর, নাগাভূমি, রাজস্থান, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, চণ্ডীগড়, গোয়া, দমন ও দেউ, হিমাচল প্রদেশ, লাক্ষাদ্বীপ ও মিনিকয় দ্বীপপুঞ্জ, মণিপুর, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চল এবং

ত্রিপুরা। 1970-71 সাল থেকে কেন্দ্রীয় উদ্যোগে ও সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় আর্থিক সাহায্যে অন্ধ্র প্রদেশ, বিহার, মহারাষ্ট্র, মহীশূর, উড়িষ্যা, তামিলনাড়ু এবং পশ্চিমবঙ্গ এই সাতটি প্রধান কলেরা-আক্রান্ত রাজ্যে কলেরা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা কার্যকর করা হয়েছে।

জাতীয় কুষ্ঠরোগ নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার কাজ এদেশে 16 বছর পূর্ণ হয়েছে এবং 17 লক্ষ লোককে 1970-71 সালে এই পরিকল্পনায় চিকিৎসা করা হয়েছে। মহীশূরে দুটি এবং উত্তর প্রদেশে তিনটি—মোট পাঁচটি নতুন কুষ্ঠরোগ নিয়ন্ত্রণ-কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে এবং তার ফলে মোট কেন্দ্রের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 196টি।

চিঠিপত্রের বিভাগ ঃ একটি বিজ্ঞপ্তি

আধুনিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়, মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষা, বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ প্রভৃতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনার উদ্দেশ্যে এই পত্রিকায় একটি 'চিঠিপত্রের বিভাগ' খুলিবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। উক্ত বিভাগে প্রকাশের জন্য পাঠকবর্গের নিকট হইতে চিঠি আহ্বান করা হইতেছে। প্রতিটি চিঠির একটি উপযোগী শিরোনাম দেওয়া প্রয়োজন এবং চিঠির আয়তন মোটামুটিভাবে 400 শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা বাঞ্ছনীয়। চিঠির প্রকাশ এবং আবশ্যকবোধে উহার অল্পবিস্তর পরিবর্তন সম্বন্ধে পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর অভিমতই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

চিঠিপত্র পাঠাইবার ঠিকানা—প্রধান সম্পাদক, 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান', পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-6।

প্রধান সম্পাদক —শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেস 37/7বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

রজত জয়ন্তী বর্ষ | জুন, 1972 | ষষ্ঠ সংখ্যা

বিজ্ঞান ও প্রতিরক্ষা

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সঙ্গে প্রতিরক্ষার সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। আদিম যুগ থেকে মানুষ তার সহজাত বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিকেই প্রথমে আত্মরক্ষার কাজে নিয়োজিত করেছে। তাই তীরধনুক, ব্যুমেরাং থেকে আরম্ভ করে আধুনিকতম অস্ত্রশস্ত্র পর্যন্ত প্রতিরক্ষা-বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ সম্ভব হয়েছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে আধুনিক-বিজ্ঞানের যে দুটি বিস্ময়কর বিষয় বিংশ শতাব্দীতে সাড়া তুলেছে, তা হলো নিউক্লীয় বিজ্ঞান ও মহাকাশ-বিজ্ঞান। প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে আধুনিকতম অস্ত্র ফিসন ও ফিউসন বোমা এবং ক্ষেপণাস্ত্র মিসাইল প্রভৃতি এই দুটি বিজ্ঞান-গবেষণার ফল। বস্তুতঃ সামরিক তাগিদেই গত মহাযুদ্ধে ফিসন বোমার আবিষ্কার হয়। তাছাড়া রকেট সম্পর্কিত গবেষণা সেই সময় থেকেই আরম্ভ হয়েছিল। এখন সেই গবেষণার ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র ICBM (Inter-Continental Ballistic missile)। ফিসন বোমার সাহায্য নিয়ে আরো শক্তিশালী ফিউসন বোমা তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। বিজ্ঞানের আরো নতুন নতুন আবিষ্কার, যেমন—সেমিকণ্ডাক্টর, লেসার প্রভৃতি পরোক্ষভাবে প্রতিরক্ষার কাজে এক নতুন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছে।

রকেট গবেষণার ফল ক্ষেপণাস্ত্র যেমন প্রতিরক্ষার সমরসম্ভার হয়ে পড়েছে, তেমনি কৃত্রিম উপগ্রহ ও মহাকাশ পরিক্রমা এর শান্তিপূর্ণ দিক।

ফিসন থেকে বোমা ছাড়াও বিদ্যুৎশক্তি পাওয়া যাচ্ছে—যাকে শান্তিপূর্ণ ব্যবহার বলে অভিহিত করা যায়। হাইড্রোজেন ও হাল্কা নিউক্লিয়াস দিয়ে ফিউসন বা সংযোজন প্রক্রিয়ায় যে অমিত শক্তি পাওয়া যায়, ফিউসন বোমা ছাড়া তার কোন শান্তিপূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হয় নি। চেষ্টা চলেছে উপযুক্ত প্লাজ্‌মা তৈরি করে ফিউসনের শান্তিপূর্ণ ব্যবহার যাতে সম্ভব হয়।

আমাদের আলোচ্য বিষয় প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে আধুনিক বিজ্ঞানের ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে। বিশেষতঃ ভারত সরকারীভাবে পরমাণু-শক্তির যখন কেবলমাত্র শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের জন্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ—তাছাড়া সরকারী ও বেসরকারী-সূত্রে 'ভারত পরমাণু-বিজ্ঞানে প্রথম সারিতে' এই কথাও বার বার বলা হচ্ছে, তখন্ এদেশে প্রতি-রক্ষার ক্ষেত্রে আধুনিক বিজ্ঞানের মূল্যায়ন করবার প্রয়োজনীয়তা নতুন করে দেখা দিয়েছে। যে দুটি বড় প্রশ্ন আমাদের কাছে উপস্থিত, তা হলো ফিসন ও ফিউসন বোমা আমাদের তৈরি করা উচিত কিনা? যদি উচিত হয়—তবে আমাদের পক্ষে তা করা সম্ভব কিনা? প্রথম প্রশ্নটি বহুলাংশে রাজনৈতিক। কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে এটা সুস্পষ্ট যে, পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনে যাঁরা ভূমিকা নেবেন, তাঁদের দুর্বল হলে চলবে না। পরমাণুশক্তি সমন্বিত প্রতিরক্ষার ব্যবস্থায় বলীয়ান বলেই আমেরিকা, রাশিয়া, গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স বিশ্ব শান্তির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। এমন কি, চীন বিশ্বের বৃহত্তম দেশ হয়েও সে গোষ্ঠীতে অপাংক্তেয় ছিল; আধুনিক সমরসম্ভারে বলীয়ান হয়ে সেও বিশ্বের দরবারে নিজের ঠাঁই করে নিয়েছে। এসব দেশই নিজেদের শান্তিকামী বলে প্রচার করে। তবু পরস্পরের মধ্যে পরমাণু বোমার পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কে এদের মধ্যে কখনও ঐক্যমত হয় নি। তার কারণ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অবিশ্বাস আধুনিক যুগে একটি বড় অভিশাপ। ভারত শান্তিকামী বলেই নির্বিরোধ থাকতে পারে না। গত বাংলা দেশের যুদ্ধেই দেখা গেছে যে, ভারতকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে এবং গত এক দশকে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা অনেক আধুনিকতর হয়েছিল বলেই সে যুদ্ধ আমরা জয়লাভ করতে পেরেছি।" আধুনিক বিজ্ঞানের বহু কিছু উপ-করণই আমাদের প্রতিরক্ষায় ব্যবহৃত হচ্ছে। এই আধুনিকীকরণের ফলেই যে আমরা বাংলা-দেশের ক্ষেত্রে শান্তি স্থাপনে সক্ষম হয়েছি, একথা অস্বীকার করা যায় না। নৈতিক দিক দিয়ে তাই পরমাণুশক্তিকে প্রতিরক্ষার কাজে লাগানো বোধ-হয় অনুচিত বলা যায় না। তবে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এই যুক্তি যাচাই হওয়া প্রয়োজন। চীনের মত উন্নতিকামী দেশ নিশ্চয়ই বহু ত্যাগ স্বীকার করে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় আধুনিক সমরসম্ভার যুক্ত করেছে, সে সম্পর্কে সন্দেহ নেই। পরমাণু বোমা ও মিসাইল নির্মাণে চীনের অগ্রগতি এশিয়া মহাদেশের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে।

পরমাণু বোমা, মিসাইল ইত্যাদি আধুনিক সমরসম্ভার নির্মাণ ভারতের যদি অবশ্য কর্তব্য হয়, তবে তা নির্মাণের ক্ষমতা তার রয়েছে কিনা, তা পরীক্ষা করা প্রয়োজন। প্রথমতঃ আসে নিউক্লীয় জ্বালানীর (Nuclear fuel) প্রসঙ্গ। ইউরেনিয়াম-235 অথবা প্লুটোনিয়াম এই দুটির প্রচুর সরবরাহ না থাকলে ফিসন বা ফিউসন বোমা তৈরি করা যায় না। ফিউসন বোমার প্রত্যক্ষ জ্বালানী অবশ্য হাইড্রোজেনের আইসোটোপের নিউক্লিয়াস বা অন্য কোন হাল্কা নিউক্লিয়াস—কিন্তু ফিউসন ক্রিয়া পেতে হলে ফিসন বোমাজনিত তাপের প্রয়োজন। চীনের সুবিধা হলো তার প্রচুর স্বাভাবিক ইউরেনিয়াম খনিজ আছে। আর ইউ-235 পৃথকীকরণের জন্যে তাদের দুটি বিশাল ডিফিউসন প্ল্যান্ট (Geseous diffusion plant) রয়েছে। আমাদের

অবশ্য প্লুটোনিয়ামের উপর নির্ভরশীল হতে হবে। চালু রিঅ্যাক্টরগুলি থেকে প্লুটোনিয়াম পৃথক করা যায়—কিন্তু আমাদের বর্তমান রিঅ্যাক্টরগুলি বৈদেশিক সহায়তায় তৈরি হয়েছে। বোমা তৈরির কাজে তাই এই সব রিঅ্যাক্টর থেকে প্লুটোনিয়াম সংগ্রহ করবার বাধা আছে। কালক্রমে নতুন রিঅ্যাক্টরটি বিনা বৈদেশিক সহায়তায় চালু করবার পরিকল্পনা রয়েছে। তা সম্ভব হলে তবেই ফিসন বোমার জ্বালানী সংগ্রহ করা সম্ভব হবে। জ্বালানী পাওয়া গেলেও তা প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে ফিসন বোমায় লাগানো আমাদের দেশে সম্ভব কিনা, তা দেখতে হবে। আধুনিক মৌলিক বিজ্ঞান-গবেষণায় ভারতের যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। কিন্তু আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যায় আমরা কত দূর এগিয়ে আছি, সে প্রশ্ন বিতর্কিত। আজ পর্যন্ত আমাদের রিঅ্যাক্টর প্রযুক্তিবিদ্যায় কিছু অভিজ্ঞতা আছে মাত্র—কিন্তু কোন বড় যন্ত্র নির্মাণে আমাদের অভিজ্ঞতা সীমিত। যেমন ধরুন, কোন বড় ত্বরণযন্ত্র (Accelerator) আমাদের দেশে পুরাপুরি এখনও তৈরি করা যায় নি। কলকাতার VEC বা ভেরিয়েবল এনার্জি সাইক্লোট্রনটি সম্পূর্ণ দেশী প্রচেষ্টায় চালু হলে আমরা বলতে পারবো যে, একটি বড় আধুনিক যন্ত্র আমরা তৈরি করতে পেরেছি। আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি মৌলিক বিজ্ঞানের সমানুপাতিক অগ্রগতি ছাড়াও সম্ভব। চীনই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। 1966 খৃঃ থেকে চীনে যে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূচনা হয়েছে, তার সাফল্য একটি বিতর্কিত বিষয়। 1968 খৃঃ জুলাইতে ওয়েন হুই পাও পত্রিকার মন্তব্য হলো—'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বর্তমান পরিস্থিতি সন্তোষজনক নয়'। সে যাহোক, সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি না হলেও প্রাক্-বিপ্লব যুগে 1964 খৃঃ 16ই অক্টোবর চীন ফিসন বোমার প্রথম পরীক্ষা করেছিল। তারপর 1966 খৃঃ ডিসেম্বরে লিথিয়াম-6 জ্বালানী দিয়ে ফিউশন বোমা পরীক্ষার ব্যবধান সময়ে 20 থেকে 500 কিলোটন পর্যন্ত প্রায় আরো তিনটি ফিসন বোমা তারা পরীক্ষা করেছে। 1971 খৃষ্টাব্দের 18ই নভেম্বরের ফিসন বোমার শেষ পরীক্ষা ধরলে চীন মোট বারোটি বোমা পরীক্ষা করতে পেরেছে। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ফলে সাধারণ বিজ্ঞান-গবেষণায় হয়তো কিছু বাধা এলেও প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে চীনের এই অগ্রগতি থেমে থাকে নি। তাছাড়া চীনের হাতে যে আরও প্রায় 100টি ফিসন বোমার জ্বালানী জমা আছে, তা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে।

তাছাড়া আর একটি বিষয়ও লক্ষ্য করবার মত। চীনের ফিসন ও ফিউশন বোমা পরীক্ষার ব্যবধানকাল অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম, তা নীচের সারণী থেকে বোঝা যাবে—

দেশ	ফিসন বোমা পরীক্ষার সময়	ফিউসন বোমা পরীক্ষার সময়	ব্যবধান কাল বছর
আমেরিকা	জুলাই 16, 1945	নভেঃ 1, 1952	9·5
রাশিয়া	অগাস্ট 29, 1949	অগাস্ট 12, 1953	8·4
গ্রেট বৃটেন	অক্টোঃ 3, 1952	মে 15, 1957	4·5
ফ্রান্স	ফেব্রুঃ 13, 1960	অগাস্ট 24, 1968	8·5
চীন	অক্টোঃ 16, 1964	জুন 17, 1967	2·5

অবশ্য 1945-52 খৃঃ নিউক্লীয় প্রযুক্তিবিদ্যার প্রাথমিক স্তর। সে ক্ষেত্রে আমেরিকার পক্ষে এই ব্যবধানকাল হয়তো যুক্তিসঙ্গত, কিন্তু চীনের মত উন্নতিশীল দেশের পক্ষে এই সামান্য ব্যবধান

সময়ে উপরিউক্ত অগ্রগতি বিস্ময়কর সন্দেহ নেই।

ভারতের মৌলিক বিজ্ঞান-গবেষণার ক্ষেত্রটি বিস্তৃত, কিন্তু আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যায় তার অগ্রগামিতা প্রমাণিত হয় নি। তাছাড়া প্রতিরক্ষায় সেই প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ আরও প্রয়াসসাপেক্ষ। সেই প্রয়াসযুক্ত না হলে দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন সম্ভব হবে না। প্রতিরক্ষায় নিউক্লীয় প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগের ফলে শুধু সমরসম্ভারই পাওয়া যাবে—তা নয়, আত্মবিশ্বাসী সফল একদল প্রয়োগকুশলী পাওয়া যাবে—যাঁরা ভবিষ্যৎ ভারত গড়ে তোলবার শ্রেষ্ঠ সৈনিক হবেন ও আরো কুশলী মানুষ গড়ে তুলতে সাহায্য করবেন।

শুধু ফিসন বা ফিউসন বোমা হলেই চলে না, তা বহন করবার উপযুক্ত ক্ষেপণাস্ত্রও আধুনিক প্রতিরক্ষার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। দূরপাল্লার ICBM (Inter-Continental Ballistic Missile) ক্ষেপণাস্ত্র এখন রাশিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি উপরিউক্ত সব দেশেরই রয়েছে। চীনও আগামী কয়েক বছরে তা তৈরি করে ফেলবে—এ হলো বিশেষজ্ঞদের অভিমত। অবশ্য নিকট ও মাঝারি পাল্লার বেশ কিছু ক্ষেপণাস্ত্র চীনের এখনই আছে।

ভারত মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে এখনও প্রাথমিক স্তরে আছে। সংবাদ আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে কৃত্রিম উপগ্রহ কার্যকরী বলেই প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে তার প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট। তাই মহাকাশ প্রকল্পটি প্রতিরক্ষা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত করে কৃত্রিম উপগ্রহ, ক্ষেপণাস্ত্র প্রভৃতি নির্মাণের জন্যে ভারতের অগ্রণী হওয়া প্রয়োজন। প্রতিরক্ষার অঙ্গীভূত হলেও এই সব অগ্রগতির ফলাফল শান্তিপূর্ণ কাজে ব্যবহারের কোন বাধা থাকবে না। মূলতঃ কোন দেশের সামরিক বিজ্ঞানকে অনুন্নত রাখা বিপজ্জনক বিবেচিত হয়। বিশেষতঃ নিউক্লীয় প্রযুক্তিবিদ্যা ও মহাকাশ-গবেষণার প্রতিরক্ষাসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি প্রতিরক্ষা বিভাগের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন, তাতে প্রকল্পগুলি যথাযথ সময়ে সম্পন্ন হবার সম্ভাবনা বাড়বে।

ভারত একটি মহান দেশ। জনবলে, আদর্শে ভারত প্রথম শ্রেণীর যে কোন উন্নত রাষ্ট্রের সমকক্ষ হবার যোগ্যতা রাখে। আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগে সেই যোগ্যতা প্রমাণ করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

সূর্যেন্দুবিকাশ কর

সবুজ বিপ্লবে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের ভূমিকা

মনোজকুমার সাধু*

খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার পথে ভারত দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হচ্ছে। প্রজননবিদ্যা ও রাসায়নিক প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির ফলে উচ্চ ফলনশীল নব নব প্রজাতির ফসল সৃষ্টি হয়েছে। রোগ ও কীট-পতঙ্গ প্রতিরোধকারী রাসায়নিক পদার্থ এবং রাসায়নিক সারের যথাযথ ব্যবহারের ফলে ধান ও গমসহ অন্যান্য সব ফসলেরই ফলন যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। অবশ্য এই অত্যাশ্চর্য সাফল্যের মূলে রয়েছে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের উল্লেখযোগ্য অবদান। বিগত দু-দশকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তেজস্ক্রিয় পদার্থ নিয়ে মানব-কল্যাণ সাধনে ব্যাপক গবেষণা হচ্ছে এবং ইতিমধ্যেই কৃষি-গবেষণায় এটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে।

সার প্রয়োগের পরিমাণ ও প্রণালী নির্ণয়ে তেজস্ক্রিয় পদার্থের ভূমিকা

সম্প্রতি উচ্চ ফলনশীল শস্যের জন্যে সারের ব্যবহার যথেষ্ট বৃদ্ধি পেলেও আমরা এখনও সঠিকভাবে জানি না, কোন্ সার কোন্ জমিতে কখন ও কিভাবে প্রয়োগ করলে সর্বাপেক্ষা কার্যকর হবে। কেবলমাত্র তেজস্ক্রিয় পদার্থ নিয়ে বিভিন্ন গবেষণাই উপরিউক্ত প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর দানে সক্ষম। এই সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই কিছু কিছু তথ্য সংগৃহীত হয়েছে; যেমন—চিহ্নিত সুপার ফস্ফেট (P_{32}) নিয়ে ভারতীয় কৃষি গবেষণা সংস্থার গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে জানা গেছে যে, নীচু জমিতে উৎপন্ন ধানে ফস্ফরাসঘটিত সার ছিটিয়ে দিয়ে মাটির 2cm-এর মধ্যে মিশ্রিত করলে সবচেয়ে ভাল ফল পাওয়া যায়। পূর্ব প্রচলিত ধারণানুযায়ী মাটির গভীরে ফস্ফরাস-ঘটিত সার প্রয়োগ করলে বিশেষ কার্যকরী হয় না। আরও জানা গেছে যে, বারংবার প্রয়োগ করবার চেয়ে ধান রোপণের সময় সবটুকু ফস্ফেট একই সঙ্গে প্রয়োগ করলে ধানের বৃদ্ধির জন্যে সর্বাপেক্ষা ফলদায়ক হয়। আরও দেখা গেছে যে, বীজতলায় ফস্ফেটের প্রয়োগ গাছের পরবর্তী বৃদ্ধির জন্যে মোটেই প্রয়োজনীয় নয়।

নাইট্রোজেনঘটিত সারের ক্ষেত্রে স্থায়ী N_{15} আইসোটোপ নিয়ে গবেষণা করে যে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তাতে দেখা যায় যে, অ্যামোনিয়াম সালফেট ও ইউরিয়া—এই উভয় সারই ধানের ফলন বৃদ্ধিতে প্রায় সমানভাবে কার্যকরী এবং ঐ দুটি সার মৃত্তিকার 5cm গভীরে প্রয়োগ করলে সবচেয়ে ভাল ফল পাওয়া যায়। অ্যামোনিয়াম সালফেট ও ইউরিয়ার তুলনায় অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটের কার্যকারিতা শতকরা প্রায় 20 ভাগ কম এবং নীচু জমিতে এই সার প্রয়োগ করা মোটেই উচিত নয়। শিষ বের হবার দু-সপ্তাহ পূর্বে চাপান সার হিসাবে জমিতে ছড়িয়ে দেওয়া উচিত।

ইদানীং নাইট্রোজেন ও ফস্ফরাসের জটিল রাসায়নিক সার, যেমন—নাইট্রোফস্ফেট ও অ্যামোনিয়াম ফস্ফেট নানাকারণে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করছে। N_{15} ও P_{32} দিয়ে চিহ্নিত নাইট্রোফস্ফেট এবং অ্যামোনিয়াম ফস্ফেট নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, তুলনামূলকভাবে শেষোক্ত সারটি অধিকতর ফলদায়ক।

*কৃষি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

আবার সার প্রয়োগ ও জলসেচন থেকে সন্তোষজনক ফল পেতে হলে শস্যের মূলের বিস্তার ও বিন্যাস সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন। সম্প্রতি ট্রেসার টেকনিকের (Tracer technique) সহায়তায় দেখা গেছে যে, কল্যাণ সোনার মূল গমের অন্যান্য জাতের তুলনায় মৃত্তিকার অনেক বেশী গভীরে প্রসারিত হয়। শতকরা 35 ভাগ মূল মৃত্তিকার 15cm নীচে থাকতে দেখা গেছে। ধানের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে যে, দীর্ঘকায় জাতের গাছ, যেমন—NP-130-এর তুলনায় খর্বকায় জাতের গাছ, যেমন—IR-8, সবরমতি, জ্যামাইকা ইত্যাদির মূল গভীর মৃত্তিকায় বিস্তৃত। এরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা-লব্ধ নূতন নূতন তথ্যের ভিত্তিতে সার প্রয়োগের সার্থকতার পূর্ণ মূল্যায়ন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

উদ্ভিদরোগ প্রতিরোধে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের ব্যবহার

বর্তমানে রোগ দমনে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ সাফল্যজনকভাবে কোন কোন উদ্ভিদে ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, তেজস্ক্রিয় বিকিরণের ফলে যেন উদ্ভিদের কোন ক্ষয়-ক্ষতি না হয়, খাদ্যগুণের কোন তারতম্য না ঘটে এবং মানুষের ব্যবহারের পক্ষে তা যেন সম্পূর্ণ নিরাপদ হয়।

ভাইরাস রোগ উদ্ভিদের শত্রুদের মধ্যে অন্যতম। রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে এই রোগের নিরাময় এখনও সম্ভব হয় নি। গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, গামারশ্মি টোবাকো মোজেইক ও সানহেম্প মোজেইক (Sunhemp mosaic) ভাইরাসকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় করে দেয়। অন্য দিকে অতিবেগুনী রশ্মি bottle gourd mosaic, radish mosaic, soyabean mosaic ইত্যাদি ভাইরাসকে ধ্বংস করে। আবার কেউ কেউ এক্স-রশ্মি এবং তেজস্ক্রিয় ফস্ফরাস ও সালফারের সহায়তায় ভাইরাস প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়েছেন। এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত গবেষণার প্রয়োজন। আর যেহেতু এই সব তেজস্ক্রিয় রশ্মি ব্যবহারের ফলে উদ্ভিদের মধ্যে পরিব্যক্তির (Mutation) যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে, সেহেতু এদের ব্যবহারে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

ভাইরাস ছাড়া ব্যাক্টিরিয়া ও ছত্রাক দমনের জন্যেও তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ব্যবহৃত হচ্ছে। Agrobacterium tumefaciens নামক ব্যাক্টিরিয়ার দ্বারা আক্রান্ত টোম্যাটো গাছের কাণ্ডে অস্বাভাবিক দানাদার স্ফীতি দেখা যায়। গামা রশ্মির (30 Krad) সহায়তায় উক্ত রোগের প্রতিবিধান করা যায়, উদ্ভিদেরও কোন ক্ষয়-ক্ষতি হয় না।

আলুর একটি বিশেষ রোগ হলো Late blight বা নাবি ধসারোগ। সংরক্ষণের সময় আলু 15 দিন 70-75° F তাপমাত্রায় রেখে 45 Krad পরিমাণ বিকিরণ প্রয়োগ করলে এই রোগের কারণ Phytophthora infestens নামক ছত্রাককে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা যায়।

তাছাড়া মৃত্তিকাস্থিত বিভিন্ন ধরণের রোগ বীজাণুর বিনাশও তেজস্ক্রিয় বিকিরণের সহায়তায় সম্ভব। বর্তমানে কোন কোন দেশে মৃত্তিকা নির্বীজণে তেজস্ক্রিয় কোবাল্টের বিকিরণ ব্যবহার করা হচ্ছে।

ফসল তোলবার সময় থেকে সুরু করে বিক্রয় পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ে বিভিন্ন ছত্রাক ফল ও শাকসব্জির সমূহ ক্ষতি সাধন করে। এমন কি, কম তাপমাত্রায় রক্ষিত ফসলও ছত্রাকের দ্বারা আক্রান্ত হয়। বর্তমানে ফল ও শাকসব্জি সংরক্ষণে তেজস্ক্রিয় পদার্থ ব্যবসায়িক ভিত্তিতে কোন কোন দেশে ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে যেহেতু অধিকাংশ ছত্রাক ও ব্যাক্টিরিয়ার তেজস্ক্রিয় বিকিরণ প্রতিরোধের স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে, সেহেতু এদের ধ্বংস করতে হলে অত্যধিক

মাত্রায় বিকিরণ প্রয়োগ করতে হয়। সে জন্যে অনেক সময় ফলের উৎকর্ষের অবনতি ঘটে, যেমন—ফলের স্বাভাবিক কাঠিন্য নষ্ট হয়ে যায় এবং স্বাদ ও গন্ধের অবনতি ঘটে। কাজেই স্বাদ ও গন্ধ অপরিবর্তিত রেখে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ কি ভাবে কাজে লাগানো যায়, সে বিষয়ে গবেষণা হচ্ছে। কম তাপমাত্রা বা ছত্রাক-বিনাশী রাসায়নিক পদার্থ ও তেজস্ক্রিয় বিকিরণ যুগ্মভাবে ব্যবহার করে ইতিমধ্যেই বিশেষ সন্তোষজনক ফল পাওয়া গেছে। গামা রশ্মির দ্বারা কমলা-লেবু, ন্যাসপাতি, পীচ, স্ট্রবেরি ও বিভিন্ন ধরণের সব্জির সংরক্ষণকাল বেশ কিছু দিন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে (1নং তালিকা দ্রষ্টব্য)।

1নং তালিকা। তেজস্ক্রিয় বিকিরণের সাহায্যে ফলের সংরক্ষণকাল বৃদ্ধি

ফলের নাম	ছত্রাকের নাম	বিকিরণ মাত্রা	সংরক্ষণকালে তাপমাত্রা	সংরক্ষণকাল বৃদ্ধি
কাগজীলেবু	Pen icillium digitatum	1,50,000—2,00,000 rep	75° F	12 দিন
কাগজীলেবু	Penicillium italicum	1,500,000 rep	55° F	17 দিন
			75° F	15 দিন
কমলালেবু	P. italicum	2,00,000 rep	55° F	17 দিন
			75° F	20 দিন
পীচ	Rhizopus nigracans	2,50,000 rep	80°-85° F	10 দিন
পীচ	Monilia fructicola	2,00,000 rep	80°-85° F	10 দিন

কীট-পতঙ্গ দমনে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের ভূমিকা

কীট-পতঙ্গের আক্রমণে প্রতি বছরই ফসলের উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে ব্যাহত হয়। এদের দমনে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহৃত হলেও অধিকতর কার্যকরী প্রতিরোধের জন্যে বিশদ গবেষণার প্রয়োজন এবং এই বিষয়ে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। নিম্নলিখিত বিষয়ে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা বাঞ্ছনীয়।

1. কীট-পতঙ্গ ধ্বংসকারী রাসায়নিক পদার্থের ক্রিয়াপদ্ধতি।

2 ঐ সকল রাসায়নিক পদার্থের বিরুদ্ধে কীট-পতঙ্গের স্বাভাবিক সহনক্ষমতা ও প্রতিরোধ।

3. উদ্ভিদের মধ্যে কীটঘ্ন পদার্থের পরিণতি।

4. তেজস্ক্রিয় পদার্থের সাহায্যে কীট-পতঙ্গের সরাসরি দমন।

শেষোক্ত বিষয়ে ইতিমধ্যেই কিছু কিছু সাফল্য লাভ হয়েছে। যেমন—আমেরিকায় গবাদি পশুর একটি বিশেষ শত্রু কীটের (Screw worm) সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সম্ভব হয়েছে, পুরুষ কীটগুলিকে কৃত্রিম উপায়ে নির্বীজিত করে। বলা বাহুল্য, তেজস্ক্রিয় বিকিরণের সহায়তায় পুরুষ কীটদের নির্বীজিত করা হয়েছিল। অনুরূপ উপায়ে অন্যান্য কীট-পতঙ্গ ধ্বংসের চেষ্টা চলেছে। শুধু এদের উচ্ছেদই নয়, প্রয়োজনীয় কীট-পতঙ্গ, যেমন—মৌমাছি, লাক্ষাকীট ও রেশমকীটের উন্নত প্রজাতি উদ্ভাবনের ক্ষেত্রেও তেজস্ক্রিয় বিকিরণের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে।

ফসল সংরক্ষণে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের ভূমিকা

কন্দজাতীয় ফসল, যেমন—আলু, পিঁয়াজ ইত্যাদির অন্যতম সমস্যা হলো—সুদীর্ঘকাল

এগুলিকে সংরক্ষিত রাখা যায় না। দীর্ঘ সংরক্ষণ-কালে এগুলি অঙ্কুরিত হয় এবং অনেক সময় পচেও যায়। রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে আলু, পিঁয়াজের অঙ্কুরোদ্গম সম্পূর্ণ ফলপ্রসূ হয় নি। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, তেজস্ক্রিয় বিকিরণ অঙ্কুরোদ্গম করতে সক্ষম। আশা করা যায়—ভবিষ্যতে প্রক্রিয়াটি আলু ও পিঁয়াজের সংরক্ষণকাল দীর্ঘায়িত করতে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ব্যবহৃত হবে।

বিদেশের বাজারে আম ও কলার বেশ চাহিদা রয়েছে। কিন্তু এই ফল দুটির সংরক্ষণ-কাল বৃদ্ধির উপায় এখনও আমাদের জানা নেই। তেজস্ক্রিয় বিকিরণের সহায়তায় ফলের পরিপক্বতায় কিছু বিলম্ব ঘটানো যেতে পারে। তবে এই বিষয়ে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন।

গুদামজাত থাকাকালীন শতকরা প্রায় 10-30 ভাগ শস্য কীট-পতঙ্গের আক্রমণে নষ্ট হয়। যথেষ্ট সতর্কতা ব্যতীত রাসায়নিক কীটঘ্ন পদার্থ সংরক্ষণ-কালে ব্যবহার করা যায় না। আবার কীট-পতঙ্গের ডিমের উপর রাসায়নিক কীটঘ্ন পদার্থ বিশেষ কার্যকরীও নয়। তাই তেজস্ক্রিয় বিকিরণের সাহায্যে গুদামজাত শস্য ধ্বংসকারী কীট-পতঙ্গ দমনের চেষ্টা হচ্ছে।

খাদ্যশস্যের গুণগত উৎকর্ষসাধনে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের ভূমিকা

আমাদের পুষ্টি ও শরীর রক্ষায় প্রোটিন অপরিহার্য। ভারতের বিপুল জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ নিরামিশাষী এবং তণ্ডুলজাতীয় খাদ্য তাদের প্রধান খাদ্য। ধান, গম, ভুট্টায় অতি সামান্যই প্রোটিন আছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই ঐ প্রোটিন নিকৃষ্ট শ্রেণীর। কারণ ঐ প্রোটিনে প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিড অতি অল্প পরিমাণে আছে বা অনেক ক্ষেত্রে একেবারেই নেই। প্রোটিনের উৎকর্ষ ও গুণাগুণ নির্ভর করে তার উপাদান বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিডের প্রকৃতি ও পরিমাণের উপর। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের জন্যে নিম্নোক্ত অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি একান্তই প্রয়োজনীয়; যথা—লাইসিন, ট্রিপটোফ্যান, ফিনাইল অ্যালানিন, মিথিওনিন, লিউসিন, আইসোলিউসিন, থ্রিয়োনিন ও ভ্যালিন। বর্তমানে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর অধিক প্রোটিনসমৃদ্ধ ফসল আবিষ্কারের চেষ্টা চলেছে। ইতিমধ্যে ভারতীয় কৃষি গবেষণা সংস্থায় গামা রশ্মি ও অতিবেগুনী রশ্মি যুগ্মভাবে ব্যবহার করে একটি নূতন পরিব্যক্ত (Mutant) গম আবিষ্কৃত হয়েছে। এই নূতন ধরণের গমের নাম হলো সরবতী সোনোরা। এতে অন্যান্য প্রকার গমের তুলনায় অনেক বেশী প্রোটিন ও লাইসিন আছে। গামা রশ্মি প্রয়োগ করে অধিক লাইসিনসমৃদ্ধ এক প্রকার ভুট্টাও আবিষ্কৃত হয়েছে। তেমনি এক্স-রশ্মির সাহায্যে বার্লিতে পরিব্যক্তির ফলে যে নূতন ধরণের বার্লি পাওয়া গেছে, তাতে শতকরা 25 ভাগ বেশী প্রোটিন আছে। অনুরূপভাবে এক্স-রশ্মি, গামা রশ্মি ইত্যাদির বিকিরণের সাহায্যে নূতন নূতন পরিব্যক্তি সৃষ্টি করে ধান, গম, বার্লি, ভুট্টা, যব, জোয়ার ইত্যাদি শস্যের গুণগত উৎকর্ষ সাধনের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

খেসারি (Lathyrus sativus) আমাদের দেশে প্রায় 50 লক্ষ একর জমিতে চাষ হয় এবং স্বল্প মূল্যের জন্যে ডাল হিসাবে অনেকে ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু এই ডালে একটি মারাত্মক বিষাক্ত পদার্থ আছে, যা ক্রমাগত শরীরে যাবার ফলে বহু সহস্র লোক চিরদিনের মত পঙ্গু হয়ে পড়ে। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে রোগটির নাম হলো ল্যাথিরিজম (Lathyrism)। স্নায়ু আক্রমণকারী বিষাক্ত পদার্থটির রাসায়নিক নাম হলো B(N) oxalyl, B-diamino-propionic acid (BOPA)। বর্তমানে ভারতীয় কৃষি গবেষণাগারে কৃত্রিম উপায়ে গামা রশ্মির সহায়তায়

নূতন পরিব্যক্তি সৃষ্টি করে বিষমুক্ত খেসারি ডাল উদ্ভাবনের চেষ্টা চলেছে।

আবার অধিকাংশ ডালজাতীয় শস্যে প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিড মেথিওনিনের (Methionine) স্বল্পতা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। কৃত্রিম উপায়ে পরিব্যক্তি সৃষ্টি করে অধিক মেথিওনিনযুক্ত প্রোটিনসমৃদ্ধ ডালের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়েছে এবং এই বিষয়ে বিভিন্ন গবেষণাগারে বিশদভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে। আবার সরিষার তেলে প্রয়োজনীয় ফ্যাটি অ্যাসিড, যেমন—লিনোলিক, লিনোলাইক ও আরকিডোনিক অ্যাসিডের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্যে তেজস্ক্রিয় রশ্মি ও রাসায়নিক পদার্থ নিয়ে গবেষণা হচ্ছে।

কৃষির কয়েকটি প্রধান সমস্যায় তেজস্ক্রিয় বিকিরণের ভূমিকা আলোচিত হলো। বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার গবেষণায় তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হলেও কৃষি গবেষণায় এর ব্যবহার সীমিত। কৃষি বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে শস্যের ফলন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন সমস্যাও উদ্ভূত হচ্ছে। আশা করা যায়, ঐ সকল সমস্যাবলীর দ্রুত সমাধানের হাতিয়ার হিসাবে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ভবিষ্যতে আরও ব্যাপক ও কার্যকরীভাবে ব্যবহৃত হবে।

ভারতে তুঘলক রাজত্বকালের স্থাপত্য ও নগর-বিন্যাস

অবনীকুমার দে*

1192 খৃষ্টাব্দে মোহাম্মদ ঘোরী রাজপুত বীর পৃথ্বীরাজকে পরাজিত করে দিল্লীতে মুসলমান রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করেন। পাঠান ও তুর্কী সুলতানেরা তিন-শ' বছরেরও বেশী দিল্লীতে রাজত্ব করেন। এঁদের মধ্যে 1320 থেকে 1413 খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় এক-শ' বছর ধরে তুঘলক রাজবংশ রাজত্ব করেন। এই রাজবংশের সুরু ও পরিসমাপ্তি দুঃখময়। তুঘলক বংশের এগারো জন সুলতানের মধ্যে মাত্র তিনজন বাস্তুকলার বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন; যথা—এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম গিয়াসুদ্দীন তুঘলক (1320 থেকে 1325 খৃষ্টাব্দ), তাঁর পুত্র মোহাম্মদ বিন তুঘলক 1325-1351 খৃঃ) ও ফিরোজ শাহ তুঘলক (1351—1388 খৃঃ)। এঁদের মধ্যে শেষোক্ত ফিরোজ শাহই প্রচুর ইমারত ও সৌধাদি নির্মাণ করেছিলেন।

সুলতানী আমল

দিল্লীর সুলতানদের সুবর্ণ যুগ হলো ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দী। সুলতানেরা পারস্যের সম্রাটদের অনুকরণে নিজেদের রাজপ্রাসাদ তৈরি করেন। হারেমে দাস, দাসী এবং রাজ্যে আমীর, ওমরাহ ইত্যাদি পোষণ করে বিলাস-ব্যসনে তাঁরা জীবনযাপন করতেন। ক্রীতদাস পালন করা তাঁদের একটা সখ ছিল। এই দাসদের খাসবান্দা বলা হতো। ফিরোজ শাহের খাস-বান্দার সংখ্যা নাকি ছিল দু-লক্ষ। সুলতানেরা বিভিন্ন নগরে নানা রকম নির্মাণকার্যে এসব ক্রীতদাসদের নিযুক্ত করতেন। এদের মধ্যে হাজার হাজার কারিগর, পাথর-খোদাই শিল্পী ও কারুশিল্পীরা এত দক্ষ ছিল যে, তারা নাকি পনেরো

* স্থাপত্য এবং নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ, বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, শিবপুর।

দিনের মধ্যেই বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ করতে পারতো। এরাই বড় বড় অট্টালিকা, প্রাসাদ, দুর্গ, মসজিদ, সমাধিসৌধ ইত্যাদি গড়ে তুলেছিল এবং এদের দ্বারাই সূক্ষ্ম ও উৎকৃষ্ট ধরণের কারুশিল্প বিকাশ লাভ করে। প্রথমে সুলতানেরা রাজধানীতে দুটি করে প্রাসাদ তৈরি করতেন—একটি নিজের বাসের জন্যে আর একটি রাজকীয় কাজকর্ম পরিচালনার জন্যে। এগুলির নাম ছিল শ্বেত প্রাসাদ ও দৌলতখানা। পরে তৃতীয় প্রাসাদও তৈরি হয়। এটিকে বলা হতো সবুজ প্রাসাদ। আমীর-ওমরাহ, অন্তরঙ্গ রাজসঙ্গী ও সাধারণ প্রজা—শুধু এই তিন শ্রেণীর লোকদের দর্শন দেবার জন্যে ফিরোজ শাহ্ তিন রকমের প্রাসাদ তৈরি করেছিলেন। তাছাড়া সুলতানেরা নতুন নতুন নগর স্থাপন করে সেখানে দুর্গ, পথঘাট, প্রাসাদ, উদ্যান, মসজিদ ইত্যাদি তৈরি করেন। উদ্যান রচনার দিকেও সুলতানদের খুব আকর্ষণ ছিল। সে জন্যে সুলতানী আমলে ফল ও ফুলের উদ্যান-চাষ খুব উন্নত হয়েছিল। ফিরোজ শাহ্ কেবলমাত্র দিল্লী ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বারো-শ' উদ্যান রচনা করেন। তাছাড়া পথ, ঘাট, বাজার ইত্যাদি তৈরি করে এবং খাল কেটে সেচের সুব্যবস্থা করে সুলতানেরা কৃষির অনেক উন্নতি সাধন করেছিলেন।

সুলতানী আমলে রাজ্যলাভের জন্যে অনেক গোপন চক্রান্ত ও হত্যাকাণ্ড হয়েছে। এর ফলে দিল্লীর সিংহাসনে ঘন ঘন সুলতান বদল হয়েছে। লোভ ও প্রতিহিংসা তাঁদের জীবনকে বিষময় করে তুলেছিল। এসবের মধ্যেও সুলতানেরা উচ্ছৃঙ্খল ও বিলাসী জীবনযাপন করতেন। কিন্তু তবুও তাঁরা সাহিত্য ও শিল্পকলার সমৃদ্ধি সাধন করে গেছেন। তবে দুঃখের বিষয়, জনসাধারণের দারিদ্র্য লাঘব ও দীন জীবনযাত্রার কোন রকম উন্নতির জন্যে তাঁরা কিছু করেন নি।

সুলতানী আমলে তাঁতশিল্প, ধাতুশিল্প, প্রস্তরশিল্প এবং কাগজ, নীল, চিনি প্রভৃতি দ্রব্যের উৎপাদন খুব বৃদ্ধি পায়। এই সব শিল্পদ্রব্য কারুশিল্পীদের কুটিরে উৎপন্ন হতো। কারিগরেরা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে এই সব দ্রব্য তৈরি করতেন এবং নগর, সহর ও রাজধানীর ব্যবসায়ীদের সেগুলি সরবরাহ করতেন। ব্যবসায়ীরা এই সব জিনিষ স্থানীয় বাজারে বিক্রয় করতেন বা অন্যত্র চালান দিতেন। সব কিছুই ছিল হস্তনির্মিত। যন্ত্রের প্রচলন ছিল না। দিল্লীর সুলতানেরা নিজেদের ব্যবহারের জিনিষপত্র তৈরি করবার জন্যে প্রথম রাজধানীতে কারুশিল্পীদের কারখানা স্থাপন করেন। এই সব কারখানায় যা কিছু উৎপাদন করা হতো, তার প্রায় সবই সুলতান ও তাঁদের আমীর-ওমরাহদের ভোগবিলাসের জিনিষ। জনসাধারণের ব্যবহারের সাধারণ কোন জিনিষ এখানে উৎপাদন করা হতো না। সুলতানদের কারখানায় হাজার হাজার শিল্পী কাজ করতো। তাঁদের রেশমের কারখানায় অনেক সময় চার হাজার পর্যন্ত তাঁতি কাজ করতো। রাজকর্মচারীরা এই সব কর্মীদের কাজের তত্ত্বাবধান করতেন। নানা রকমের পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের জন্যে অনেক কারখানা ছিল। এক-একটি কারখানায় কারুশিল্পীরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে একটি জিনিষ উৎপাদন করতেন। এই রকম উৎপাদন প্রথার ফলে উৎপাদনের পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং উৎপাদিত জিনিষও যথেষ্ট উৎকৃষ্ট মানের হতো।

সুলতানী আমলে কারুশিল্প ও স্থাপত্যকলা উল্লেখযোগ্য উন্নতি লাভ করেছিল। তারের কাজ, মিশ্র ধাতুর উপর সোনা ও রূপার তার বা পাত বসাবার কাজ, মিনা করবার কাজ, ধাতু খোদাইয়ের কাজ প্রভৃতি ছিল এই সময়ের বিখ্যাত কারুশিল্প। স্থাপত্যকলায় মিনাকরা চিত্রিত টালির কাজ, পাথরের মোজায়েকের কাজ, পাথরের জাফরি ও জালির কাজ প্রভৃতি

খুবই উন্নত মানের ছিল। স্থাপত্যে অলঙ্করণের প্রয়োগ ছিল এই আমলের একটি বিশেষত্ব। প্রাসাদ, অট্টালিকা, মসজিদ, সমাধিসৌধ ইত্যাদি লম্বা, টানা টানা আরবী ও পারসী অক্ষরের ছাঁদে পবিত্র কোরাণের বয়েত অলঙ্করণের জন্যে ব্যবহৃত হতো। মুসলমান যুগের স্থাপত্যের অলঙ্করণের জন্যে অক্ষরকলার প্রয়োগ ছিল একটি বৈশিষ্ট্য। ঐসলামিক স্থাপত্যের অন্য বৈশিষ্ট্য হলো মিনার বা মসজিদের বুরুজ, অর্ধবৃত্তাকার গম্বুজ ইত্যাদি। হিন্দুদের মন্দির স্থাপত্যের প্রভাবও তাদের মসজিদ, সমাধিসৌধ ইত্যাদিতে যথেষ্ট প্রতিফলিত হয়েছিল। এই স্থাপত্য রীতিকে 'ইন্দো-ইসলামিক' রীতি বলা হয়। তুঘলক রাজাদের স্থাপত্যের মধ্যে এই সব হিন্দু বিশেষত্বের নমুনা হলো সমদূরবর্তী স্তম্ভশ্রেণীর উপরকার ছাদের কিনারার পাথর, ব্র্যাকেট এবং খিলানের দুই পিল্লার মধ্যবর্তী ফাঁকের উপর স্থাপিত কড়ি। তাঁদের সময়কার স্থাপত্যের অন্যান্য বিশেষত্ব হলো এই যে, ইমারৎ ও প্রাচীরের দেয়াল ছিল অতিমাত্রায় সাদাসিধা, অসমতল ও বৃহদায়তনের। স্থাপত্যের বিশালাকৃতি খুব বেশী চোখে পড়ে। এই দেয়ালগুলি ছিল যথেষ্টভাবে হেলানো। সেগুলি দেখে প্রাচীন মিশরীয় পিরামিডের কথা মনে হয়। ইমারতের কাঠামোর গঠনরীতিও ছিল অতিমাত্রায় সাদাসিধা। স্থাপত্যের অঙ্গ হিসাবে সাধারণভাবে কেবলমাত্র বিশুদ্ধ খিলান ব্যবহার করা হতো। ইমারতের পুরাপুরি অখণ্ড অংশ হিসাবে গম্বুজ তৈরি করা হতো। এর পার্শ্বভাগে অবস্থিত থামগুলি দেখে মনে হয় যে, এথেকেই ভবিষ্যতের মিনারের উৎপত্তি হয়েছে। স্থাপত্যে অতিমাত্রায় কারুকার্য এক রকম ছিল না বললেই চলে। সুলতানী আমলের স্থাপত্য দেখে মনে হয়—যদিও সুলতানেরা তাঁদের রাজ্যের আভ্যন্তরীণ প্রশাসনে যথেষ্ট নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতা দেখিয়েছিলেন, তবুও তাঁরা তাঁদের শিল্প ও স্থাপত্যকলার মধ্যে আত্মপ্রকাশে যথার্থ আগ্রহী ছিলেন।

তুঘলকাবাদ

বৃদ্ধ ঘিয়াসুদ্দীন তুঘলক 1320 খৃষ্টাব্দে সিংহাসন লাভ করবার পর মাত্র পাঁচ বছর রাজত্ব করেছিলেন। রাজনীতি অপেক্ষা যুদ্ধাদি ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকাই তিনি বেশী পছন্দ করতেন। এই স্বল্প রাজত্বকালের মধ্যে তাঁর স্থাপত্যকলার উন্নতির প্রচেষ্টা দিল্লীর তৃতীয় সহর তুঘলকাবাদ নির্মাণের কাজে বিশেষ করে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। কুতবের প্রায় চার কিলোমিটার পূর্বে তুঘলকাবাদের বিশাল দুর্গ অবস্থিত। এর বেশীর ভাগই এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত। ভারতের মধ্যযুগে চতুর্দশ শতাব্দীর পরাক্রান্ত সুলতানদের স্থাপত্যের এক বিস্ময়কর ধ্বংসাবশেষ এটি। প্রবাদ ছিল যে, সিদ্ধপুরুষ নিজামুদ্দীন আউলিয়ার অভিশাপের ফলে তুঘলকাবাদ স্থাপনের পনেরো বছর পরেই এটি নির্জন সহরে পরিণত হয়।

প্রাচীন তুঘলকাবাদের বিস্তৃত জায়গাটি এখন ধ্বংসাস্তূপে পরিণত একটি নির্জন, নিষ্প্রাণ স্থান। এখানকার অসংখ্য ইমারতের বেশীর ভাগই এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত। খুব কম পর্যটকই এখন এগুলি দেখতে যান। অদ্ভুত স্থাপত্যশৈলীতে তৈরি বিশালাকার, হেলানো দেয়াল দেখে সেই সময়কার অত্যাচার, উৎপীড়ন, আক্রমণ ও যুদ্ধ জয়ের ইতিহাসই মনে পড়ে যায়। তদানীন্তন বিশৃঙ্খলা, সারা দেশব্যাপী অরাজকতা, মঙ্গোলদের বিরুদ্ধে দীর্ঘকালব্যাপী ভয়ঙ্কর যুদ্ধ ইত্যাদির কথাই যেন এরা বলে। এই প্রেতপুরীর সব কিছু যেন শুধুই মনে করিয়ে দেয় সুলতানদের জাঁকজমকপূর্ণ অতীতের কথা। সমসাময়িক পর্যটক ইবন বটুটা লিখে গেছেন যে, এই তুঘলকাবাদে তুঘলক সুলতান [illegible]

করেছিলেন। এখানে ছিল সোনার মত উজ্জ্বল ইটের তৈরি প্রাসাদ। এই প্রাসাদের উপর সূর্যকিরণ প্রতিফলিত হয়ে এই ইটগুলির প্রখর ঔজ্জ্বল্যে চোখে ধাঁধা লেগে যেত। প্রাসাদের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকা সম্ভব হতো না। তুঘলকাবাদ ছিল দুর্গ, প্রাসাদ ও সহরের এক বিরাট সংমিশ্রণ। তদানীন্তন আবাসিক ও সামরিক প্রয়োজনানুসারে এটি গড়ে উঠেছিল।

উঁচু পাহাড়ী জায়গার উপর তুঘলকাবাদ স্থাপিত হয়েছিল। রোমকদের দুর্গ নির্মাণরীতি অনুযায়ী এই সুরক্ষিত নগরটির ছিল দুটি অংশ—পাশ্চাত্যের দুর্গের মত সহর রক্ষার জন্যে দুর্গ এবং এই দুর্গের লাগোয়া বাইরের প্রাচীরঘেরা সহর। এখানকার পাথরের তৈরী হেলানো দেয়াল সম্ভবতঃ আরবদের সেনানিবাসের অনুকরণে তৈরি করা হয়েছিল। আরবদের দেয়ালগুলি মাটি অথবা রৌদ্রপক্ক ইট দিয়ে তৈরি হতো বলে সেগুলি হেলানো থাকতো। আরবদের এই রকম নির্মাণ-পদ্ধতি আবার রোমক পূর্তবিদ্‌দের নির্মাণ-পদ্ধতির দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিল।

জমির উপর জমা হওয়া প্রস্তর স্তর যে রকম ভাবে বিন্যস্ত ছিল, সেই ভাবেই বাইরের প্রাচীর তৈরি করবার জন্যে তুঘলকাবাদের বাইরের রেখাও খুব অসমান ছিল। তবে মোটামুটি এটি ছিল আয়তাকার, দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে প্রায় 2200 গজ করে বিস্তৃত। নগরের চারপাশের প্রাচীরের মোট দৈর্ঘ্য ছিল চার মাইলেরও বেশী। মাটি থেকে প্যারাপেটের উপর পর্যন্ত এই প্রাচীরের উচ্চতা ছিল প্রায় নব্বই ফুট। আক্রমণকারীদের হাত থেকে সুদৃঢ়ভাবে রক্ষা করবার জন্যে নিশ্চয়ই এই নগর-প্রাচীর এত মজবুতভাবে নির্মিত হয়েছিল। কারণ গিয়াসুদ্দীনের পূর্ববর্তী কালে আলাউদ্দীন খিলজীর রাজধানী ও দিল্লীর দ্বিতীয় শহর সিরি-কে (যা এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে) সহজে রক্ষা করা সম্ভব হয় নি। নগর-প্রাচীরের মধ্যে সন্নিবিষ্টভাবে ছিল বৃহদায়তনের বৃত্তাকার পর্যবেক্ষণ বুরুজ। এগুলি দুর্গের প্রাচীর থেকে ঠেলে বের করা ছিল। কয়েকটি বুরুজ ছিল আবার দ্বিতল। প্রাচীরের উপরকার প্যারাপেটে ছিল তীর ও বর্শা নিক্ষেপ করবার জন্যে অসংখ্য ফোকর। প্রাচীরের পাশ ছিল বেশ হেলানো। প্রাচীরের মধ্যেও তীরন্দাজদের তীর নিক্ষেপ করবার জন্যে ছিদ্রযুক্ত অসংখ্য স্থান ছিল। সমগ্র প্রাচীরের মধ্যে ছিল বাহান্নটি প্রবেশদ্বার। এদের মধ্যে বেশীর ভাগই এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। প্রবেশদ্বারগুলি ছিল খুব প্রশস্ত ও উঁচু। দ্বারের দুই পাশে ছিল বুরুজ। ধীরে ধীরে উঁচু হয়ে-আসা চওড়া রাস্তা দিয়ে প্রবেশদ্বারে পৌঁছানো যেত। সহজেই হাতী চলাচলের জন্যে রাস্তা এই রকম অল্প ঢালু এবং প্রবেশদ্বার প্রশস্ত ও উঁচু করা হতো। পাহাড়ী জায়গায় স্থাপিত হওয়ায় পাশাপাশি জায়গার পাথর-খাদ থেকে পাথর সংগ্রহ করা হতো। অসমানভাবে কাটা বড় বড় আকারের পাথর দিয়ে এখানকার নির্মাণ কাজ করা হয়েছিল।

প্রাচীরঘেরা তুঘলকাবাদের ভিতরের বিভিন্ন অংশের, বিশেষতঃ সহর অংশের ইমারতগুলির বিশেষ কোন চিহ্নই এখন আর নেই। চারপাশের সব কিছুর উপর আধিপত্য বিস্তার করে দাঁড়িয়েথাকা এই দুর্গটির চারদিক ছিল গভীর পরিখাবেষ্টিত। পরিখা, তীর নিক্ষেপের জন্যে ফোকরযুক্ত দেয়ালবিশিষ্ট দীর্ঘ ও সঙ্কীর্ণ বারান্দা এবং সুরক্ষিত প্রবেশদ্বারের কিছু কিছু নিদর্শন এখনও আছে। এখানকার প্রাসাদটি দুটি ঘেরা অংশে বিভক্ত ছিল। প্রাসাদে ছিল বাসভবন, জেনানা মহল, জনসাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্যে দরবার কক্ষ ইত্যাদি। এখানে কোনও কোনও ঘরের ছাদের নীচে কাঠের কড়ি ব্যবহৃত

হয়েছিল। আরও ছিল একটি লম্বা ভূগর্ভস্থ বারান্দা-পথ, যার দু-ধারে ছিল অনেকগুলি কক্ষ, যেখান থেকে গুপ্তদ্বার দিয়ে দুর্গের বাইরে যাওয়া ও ভিতরে প্রবেশ করা যেত। এই পথের সঙ্গে সুন্দর স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত অপেক্ষাকৃত একটি ছোট ইমারতের সংযোগ ছিল। এটি হলো ঘিয়াসুদ্দীন তুঘলকের সমাধিসৌধ।

সমাধিসৌধটি খুব ভাল অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। এটি একটি কৃত্রিম হ্রদের মধ্যে অবস্থিত ছিল। এখন এই হ্রদ আর দেখা যায় না। দুর্গ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত হলেও এই বৃহৎ হ্রদের উপরে তৈরী পাথর-বাঁধানো 250 গজ লম্বা উঁচু একটি রাস্তা দিয়ে সমাধিসৌধটি দুর্গের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। এটিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি ছোটখাটো দুর্গও বলা চলে। মনে হয় এটি ছিল সহরের পিছন দিকে অবস্থিত দূরবর্তী ঘাঁটি অথবা সহরে শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধের শেষ আশ্রয়স্থল।

সমাধিসৌধটির বাইরের আকার অসমান পঞ্চভুজাকৃতি। প্রাচীরের প্রত্যেক কোণে ছিল প্রাচীর থেকে ঠেলে বের-করা অংশ। যে ছোট পাহাড়ী দ্বীপটির উপর এটি নির্মিত হয়েছিল, তার অসমান সীমারেখার জন্যে এটিকেও এই রকম অসাধারণ আকারে তৈরি করতে হয়েছিল।

প্রাচীরের মধ্যে প্রধান প্রবেশপথে ছিল অতি সুন্দর একটি দ্বার। এটি আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে মরণফাঁদ হিসাবেও ব্যবহৃত হতো। প্রাচীরের ভিতরের চত্বরটিও বাইরের মত একই রকম অসমান আকৃতির। এই চত্বরের নীচে কয়েকটি খুব মজবুত করে তৈরি ভূগর্ভস্থ ও খিলানকরা ছাদযুক্ত কক্ষ ছিল। আসল সমাধিকক্ষের সঙ্গে এই কক্ষগুলির কিন্তু কোন সম্পর্ক নেই। সুলতানের সঞ্চিত ধনরত্ন ও অন্যান্য ঐশ্বর্য নিরাপদে রাখবার জন্যে এই সুরক্ষিত কক্ষগুলি ব্যবহৃত হতো। ইবন বটুটা বলে গেছেন যে, ঘিয়াসুদ্দীন এখানে অতুল ঐশ্বর্য জমা করে রেখেছিলেন। এখানে একটি বড় চৌবাচ্চা তৈরি করিয়ে তিনি তার মধ্যে সোনা গালিয়ে ঢেলে রেখেছিলেন। এই সোনা জমাট হয়ে একটি বিরাট শক্ত সোনার তালে পরিণত হয়েছিল।

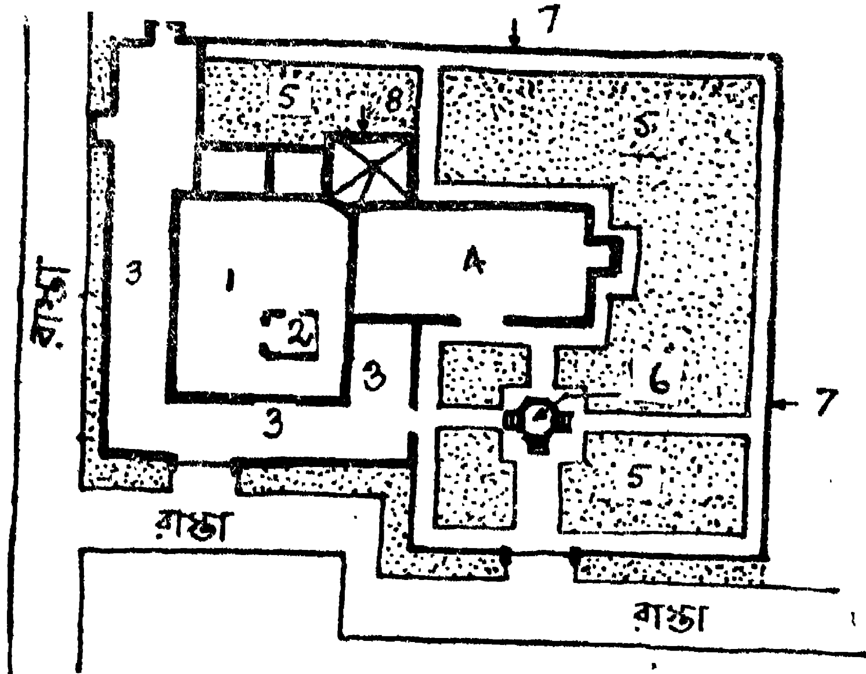
সৌধটির বহুলাংশ সূক্ষ্মভাবে কাটা লাল বেলে পাথরে তৈরি। উপরের দিকের খানিকটা অংশ সাদা মার্বেল পাথরে তৈরি হওয়ায় একঘেয়েমির ভাব আংশিকভাবে লাঘব হয়েছে। সাদা মার্বেল পাথরে নির্মিত এর গম্বুজটি দিল্লীতে এই ধরণের প্রথম গম্বুজ। সে জন্যে ভারতের মধ্যযুগীয় স্থাপত্যের ইতিহাসে এই সমাধিসৌধটি স্মরণীয় হয়ে আছে।

সঠিকভাবে মক্কার অভিমুখে রাখবার জন্যে সমাধিকক্ষটিকে চত্বরের সবচেয়ে চওড়া অংশে স্থাপন করা হয়েছে। 75 ডিগ্রীতে হেলানো এর বাইরের দেয়াল খুব চিত্তাকর্ষক। কক্ষটির বর্গাকার নীচের অংশের প্রত্যেকটি দিক 61 ফুট লম্বা এবং এর মোট উচ্চতা 80 ফুটেরও বেশী। প্রত্যেক দেয়ালের মাঝখানে আছে ভিতরে ঢোকানো, উঁচু ও ছুঁচালো খিলানযুক্ত ফাঁক। এগুলির মধ্যে তিনটিতে আছে প্রবেশদ্বার। চতুর্থটির ভিতরের দিকে মিহরাব থাকায় সেটি বন্ধ। খিলানের নিম্নাংশ দুটিকে যুক্ত করে আছে কড়ি। এভাবে কড়ি ও খিলান—এই দুই রকমের ভার বহন করবার পদ্ধতিই একত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে বেশী মাত্রায় অলঙ্করণের জন্যেই কড়ি ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে এই ধরণের নির্মাণ-পদ্ধতি সর্বপ্রথম। আরও বেশী অলঙ্করণের জন্যে কড়ির দুই প্রান্তের তলার দিকে ব্র্যাকেট ব্যবহৃত হয়েছে। ভিতরে 30 ফুট বর্গাকার একটি মাত্র কক্ষ আছে। উপরিউক্ত তিনটি খিলানযুক্ত ফাঁকের ভিতর দিয়ে কক্ষের মধ্যে আলো প্রবেশ

করে। কক্ষের উপরকার গম্বুজ নির্মাণে বিশেষত্ব আছে। ভিতরের দিকে ইট এবং বাইরের দিক মার্বেল পাথর দিয়ে গাঁথা। ভিতর ও বাইরের দুই তলের মধ্যে কোন ফাঁকা স্থান নেই। 55 ফুট বিস্তারের এই গম্বুজটি 'তাতার' বা ছুঁচালো আকৃতির। অস্থায়ী কাঠামো (Centering) তৈরি করে তার উপরে সম্পূর্ণ গম্বুজটি তৈরি করা হয়েছিল।

বারখাম্বা

তুঘলক সুলতানদের সময়ের সাধারণ বাসগৃহের কোন নিদর্শন এখন আর নেই। তবে বাসগৃহের প্রাচীরঘেরা চত্বরের মধ্যস্থলে ছিল কূপ ও স্নানের জায়গা এবং চারধারে ছিল ঘোড়ার আস্তাবল ও ভৃত্যদের থাকবার ঘর। আরও ভিতর দিকে অবস্থিত সিঁড়ি দিয়ে উপরকার প্রশস্ত সমতল ছাদে যাওয়া যেত। চারপাশে প্যারাপেটঘেরা এই ছাদ গ্রীষ্মকালে খুবই আরামদায়ক হতো। নীচেকার চত্বর-সংলগ্ন থামওয়ালা অংশটি সম্ভবতঃ বাসস্থানরূপে ব্যবহৃত হতো। বাসকক্ষের বাইরে ছিল উঁচু পাঁচিলঘেরা বাগান। বাগানের মধ্যে ছিল কূপ ও চবুতরা অর্থাৎ বাইরে বসবার জন্যে বাঁধানো চাতাল। নিরাপত্তা ও রাস্তা থেকে



বারখাম্বা বাড়ীর নক্সা
1—চত্বর, 2—কূপ ও স্নান ঘর, 3—ঘোড়ার আস্তাবল, 4—থামওয়ালা প্রশস্ত ঘর, 5—বাগান, 6—চবুতরা, 7—উঁচু প্রাচীর, 8—তিনতলা উঁচু বুরুজ।

কিছু পরবর্তীকালে লোদী বংশের রাজত্বের (1451 থেকে 1517 খৃষ্টাব্দ) সময়ে পঞ্চদশ শতাব্দীতে তৈরী তদানীন্তন এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাসগৃহের ভগ্নাবশেষ আছে পুরনো দিল্লীর বেগমপুরায়। এটিকে বলা হয় বারখাম্বা বা বারোটি স্তম্ভ। এই গৃহের অভ্যন্তর ভাগের গোপনীয়তা রক্ষার জন্যে সম্পূর্ণ বাড়ীটিই উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ছিল। তদানীন্তন অনিশ্চিত জীবনযাত্রার কথাই মনে করিয়ে দেয় এই ধরণের নির্মাণ-পদ্ধতি। গৃহের একতলার সকল অংশ থেকেই সহজে পৌঁছানো

যায়, এমন স্থানে ছিল তিনতলা বর্গাকার একটি বুরুজ। সমগ্র গৃহটির একটি বিশিষ্ট অংশ ছিল এই বুরুজ। বুরুজের উপরতলার ঘরগুলি ছিল খোলামেলা। পরিবারের বয়স্কেরা এই সব ঘরে বাস করতেন। ফলে তাঁরা প্রচুর আলো-বাতাস পেতেন এবং চারদিকের দৃশ্য উপভোগ করতে পারতেন। এই বুরুজের হেলানো ছাদ ছিল পিরামিডের আকৃতিবিশিষ্ট।

জাহাপনা

গিয়াসুদ্দীনের পুত্র ও উত্তরাধিকারী মোহাম্মদ বিন তুঘলক (1325-1351 খৃষ্টাব্দ) তুঘলকাবাদের কাছেই দিল্লীর প্রথম ও দ্বিতীয় সহরের মধ্যের স্থানটিকে বিশাল সুরক্ষিত প্রাচীর দিয়ে ঘিরে দিয়েছিলেন। এই বিরাট প্রাচীরটির আর বিশেষ কিছুই এখন অবশিষ্ট নেই। এখানে তিনি দিল্লীর চতুর্থ সহর নির্মাণ করেছিলেন, যার নাম ছিল জাঁহাপনা অর্থাৎ পৃথিবীর আশ্রয়স্থল। এখানে অল্প যা কিছুর নিদর্শন এখনও আছে, তাদের মধ্যে সংরক্ষিত রয়েছে সাতটি বিস্তার-এর দু-তলা ও অলঙ্কৃত একটি জলদ্বার (Sluice)। এটির দুই প্রান্তে আছে দুটি বুরুজ। নতুন সহরের বিশেষ আকর্ষণীয় বস্তু ছিল একটি কৃত্রিম হ্রদ। এই জলদ্বারের সাহায্যে ঐ হ্রদে জল প্রবেশ করানো ও নির্গমনের কাজ নিয়ন্ত্রিত হতো।

সুলতান মোহাম্মদ তুঘলক ছিলেন অতিমাত্রায় খামখেয়ালী। এই খেয়ালের বশে 1340 খৃষ্টাব্দে তিনি ছয় শত মাইল দূরে সুদূর দাক্ষিণাত্যের দৌলতাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। তার সঙ্গে অগণিত প্রজাকেও সেখানে চলে যেতে হয়েছিল। সকলকে অশেষ দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল তাঁর এই খেয়াল চরিতার্থের জন্যে। ফলে যে দিল্লীকে তাঁর পূর্বপুরুষেরা সুন্দর করে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন, সেই চেষ্টার বিরতি হলো। দিল্লী সহর পরিত্যক্ত ও নির্জন হয়ে পড়লো এবং সেখানে বাস্তুকলার প্রসারে ছেদ পড়লো। পরে তাঁর উত্তরাধিকারী ফিরোজ শাহের সময়ে সেখানে স্থাপত্যের কাজ পুনরায় সুরু হয়।

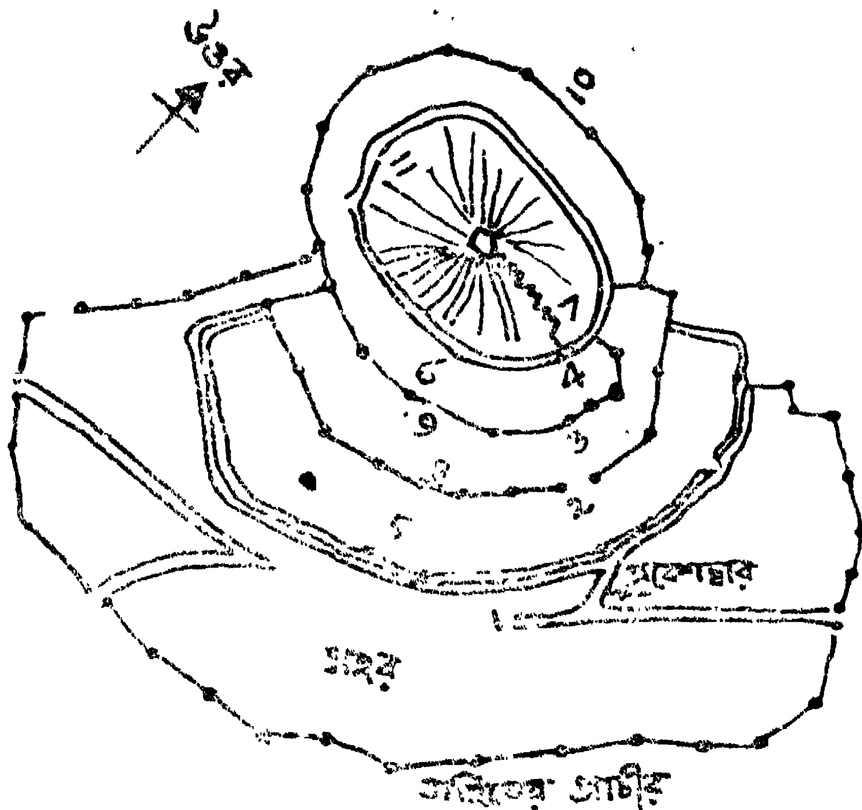
দৌলতাবাদ

ঔরঙ্গাবাদ সহরের নয় মাইল উত্তর-পশ্চিমে ও ইলোরা যাবার রাস্তার ধারে দৌলতাবাদের স্থল ও পার্বত্য দুর্গটি অবস্থিত। সমতল জমি থেকে খাড়াভাবে সাত-শ' ফুট উঠে-যাওয়া শঙ্কুর আকারের সম্পূর্ণ পৃথকভাবে অবস্থিত একটি ছোট পাহাড়ের উপর দুর্গটি তৈরি করা হয়েছিল।

একাদশ শতাব্দীর প্রায় শেষ ভাগের দিকে প্রধানতঃ হিন্দুশৈলীতে এই শক্তিশালী দুর্গটি নির্মিত হয়। সম্ভবতঃ 1080 থেকে 1090 খৃষ্টাব্দের মধ্যে এখানকার অন্তর্দুর্গের পাদদেশের চারদিকের পরিখাটি তৈরি করা হয়েছিল। এ হলো দুর্গটির মুসলীম অধিকারের বহু দিন আগেকার কথা। অন্তর্দুর্গের পাদদেশে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক পাহাড় খোদাই করে তৈরি করা একটি হিন্দু মন্দির অথবা পীঠস্থান ছিল। পরিখা খনন করবার সময় পীঠস্থান ও সেখানে যাবার রাস্তা সংরক্ষিত করে সামনের চত্বরের ধার দিয়ে পরিখাটি ঘুরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। হিন্দু পীঠস্থান সংরক্ষণ করবার এই প্রয়াস দেখে মনে হয় যে, মুসলিম অধিকারের পূর্বেই এই পরিখাটি খনন করা হয়েছিল। দুর্গের নীচের দিকে পাহাড়ের বিভিন্ন উচ্চতায় পর পর অবস্থিত প্রাচীরগুলি ও অন্যান্য প্রতিরোধ ব্যবস্থা মুসলমান আমলে তৈরি করা হয় অথবা পুরাতন ব্যবস্থার রদবদল বা মেরামত করা হয়।

পরবর্তী কালে দুর্গের নীচের দিকে সহর স্থাপন করা হয়েছিল। সহর ঘিরে বাইরের দিকে ছিল পাচিল। এই পাচিলের সামান্য

অংশমাত্র এখন অবশিষ্ট আছে। দৌলতাবাদ দুর্গের প্রতিরোধ ব্যবস্থা এত শক্তিশালী ছিল যে, দুর্গটি একপ্রকার দুর্ভেদ্য ছিল বলা যায়। দিকের অংশ পূর্বদিকে অনেকটা বাঁকা। এর ফলে প্রথম প্রবেশদ্বার, পরিখার উপর টানা পুল ও বুরুজ থেকে প্রবেশপথের ভিতরের প্রথম চত্বর



দৌলতাবাদ দুর্গের নক্সা
1—পরিখা, 2, 3, 4—প্রবেশদ্বার, 5—দুটি প্রাচীর ও পরিখা, 6—পরিখা, 7—সুড়ঙ্গ, 8, 9, 10—প্রাচীর, 11—অন্তর্দুর্গ।

সহরের পর দ্বিতীয় বাধাস্বরূপ ছিল 60 ফুট ব্যবধানে অবস্থিত দুটি প্রাচীর। প্রত্যেক প্রাচীরের সামনে ছিল পরিখা। ভিতর দিককার প্রাচীরে আছে প্রবেশদ্বার। শক্তিশালী প্রবেশদ্বারের সামনে পরিখার উপর ছিল টানা সেতু। সেতুটি টেনে তোলা যেত আবার প্রয়োজনমত নামানো যেত। এর ফলে শত্রুর আক্রমণের সময় দুর্গের প্রবেশপথ বন্ধ হয়ে যেত। প্রবেশপথের অংশটি প্রাচীর থেকে অনেকটা বেরিয়ে এসেছে। প্রথম প্রবেশদ্বারের ডান দিকে আছে বিশাল একটি বুরুজ। প্রবেশপথের সামনের ও বাইরের দিকে অনেক দূর পর্যন্ত নজর রাখা চলতো। বুরুজের পিছন দিকে হলো প্রথম চত্বর। তারপর আবার একটি প্রবেশদ্বার দিয়ে দ্বিতীয় চত্বর। তারপর আবার একটি প্রবেশদ্বার। দুর্গের প্রবেশপথে পর পর এই রকম দুটি চত্বর ও কয়েকটি শক্তিশালী প্রবেশদ্বার থাকায় দুর্গের ভিতরে শত্রুর পক্ষে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য ছিল। প্রতিরোধ ব্যবস্থা কিন্তু এখানেই শেষ হয় নি। এর পর পাহাড়ের বিভিন্ন উচ্চতায় আছে দুই সারি প্রাচীর এবং প্রত্যেক প্রাচীরের মধ্যে প্রবেশদ্বার। আক্রমণকারীরা প্রাচীর দুটিতে বিরাট বাধায় সম্মুখীন হতো।

সর্বশেষ পাহাড়ের উপরে হলো অন্তর্দুর্গ। এর বাইরের দিকে চারপাশ পরিখার দ্বারা বেষ্টিত। পরিখার উপর অন্তর্দুর্গের প্রবেশপথে আছে অদ্ভুত ধরণের একটি সেতু। প্রথমে কয়েক ধাপ সিঁড়ি নীচের দিকে নেমে গেছে, তারপর একটু সমতল স্থান। তারপর আবার কয়েক ধাপ সিঁড়ি উপরে উঠে গেছে। সেখান থেকে প্রাচীরঘেরা দীর্ঘ ও সঙ্কীর্ণ পথ চলে গেছে। এই পরিখার জলের উচ্চতা নিয়ন্ত্রণ করবার ব্যবস্থা ছিল। শত্রুর আক্রমণের সময় অন্তর্দুর্গের প্রতিরোধ আরও দৃঢ় করবার উদ্দেশ্যে পরিখার জলের গভীরতা আরও বাড়িয়ে দেওয়া যেত, যাতে শত্রুসৈন্য সেতুর উপর দিয়ে অতিক্রম করতে না পারে।

দীর্ঘ সঙ্কীর্ণ পথটি একটি উঁচু বুরুজের তিন দিক দিয়ে চলে গেছে। শত্রুসৈন্য এই পথ দিয়ে অগ্রসর হলে এই বুরুজের উপর থেকে এবং সংলগ্ন উঁচু প্রাচীরের উপরকার ফোকর থেকে আক্রমণের সম্মুখীন হতো। সঙ্কীর্ণ পথটির বন্ধ শেষ প্রান্ত থেকে সিঁড়ি উঠে গেছে ঐ উঁচু প্রাচীরের উপর। শত্রুসৈন্য সিঁড়ি বেয়ে প্রাচীরের উপর ওঠবার চেষ্টা করলেও বাধার সম্মুখীন হবে। পথটি শেষ হবার অল্প একটু আগেই প্রাচীরের ফোকর দিয়ে কয়েক ধাপ সিঁড়ি উঠে একটি বৃহৎ গুহার মধ্যে প্রবেশ করেছে। গুহায় প্রবেশের সামনেই বাঁ-দিকে আছে প্রহরীদের জন্যে একটি পাথরের বেঞ্চি। প্রশস্ত ও দীর্ঘ গুহা পেরিয়ে আবার একটি সঙ্কীর্ণ ফাঁক দিয়ে একটি উন্মুক্ত চত্বরে আসা যায়।

চত্বরের অপর দিকে আছে সুড়ঙ্গ ও সেখানে প্রবেশ করবার বিরাট প্রবেশদ্বার। এই প্রবেশদ্বারটি 400 খৃষ্টাব্দে তৈরি দৌলতাবাদের নিকটবর্তী হিন্দু স্থাপত্যে নির্মিত ইলোরার কৈলাস মন্দিরের প্রবেশদ্বারের কথা মনে করিয়ে দেয়।

সুড়ঙ্গ থেকে বের হয়ে আসবার পর খুব প্রশস্ত অনেক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠে একটি মণ্ডপে এসে পৌঁছানো যায়। পরবর্তী কালে খুব সম্ভব 1636 খৃষ্টাব্দে সম্রাট শাজাহান এই মণ্ডপটিকে পুনঃনির্মাণ অথবা নতুন আকারে গঠন করেন। মণ্ডপটি খাড়া উঁচু পাহাড়ের উপর অবস্থিত হওয়ায় এখান থেকে বহু দূর পর্যন্ত দেখা যায়। মণ্ডপ থেকে আবার অনেকগুলি সিঁড়ি আঁকাবাঁকাভাবে উঠে গিয়ে একেবারে পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে পৌঁচেছে। মাঝপথে পর পর দুটি দ্বার আছে। পাশাপাশি অবস্থিত দুটি খাড়া পাহাড়ের মধ্যে আছে এই দুটি দ্বার। পাহাড়ের চূড়ায় একটি বর্গাকার প্রাচীরে ঘেরা চত্বরের এক কোণে আছে একটি ভগ্ন ইমারত। পরে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এখানে দুটি উঁচু ঢিবির উপর কামান রাখবার বন্দোবস্ত করা হয়। পাহাড়ের প্রস্রবণ থেকে অন্তর্দুর্গে সারা বছর ধরে প্রচুর পরিমাণে জল পাওয়া যেত।

দৌলতাবাদ দুর্গের বিন্যাস ও প্রতিরোধ ব্যবস্থার বর্ণিত ব্যবস্থাদি থেকে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, মধ্যযুগের সবচেয়ে শক্তিশালী ও চিত্তাকর্ষক দুর্গগুলির মধ্যে এটি ছিল অন্যতম।

ফিরোজ শাহ তুঘলক (1351—88 খৃষ্টাব্দ) বাস্তু নির্মাণে যে খুবই উৎসাহী ছিলেন, তাঁর নিজের লেখা থেকেই তা বোঝা যায়। তিনি লিখেছিলেন—"ভগবান তাঁর দীন ভৃত্য আমাকে যে সব বস্তু দান করেছেন, তার মধ্যে একটি হলো জনসাধারণের জন্যে ইমারত নির্মাণের প্রবল ইচ্ছা"।

ফিরোজ শাহের নির্মিত প্রধান প্রধান ইমারতগুলিতে তাঁর নিজস্ব এক অদ্ভুত শৈলী দেখা যায়। এই শৈলী পূর্ববর্তী কালের স্থাপত্যশৈলী থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এর সঙ্গত কারণও ছিল। পাথর কাটাই ও পাথরের কাজে কুশলী ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন রাজমিস্ত্রী ও বাস্তু নির্মাণের অন্যান্য কারিগরের একান্ত অভাব হওয়ায় এবং তাঁর পূর্ববর্তী সুলতানের অমিতব্যয়িতার ফলে

রাজকোষের অর্থ অসম্ভব রকম কমে যাওয়ায় অপেক্ষাকৃত সুলভ মালমশলা দিয়ে এবং সাধারণ মিস্ত্রী ও কারিগরের দ্বারা ফিরোজ শাহকে ইমারতাদি নির্মাণ করতে হয়েছিল। এই জন্যে তাঁর স্থাপত্য খুবই সাধারণ ও কার্যকরীভাবে করতে হয়েছিল। পূর্ববর্তী সময়ে বাস্তু নির্মাণে সুন্দরভাবে খোদাই করা ও খুব ভালভাবে সম্পূর্ণ করা বেলেপাথর ব্যবহার করা হয়েছিল। অলঙ্করণের কাজও যথেষ্ট ছিল। এই সবের পরিবর্তে ফিরোজ শাহকে অসমানভাবে খোদাই করা পাথর দিয়ে বাস্তু নির্মাণ এবং ওই একই রকম পাথর দিয়ে কড়ি, থাম ইত্যাদি তৈরি করতে হয়েছিল। তাঁর স্থাপত্যে অলঙ্করণের কাজও খুব কম দেখা যায়। অল্প যা কিছু অলঙ্করণের ব্যবহার করা হয়েছিল, তাও পাথরে খোদাই করবার বদলে ছাঁচের মধ্যে প্লাস্টার দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। ইমারতের বাইরের দিকে চুনকাম ও রং-করা থাকতো।

তিনি জৌনপুর, ফতেহাবাদ, হিসার ও দিল্লীর পঞ্চম সহর ফিরোজাবাদে চারটি দুর্গনগরী নির্মাণ করেন।

ফিরোজাবাদ

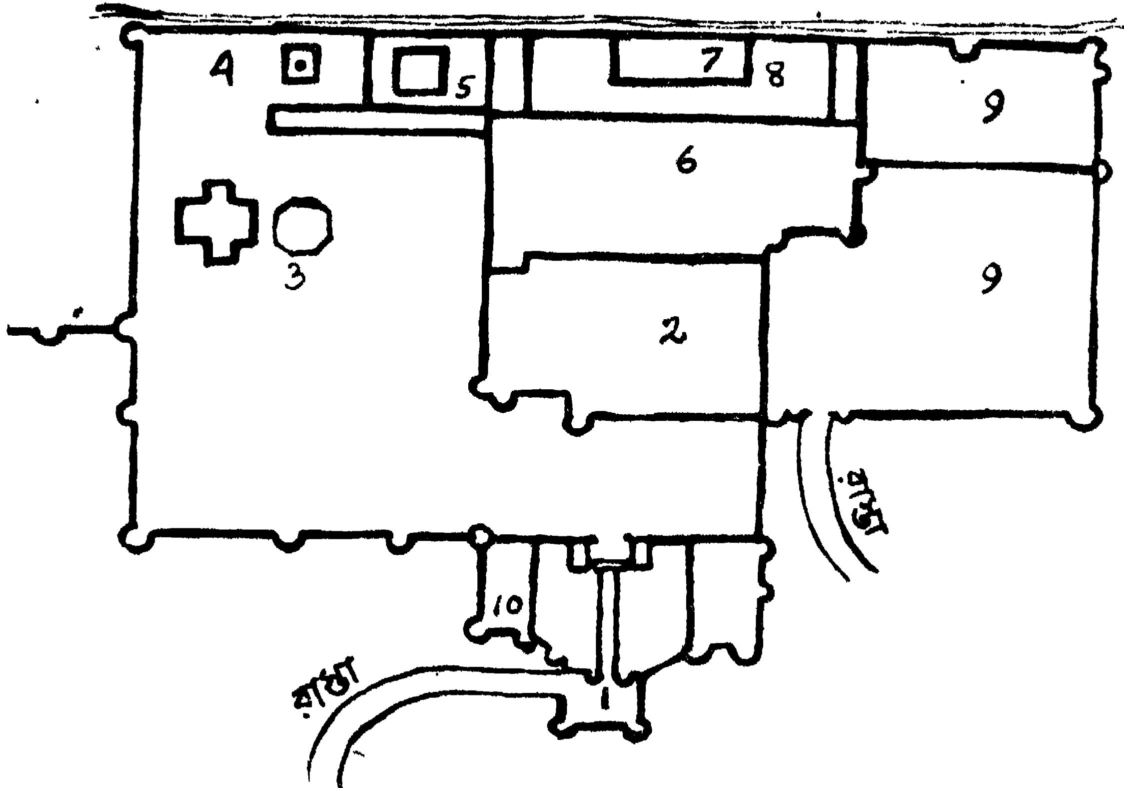
1354 খৃষ্টাব্দে যমুনাতীরে বিরাট সমতল জায়গায় অবস্থিত ফিরোজ শাহের রাজধানী ফিরোজাবাদের নির্মাণকার্য সুরু হয়। বর্তমান ফিরোজ শাহ কোটলাতে এর ধ্বংসাবশেষ আছে। এই বিশাল প্রাসাদদুর্গটি ছিল সম্পূর্ণ প্রাচীর-ঘেরা। এর ভিতরে রাজকীয় বাসস্থান ও আনুষঙ্গিক ইমারতাদি ছিল। দৈনন্দিন জীবনের সব রকম সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বন্দোবস্তও ছিল। স্থাপিত হবার দেড়-শ' বছর পরে এই প্রাসাদ দুর্গটি পরিত্যক্ত হয়।

এটি আকারে একটি আয়তক্ষেত্র। উত্তর-দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত লম্বা দিকটির দৈর্ঘ্য আধ মাইলের চেয়ে অল্প কিছু কম এবং চওড়ায় প্রায় সিকি মাইল বিস্তৃত। চারদিকের উঁচু প্রাচীরের উপরের প্যারাপেটে মাঝে মাঝে অসংখ্য ফাঁক ছিল। এই সব ফাঁক দিয়ে শত্রুর উপর তীর ও বর্শা নিক্ষেপ করা হতো। প্রাচীরের মধ্যে মাঝে মাঝে বিস্তৃতভাবে ঠেলে বেরকরা বুরুজ ছিল। এগুলি রক্ষীদের পর্যবেক্ষণ বুরুজরূপে ব্যবহৃত হতো। দুর্গপ্রাসাদের প্রধান প্রবেশ-দ্বার পশ্চিম দিকে অবস্থিত ছিল। অতি-সুরক্ষিত এই তোরণদ্বারটির ভিতরের দিকে অবস্থিত চত্বরের পাশে ছিল প্রহরীদের কক্ষ ও সৈন্যদের বাসস্থান। প্রধান প্রবেশদ্বারের বিপরীত দিকে নদীর বাঁধ ঘেঁষে ছিল প্রাচীরঘেরা বৃহৎ ও আয়তাকার একটি চত্বর, যেখানে ছিল রাজপ্রাসাদ বা খাসমহল, জেনানা মহল ও অন্যান্য ব্যক্তিগত প্রাসাদ। নদীর শীতল বাতাস মহল-গুলির মধ্যে চলাচল করবার সুবিধার জন্যে এই প্রাসাদগুলির বেশীর ভাগেরই বাইরের দেয়াল নদীর ধারসংলগ্ন ছিল।

কোটলার অভ্যন্তর ভাগ প্রাচীরঘেরা ও আয়তাকার অথবা বর্গাকার কয়েকটি চত্বরে বিভক্ত ছিল। সবচেয়ে বড় চত্বরটি ছিল দেওয়ান-ই-আম, যেখানে সুলতান জনসাধারণকে দর্শন দিতেন এবং আমদরবার পরিচালনা করতেন। এই সুবিস্তৃত উন্মুক্ত চত্বরের চারপাশ ঘিরে ছিল থামওয়ালা বারান্দা। এখানে সরকারী ও রাজ-নৈতিক কাজকর্ম চলতো। অবশিষ্ট চত্বরগুলিতে দ্রাক্ষাকুঞ্জ, জল-উদ্যান, স্নানাগার, পুষ্করিণী, সৈন্যদের বাসস্থান, অস্ত্রাগার, ভৃত্যদের বাসস্থান ইত্যাদি ছিল। নদীর ধারের প্রাচীরসংলগ্ন ও কোটলার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত জুম্মা মসজিদ বা জনসাধারণের উপাসনা স্থান। বিশাল ও চিত্তা-কর্ষক এই মসজিদের চত্বরে প্রায় দশ হাজার লোকের একত্রে সমবেত হবার মত স্থান ছিল। জুম্মা মসজিদ ছাড়া কোটলার বিভিন্ন অংশে

ছোট ছোট উপাসনাগার এবং প্রাসাদের নিজস্ব একটি পৃথক উপাসনাগারও ছিল।

কোটলার কেন্দ্রস্থলে আর একটি বিশাল ও চিত্তাকর্ষক ইমারত ছিল। এর ধ্বংসাবশেষ আম্বালার কাছে প্রথম থেকে প্রায় ষোল শত বছর ধরে থাকবার পর ফিরোজ শাহ এটিকে সেখান থেকে সরিয়ে এনে ফিরোজাবাদে স্থাপন করেন। জানা যায়, এই উঁচু স্তম্ভটিকে খুব



ফিরোজ শাহ কোটলার আনুমানিক নক্সা।
1—প্রধান প্রবেশদ্বার, 2—দ্রাক্ষাউদ্যান, 3—মণ্ডপ, 4—অশোক লাট, 5—জুম্মা মসজিদ, 6—দেওয়ান-ই-আম, 7—খাসমহল, 8—জেনানা মহল, 9—পরবর্তী কালের তৈরী অংশ, 10—জলাশয়।

এখনও আছে। এটির নাম লাট পিরামিড। এটিকে ধাপে ধাপে আকারে কমে-আসা পিরামিডের মত মনে হতো। পর পর তিনটি বিভিন্ন তলে অবস্থিত স্তম্ভশ্রেণীর উপরে খিলানযুক্ত পথের উপরকার বর্গাকার সমতল ছাদের সমষ্টি ছিল এই ইমারতটি। যত উঁচু হয়েছে, ততই এই ছাদগুলি আকারে ছোট হয়ে গেছে। অশোকের একটি বিখ্যাত বৌদ্ধস্তম্ভ এই ইমারতটির উপর স্থাপিত হয়েছিল। সাবধানে নিয়ে এসে যান্ত্রিক ব্যবস্থায় পুনরায় স্থাপন করা হয়। সমসাময়িক পুস্তক সিরাত-ই-ফিরোজশাহীতে লিখিত আছে যে, একটিমাত্র পাথর থেকে খোদাই করা এই বিশাল স্তম্ভটির প্রতি ফিরোজ শাহ অত্যন্ত আকৃষ্ট হন এবং এটির নাম দেন মিনার-ই-জরীন বা স্বর্ণস্তম্ভ। তাঁর রাজধানী ফিরোজাবাদের জুম্মা মসজিদে এটিকে স্থাপন করতে মনস্থ করেন। সুলতানের পূর্তবিদেরা কি করে এই স্তম্ভটিকে নামিয়ে নিয়ে

গিয়ে কি ভাবে তুলে আবার ফিরোজাবাদে স্থাপন করা যায়, সে বিষয়ে কোন উপায় উদ্ভাবন করতে না পারায় সুলতান নিজেই এক অভিনব উপায় আবিষ্কার করেন। প্রত্যেকটি দশ গজ পরিধির ও স্তম্ভের সমান লম্বা ছয়টি কাঠের থামের সঙ্গে বেঁধে দড়ির সাহায্যে স্তম্ভটিকে মাটিতে নামানো হয়। স্তম্ভটির সমান লম্বা এবং প্রত্যেকটি দশ গজ পরিধিবিশিষ্ট বিয়াল্লিশটি চাকার একটি গাড়ীতে স্থাপন করে বলদ, হাতী ও হাজার হাজার লোক দিয়ে টেনে যমুনাতীরে এনে কয়েকটি বড় বড় নৌকার উপর স্তম্ভটিকে রাখা হয়। কোটলায় আনীত হবার পর একই-ভাবে স্তম্ভটিকে নামানো হয় এবং 1367 খৃষ্টাব্দের 30শে সেপ্টেম্বর পঁয়ত্রিশটি মজবুত কাছির সাহায্যে স্তম্ভটিকে টেনে তুলে খাড়াভাবে স্থাপন করা হয়। যে পিরামিডাকৃতির ইমারতের উপর স্তম্ভ-টিকে স্থাপন করা হয়, সেটির প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ছাদগুলি যথাক্রমে 118 ফুট, 83 ফুট ও 55 ফুট বর্গাকার। স্তম্ভের নীচে চারদিকে সাদা মার্বেল, লাল ও কালো পাথরের চাতাল তৈরি করা হয়। নীচের দিক থেকে উপর দিকে ক্রমশঃ সরু হয়ে আসা এই স্তম্ভটিকে গিল্টি ও পালিশ করা হয়। সোনার মত রঙের উপর আবার পালিশ করবার ফলে স্তম্ভটির সৌন্দর্য খুবই বৃদ্ধি পায়।

হাউজ-খাস

বৃহত্তর দিল্লীর যে অংশটিকে এখন বলা হয় হাউজ-খাস, সেখানে ছিল একটি বিরাট মাদ্রাসা ও তার অনেকগুলি আনুষঙ্গিক ইমারত। এগুলির মধ্যে ফিরোজ শাহের সমাধিসৌধটিই প্রধান। এই স্মৃতিসৌধটি ছাড়া আর সব কিছুই এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত। এই সব ইমারত একটি রমণীয় কৃত্রিম হ্রদের দু-ধারে ছবির মত বিস্তৃত ছিল। হ্রদে আজ আর জল নেই, অনেক দিন আগেই শুকিয়ে গেছে। হ্রদটির কাছাকাছি যে প্রান্তরে একদা দিল্লী অধিকারের জন্যে ভীষণ যুদ্ধ হয়েছিল, সেখানে এখন সরকারী কর্মচারীদের বাসগৃহ তৈরি হয়েছে।

চারপাশের ভগ্নস্তূপের মাঝে ফিরোজ শাহের এই সমাধিসৌধটি মোটামুটি সম্পূর্ণভাবেই রক্ষিত আছে। বর্গাকার এই সমাধিসৌধটির এক-একদিকের মাপ 45 ফুট। দেয়ালগুলি দেখতে সাধাসিধা ও খাড়াইয়ের দিকে অল্প হেলানো। প্রত্যেক দিকের খানিকটা অংশ ঠেলে বের করা। এরূপ চারটির মধ্যে দুটি অংশের মধ্যে আছে সুদৃশ্য খিলানযুক্ত প্রবেশদ্বার। সৌধটির উপরের দিকের অলঙ্কারবহুল প্যারাপেটের উপর অষ্টভুজা-কৃতি পিপার মত অংশের উপর রয়েছে স্বল্প উচ্চতার সূচালো গম্বুজ। দক্ষিণ দিকে সৌধটির সামনে আছে সুদৃশ্য ও অল্প উচ্চতার রেলিং ঘেরা নীচু ও ছোট চাতাল। সমাধিসৌধটির ভিতরে আছে একটিমাত্র বর্গাকার কক্ষ। কক্ষটির পশ্চিম দেয়ালের মধ্যে আছে ভিতরে ঢোকানো খিলানযুক্ত মিহরাব। সমগ্র সৌধটি দেখতে খুব সাদাসিধা হলেও খুবই গাম্ভীর্যের পরিচায়ক।

তৈমুরলঙ

এই তুর্কী সাম্রাজ্যের পতনের সূত্রপাত হয়েছিল সুলতান মোহাম্মদ বিন তুঘলকের আমলে। 1388 খৃষ্টাব্দে ফিরোজ শাহের মৃত্যুর পর দেশে বিশৃঙ্খলা ও অন্তর্বিদ্রোহ দ্রুত বাড়তে থাকে। এর কিছু কাল পরে 1398 খৃষ্টাব্দে মধ্য এশিয়ার অন্তর্গত সমরকন্দের অধিপতি তৈমুর-লঙ এই আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বিবাদের সুযোগ নিয়ে ভারত আক্রমণ করে। উত্তর ভারতের উপর দিয়ে তার মঙ্গোল দলবল নিয়ে বিধ্বংসী অভিযান চালিয়ে দুর্বার গতিতে এগিয়ে আসে তৈমুর। নানা স্থান ধ্বংস করে সে দিল্লীতে উপস্থিত হয়। রাজধানী নির্মমভাবে

লুণ্ঠন করে এবং প্রায় এক লক্ষ লোককে হত্যা করে। পূর্ববর্ণিত হাউজ-খাসের হ্রদের ধারে তার শিবির স্থাপিত হয়েছিল। বিজেতা তৈমুর পাথর-খোদাই কাজের মিস্ত্রী, ইমারত নির্মাণের অন্যান্য কারিগর এবং প্রয়োজনীয় শিল্পীদের হত্যা করে নি। বিজিতদের হত্যা করাই ছিল তার সাধারণ নিয়ম। এই ক্ষেত্রে সে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করেছিল; কারণ তার সাম্রাজ্যের রাজধানী সমরকন্দে সে সারা পৃথিবীতে অতুলনীয় একটি জুম্মা মসজিদ নির্মাণের সঙ্কল্প করেছিল। এই সব শিল্পী ও কারিগরদের এই মসজিদ নির্মাণে নিযুক্ত করবার জন্যেই সে হত্যা করে নি। তার পরিকল্পিত এই বিরাট সৌধটি নির্মাণের জন্যে অভিযানে ধৃত নব্বইটি হাতীর পিঠে বোঝাই করে এদেশ থেকে পাথরও নিয়ে গিয়েছিল। সৌভাগ্য-বশতঃ তৈমুর বেশী দিন এদেশে ছিল না। সামনে যা কিছু পেয়েছিল, সব কিছুই নিষ্ঠুর-ভাবে ধ্বংস করে দিয়ে তার দেশে ফিরে গিয়েছিল।

পৃথিবীর বাইরে জীবনের সম্ভাব্য অস্তিত্ব

অরুণকুমার সেন*

অগণিত তারায় শোভিত রাত্রির আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে কার না মনে হয়, "যদি একবার যেতে পারতাম ঐ তারার দেশে, তাহলে জানা যেত না জানি কত রহস্যই লুকিয়ে আছে ঐ তারার রাজ্যে। সত্যই কি ঐ মিট্‌মিট্‌করা তারাটির কাছে গেলে সেটি ক্রমশঃ সূর্যের মত উজ্জ্বল হয়ে প্রতিভাত হবে, তার দিকে আর তাকানো যাবে না? সত্যই কি তারাটির চারপাশে গ্রহ-উপগ্রহ নিয়ে রয়েছে একটি তারার জগৎ? সে সব গ্রহ কি মরুময়, না আমাদের মত বিচিত্র জীবে ভরা, না আমাদের চেয়ে উন্নততর জীবনের স্পন্দন সেখানে বিরাজমান? এসব নানা প্রশ্ন মনের মধ্যে জাগে। প্রশ্নের কোন মীমাংসা করতে না পেরে পরক্ষণেই হয়তো দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় একটি স্থির ও উজ্জ্বল তারার দিকে, যেটি আসলে হয়তো আমাদের পৃথিবীর মতই সূর্যের আর একটি গ্রহ—বৃহস্পতি, না হয় মঙ্গল, না হয় শুক্র। আছে কি ওখানে জীবনের স্পন্দন, না কি এগুলি জীবনের অস্তিত্বশূন্য? বস্তুতঃ পৃথিবীর বাইরে অন্য কোন গ্রহ, উপগ্রহ বা তারার রাজ্যে জীবনের অস্তিত্ব আছে কিনা, থাকলে তা কি ধরণের, তাদের সঙ্গে যোগা-যোগের কোন সম্ভাবনা আছে কিনা—এসব প্রশ্ন নিয়ে মানুষ বহু দিন থেকেই ভেবে আসছে। মানুষের এই সব ভাবনা অনেকেই অবাস্তব পরি-কল্পনা বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছে। কারণ, পৃথিবীর বাইরে মানুষ যে কখনও যেতে পারবে—একথা তখনও প্রমাণিত হয় নি। 1957 সালে রাশিয়া থেকে পৃথিবীর একটি কৃত্রিম উপগ্রহ স্পুট্‌নিক-1 সাফল্যের সঙ্গে কক্ষপথে স্থাপন করবার পর থেকে মানুষকে যেন আবার নূতন করে পেয়ে বসেছে ঐসব ভাবনা।

সেদিন ঠাকুমার কাছে গল্প শুনছিলাম, স্বয়ং ব্রহ্মা নাকি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে এসে গর্বভরে মা-কালীকে বলেছিলেন—মা, দেখবে এস কেমন ব্রহ্মাণ্ড বানিয়েছি আমি। উত্তরে মা কালী

* ইনস্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স, কলিকাতা-9

নাকি বলেছিলেন,—কোন ব্রহ্মাণ্ডের কথা বলছিস তুই? তাই শুনে ব্রহ্মা তো রেগে আগুন হয়ে বলে উঠেছিলেন, ব্রহ্মাণ্ড তো একটাই, যেটা আমি বানিয়েছি। তখন নাকি মা কালী ব্রহ্মাকে একটার পর একটা ব্রহ্মাণ্ড দেখাতে সুরু করেছিলেন আর তাই দেখে স্বয়ং ব্রহ্মারও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করবার উপক্রম হয়েছিল। গল্প হলেও মূল ভাবটি হয়তো উড়িয়ে দেবার নয়। বস্তুতঃ সব দেশেই এই ধরণের পৌরাণিক কাহিনীগুলি মানুষের কল্পনার ইঙ্গিত বহন করে। আর সে সব কল্পনার অনেকগুলিকেই পরবর্তী কালে অনেকটা বাস্তব রূপ নিতে দেখা গেছে। পুরাপুরি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতেও এটা ভাবা খুবই অস্বাভাবিক হবে যে, এতবড় বিশ্বে পৃথিবীস্বরূপ আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডই শুধুমাত্র বহন করে জীবনের স্পন্দন, বা সঞ্চালিত হয় সৌরশক্তিতে, উদ্ভাসিত হয় সূর্যকিরণে। বস্তুতঃ আকাশের বহু তারা আছে, যেগুলি আয়তনে ও শক্তিতে আমাদের সূর্যেরই মত। আবার অনেক তারা আছে, যা সূর্যের চেয়ে অনেক গুণে বড়। আসলে সূর্য নিজেও ঐ তারাগুলিরই একটি; তবে তারার তুলনায় অনেক কাছে আছে বলে সূর্যকে আমরা আলো ও শক্তির আধার হিসাবে দেখে থাকি। সূর্যস্বরূপ ঐ দূরদেশের তারাগুলির চারপাশেও তাদের নিজস্ব গ্রহ-উপগ্রহ থাকা সম্ভব, যেমন রয়েছে আমাদের সৌরজগতে। ঐসব গ্রহ-উপগ্রহের কোন কোনটিতে জীবনের সৃষ্টি ও ধারণের উপযুক্ত পরিবেশ থাকাও অসম্ভব নয়। তাই বৈজ্ঞানিকেরা হিসাবে বসলেন, সারা বিশ্বে এহেন ব্রহ্মাণ্ড বা জীবজগৎ কটা থাকতে পারে, তাদের পারস্পরিক দূরত্বই বা কতটা, তাদের মধ্যে যোগাযোগের সম্ভাবনাই বা কি রকম—এই সব ব্যাপার নিয়ে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে বর্তমানে এক হাজার কোটি আলোকবর্ষ দূরত্ব ভেদ করে দেখা যায় সেখানকার জ্যোতিষ্ককে। বলা বাহুল্য, আলো প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে ধাবিত হয়। তাহলে আলো এক দিনে কতটা যাবে—এক মাসে, এক বছরে এবং সর্বশেষে এক হাজার কোটি বছরে কতদূর যাবে, তার হিসাব খাতায় কলমে করতে পারলেও প্রকৃত ধারণা করা প্রায় অসম্ভব। এহেন দূরত্ব পর্যন্ত যত তারা দেখা যায়, তার সংখ্যা হলো প্রায় এক হাজার কোটির এক হাজার কোটি গুণ। বিশ্বের ঐসব অঞ্চল যে সকল পদার্থে গঠিত, পৃথিবীতেও আমরা সেগুলি দেখতে পাই। আর সেই সকল পদার্থের ধর্ম ও রাসায়নিক ক্রিয়াকলাপ এই 'নিয়মের রাজত্বে' সারা বিশ্বে একই রকম। তাই এমন কোন বিশেষ কারণ থাকতে পারে না, যাতে ঐসব অগণিত তারার মধ্যে একমাত্র সূর্য তার গ্রহ পৃথিবীতেই কেবল জীবনের সঞ্চার ও সঞ্চালনের উপযুক্ত আবহাওয়া বজায় রেখেছে।

তারার রাজ্যে জীবনের অস্তিত্ব নিয়ে গবেষণার পথে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে বৈজ্ঞানিকেরা সন্ধান করেছেন, সৌরমণ্ডলের আর কোন গ্রহে জীবন আছে কিনা। দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে সেগুলিকে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে এবং সেগুলির বর্ণালী বিশ্লেষণ করে অনুমান করা হলো যে, গ্রহগুলির মধ্যে একমাত্র মঙ্গলগ্রহেই হয়তো জীবনের অস্তিত্ব আছে। তাই মঙ্গলগ্রহ নিয়ে গবেষণার অন্ত নেই। প্রায় এক শত বছর আগে ইটালীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী জি. ভি. সিয়াপারেলি মঙ্গলগ্রহের উজ্জ্বল কয়েকটি অংশে কতকগুলি প্রায় সোজা সোজা সূক্ষ্ম দাগ দেখতে পান, যেগুলির নাম দিয়েছিলেন তিনি ক্যানেল বা খাল। তিনি এবং তাঁর পরবর্তী কালের গবেষক লভেল ও সহকর্মীরা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখলেন যে, খালগুলি যেন গ্রহটির উপর কতকগুলি কালো কালো অঞ্চলকে সেগুলির মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থিত এক-একটি ছোট গোলাকৃতি বিন্দুর সঙ্গে সুসংবদ্ধভাবে

যোগাযোগ স্থাপন করিয়ে দিচ্ছে। তাঁরা ভাবলেন যে, ঐ বিন্দুগুলি হয়তো জলাশয়। তাই সেগুলির নাম দিলেন হ্রদ। ঐ হ্রদের জলকে কালো অঞ্চলের শুকনো জমিতে সরবরাহ করবার জন্যেই যেন খালগুলি কেটে রেখেছে মঙ্গলগ্রহের কোন বুদ্ধিমান জীব। এই ধারণার পরিবর্তন হলো উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে, যখন ই.এম.অ্যান্টনিয়াডি, মিউডন মানমন্দিরের 32″ ব্যাসবিশিষ্ট দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ঐসব খালের আরও নিখুঁত পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্তে এলেন যে, ঐসব দাগ খুবই আঁকাবাকা এবং কোন প্রাকৃতিক উপায়ে সৃষ্ট। বুদ্ধিমান জীবের ক্রিয়াকলাপ হিসাবে সেগুলিকে মোটেই মনে হয় না। কালক্রমে ইউরোপ ও আমেরিকার জ্যোতির্বিজ্ঞানীরাও একই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন। 1941 সালে জ্যোতির্বিদ্ লিয় ও তাঁর সহকর্মীদের গবেষণায় এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছিল পিকি ডু মানমন্দিরে। তাঁরা এবং পরবর্তীকালে 1948 সালে এডলফাস বড় দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখতে পান যে, খালের মত যেগুলিকে মনে হতো, সেগুলির কোন কোনটি আসলে কতকগুলি বিক্ষিপ্ত বিন্দুর সারি ছাড়া আর কিছুই নয়।

দূরবীক্ষণ যন্ত্রের ভিতর দিয়ে দেখলে মঙ্গলগ্রহের মেরু অঞ্চলকে খুব চক্‌চকে সাদা মনে হয়। ঐ অঞ্চলের পরিধি ও অবস্থান সেখানে ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বদ্‌লাতে দেখা যায়। এখন জানা গেছে যে, ঐ উজ্জ্বল মেরু অঞ্চল আসলে বরফে ঢাকা। মঙ্গলগ্রহের কোন গোলার্ধে শীতের পর গরমকাল এগোবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ মেরু অঞ্চল ক্রমশঃ ছোট হয়ে যায়, যা থেকে অনুমান করা হয় যে, ঐ সময় মেরু প্রদেশের বরফ ক্রমশঃ অন্তর্হিত হয়ে যায়। সেই সঙ্গে মেরুপ্রদেশের চারধারের কালো অঞ্চল বিস্তার লাভ করতে থাকে এবং অবশেষে বিষুব অঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে, কালো অঞ্চলগুলি বিস্তার লাভ করবার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলির রংও বদ্‌লাতে থাকে। মঙ্গলগ্রহে বসন্তের সুরু থেকে ঐসব অঞ্চলের রং ধূসর, নীল অথবা সবুজ থেকে বদ্‌লে গিয়ে বাদামী হয়ে যায়। অঞ্চলবিশেষে সময় সময় রং বদ্‌লে গিয়ে বেগুনী ও ক্রিমসন বর্ণও ধারণ করে। ঐসব রঙীন অঞ্চলে কি আছে, তা নিয়ে গবেষণা সুরু হলো। 1948 সালে পিকারিং বললেন যে, ওগুলি সমুদ্র হতে পারে না। টেলার ও কেসেনকফ এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিকেরা প্রমাণ করলেন যে, ঐসব অঞ্চলে কোন তরল পদার্থই থাকতে পারে না। অনেকে মনে করলেন রঙীন অঞ্চলগুলি আসলে আমাদের পৃথিবীর মত গাছপালায় আবৃত।

মঙ্গলগ্রহে জীবনের অস্তিত্ব থাকতে হলে সেখানে জীবের উপযোগী বায়ুমণ্ডল থাকা প্রয়োজন। তাই সেখানকার বায়ুমণ্ডলের প্রকৃতি নিয়েও গবেষণা চলেছে। মঙ্গলগ্রহের বর্ণালী বিশ্লেষণ করে অনুমান করা যায় যে, সেখানে আছে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস। জ্যোতির্বিজ্ঞানী কুইপারের মতে, এই গ্যাসের পরিমাণ হবে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে যা আছে, তার দ্বিগুণ। অপর দিকে 1933 সালে অ্যাডাম্‌স্ ডানহ্যাম অনেক চেষ্টা করেও মঙ্গলগ্রহের আবহাওয়ায় অক্সিজেনের অস্তিত্বের কোন নিদর্শন পেলেন না। পরবর্তী কালে তিনি মাউন্ট উইলসন মানমন্দিরে শক্তিশালী যন্ত্রাদির সাহায্যে পরীক্ষা করেও গ্রহটিতে জলীয় বাষ্পের কোন নিদর্শন পেলেন না। 1948 সালে তিনি হিসাব করে দেখলেন যে, জলীয় বাষ্প যদিও থাকে, তবে তার পরিমাণ প্রতি 600 ভাগের মধ্যে এক ভাগের বেশী হবে না। তত্ত্বগত হিসাবে অনুমান করা হয় যে, মঙ্গলগ্রহের আবহাওয়ায় নাইট্রোজেন ও আর্গন গ্যাস আছে।

মঙ্গলগ্রহের আবহাওয়ায় অনেক সময় রং-বেরঙের মেঘ দেখা যায়। নানা রঙীন

কাচের মধ্যে দিয়ে মঙ্গলগ্রহকে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করে সেখানকার আবহাওয়ায় নীল, হল্দে ও সাদা রঙের মেঘ লক্ষ্য করা গেছে। তাছাড়া গ্রহটির গায়ে মাঝে মাঝে কতকগুলি বিন্দুর আকারে বেগুনী স্তর দেখা যায়। এগুলি আসলে হয়তো ঘনীভূত জলীয় বাষ্প, না হয় ঘনীভূত কার্বন ডাই-অক্সাইড। নীলাভ মেঘগুলি সম্পর্কে রাশিয়ার জ্যোতির্বিদ্ খারোনভ এবং আরও অনেকে বললেন যে, ওগুলি আসলে গভীরভাবে ঘনীভূত গ্যাস, যা আছে বেগুনী স্তরে। হল্দে মেঘগুলি সম্বন্ধে ডগলাস এবং অ্যান্টনিয়াডির ধারণা হলো যে, ওগুলি হয়তো মঙ্গলগ্রহের কোন মরুময় অঞ্চলে ধূলিঝড়ের সময় উত্থিত ধূলিমেঘ। কেউ কেউ অবশ্য বললেন যে, হল্দে মেঘগুলি আসলে মঙ্গল-গ্রহের কোন আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্ন্যুৎপাতের সময় উত্থিত ধূলিমেঘ। সাদা রঙের মেঘগুলি সাধারণতঃ গ্রহটির কালো অঞ্চলগুলির উপর দেখা যায় এবং অনেকের মতে, এগুলির সঙ্গে সৌরবিকিরণের সম্পর্কে আছে। মঙ্গল-গ্রহের শীতকালে মেরু অঞ্চলে নীলাভ কুয়াশার মত দেখা যায়। গরম আসবার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে কুয়াশাটা ক্রমে কেটে যায়।

মঙ্গলগ্রহে বায়ুমণ্ডলের চাপ জীবের জীবনধারণের উপযোগী কিনা, সে সম্বন্ধেও গবেষণা হয়েছে। পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে পর্যবেক্ষণ করে মনে হয়েছে যে, সেখানে বায়ুমণ্ডলের চাপ খুবই কম; হয়তো পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের চাপের $\frac{1}{11}$ ভাগ হবে। মঙ্গলগ্রহের পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রা জীবের পক্ষে অনুকূল কিনা, তা জানবার উদ্দেশ্যে 1922 সালে লাওয়েল মানমন্দিরের জ্যোতির্বিজ্ঞানী কোবলেনৎজ, ল্যাম্পল্যাণ্ড এবং মেঞ্জেল মঙ্গলগ্রহের চিত্র দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্য দিয়ে থার্মোকাপল্ নামে সূক্ষ্ম তাপনির্ণায়ক যন্ত্রের উপর ফেলে সরাসরি-গ্রহটির পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রা নির্ধারণ করেন। দেখা গেল যে, পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রা গড়ে -40° সেন্টিগ্রেড হবে। সেখানকার গরম-কালে দুপুরবেলায় অবশ্য কতকগুলি অঞ্চলে 0° সেন্টিগ্রেডের উর্ধ্বে—এমন কি, 20° সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত তাপমাত্রা উঠতে পারে। পরবর্তী কালে মঙ্গল-গ্রহের পৃষ্ঠদেশ থেকে বিকিরিত অবলোহিত রশ্মির পরিমাপ করে জানা গেছে যে, ঐ তাপমাত্রা সেখানকার দুপুরে সূর্য ঠিক মাথায় উপরে এলে 33° সেন্টিগ্রেড হতে পারে। আবার মেরু অঞ্চলে তাপমাত্রা হয়তো মাত্র -72° সেন্টিগ্রেড। 1956 সালে জ্যোতিবিজ্ঞানী মেয়ার ও তাঁর সহকর্মীরা 50 ফুট ব্যাসবিশিষ্ট বেতার-দূরবীক্ষণ যন্ত্র সহযোগে 3.15 সেন্টিমিটার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্ত করেন যে, সমগ্র পৃষ্ঠদেশের গড় তাপমাত্রা হবে -55° সেন্টিগ্রেড। 1958 সালে আরও নিখুঁৎ পর্যবেক্ষণে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈজ্ঞানিকেরা দেখালেন যে, ঐ গড় তাপমাত্রা হলো -62° সেন্টিগ্রেড। বেতার-তরঙ্গের মাধ্যমে নির্ধারিত এই গড় তাপমাত্রা অবশ্য ঠিক পৃষ্ঠদেশের বলা যায় না বরং এটা আসলে মঙ্গলগ্রহের মাটির নীচের খানিকটা তাপমাত্রা সূচিত করে। বস্তুতঃ রেডার যন্ত্রের সাহায্যে বেতার-তরঙ্গের ঝলক পাঠালে ঝলকটি গ্রহটির মাটিকে কিছুটা ভেদ করে গিয়ে নীচ থেকে প্রতিফলিত হয়। 1963 সালে গোল্ডষ্টাইন ও গিলমোর এবং কটেলনিকভ ও তাঁর সহকর্মীরা দেখলেন যে, ঐ প্রতিফলন-শক্তি মঙ্গলগ্রহের দ্রাঘিমার সঙ্গে পরিবর্তন হয়। 1965 সালে ইভান্স এবং অ্যারেকিবোর আয়োনোস্ফিয়ার গবেষণা কেন্দ্রে ডাইস অনুরূপ প্রতিফলন-শক্তির তারতম্য লক্ষ্য করেন। এই সব গবেষণা থেকে অনুমান করা গেল যে, মঙ্গলগ্রহের মাটি শক্ত পাথরে গড়া নয়। আর প্রতিফলন-শক্তির তারতম্য থেকে মনে হলো যে, ঐ মাটির গঠন সর্বত্র এক রকম নয়, না হয় ঐ মাটি এক এক জায়গায় এক এক রকমভাবে অমসৃণ।

বিগত দশকে কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠিয়ে মঙ্গল গ্রহের খুব কাছ থেকে তোলা আরও নিখুঁৎ চিত্র পাওয়া গেছে। 1965 সালের জুলাই মাসে আমেরিকার কৃত্রিম উপগ্রহ মেরিনার-4 স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরা ও টেলিভিসন যন্ত্র বহন করে মঙ্গলগ্রহের 6000 মাইলের মধ্যে গিয়ে খুব চমকপ্রদ অনেকগুলি ছবি পৃথিবীতে পাঠিয়েছে। ছবিগুলিতে মঙ্গলগ্রহে তথাকথিত খালের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নি বরং দেখা যায়, অনেকগুলি আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ সদৃশ গহ্বর বিক্ষিপ্তভাবে রয়েছে, যার সংখ্যা সমগ্র গ্রহটিতে অন্ততঃপক্ষে 10,000 হবে। বলা বাহুল্য, এই ধরণের জ্বালামুখ চাঁদের গায়ে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরিষ্কারভাবে দেখা যায়। তাই মনে হয়, মঙ্গলগ্রহেও ঐ গহ্বরগুলি একই কারণে সৃষ্ট হয়েছে। বড় বড় উল্কাপাতকে এরকম জ্বালামুখ সৃষ্টির কারণ হিসাবে বলা হয়। উল্কাপিণ্ড গ্রহের জমিতে পড়ে সেখানে অতবড় গহ্বরের সৃষ্টি করে। পৃথিবীর ক্ষেত্রে অবশ্য অধিকাংশ উল্কাপিণ্ডই বায়ুমণ্ডলে ঢোকবার সময় ঘর্ষণের ফলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়—যদিও কদাচিৎ দু-একটা বিশালাকার উল্কাপিণ্ডকে ঐভাবে সম্পূর্ণ না পুড়ে মাটিতে পড়তে দেখা যায়। তবে পৃথিবীর গায়ের ঐ সব উল্কাপাতের দাগ জলীয় বাষ্পসমৃদ্ধ বায়ুমণ্ডলের সংস্পর্শে এসে দ্রুতভাবে পরিবর্তিত হতে থাকে এবং শেষে মিলিয়ে যায়। চাঁদের বেলায়—এমন কি, মঙ্গল গ্রহেও যেখানে বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্প প্রায় নেই বললেই চলে, সেখানে গহ্বরগুলি দীর্ঘকাল অপরিবর্তিত অবস্থায় থেকে যায়।

পৃথিবী থেকে মঙ্গলগ্রহ, তথা যে কোন জ্যোতিষ্ককে পর্যবেক্ষণ করবার প্রধান অসুবিধা হলো, ধূলিকণাবহুল বায়ুমণ্ডলের শোষণ। তাই 1969 সালে ষ্টারস্কোপ-2 নামে একটি বেলুনে করে 36" ব্যাসের একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্রকে পৃথিবীপৃষ্ঠের 15 মাইল উপরে পাঠানো হয়। একদিন পরে টেলিস্কোপটি প্যারাসুটের সাহায্যে পৃথিবীতে নেমে আসে, মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে বহুবিধ তথ্য সংগ্রহ করে। এই সব তথ্য বিশ্লেষণ করে মনে হয়, মঙ্গলগ্রহের আবহাওয়ায় হয়তো অল্প পরিমাণে জলীয় বাষ্প আছে। বলা বাহুল্য, জলীয় বাষ্পের অস্তিত্বটা জীব সৃষ্টি ও তার বেঁচে থাকবার ব্যাপারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য হয়ে থাকে। যদি আমরা মনে করি, মঙ্গলগ্রহের আবহাওয়া পৃথিবীর আবহাওয়ার মত একই রকম বিবর্তনের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে, তাহলে বলতে হয় যে, সেখানে প্রথমে ছিল জল, হাইড্রোজেন এবং অ্যামোনিয়া। এগুলির মধ্যে কিছু পরিমাণ জল উচ্চ বায়ুমণ্ডলের আলোক-রাসায়নিক (Photo-Chemical) ক্রিয়াকলাপে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনে রূপান্তরিত হয়। অতঃপর মঙ্গলগ্রহের দুর্বল মাধ্যাকর্ষণের ফলে হাইড্রোজেন গ্যাস ক্রমে গ্রহ ছেড়ে মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়ে। আর তখন অ্যামোনিয়া ভেঙ্গে গিয়ে তার একটি রাসায়নিক উপাদান নাইট্রোজেনের সৃষ্টি হয়। এমন কি, যতটা হাইড্রোজেন মিথেন গ্যাসের আকারে ছিল, তাও ভেঙ্গে গিয়ে অন্তর্হিত হলো মহাশূন্যে আর মিথেন গ্যাসের অপর একটি উপাদান কার্বনের সঙ্গে আবহাওয়ার অক্সিজেনের রাসায়নিক মিলনের ফলে তৈরি হলো কার্বন ডাই-অক্সাইড। এই সব রাসায়নিক পরিবর্তনের সময় জৈব পদার্থ তথা জীবের সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। তবে সেখানে এভাবে সৃষ্ট জীবনের নিদর্শন যদিও থাকে, তাহলে তা আমাদের পৃথিবীর মত উন্নত স্তরের হবে না। কারণ সেখানকার বায়ুমণ্ডল কার্বন ডাই-অক্সাইড ও নাইট্রোজেন প্রধান। তাছাড়া বায়ুমণ্ডলের চাপ, মেরিনার-4-এর সাহায্যে সর্বশেষ যা জানা গেছে, তা হলো পৃথিবীর বায়ুচাপের 200 ভাগের এক ভাগ মাত্র।

মঙ্গলগ্রহ ছাড়া সৌরমণ্ডলের আর যে সব গ্রহে জীবের সন্ধান করা হচ্ছে, তার মধ্যে আছে শুক্রগ্রহ, যাকে আমরা সন্ধ্যার আকাশে শুকতারা-রূপে দেখে থাকি। বলা বাহুল্য, মঙ্গল ও শুক্র—এই গ্রহ দুটিই পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে। আর সূর্য থেকে শুক্র, পৃথিবী ও মঙ্গল গ্রহের দূরত্ব হলো যথাক্রমে 6½ কোটি, 9 কোটি 30 লক্ষ এবং 14 কোটি মাইল। আয়তনে মঙ্গলগ্রহ পৃথিবীর প্রায় ⅛ ভাগ আর শুক্রের আয়তন পৃথিবীরই মত।

শুক্রগ্রহ নিয়ে বহু গবেষণা হয়েছে। কিন্তু গ্রহটির পৃষ্ঠদেশের গঠন ও প্রকৃতি কি রকম—সে বিষয়ে বৈজ্ঞানিকেরা আজও একমত হতে পারেন নি। প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মধ্যে কেউ কেউ বললেন যে, গ্রহটির পৃষ্ঠদেশে আছে মরুভূমি, কেউ বা বললেন, সেখানে আছে সমুদ্র আবার কেউ হয়তো বললেন, ওখানে আছে তেলের সমুদ্র। পৃষ্ঠদেশের বিষয়ে এত মতভেদের প্রকৃত কারণ হলো এই যে, সেটি সব সময়ে খুব ঘন মেঘের স্তরে আচ্ছাদিত থাকে। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্য দিয়ে গ্রহটির বর্ণালী বিশ্লেষণ করে জানা গেছে যে, ঐ মেঘের স্তরে আছে কার্বন ডাই-অক্সাইড। কিন্তু কোন জলীয় বাষ্প বা অক্সিজেনের নিদর্শন ঐ বিশ্লেষণে পাওয়া যায় না। ঘন মেঘের আচ্ছাদন থাকাতে গ্রহটির আহ্নিক গতির হিসাব করাও খুব কঠিন ব্যাপার। মানমন্দির থেকে পর্যবেক্ষণ করে যতটা জানা গেছে, তাতে বলা যায় শুক্রগ্রহ পৃথিবীর তুলনায় অনেক আস্তে আস্তে ঘোরে, যার ফলে 14 ঘণ্টায় সেখানে হয় 1 দিন। শুক্রগ্রহের ঘন মেঘের আচ্ছাদনটির বিষয়ে আরও নূতন খবর পাবার আশায় 1959 সালে জন ষ্ট্রং ও তাঁর সহকর্মীরা একটি বেলুনে যন্ত্রপাতিসহ মানুষকে পাঠালেন পৃথিবী পৃষ্ঠের প্রায় 80,000 ফুট উর্ধ্বে। স্বভাবতঃই এই পর্যবেক্ষণ অনেকাংশে আমাদের বায়ুমণ্ডলের শোষণের হাত থেকে মুক্ত ছিল। এই গবেষণায় মনে হয়েছিল যে, শুক্রগ্রহের উচ্চ বায়ুমণ্ডলে হয়তো জলীয় বাষ্পের চিহ্ন আছে। শুক্রগ্রহের পৃষ্ঠদেশের খবর সংগ্রহের আরও চেষ্টা হতে থাকে। অবলোহিত রশ্মির মাধ্যমে গবেষণা করে দেখা গেল, ঐ রশ্মিও মেঘের আচ্ছাদন ভেদ করতে পারে না। তবে ঐ গবেষণা মেঘের স্তরে 40 কিলোমিটার উর্ধ্বের বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রার খবর দিল, যা হলো -39° সেন্টিগ্রেড। এরপর বেতার-তরঙ্গের মাধ্যমে গবেষণার চেষ্টা করা হলো। 1956 সালে মেয়ার ও তাঁর সহকর্মীরা 3·15 সেন্টিমিটার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে পর্যবেক্ষণ করে দেখলেন যে, ঐ বেতার-তরঙ্গ মেঘের আচ্ছাদন ভেদ করে পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রার খবর দিতে পারছে। জানা গেল ঐ তাপমাত্রা হবে 327° সেন্টিগ্রেড। এরপর 4 মিলিমিটার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বেতার-তরঙ্গের মাধ্যমে গবেষণা করে জানা গেল যে, নিম্ন বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা হবে প্রায় 117° সেন্টিগ্রেড এবং তা এত ঘন যে, বেতার-তরঙ্গ পৃষ্ঠদেশ থেকে প্রায় 25 কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত বায়ুস্তরটিকে মিলিমিটার বেতার-তরঙ্গটি ভেদ করতে পারে না। 1962 সালের অগাস্ট মাসে আমেরিকার কেপ কেনেডি থেকে উৎক্ষিপ্ত মেরিনার-2 নামে কৃত্রিম উপগ্রহটি নানাবিধ স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি বহন করে নিয়ে শুক্র-গ্রহের রহস্য উন্মোচন করলো। মেরিনার-2 শুক্র-গ্রহের প্রায় 22,000 মাইলের মধ্যে পৌঁচেছিল এবং যে সব তথ্য পৃথিবীতে পাঠিয়েছে, তা থেকে জানা যায় যে, শুক্রগ্রহের দিন ও রাত্রির সীমারেখায় তাপমাত্রা হলো প্রায় 425° সেন্টিগ্রেড এবং জলের কোন চিহ্নও সেখানে নেই বলে মনে হয়। অপর পক্ষে, মেঘের তাপমাত্রা অনেক গুণে কম, অর্থাৎ মাঝামাঝি উচ্চতায় হবে -35° সেন্টি-গ্রেড এবং আরও বেশী উচ্চতায় হবে প্রায় -50° সেন্টিগ্রেড। এসব তথ্য থেকে মনে হয় যে, শুক্রগ্রহ কতকগুলি বিষয়ে যদিও পৃথিবীর সঙ্গে তুলনীয়, তবুও পৃষ্ঠদেশের কাছে ঐ নিদারুণ

তাপমাত্রা কোন রকম জীবনধারণেরই অনুপযোগী। এই ধারণাটা আরো জোরালো হলো 1967 সালের অক্টোবর মাসে, যখন রাশিয়ার প্রেরিত কৃত্রিম উপগ্রহ ভেনাস-4 ঐ মেঘের আচ্ছাদনকে একেবারে ভেদ করে গিয়ে শুক্রগ্রহের উপর খুব আস্তে আস্তে অক্ষত অবস্থায় অবতরণ করলো। ভেনাস-4 কর্তৃক প্রেরিত তথ্যাদি থেকে জানা যায় যে, শুক্রগ্রহের বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের তুলনায় প্রায় 15 গুণ ঘন এবং গ্রহটির জমিতে তাপমাত্রা 277° সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত হতে পারে। এক্ষেত্রে বাস্তবিকই শুক্রগ্রহে কোন রকমের জীবের বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।

সৌরমণ্ডলের বাকী গ্রহগুলির মধ্যে বুধগ্রহ হলো সূর্যের সবচেয়ে নিকটে এবং তার উপর আবার সেটি সব সময় একটা পিঠই সূর্যের দিকে ফিরিয়ে থাকে। তাই ঐ পিঠের তাপমাত্রা 350—450° সেন্টিগ্রেডের মত হবে। তাছাড়া বুধগ্রহের মাধ্যাকর্ষণও খুব দুর্বল। এমতাবস্থায় কোন রকম বায়ুমণ্ডলই শুক্রগ্রহ ধারণ করে রাখতে পারে না। এসব কারণে সেখানে কোন রকম জীবের অস্তিত্বের প্রশ্নই ওঠে না।

সৌরমণ্ডলের সবচেয়ে দুটি বড় গ্রহ বৃহস্পতি ও শনিতে হয়তো তরল ও গ্যাসীয় পদার্থ ছাড়া আর কিছুই নেই। গ্রহ দুটি সূর্য থেকে অনেক দূরে থাকায় তাদের তাপমাত্রা হয়তো −100° সেন্টিগ্রেডের কম হবে। যদি সেখানে জল থাকেও, তবে তা নিশ্চয়ই বরফের আকারে থাকবে। তাছাড়া সেখানকার আবহাওয়ায় বিষাক্ত অ্যামোনিয়া ও মিথেন গ্যাসের নিদর্শন পাওয়া যায়। বৃহস্পতির গড় ঘনত্বের পরিমাপ থেকে মনে হয় যে, গ্রহটির অন্তঃস্থলে একটা বিরাট পাথুরে কেন্দ্রীন বা নিউক্লিয়াস আছে। আর শনির গড় ঘনত্ব সূচিত করে যে, সেটির কেন্দ্রীন অনেক ছোট এবং তা হয়তো প্রধানতঃ তরল হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম এবং আংশিকভাবে অ্যামোনিয়া ও মিথেন দিয়ে আবৃত। এসব তথ্য থেকে মনে হয় যে, বৃহস্পতি ও শনিতে সেখানকার আবহাওয়ায়, বিশেষতঃ অত অল্প তাপমাত্রায় জীব থাকা সম্ভব নয়। আজকাল অবশ্য এই ধারণার কিছু পরিবর্তন হতে চলেছে। 1959 সালে ম্যাকক্লেন এবং স্লোনকার আমেরিকার ন্যাভাল রিসার্চ লেবরেটরী থেকে 84 ফুট ব্যাস-বিশিষ্ট বেতার-দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে 10 সেন্টিমিটার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে গবেষণা করে দেখেন যে, বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডলের নীচে তাপমাত্রা প্রায় 17° সে. থেকে 587° সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত হতে পারে। তাই বৈজ্ঞানিক আর্থার ক্লার্ক মনে করেন যে, বৃহস্পতিগ্রহে যদিও উচ্চ বায়ুমণ্ডলের আবহাওয়া খুবই কম, নীচের দিকে পৃষ্ঠদেশের আবহাওয়া অনেক গরম—এমন কি, পৃথিবীর চেয়েও গরম হতে পারে। এমতাবস্থায় তাঁর মনে হয় যে, সেখানকার হাইড্রোজেন, মিথেন ও অ্যামোনিয়ার আবহাওয়ায় সৃষ্ট হতে পারে খুব আদিম কালের নিম্ন স্তরের জীব, ঠিক যেমন হয়েছিল পৃথিবীর ক্ষেত্রে প্রথম জীব সৃষ্টির সময়ে।

ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটো হলো সৌরমণ্ডলের সবচেয়ে দূরবর্তী গ্রহ। তাই সেখানকার তাপমাত্রা আরও অনেক কম হবে। ইউরেনাস ও নেপচুনের আবহাওয়ায় প্রধানতঃ মিথেন গ্যাস আছে। প্লুটোর তাপমাত্রা হয়তো −273° সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি। বলা বাহুল্য −273° সেন্টিগ্রেড হলো সর্বনিম্ন তাপমাত্রা, যার নীচে কোন তাপমাত্রা কখনও নামতে পারে না। স্বভাবতঃই এত কম তাপমাত্রায় প্লুটোতে কোন পদার্থই গ্যাসীয়, এমনকি তরল অবস্থাতেও থাকতে পারে না। এই পরিবেশে কোন জীবের অস্তিত্বের কথা ভাবাই যায় না।

আমাদের সৌরমণ্ডলের যাবতীয় গ্রহের হিসাব-নিকাশ করে এটা বেশ মনে হচ্ছে যে, হয়তো এগুলির মধ্যে আমাদের এই ধরিত্রীরই সৌভাগ্য

হয়েছে আমাদের মত উন্নত স্তরের জীব ধারণ করবার। অন্যান্য গ্রহের মধ্যে একমাত্র মঙ্গল-গ্রহে হয়তো কোন রকম উদ্ভিদাদি থাকতে পারে, যার চেহারা নিঃসন্দেহে পৃথিবীর উদ্ভিদ-জগতের তুলনায় অনেক ভিন্ন রকমের হবে। আর অন্যান্য গ্রহগুলির মধ্যে বৃহস্পতিতে খুব আদিম কালের জীব আছে কিনা, তা এখনও বহু গবেষণা-সাপেক্ষ।

আমরা সৌরমণ্ডলের একমাত্র বুদ্ধিমান অধিবাসী হলেও সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সত্যই কি আমরা একলা? এই নিয়ে আজ জল্পনা-কল্পনার অন্ত নেই। তবে কল্পনার গতি পেরিয়ে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের আওতায় এই ব্যাপারটিকে আনা এখনও পর্যন্ত সম্ভব হয় নি। এর প্রধান কারণ হলো দুটি সম্ভাব্য উন্নত স্তরের জীবজগতের অপরিসীম দূরত্ব। এই দূরত্বের হিসাব করতে গিয়ে প্রথমেই বেছে নেওয়া হয় সেই সব তারাকে, যাদের বর্ণালী অনেকটা সূর্যের মত। দ্বিতীয়টি ঐসব তারার চারপাশে সৌরমণ্ডলের মত গ্রহও থাকা প্রয়োজন। তার উপর আবার ঐসব গ্রহের কোন কোনটির পরিবেশ হতে হবে আমাদের পৃথিবীর মত। এই সব নানা দিক দিয়ে বিচার করে হিসাব করলে দেখা যায় যে, আধুনিক দূরবীক্ষণে যত তারা দেখা যায়, তার মধ্যে 10 লক্ষ থেকে 10 হাজার কোটি তারা থাকতে পারে, যাদের গ্রহে বুদ্ধিমান জীব আছে। এথেকে হিসাব করা যায় যে, দুটি সভ্যজগতের গড় দূরত্ব কয়েক শত আলোক-বর্ষের কম নয় এবং সম্ভবতঃ তা হবে কয়েক হাজার আলোক-বর্ষ। তাই এহেন দূরত্বে আলো বা বেতার-তরঙ্গ পৌঁছুতেই হয়তো লেগে যাবে কয়েক হাজার বছর। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে জীবজগতের সন্ধানের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হলো তারার চারপাশে গ্রহের অস্তিত্ব। এখন পর্যন্ত কোন উপায় জানা নেই, যার সাহায্যে কোন একক তারার চারপাশের গ্রহের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যাবে। তবে কতকগুলি যুগ্মতারা আকাশে দেখা যায়, যারা পরস্পরের চারপাশে আবর্তিত হয়ে থাকে। তারা দুটির এহেন গতিবিধির তারতম্য লক্ষ্য করে প্রমাণ করা গেছে যে, ঐ যুগ্ম-তারার গ্রহ আছে, আর সেই গ্রহই তারার গতিবিধিকে আংশিকভাবে প্রভাবিত করছে। মাত্র দশ আলোক-বর্ষ দূরের এহেন দুটি যুগ্ম-তারা 61-সিগনি এবং 70-অফিউসি। এদের প্রত্যেকটিরই যে নিজস্ব গ্রহ আছে, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। সম্প্রতি আর একটি গুরুত্ব-পূর্ণ গবেষণায় এহেন একটি তারার জগতে পশ্চিম ভার্জিনিয়ার গ্রীনব্যাঙ্ক মানমন্দির থেকে বেতার-সঙ্কেত পাঠানো হয়েছে। প্রায় 10 আলোক-বর্ষ দূরের এই তারার রাজ্য থেকে প্রেরিত ঐ সঙ্কেতের প্রতিধ্বনি বা কোন রকম উত্তর পেতে আরও কয়েক বছর অপেক্ষা করতে হবে।

কেবলমাত্র উন্নত স্তরের জীবের কথা না ভেবে যদি উচ্চ-নিম্ন নির্বিশেষে যে কোন রকম জীবের কথা ধরা যায়, তাহলে জ্যোতির্বিজ্ঞানী হয়াঙের মতে, ঐ রকম জীবের সংখ্যা আমাদের নিজস্ব বিশ্বেই আছে হয়তো প্রায় দুই কোটি। বলা বাহুল্য, আমাদের বিশ্ব বলতে বোঝা যায় অগণিত তারার একটি সমন্বয়, যা এককভাবে নিজ কেন্দ্রের চারপাশে ঘুরে থাকে। আমাদের সূর্যস্বরূপ তারাটি ঐ কেন্দ্রের প্রায় 30,000 আলোক-বর্ষ দূরে থেকে নিজস্ব গ্রহরাজ্য নিয়ে তারার সমন্বয়টির একটি হয়ে অংশ গ্রহণ করে ঐ সামগ্রিক ঘূর্ণনে। এই ঘূর্ণায়মান তারার সমন্বয়টিই হলো আমাদের বিশ্ব, যা রাত্রির চন্দ্রবিহীন আকাশে দেখা যায় ছায়াপথের আকারে। এহেন বিশ্ব, সাথা মহাবিশ্বে যতদূর দূরবীক্ষণের নাগালে আসে, তার মধ্যে আছে প্রায় 1 হাজার কোটি।

সমগ্র মহাবিশ্বে অসংখ্য সভ্যজগতের সঙ্গে যোগাযোগের পথে সবচেয়ে বড় বাধা বলা যায়—তাদের পারস্পরিক দূরত্ব। কারণ ঐ যোগাযোগের জন্যে বেতার বা বেতারের আলোক-তরঙ্গ সংস্করণ লেসার ব্যবহার করলেও যেখানে সময় লাগবে হয়তো কয়েক হাজার বছর, সেখানে কোন মানুষের অভিযান করাটা একেবারে অবাস্তব মনে হবে—এই বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে কোন যানের গতিবেগ যদি আলোর গতিবেগের কাছাকাছি করা যায়, তাহলে আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ অনুসারে অভিযাত্রীর সময়ের মাপকাঠি পৃথিবীর তুলনায় অনেক বড় হয়ে যাবে, যার ফলে সে বহু দিনই নবীন থেকে যাবে, সহজে বৃদ্ধ হবে না বা মরবে না। হিসাবে দেখা গেছে, যদি কোন দিন কোন যানের গতিবেগ আলোর গতিবেগের শতকরা 99 ভাগ করা যায়, তাহলে যানটির অভিযানের সময় অনুযায়ী দশ আলোক-বর্ষ দূরের এপ্সিলন নামক তারার রাজ্যে পৌঁছুতে লাগবে মাত্র তিন বছর, যদিও পৃথিবীর সময় অনুযায়ী ঐ যাত্রার সময় মনে হবে 20 বছর দীর্ঘ। অনেকে ইতিমধ্যেই তত্ত্বগতভাবে দেখিয়েছেন যে, শক্তিশালী আলোক-রশ্মির সাহায্যে ফোটন রকেট নামে এমন যান তৈরি করা সম্ভব, যার গতিবেগ আলোর গতি-বেগের কাছাকাছি হতে পারে। তবে এই রকম দ্রুতগতিসম্পন্ন যান তৈরি করলেও আর একটি সভ্যজগতের দূরত্ব পর্যন্ত পৌঁছুবার উপযোগী আয়ু কোন মানুষের থাকা সম্ভব মনে হয় না। তাছাড়া যদি তাও সম্ভব হতো, পৃথিবীর মানুষ কখনই এত দীর্ঘায়ু হতে পারে না, যাতে একজনের জীবদ্দশায় ঐ অভিযানের ফলাফল জানতে পারতো। এমতাবস্থায় মানুষকে হয়তো রোবট বা যন্ত্রমানবের সাহায্য নিতে হবে, তারার রাজ্যে সভ্যজগতের সন্ধানে। বস্তুতঃ যন্ত্রমানব হলো একটি খুব উঁচুদরের কম্পিউটারবিশেষ। আগামী দিনের পারমাণবিক কম্পিউটার এই ব্যাপারে একটা বিরাট ধাপ এগিয়ে দিতে পারে। সম্প্রতি অনেক খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক মনে করেন, আলোর চেয়েও দ্রুতগতির সৃষ্টি করা সম্ভব। সে ক্ষেত্রে তারার রাজ্যে অভিযান হয়তো একদিন বাস্তবে পরিণত হতে পারে।

পৃথিবীর বাইরে দ্বিতীয় কোন সভ্যজগতের সঙ্গে যোগাযোগ ও সেখানে অভিযান করবার পথে এই সব বড় বড় বাধার কথা ভেবে এক এক সময় মনে হয় যে, ঐ দ্বিতীয় সভ্যজগতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনটা বোধ হয় আর কোনদিন হবে না। কেউ কেউ ভাবলেন—না, এমনও তো হতে পারে—এই সব জগতের এমন কোন কোনটি আছে, যাদের সভ্যতা আমাদের চেয়ে অনেক অনেক বেশী এগিয়ে গেছে। সেখানকার সভ্যতর জীব নিশ্চয় আমাদের মত অপেক্ষাকৃত কম উন্নত সভ্যতার খোঁজে আন্তর্জাগতিক যোগাযোগের কথাকে ভাবনার গণ্ডী পেরিয়ে বাস্তবে রূপায়িত করেছে। অতএব খুঁজে দেখা যাক, বহির্জগতের অতিমানবের বার্তাবহনকারী কোন সঙ্কেত আমরা পৃথিবী থেকে ধরতে পারি কিনা। ধরতে গিয়ে প্রথম সমস্যা হলো কোন্ মিটারে সঙ্কেত আসতে পারে, সে বিষয়ে অনুমান করতে গিয়ে। কেন না, ঐ মিটার বা বেতারের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যটা ঠিক কত, তা না জানলে তেমন শক্তিশালী গ্রাহক-যন্ত্র বা রেডিও তৈরি সম্ভব হবে না। পদার্থবিদ ককনি ও মরিসন ভাবলেন যে, অন্য জগতের অতি মানবেরা নিশ্চয়ই জানে 1420 মেগাসাইকেল তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে মহাশূন্যের হাইড্রোজেন পরমাণু একটা ক্ষীণ বেতার-তরঙ্গ বিকিরণ করে। বস্তুতঃ হাইড্রোজেন পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ ইলেকট্রনের ঘূর্ণনের দিক হঠাৎ উল্টে গেলেই ঐ রকম বিকিরণ আশা করা যায়। ঐ বিকিরণ ধরবার উদ্দেশ্যে বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের খুব শক্তিশালী বেতার

গ্রাহক-যন্ত্র ইতিমধ্যেই তৈরি করতে হয়েছে। তাই অন্ত জগতের অতিমানবও এই কথা বুঝতে পেরে হয়তো ঐ 1420 মেগাসাইকেলেই সঙ্কেত পাঠাবে। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে ড্রেক ওজমা নামক একটি পরিকল্পনার কাজ সুরু করলেন এবং চূড়ান্তভাবে শক্তিশালী একটি গ্রাহক-যন্ত্র তৈরি করলেন। কিন্তু ঐ যন্ত্রে কোন সঙ্কেতই ধরা পড়লো না। কেউ কেউ অবশ্য বললেন, অতিমানবের জগৎ হয়তো ভাবতে পারে না, 1420 মেগাসাইকেলে যখন হাইড্রোজেন পরমাণুর বিকিরণ ধরে মহাশূন্যের হাইড্রোজেন নিয়ে গবেষণা করতে হয়, তখন আর সেই একই তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে বেতার-সঙ্কেত পাঠিয়ে আমাদের গবেষণার বাদ সাধতে যাবে না। তাই সম্ভবতঃ অন্য কোন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে সঙ্কেত পাঠাতে পারে। এই বিষয়ে এখনও গবেষণা চলছে।

বস্তুতঃ ঐ রকম বেতারে সঙ্কেত পাঠাতে হলে অতিমানবের দেশের প্রেরক-যন্ত্রটির যতটা শক্তি বিকিরণ করতে হবে, তার পরিমাণ হলো অন্ততঃ 1 হাজার কোটি মেগাওয়াটের 1 হাজার কোটি গুণ (1 মেগাওয়াট=1000 কিলোওয়াট)। এই শক্তির তুলনায় পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশী যত শক্তি সৃষ্টি করা গেছে, তার পরিমাণ হলো 30 লক্ষ মেগাওয়াট। আগামী 20 বছরে ঐ শক্তির পরিমাণ হয়তো দ্বিগুণ করা যাবে এবং আগামী 200 বছরে হয়তো দাঁড়াবে 300 কোটি মেগাওয়াট। এর চেয়েও বেশী শক্তি সৃষ্টি করতে গেলে তা পৃথিবীতে বসে সৃষ্টি করা নিরাপদ হবে না। তাই সে ক্ষেত্রে হয়তো মানুষকে পৃথিবীর বাইরে কোথাও ঐ শক্তির সৃষ্টি করতে হবে। কালক্রমে আমাদের কোন প্রতিবেশী গ্রহের সবটাকে ব্যবহার করে পারমাণবিক প্রক্রিয়ায় শক্তিতে রূপান্তরিত করা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বেতার যোগাযোগের উপযোগী শক্তি আহরণ করা অসম্ভব হবে না। অপরপক্ষে কোন অতিমানবের জগৎ ইতিমধ্যেই ঐ পরিমাণ শক্তি সৃষ্টি করে থাকবে! রাশিয়ার বৈজ্ঞানিক অ্যাম্বে-বার্তসুমিয়ানের মতে—মহাবিশ্বে এমন অতিমানবের জগৎ থাকতে পারে, যেখানে ইতিমধ্যেই এত বিপুল শক্তি সৃষ্টি করা হয়েছে, যা আন্তর্জাতিক যোগাযোগের চাহিদার তুলনায় 1 হাজার কোটি গুণ বেশী। এহেন শক্তি দিয়ে অনায়াসে সেখানকার অতিমানব জীবজগৎ ধারণের উপযোগী সুবিশাল কৃত্রিম গ্রহ সৃষ্টি করতে পারবে। এমন কি, নিজেদের তারার জগতের গ্রহগুলিকে ভেঙ্গে গড়ে, তাদের গতিবিধি ও অবস্থান বদলে দিয়ে সম্পূর্ণরূপে বসবাসের উপযোগী করে তুলতে পারে। ঐ শক্তির সাহায্যে তারা ক্রমে নিজের তারকা-জগৎ ছেড়ে অন্য তারকা-র জগতে ছড়িয়ে পড়তে পারে। এইভাবে ক্রমে তার নিজ বিশ্বের সব কয়টি উপযুক্ত তারার রাজ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে। এসব ঘটতে সময় লাগবে হয়তো কয়েক কোটি বছর। বস্তুতঃ পৃথিবীতেও আমরা দেখে থাকি যে, সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও জীবনধারণের সবচেয়ে উপযোগী জীবই বেঁচে থাকে এবং চারদিকে তার বংশবিস্তারের চেষ্টা করে। তাই সে সব অতিমানব যে তার বংশকে নিজ ব্রহ্মাণ্ডের গণ্ডী পেরিয়ে সব কয়টি তারার রাজ্যে বিস্তারের চেষ্টা করবে না—একথা ভাববারও কোন কারণ নেই। তবে এই কথাও ধরে নেওয়া ঠিক হবে না যে, সমগ্র মহাবিশ্বের প্রতিটি সভ্যজগৎই একনাগাড়ে উন্নতির পথে যাবে। কেন না, সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতার অভিশাপগুলিও মাঝে মাঝে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে, যার ফলে অনেক সময় সভ্যতা হঠাৎ অনেকটা পিছিয়ে—এমন কি, লোপ পেয়ে যেতে পারে। রাশিয়ার বৈজ্ঞানিক স্কুভস্কির মতে, ঐ অভিশাপের কারণ হতে পারে পারমাণবিক শক্তির অপপ্রয়োগ, বংশবৃদ্ধি লোপ, মানুষের জ্ঞানার্জন ও জ্ঞান ধারণের ক্ষমতার অতিরিক্ত অগ্রগতি অথবা মানুষের সৃষ্ট কোন

কৃত্রিম জীবনের ফ্রাঙ্কেনষ্টাইনের দানবসুলভ ক্রিয়াকলাপ। সর্বশেষে, কোন অগ্রগামী সভ্যতা হয়তো তার রাজ্য বিস্তারের আর চেষ্টা না করে তাদের নিজেদের জীবনধারা'র নানাবিধ উন্নতির দিকেই নজর দিতে পারে। তবে এহেন প্রচেষ্টা—স্ক্লভস্কির মতে, সভ্যতার অবনতির পরিচায়ক। আর বহু সভ্যজগৎই থাকা সম্ভব, যারা এই অবনতির পথ এড়িয়ে চলবে। বলা বাহুল্য, আমাদের পৃথিবীতে পারমাণবিক বিস্ফোরণের অপপ্রয়োগজনিত সম্ভাব্য বিপর্যয়ের কথা মাঝে মাঝে উঠছে। তবে জডরেল ব্যাঙ্ক মানমন্দিরের অধ্যক্ষ সার লভেলের মতে, আধুনিক কালে মহাশূন্যে গবেষণার ব্যাপারে বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে পাল্লা দেবার মনোভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে, সেটাই হয়তো তাদের পারমাণবিক বিস্ফোরণের অভিশাপ থেকে রক্ষা করবে

মহাবিশ্বের অগণিত সভ্যজগতের কথা ভেবে মনে হয়, কি বিচিত্র এই সৃষ্টি। নতুন করে আর একবার আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন জাগে, সৃষ্টিকর্তা কি জীবজগৎ ধারণের উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে দেবার উদ্দেশ্যেই মহাবিশ্ব রচনা করেছেন, না জীবজগৎই বিরাট বিশ্বের মাঝখানে তার উপযুক্ত স্থান বেছে নিয়েছে? এইভাবে হতভম্ব হয়ে ক্ষণিকের জন্যে চেয়ে চেয়ে অবশেষে মনে হয়—সৃষ্টি-রহস্য কোনদিনই হয়তো উন্মোচিত হবে না। আমরা শুধুমাত্র জানবার চেষ্টা করে যাব। কারণ ঐ চেষ্টা হলো একান্তই সহজাত। তবে এই চেষ্টা করতে গিয়ে দেখা যায় যে, আমাদের তুলনায় অতি ছোট বা অতি বড়—এই দুয়েরই ধারণা করাটা হয়তো একই রকম কঠিন। তাই দেখা যায় যে, পদার্থের সূক্ষ্মতম অংশ ইলেকট্রন, প্রোটন, পজিট্রন—এই সব মৌলিক কণিকার পর্যবেক্ষণে একটা ন্যূনতম অনিশ্চয়তা অবশ্যম্ভাবী। অনুরূপভাবে হয়তো ঐ ক্ষুদ্রতম অংশের বৃহত্তম সমাবেশের গতিপ্রকৃতি নির্ধারণে একটা অনিশ্চয়তা অবশ্যম্ভাবী অর্থাৎ তা কখনও সম্পূর্ণভাবে জানা যাবে না। অতএব এই মহাবিশ্ব তথা তার সমগ্র জীবজগৎকে সম্পূর্ণভাবে জানবার হয়তো কোন আশা নেই। তবে কি সৃষ্টিকর্তা ইচ্ছা করেই আমাদের বুদ্ধিকে এমন সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন, যাতে কোন দিনই তাঁর সৃষ্ট রহস্য ভেদ করতে না পারি! আর এখানে এসেই প্রত্যেক বৈজ্ঞানিকের অনন্ত জিজ্ঞাসা হঠাৎ যেন ক্ষণিকের জন্যে স্তব্ধ হয়ে যায়, পরক্ষণেই হয়তো সে আবার স্বভাবসিদ্ধভাবে ছুটে চলে অজানার রহস্যসন্ধানে।

সঞ্চয়ন

মঙ্গলগ্রহের ধূলিঝড়

মার্স-2 এবং মার্স-3-এর আন্তগ্রহ অভিযান থেকে যেসব তথ্য সংগৃহীত হয়েছে, সেই সকল তথ্যের ভিত্তিতে উপনীত কতকগুলি সিদ্ধান্তের কথা দু-জন সোভিয়েট বিজ্ঞানী—ভি. মোরোজ এবং এল. ক্সানফোমালিতি ইজভেস্তিয়ায় লিখেছেন। তাঁরা বলেছেন যে, মঙ্গলগ্রহ মিহি ধূলিকণায় ঢাকা। সমুদ্রাঞ্চলও ধূলিকণায় ঢাকা, তবে সে ধূলিকণা আর একটু মোটা। ওখানে পাহাড়ের বিভিন্ন অংশে উদ্ভিদ বেশী হয়। মনে করা হচ্ছে যে, ধূলিঝড়ের সময় এই অঞ্চলের ধূলিকণা উপরে উঠে আবহাওয়ার সঙ্গে মিশে যায় এবং গ্রহের উপরিভাগে ছড়িয়ে পড়ে। এই ধরণের ধূলিঝড় গত অক্টোবরের প্রথম দিকে সুরু হয়েছিল এবং সেই ঝড় তিন মাস চলেছিল।

সূক্ষ্ম ধূলিকণাগুলি মঙ্গলগ্রহের আবহাওয়ায় খুব ধীরে ধীরে ছড়াতে থাকে। সে জন্যে এই সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল যে, ঝড় ওখানে দীর্ঘস্থায়ী হয় না অর্থাৎ যখন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হচ্ছিল, তখন সেখানে স্থায়ী বাতাস ছিল না। যে বাতাস মাটি থেকে ধূলিকণা উপরে তোলে, তা সম্ভবতঃ এই ব্যাপারটার প্রাথমিক পর্যায়ে প্রবাহিত হয়। তারপর শান্ত আবহাওয়ায় সেই ধূলিকণা অনেকক্ষণ ঝুলে থাকে।

এই ধূলিঝড় সৃষ্টির অর্থ হলো গ্রহের আবহাওয়ায় মেঘের সৃষ্টি। কিন্তু এই মেঘ অস্থায়ী। এই মেঘ শুক্রগ্রহের মেঘের মত নয়। শুক্রগ্রহে একটি স্থায়ী মেঘস্তর বিদ্যমান।

আরও বলা হয়েছে যে, মঙ্গলগ্রহের মেঘের উপরের প্রান্ত খুব উঁচু। সে উচ্চতা 8-10 কিলোমিটারের কম নয় এবং এই মেঘের উচ্চতা সব জায়গায় একরকম নয়। উঁচু জায়গায় তার উচ্চতা কম আর নীচু জায়গায় বেশী।

শুক্রগ্রহের আবহাওয়া এবং মেঘ সূর্যালোকের পক্ষে অনেকটা স্বচ্ছ। তাতে 'হট্ হাউসে'র ফল হয়—মাটি খুব তেতে যায়। মঙ্গলগ্রহে ধূলিঝড়ের সময় কি রকম প্রতিক্রিয়া হয়, সে সম্বন্ধে জানা গেছে যে, তখন বিপরীত ব্যাপারই ঘটে। গ্রহের তাপ নির্গমনে মেঘের স্তর কিছুটা স্বচ্ছ হয় এবং সূর্যালোকের হ্রস্ব তরঙ্গে তার চেয়ে বেশী স্বচ্ছ হয়। এই ক্ষেত্রে মাটি তেতে ওঠে না বরং ঠাণ্ডা হয়। আর আমরা 'হট হাউসে'র বিপরীত প্রতিক্রিয়া পাই। ধূলিঝড়ের সময় মাটির তাপ 20-30 ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড নীচে নেমে যায়। ঝড় থেমে যাবার পর তাপমাত্রা বেড়ে যায়। ধূলিঝড়ের সময় মাটি ঠাণ্ডা হয়, কিন্তু আবহাওয়া গরম থাকে, কারণ তা যথেষ্ট পরিমাণে সৌর বিকিরণ আত্মসাৎ করে।

ধূলিঝড়ের সময় এবং ধূলিঝড়ের পরে আবহাওয়ায় জলীয় উপাদান সামান্যই থাকে। এই উপাদান পৃথিবীর আবহাওয়ার উপাদানের চেয়ে 2000 গুণ কম। ধূলিঝড়ের সময় এবং ধূলিঝড়ের পরে মঙ্গলগ্রহের আবহাওয়ায় আর্দ্রতা খুব কমে যায়। এই ব্যাপারটা আকস্মিক কিনা অথবা এর সঙ্গে অন্য কিছুর যোগাযোগ আছে কিনা, বিজ্ঞানীরা তা সঠিকভাবে বলতে পারেন না। মঙ্গলগ্রহে জলের অস্তিত্বের বিষয় খুবই কৌতূহলোদ্দীপক।

এই কথা সকলেরই জানা আছে যে, মঙ্গলগ্রহে তরল জলের অস্তিত্ব নেই। জল হয় জমে যায়,

নয় তো ফুটতে থাকে। তবু তুলনামূলকভাবে মঙ্গল গ্রহের সাম্প্রতিক জলহাওয়া অন্য রকম হতে পারে। এর চাপ এবং তাপ বেশী ছিল। উপসংহারে বলা হয়েছে যে, জলহাওয়ার প্রকৃতিতে এই রকম বিরাট পরিবর্তন মাঝে মাঝে হয়ে থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রের চন্দ্রাভিযান পরিকল্পনা

আট বছর আগে 1964 সালের 31শে জুলাই আমেরিকার অ্যাপোলো নামে চন্দ্রাভিযান পরিকল্পনা রূপায়ণের কাজ শুরু হয়েছিল। 1972 সালের ডিসেম্বর মাসে তিনজন মহাকাশচারীসহ অ্যাপোলো-17 নামে মহাকাশযানটি চন্দ্রাভিমুখে প্রেরিত হবে এবং এই পরিকল্পনা রূপায়ণের সঙ্গে সঙ্গে এই কার্যসূচীর পরিসমাপ্তি ঘটবে।

তবে গ্রহান্তর যাত্রায় চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণের প্রস্তুতি চলেছে বহুকাল ধরে। এরই প্রস্তুতি হিসাবে প্রথমতঃ রেঞ্জার-7, এর পর 1965 সাল থেকে 1968 সালের মধ্যে রেঞ্জার-8 ও রেঞ্জার-9, পাঁচটি সার্ভেয়ার এবং পাঁচটি লুনার অরবিটার নামে যাত্রীবিহীন স্বয়ংক্রিয় তথ্যসন্ধানী মহাকাশযান চন্দ্রলোকে প্রেরণ করা হয়। এই সকল উপগ্রহের সাহায্যে সমগ্র চন্দ্রপৃষ্ঠের—এমন কি, চাঁদের যে দিক পৃথিবী থেকে দৃষ্টিগোচর হয় না, সে দিকেরও আলোকচিত্র গৃহীত হয়েছে। সার্ভেয়ারের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির সাহায্যে চন্দ্রপৃষ্ঠের মৃত্তিকা সম্পর্কে তথ্যাদি সংগৃহীত হয়েছে।

খুব কাছে থেকে তোলা চন্দ্রপৃষ্ঠের প্রায় এক লক্ষ আলোকচিত্র এই সকল স্বয়ংক্রিয় মহাকাশযান পৃথিবীতে প্রেরণ করেছে এবং এই সকল আলোকচিত্রের ভিত্তিতেই মানুষের চন্দ্রপৃষ্ঠের অবতরণের স্থান নির্ণয় করা হয়েছে।

তারপরেই চলেছে, কি ধরণের মহাকাশযানে মহাকাশচারীরা চন্দ্রলোকে যাত্রা করবেন, তা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। তাছাড়া এই সুদীর্ঘ যাত্রার জন্যে মহাকাশচারীদেরও তৈরি করবার কাজ চলে এবং তাদের নিয়ে চলে নানা রকমের পরীক্ষা।

প্রথমতঃ 1961 সালে একজন মানুষের জন্যে তৈরি মার্কারী মহাকাশযানে একজন মহাকাশচারীকে মহাশূন্যাভিমুখে প্রেরণ করা হয়। পৃথিবীর কক্ষপথের অর্ধেক পরিক্রমা করেই তিনি ফিরে আসেন। 1962 ও '63 সালে পর পর চারবার ঐ যানেই মহাকাশচারীরা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন। তারপর আসে দু-জন যাত্রীবাহী জেমিনি মহাকাশযানের পালা। 1965 থেকে 1966 সালের মধ্যে জেমিনি মহাকাশযানে মার্কিন মহাকাশচারীরা দশ বারেরও বেশী পৃথিবী পরিক্রমা করেন। জেমিনী মহাকাশযানই অ্যাপোলোযানের পথ রচনা করে।

1964 সালের অক্টোবর মাসে অ্যাপোলো-7 মহাকাশযানটিকে পরীক্ষামূলকভাবে যাত্রীসহ পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করা হয়। মহাকাশচারীরা ঐ যানে পৃথিবী পরিক্রমায় 11 দিন কাটান। এর দু-মাস পরেই তিনজন যাত্রীসহ অ্যাপোলো-8-এর সাহায্যে মানুষ প্রথম চাঁদের খুব কাছে যায় এবং চাঁদের কক্ষপথে থেকে 10 বার চাঁদকে পরিক্রমা করে ফিরে আসে।

তারপর চান্দ্রযানের চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়। 1969 সালের মার্চ মাসেই অ্যাপোলো-9-এর মাধ্যমে পৃথিবীর কক্ষপথে থেকেই এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়েছিল। ঐ বছরেরই মে মাসে যাত্রীবাহী অ্যাপোলো-10 মহাকাশযানটিকে চন্দ্রাভিমুখে প্রেরণ করা হয়—চান্দ্রযানটি চন্দ্রপৃষ্ঠের খুবই কাছে আসে। এ ছিল চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণের মহড়া।

এর দু-মাস পরে 1969 সালের জুলাই মাসে অ্যাপোলো-11-এর দু-জন মহাকাশচারী প্রথম চন্দ্রপৃষ্ঠে পদার্পণ করে ইতিহাস সৃষ্টি করেন। ঐ বছরের নভেম্বর মাসে প্রেরণ করা হয় অ্যাপোলো-12-কে। ঐ যাত্রায় পূর্বের তুলনায় মহাকাশচারীরা বেশ কিছু বেশী সময় চন্দ্রপৃষ্ঠে অতিবাহিত করেন।

1970 সালে অ্যাপোলো-13 অভিযানে দুর্ঘটনা ঘটে, অক্সিজেন আধারে গোলযোগ দেখা দেয়, মহাকাশচারীরা চন্দ্রপৃষ্ঠে পদার্পণ না করেই পৃথিবীতে ফিরে আসেন।

1971 সালে অ্যাপোলো-14 ও অ্যাপোলো-15 পরিকল্পনা বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হয়। অ্যাপোলো-15-এর মহাকাশচারীরা চন্দ্রপৃষ্ঠে প্রথম বিদ্যুৎ-শক্তি চালিত মোটরগাড়ী নিয়ে যান। এবারেও অ্যাপোলো-16 অভিযানের মহাকাশচারী ইয়ং ও ডিউক এই ধরণের একটি লুনার রোভিং ভিহিকলে চড়ে চন্দ্রপৃষ্ঠে তথ্যাদি ও নানা উপকরণ সংগ্রহ করেছেন।

16ই এপ্রিল (1972) অ্যাপোলো-16 তিনজন মহাকাশ অভিযাত্রীকে নিয়ে চন্দ্রাভিযান সুরু করে এবং অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হবার পর 27শে এপ্রিল পৃথিবীতে নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করে। 1972 সালের ডিসেম্বর মাসে অ্যাপোলো-17 অভিযানের পরেই যুক্তরাষ্ট্রের চন্দ্রাভিযান পরিকল্পনার সমাপ্তি ঘটবে।

এর পরে পৃথিবী থেকে মহাকাশে যাতায়াতের পথ সুগম করা ও পরিবহন সমস্যা সমাধান করাই হবে মার্কিন মহাকাশ পরিকল্পনার লক্ষ্য। মহাকাশে সুদীর্ঘকাল মানুষ থাকতে পারে কি না, সেই বিষয়েও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হবে। কারণ গ্রহান্তরে যেতে হলে মহাশূন্যে দীর্ঘকাল থাকতে হবে—এই উদ্দেশ্যে মহাকাশে গবেষণাগার বা 'স্কাই ল্যাব' স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয়েছে—1973 সালে এটি চালু হবার কথা এবং 1978 সাল পর্যন্ত পৃথিবী থেকে মহাকাশে যাতায়াতের পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলবার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

নিউটন

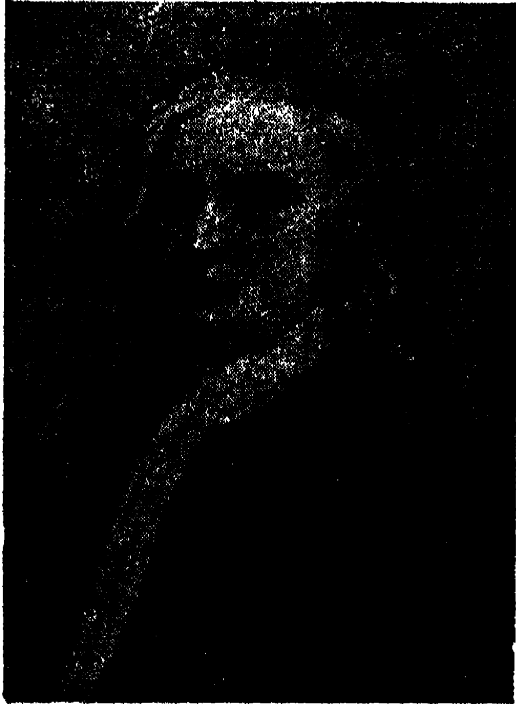
শ্রীপতিরঞ্জন চৌধুরী*

প্রতিভাবান ব্যক্তিদের জীবনকে কোন সুনির্দিষ্ট ধারায় বিশ্লেষণ করা যায় না। প্রতিভা সব সময়েই অদ্ভুত, অনেকটা আপন খেয়ালের মধ্যেই এর জন্ম। সপ্তদশ শতকের নিউটনকে কেন্দ্র করে বিজ্ঞান-জগতে যে বিরাট প্রতিভা প্রকাশিত হয়েছিল, তা যে কি পরিমাণে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ও বৈপ্লবিক, আমরা বর্তমানে সে সব ধারণার সঙ্গে প্রথম থেকেই পরিচিত থাকায় তার অসাধারণত্ব যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবো না।

Pascal, Galois এবং Hamilton প্রমুখ প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের মত নিউটন কিন্তু তাঁর বাল্যকাল থেকেই প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে প্রকাশিত হন নি। বিদ্যালয়ে প্রাথমিক অবস্থায় তিনি ছিলেন লেখাপড়ায় কিছু পরিমাণে অলস প্রকৃতির ছাত্র। তাঁর বিশেষ সমাদর হতো বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে। কারণ তিনি তাদের নিত্য নতুন খেলার সামগ্রী উপহার দিতে পারতেন। তাছাড়া বাল্যাবস্থায় তাঁর

* বিজনারায়ণ মহাবিদ্যালয়; ইটাচুনা, হুগলী

বিশেষ ঝোঁক ছিল—বায়ুর গতিবেগ নির্ণয়, বায়ু-চালিত যন্ত্র তৈরি, সূর্যঘড়ি ইত্যাদি বিষয়ের উপর। এসব ঘটনা তাঁর প্রতিভার সুস্পষ্ট লক্ষণ প্রকাশ করেছিল কিনা, তা আমরা বলতে পারি না। যন্ত্রপাতির প্রতি তাঁর ঝোঁক ছিল বরাবরই। স্কুল জীবনের শেষের দিকে বা কলেজ জীবনের প্রথম থেকেই নিউটনের জীবনে সবকিছু জানবার একটা প্রবল ইচ্ছা দেখা যেত। Euclid-এর জ্যামিতি তাঁর কাছে অত্যন্ত সহজ বোধ হতো, তিনি তা পাশে সরিয়ে রেখে Descarte-এর



সার আইজ্যাক নিউটন
জন্ম—25শে ডিসেম্বর, 1642
মৃত্যু—20শে মার্চ, 1727

মধ্যে মনের খোরাক খুঁজে পান এবং ধৈর্য ও দৃঢ়তার সঙ্গে Descarte-এর জ্যামিতিক তত্ত্বগুলি আয়ত্ত করেন। তাঁর জানবার ইচ্ছা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে, বিশেষ করে—গণিতশাস্ত্র, আলোকতত্ত্ব, সৌরজগতের গ্রহ-নক্ষত্রের গতি-প্রকৃতির ক্ষেত্রে তাঁর অদম্য কৌতূহল দৃষ্ট হয়।

নিউটনের একটি বিশেষ ধারণা ছিল যে, এই জগতে ঈশ্বর নানা গোপনীয় তত্ত্ব লুকিয়ে রেখেছেন। যে আগ্রহী, তার কাছেই সে সকল তত্ত্ব উদ্ভাসিত হবে। নিউটনের এরূপ ধারণার একটা বিশেষ কারণ ছিল এই যে, তিনি নিজেই অনেকটা এই প্রকৃতির ছিলেন। তাঁর অধিকাংশ আবিষ্কারই তিনি নিজে প্রকাশ করতে উৎসাহী ছিলেন না, বন্ধুদের বিশেষ চাপে পড়েই তিনি তা প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছেন। John Maynard Keynes বলেছেন—Newton parted with and published nothing except under the extreme pressure of friends। প্রসঙ্গতঃ Euclid সম্বন্ধে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। Euclid-ই জ্যামিতিকে প্রথম সুসংবদ্ধরূপে প্রকাশ করেন। যে জ্যামিতি আমরা স্কুল থেকে কলেজ পর্যন্ত পড়ি, তার অধিকাংশই মূলতঃ Euclid-এর জ্যামিতি। Euclid-এর জ্যামিতি নিয়ে তিনি সারাদিন খাতা-পেনসিল নিয়ে কি সব লেখা ও আঁকাতে ব্যস্ত থাকতেন এবং সেই সব কাগজ তাঁর টেবিলের তলায় গুঁজে রাখতেন। অপরকে দেখাবার বা প্রকাশ করবার জন্যে তিনি মোটেই আগ্রহ বোধ করতেন না। এই আত্মমগ্নতা তাঁর স্ত্রী সহ্য করতে পারতেন না। কিন্তু এসব কিছুই তাঁকে বিচলিত করতো না। শোনা যায়, তাঁর ছেলেই সেই সব তত্ত্বসমন্বিত কাগজ-পত্র পরে যথাযথরূপে প্রকাশ করেছিলেন এবং তার ফলে গণিত-জগতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল।

1665 খৃষ্টাব্দে প্লেগের প্রাদুর্ভাবে যখন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায়, নিউটন তখন চলে যান তাঁর জন্মস্থান উলস্থরপে। নির্জনপ্রিয়তা নিউটনের চরিত্রের একটা বিশেষত্ব ছিল। 2-3 বছর জন্মস্থানে কাটিয়ে তিনি যখন ফিরে আসেন, বয়স তখন তাঁর 24 বছর। এই কয়েক বছরের মধ্যে

বিজ্ঞানের তিনটি বিভিন্ন দিকে তিনি তিনটি নতুন বিষয় আবিষ্কার করেন। সাদা আলোকরশ্মির মধ্যে বিভিন্ন বর্ণবৈচিত্র্য (Nature of white light), পৃথিবীর উপরে ও বাইরে পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণের সূত্র ও তার ব্যাখ্যা (Universal gravitation and its consequences) এবং Differential and integral culculus প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার। নিউটনের জীবনের এই 2-3 বছরের অধ্যায়টি বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। তিনি নিজেই বলেছেন—"All this was in the two plague years of 1665 and 1666, for in those days I was in the prime of my age for invention and minded mathematics and philosophy more than at any time since"। তাঁর আবিষ্কারসমূহ যে যুগান্তকারী, তা বোঝাতে গিয়ে E. N. Andrade বলেছেন—Einstein's innovations were less revolutionary to his time than Newton's were to his। আরও আশ্চর্য ঘটনা হচ্ছে নিউটন তাঁর আবিষ্কৃত তত্ত্বকে নিজের কাছে লুকিয়ে রেখেছিলেন, প্রকাশ করবার তাগিদ অনুভব করেন নি। বেশ কয়েক বছর বাদে বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ Leibniz যখন প্রকাশ করেন যে, তিনি এক নতুন গাণিতিক প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেছেন। তখন নিউটনের সঙ্গে তার যে কথা হয়েছিল বিভিন্ন ঘটনার পরি-প্রেক্ষিতে তাতেই প্রকাশিত হয় যে, নিউটনই সর্বপ্রথম সেই গাণিতিক প্রক্রিয়া (Differential and integral calculus) আবিষ্কার করেছেন। Hook এবং Halley নামে নিউটনের দুই বন্ধু ছিল। Hook-এর নামের সঙ্গে আমরা স্কুল-পাঠ্য পুস্তকের মাধ্যমেই পরিচিত। Hooks's law অধ্যয়ন করতে হয় বিজ্ঞানের ছাত্রদের। Halley ছিলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানী। তিনি নানা দেশ ঘুরে দেখতেন এবং চেষ্টা করতেন যদি নতুন কিছু বিজ্ঞান-জগতে দেওয়া যায়। Halley-ই প্রথম নিউটনকে অভিকর্ষণজনিত সূত্রের আবিষ্কারক-রূপে জগতের কাছে প্রকাশ করেন। Hook, Halley এবং তাঁদের আর এক বন্ধু—এই তিনজনে মিলে আলোচনা করছিলেন যে, কিভাবে সূর্যের চারদিকে গ্রহের গতির একটি যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। তাঁদের চিন্তার বিষয় ছিল, কি রকম বলের দ্বারা সূর্য গ্রহকে আকর্ষণ করলে গ্রহটি উপবৃত্তাকার পথে পরিক্রমা করতে সক্ষম হবে। Hooks বলেন—আমি এর উত্তর দেব। Wren তখন বলেন—নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উত্তর দিতে পারলে আমি তোমাকে চল্লিশ শিলিং পুরস্কার দেব। যাহোক, Hooks-এর উত্তর সম্বন্ধে কোন ঘটনা জানা নেই, তবে এটা জানা গেছে, Halley একদিন বেড়াতে বেড়াতে নিউটনের কাছে গিয়ে তাদের উপরিউক্ত আলোচনার কথা প্রকাশ করায় নিউটন্ বলে ওঠেন—সূর্য ও গ্রহকে উভয়ের দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক বলের দ্বারা আকর্ষণ করলে গ্রহটি উপবৃত্তাকার পথে সূর্যকে পরিক্রম করবে। Halley অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বলে ওঠেন—তুমি কিভাবে এটা জানলে? নিউটন উত্তর দেন—কেন? আমি এটা অঙ্কের মাধ্যমে বের করেছি। Halley যখন তা দেখতে চাইলেন, নিউটন তখন বললেন তাঁর কাগজ-পত্রগুলির মধ্যে কোথাও সেটা আছে, কিছুদিন সময় পেলে তিনি তা পুনরায় করে দিতে পারেন। এমনি ভাবেই হঠাৎ তাঁর আবিষ্কারের কথা জানা গেছে। তাঁর বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ Principia লিখতে Halley তাঁকে উৎসাহিত করেছিলেন। নিউটনের জীবনে উল্লেখযোগ্য নাম হলো Issac Borrow, যিনি নিউটনের প্রতিভার প্রথম স্বীকৃতি দেন। তিনিই প্রথম বুঝতে পারেন নিউটনের মধ্যে বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে। পদার্থ-বিজ্ঞানের আলোকতত্ত্ব সম্পর্কে

তিনিই নিউটনকে উৎসাহিত করেছিলেন। নিউটনের প্রতি তার বিশ্বাস ও প্রীতি এত গভীর ছিল যে, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অত্যন্ত সম্মানিত Lucasian chair-এর পদটি স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেন এবং নিউটন সেই পদে অধিষ্ঠিত হন।

নিউটনের আবিষ্কৃত তত্ত্বগুলি জগতের কাছে হঠাৎ প্রকাশিত হলেও এগুলির কোনটিই নিউটন হঠাৎ আবিষ্কার করেন নি। প্রতিটি বিষয়েই তাঁকে গভীর চিন্তা করে তবে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়েছে। তাঁর একটা বিশেষ গুণ ছিল, কোন কিছু উপলক্ষ্য করে যদি কোন চিন্তা তাঁর মনে জাগতো, সেই বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে না আসা পর্যন্ত তাঁর চিন্তাস্রোত স্তব্ধ হতো না। এই বিশেষ গুণই নিউটনকে নির্জনতাপ্রিয় করে তুলেছিল। তিনি নিজেই বলেছেন—I keep the subject of my enquiry constantly before me and wait till the first dawning opens gradually by little and little into a full and clear light। নিউটন ছিলেন প্রতিভাবান গণিতজ্ঞ, তিনি তাঁর আবিষ্কৃত তত্ত্বকে গাণিতিক প্রক্রিয়ায় সুন্দর করে প্রকাশ করতেন। যে প্রচলিত গল্প আমরা শুনে আসছি—আপেলের নিম্নগতি দেখে নিউটনের পৃথিবীর অভিকর্ষজনিত বলের আবিষ্কারের কথা, সেই বিষয়ে তাঁকে বৃদ্ধ বয়সে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন—বাগানে বসে তিনি ভাবছিলেন কোন্ শক্তি বলে চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে, এমন সময় আপেলটির নিম্নাভিমুখী গতি তাঁকে সচেতন করিয়ে দেয় যে, এই সেই বল, যা চাঁদকে পৃথিবীর চতুর্দিক প্রদক্ষিণ করতে সহায়তা করছে এবং দূরত্বের সঙ্গে সঙ্গে বলের পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। এভাবেই তাঁর চিন্তার গতি এক সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল। নিউটন সেই অভিকর্ষজনিত বলের গাণিতিক ব্যাখ্যা পরে দিয়েছেন।

জগতের ইতিহাসে নিউটনের মত প্রতিভাবান ব্যক্তির আবির্ভাব খুব কমই হয় বলা চলে। উদাসীনতা, চিন্তার গভীরতা, প্রতিভার উজ্জ্বল দীপ্তি প্রভৃতি গুণ ছিল নিউটনের এবং মানুষ হিসাবে তিনি ছিলেন মহান। অগাধ পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও নিউটন বলেছিলেন—আমি এখনও জ্ঞানসমুদ্রের তীরে বসে নুড়ি সংগ্রহ করছি, আমার সামনে রয়েছে অনাবিষ্কৃত সত্যের বিরাট সমুদ্র। নিউটনের মত বৈজ্ঞানিকের পক্ষে এই কথা বলা যে কিরূপ চিন্তাশীলতার পরিচায়ক, তা বলে বোঝানো যায় না। মনে হয় শুধুমাত্র এই কয়টা কথাই তাঁর বৈজ্ঞানিক সকল আবিষ্কারকে ছাপিয়ে মানসিক রূপকে যথার্থ ভাবে প্রকাশ করছে।

কৃষি-সংবাদ

রাসায়নিক পদ্ধতিতে শোধিত চীনাবাদামের বীজ রোগ প্রতিরোধ করে

গবেষণার ফলে জানা গেছে যে, চীনাবাদামের বীজ পোঁতবার আগে অরগ্যানোমারকিউরিয়াল কমপাউণ্ড (Organomercurial compounds) দিয়ে শোধন করে নিলে চীনাবাদামের কলার রট (Collar rot) এবং সীড রট (Seed rot) রোগ প্রতিরোধ করা যায়। এক রকম ছত্রাক মাটিতে জন্মাবার ফলে চীনাবাদামে এই রোগ হয়।

বীজ শোধনের জন্যে সেরেসান অথবা এগ্রোসান জি. এন. (Ceresan or Agrosan G. N.—প্রতি 400 ভাগ বীজের সঙ্গে এক ভাগ রাসায়নিক) অথবা শতকরা 75 ভাগ থিরাম (Thiram—প্রতি 250 ভাগ বীজের সঙ্গে শতকরা এক ভাগ রাসায়নিক) অথবা ক্যাপটন 1 : 300 ভাগ (1 : 300) অনুপাতে ব্যবহার করা উচিত।

পটাশ প্রয়োগে তামাকের ভাল ফলন

গবেষণার ফলে জানা গেছে যে, হেক্টার প্রতি 150 থেকে 300 কেজি. পটাশ প্রয়োগে তামাকের গাছ ভালভাবে বেড়ে ওঠে আর পাতার মানও হয় উঁচু।

পটাশিয়াম সালফেটের মাধ্যমে পটাশ সমমাত্রায় দু-বার দিতে বলা হয়েছে। মোট পটাশের এক ভাগ গাছ পোঁতবার আগে আর বাকী ভাগ গাছের শিকড় শক্ত হবার পর।

তামাক চাষে পটাশ কম হলে গাছের পাতা কুঁচকে গিয়ে তার চারপাশ হলুদে হয়ে যায়। ফলে তামাক পাতার মান হয় খুব নীচু স্তরের।

উচ্চ ফলনশীল জলদি জাতের রেড়ী

তামিলনাড়ুর কৃষি বিভাগের বিজ্ঞানীরা টি. এম. ভি. আই. জাতীয় রেড়ী থেকে আর. সি.-1377 নামের এক রকম নতুন জাতের জলদি রেড়ী উদ্ভাবন করেছেন।

এই জাতীয় রেড়ী প্রতিকূল আবহাওয়াতেও 75 থেকে 100 দিনের মধ্য হেক্টার প্রতি প্রায় 1,750 কেজি. ফলন দিতে সক্ষম। ধানকাটার পর ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারী পর্যন্ত এই রেড়ী চাষের পক্ষে উপযুক্ত সময়।

এই রেড়ীর বীজে শতকরা প্রায় 53 ভাগ তেল পাওয়া যায়। তাছাড়া সব রকম মাটি ও আবহাওয়াই এই আর. সি.-1377 রেড়ী চাষের পক্ষে উপযুক্ত।

পোকামাকড়ের হাত থেকে আলু সংরক্ষণ

জমির মাটি অলড্রিন, ডাইঅলড্রিন অথবা ফোরেট গ্র্যানুয়েলস দিয়ে শোধন করে নিলে নিমাটোড অথবা কাটুই পোকা আলুর ক্ষতি করতে পারে না।

আলু বোনিবার আগে জমির মাটিতে যদি শতকরা 5 ভাগ অলড্রিন গুঁড়া (Aldrin dust) হেক্টার প্রতি 25 কেজি. হারে মিশিয়ে দেওয়া যায়, তবে কাটুই পোকা ধ্বংস করা সহজ হয়। আর প্রতি হেক্টারে যদি শতকরা 5 থেকে 10 ভাগ ডাইএলড্রিন গুঁড়া (Dieldrin) 25 থেকে 30 কেজি. অনুপাতে অথবা শতকরা 10 ভাগ ফোরেট গ্র্যানুয়েলস 62·5 কেজি হারে ছড়িয়ে দেওয়া যায়, তবে নিমাটোড বা অন্য জাতীয় পোকাও সহজে নষ্ট হয়।

[কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি-মন্ত্রণালয় (শাস্ত্রী-ভবন, নতুন দিল্লী) কর্তৃক প্রচারিত]

বিজ্ঞান-সংবাদ

ছুরির বদলে লেসার রশ্মি

আজকাল পাহাড় কাটাতে, খনি থেকে হীরা তুলতে রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া উন্নত করতে এবং আঙুরগুচ্ছ কাটবার কাজে লেসার রশ্মি ব্যবহৃত হচ্ছে। চাঁদের দূরত্ব নিরূপণেও এই রশ্মি সাহায্য করে। বিখ্যাত সোভিয়েট বিজ্ঞানীদ্বয় আর. কেভেৎস্কি এবং এন. গামালেয়া এই কথা বলেছেন।

তাঁরা বলেছেন যে, দৃষ্টিসংক্রান্ত কোয়ান্টাম জেনারেটর সৃষ্টি হবার সময় থেকেই ওষুধ উৎপাদনের ক্ষেত্রে লেসার রশ্মি প্রয়োগের চেষ্টা হয়েছিল। এই ক্ষেত্রে প্রভূত পরিমাণে লেসার রশ্মির ব্যবহার শুধু যে গুরুত্বপূর্ণ তাই নয়, এই রশ্মি বিশেষ কতকগুলি কাজে আশ্চর্য রকম ফলপ্রদ। সোভিয়েট চক্ষু-চিকিৎসকেরা ওডেসার ভি. পি. ফিলাতোভ ইনস্টিটিউট এবং অন্যান্য চক্ষু-চিকিৎসা কেন্দ্রে চোখের টিউমার নষ্ট করবার জন্যে এবং অন্যান্য চক্ষুরোগের চিকিৎসায় লেসার রশ্মি ব্যবহার করেন।

চিকিৎসার ক্ষেত্রে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার হলো, লেসারের সাহায্যে টিউমার নষ্ট করা। গবেষণার ফলে দেখা গেছে, লেসার রশ্মি সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারলে টিউমারের কোষগুলিকে নষ্ট করা যায়। 1969 সালে লেসারের সাহায্যে চিকিৎসার জন্যে প্রথম কেন্দ্র রাশিয়ায় স্থাপিত হয়। এখানে জটিল এবং অন্যান্য সব রকমের টিউমারেরই চিকিৎসা করা হয়।

এই সময়ের মধ্যে 250 জনেরও বেশী রোগী এই কেন্দ্রে চিকিৎসিত হয়েছে এবং বিশেষ লেসার পদ্ধতিতে এই চিকিৎসা করা হয়েছে। এই বিষয়ে এখনো কোন সিদ্ধান্তে আসবার সময় হয় নি। তবে এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, এক ধরণের টিউমারের চিকিৎসায় লেসার পদ্ধতি খুবই কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে।

লেসার রশ্মির জৈব কার্যকারিতা শুধু যে কোষের ক্ষেত্রেই সুফলপ্রদ তা নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রেও তা সুফল প্রদান করে। এসব গবেষণার ফলে চিকিৎসার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে এবং দেহযন্ত্রের রূপান্তরসংক্রান্ত অনেক তথ্য জানা যাবে।

লেসার রশ্মি রুগ্ন কোষগুলিকে অক্ষত রাখে এবং ফলে রক্তপাত সবচেয়ে কম হয়। এর ফলে শরীরের অভ্যন্তরে সূক্ষ্ম অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনা দেখা দেবে। শল্য-চিকিৎসকেরা সেই দিনের স্বপ্ন দেখছেন, যেদিন রক্তপাতহীন অস্ত্রোপচার সম্ভব হবে।

হৃদ্‌রোগ নির্ণয়ের নতুন পদ্ধতি

লাটভিয়ার স্বাস্থ্যনিবাস জারমালার ডাক্তারেরা হৃদ্‌রোগ নির্ণয় এবং হৃদ্‌রোগের চিকিৎসার নতুন পদ্ধতি সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন। তার একটি হলো বায়োটেলিমেট্রি অর্থাৎ দূর থেকে দেহযন্ত্রের ক্রিয়া, যেমন—মস্তিষ্ক, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ও হৃৎপিণ্ডের প্রাণপ্রবাহ প্রভৃতি রেকর্ড করা।

এই পদ্ধতিতে এক মাইল দূর থেকেও ডাক্তারেরা রোগীর হৃদ্‌যন্ত্রের উপর গভীরভাবেই লক্ষ্য রাখতে পারেন। রোগীর বুকের সঙ্গে একটি বিশেষ ধরণের যন্ত্র বেঁধে দেওয়া হয়, তাতে হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন লক্ষণ ধরা পড়ে। সেই সব তথ্য তারপর একটি সুবহ বেতার-প্রেরক যন্ত্রের বায়োঅ্যাম্পলিফায়ারে ব্যবহৃত হয় এবং সেই বেতার যন্ত্রটি রোগী নিজেই বহন করেন। সেখান থেকে বেতার সঙ্কেতগুলি

গবেষণাগারের বেতার কেন্দ্রে এসে পৌঁছয়। এভাবে রোগী এবং ডাক্তারের মধ্যে দু-মুখো যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়ে থাকে।

হাঁটা, দৌড়ানো এবং অন্যান্য প্রকারের কায়িক পরিশ্রমের সময় রোগীর অবস্থা কি দাঁড়ায়, এই নতুন পদ্ধতিতে ডাক্তারেরা তা আরো সঠিক-ভাবে নির্ণয় করতে পারেন।

অসংখ্য গবেষণার ভেতর দিয়ে এই তথ্য জানা গেছে যে, হাঁটা, ছোটা প্রভৃতি কায়িক পরিশ্রম হৃৎপিণ্ডের পক্ষে উপকারী। অবশ্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের নির্দেশ অনুযায়ী এই সব কায়িক পরিশ্রম করতে হবে। কায়িক পরিশ্রম করলে সুরুতে অবশ্য হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়। কিন্তু দেখা গেছে যে, শেষের দিকে পরিশ্রম সত্ত্বেও সেই স্পন্দন প্রায় স্বাভাবিক হয়ে আসে। একথা অবশ্য বলা বাহুল্য যে, নির্দিষ্ট কায়িক পরিশ্রমের সঙ্গে সঙ্গে চিরাচরিত চিকিৎসা ব্যবস্থাও চালিয়ে যেতে হবে।

বন্যায় বেঁচে থাকবার উপযোগী ধানগাছ উৎপাদনের উদ্যোগ

ম্যানিলার ইন্টারন্যাশন্যাল রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের গবেষণাগারে ডাঃ ববার্ট এফ স্যাণ্ডলারের তত্ত্বাবধানে এক বিশেষ ধরণের ধানগাছ উৎপাদনের চেষ্টা হচ্ছে। এই সকল গাছ বন্যার জল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়বে, ডুবে যাবে না এবং এর ডাটা হবে খুবই শক্ত ও মজবুদ। তাছাড়া রোগ প্রতিরোধক এবং প্রচণ্ড শীত ও গ্রীষ্ম অর্থাৎ সকল অবস্থাতেই জন্মাতে পারে এরকম সঙ্করজাতীয় খাদ্যশস্যের চারা উৎপাদনের চেষ্টাও তারা করছেন। খাদ্যসম্পদ বাড়াবার ব্যাপারে এই সকল গবেষণার ফলে এশিয়ার বিভিন্ন দেশ খুবই উপকৃত হবে। আমেরিকার বেসরকারী জনহিতকর সংস্থা ফোর্ড ফাউণ্ডেশন ও রকফেলার ফাউণ্ডেশনের অর্থ-সাহায্যে এই গবেষণাগারের সকল কাজকর্ম সম্পন্ন হচ্ছে।

আবর্জনা থেকে বিদ্যুৎ-শক্তি

কোন এক সময়ে হয়তো সূর্যরশ্মি অথবা পরমাণু থেকে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন হবে। তবে সেটা অনেক দূরের কথা। তার আগে আমাদের হাতের কাছে যে সকল সহজ-লভ্য উপাদান রয়েছে, সেগুলি কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন করা যেতে পারে। ময়লা ও আবর্জনাকে একাজে লাগানো যেতে পারে। ক্যালিফোর্নিয়ায় কম্‌বাশন পাওয়ার কোম্পানী নামে একটি প্রতিষ্ঠান আছে। এই প্রতিষ্ঠানটি ময়লা ও আবর্জনাকে কাজে লাগানো সম্পর্কে গত চার বছর ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছে। তারা আবর্জনাকে ইন্ধন হিসাবে ব্যবহার করে গ্যাস টারবাইন চালাতে পেরেছেন এবং বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন করেছেন। বর্তমানে আবর্জনাকে ইন্ধন হিসাবে ব্যবহার করে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের একটি কারখানা তৈরি হচ্ছে। ঐ কারখানায় প্রতিদিন 40 টন আবর্জনা ব্যবহৃত হবে এবং তা থেকে উৎপন্ন হবে 1000 কিলো-ওয়াট বিদ্যুৎ-শক্তি। পুরাপুরি চালু হবে ঐ কার-খানায় প্রতিদিন 400 টন আবর্জনা থেকে 15000 কিলোওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন হবে।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জুন — 1972

রজত জয়ন্তী বর্ষ : ষষ্ঠ সংখ্যা



সৌরমণ্ডলে আর একটি নতুন গ্রহের সন্ধান

গ্রাহাম কনরয় (বৃটিশ) নামে চৌদ্দ বছর বয়স্ক স্কুলের এই ছাত্রটি সৌরজগতের প্লুটো নামক গ্রহ থেকে অধিকতর দূরত্বে একটি নতুন গ্রহের সন্ধান পেয়েছে এবং গ্রহটির নাম দিয়েছে Poseidon। কিন্তু রেডিও-টেলিস্কোপ ও কম্পিউটারের সাহায্যে সঠিকভাবে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত সূর্য থেকে 7.179 মিলিয়ন মাইল দূরত্বে সৌরজগতে এরূপ একটি 10ম গ্রহের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞেরা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা আবিষ্কৃত গ্রহটির নাম দিয়েছেন—**'Planet-X'** এবং তাদের হিসাবমত গ্রহটি শনিগ্রহের চেয়ে তিন গুণ বড়। অত বড় হওয়া সত্ত্বেও ছায়াপথের তারকাগুলির ঔজ্জ্বল্যের দরুণ পৃথিবী থেকে সেটি প্রায়ই অদৃশ্য থেকে যায়।

মজার খেলা

নীচে পাঁচটি সারিতে কতকগুলি সংখ্যা দেওয়া আছে। তোমার কোন বন্ধুকে বলা হলো তার বয়স যত বছর, সেই সংখ্যাটি কোন্ কোন্ সারিতে আছে, তোমাকে বলবার জন্যে। ধরা যাক বন্ধুর বয়স 17 বছর। 17 সংখ্যাটি ক সারি এবং ঙ সারিতে আছে। বন্ধুটি তোমাকে সারিগুলি জানাতে তুমি ক সারির প্রথম সংখ্যা এবং ঙ সারির প্রথম সংখ্যা যোগ করে বন্ধুর বয়স বলে দেবে। 31 বছরের মধ্যে যে কোন বয়স এই সারিগুলি থেকে একই ভাবে বলে দেওয়া যাবে। (ধরা যাক 19। ক খ ও ঙ সারিতে সংখ্যাটি আছে ; সুতরাং $1+2+16=19$)।

ক	খ	গ	ঘ	ঙ
1	2	4	8	16
3	3	5	9	17
5	6	6	10	18
7	7	7	11	19
9	10	12	12	20
11	11	13	13	21
13	14	14	14	22
15	15	15	15	23
17	18	20	24	24
19	19	21	25	25
21	22	22	26	26
23	23	23	27	27
25	26	28	28	28
27	27	29	29	29
29	30	30	30	30
31	31	31	31	31

সংখ্যাগুলি বিশেষ ভাবে সাজাবার পদ্ধতি তোমরা নিজেরাই বের করতে পার। এর ব্যাখ্যা পরবর্তী কোন সংখ্যায় আলোচনা করবো। তবে ইতিমধ্যে তোমরা 1 থেকে 31 পর্যন্ত সংখ্যাকে দ্বিগুণোত্তর পদ্ধতিতে লিখে দেখ তো কোন নিয়ম বের করতে পার কিনা।

ব্রহ্মানন্দ দাশগুপ্ত ও জয়ন্ত বসু*

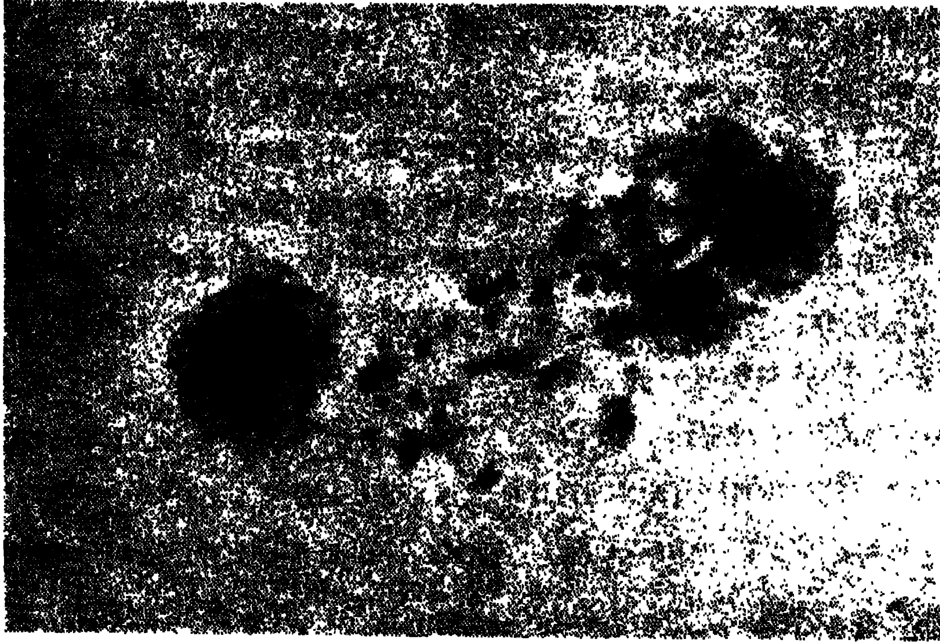
* সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-9

সৌরকলঙ্ক

আমাদের পৃথিবী থেকে প্রায় নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরের সূর্যের সমগ্র দেহটাই 864,000 মাইল ব্যাসযুক্ত একটি প্রকাণ্ড জ্বলন্ত গ্যাসপিণ্ড—কোথাও বিন্দুমাত্র তরল বা কঠিন পদার্থের চিহ্নমাত্র নেই। তথাপি সূর্যদেহ কিন্তু বৈশিষ্ট্যহীন নয়। সূর্যের কেন্দ্রস্থলের তাপমাত্রা প্রায় 20,000,000 ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং চাপ আমাদের বায়ুমণ্ডলের তুলনায় 1,000,000,000 গুণ বেশী—ফলে গ্যাসীয় কণাগুলি এত ঘন সন্নিবিষ্ট যে, যে কোন গাঢ় তরল পদার্থও তার কাছে হেয় প্রতিপন্ন হয়। সাধারণভাবে সমগ্র সূর্যের গড় ঘনত্ব হলো জলের ঘনত্বের দেড়গুণ। সূর্যের ভর হলো 2×10^{27} টন বা 2×10^{33} গ্রাম অর্থাৎ সূর্য পৃথিবীর চেয়ে তিন লক্ষ তেত্রিশ হাজার গুণ ভারী, (পৃথিবীর ভর = $6{\cdot}1 \times 10^{27}$ গ্রাম বা $6{\cdot}1 \times 10^{21}$ টন)। সূর্য-কেন্দ্র থেকে 700,000 কিঃ মিঃ উপরে অপেক্ষাকৃত কম ঘনত্বের 300 কিঃ মিঃ গভীরতাবিশিষ্ট অতি উজ্জ্বল স্তরকে বলে আলোকমণ্ডল বা ফটোস্ফিয়ার, যার কাজ হলো আলো ও তাপ সরবরাহ করা। ছয় হাজার ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রার দৃশ্যমান এই পৃষ্ঠদেশের চাপ আমাদের বায়ুমণ্ডলের চাপের এক-শ' ভাগের এক ভাগ মাত্র। অতএব সূর্যের কেন্দ্রস্থলের সঙ্গে পৃষ্ঠদেশের কি বিরাট পার্থক্য রয়েছে, তা সহজেই অনুমান করা যায়। তাছাড়া আলোকমণ্ডলের বাইরে আছে হাইড্রোজেন, ক্যালসিয়াম ও হিলিয়াম দিয়ে গড়া বর্ণমণ্ডল বা ক্রোমোস্ফিয়ার—যা খালি চোখে দেখা যায় না। তবে পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময় সূর্যের চারধারে এই বর্ণমণ্ডলকে লাল চাকার মত দেখায়। এরও পরে, শেষ অংশ হলো বিশাল ছটামণ্ডল বা করোনা। খুব ক্ষীণ এর আলো, কিন্তু তাপমাত্রা অত্যধিক—বিজ্ঞানী এড্‌লেনের পরীক্ষা অনুসারে প্রায় 1,000,000 ডিগ্রী সেলসিয়াস। ছটামণ্ডলের ছটাগুলির বিন্যাস সূর্যের চতুর্দিকে লক্ষ লক্ষ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত—আধুনিক মতবাদ অনুযায়ী পৃথিবী পর্যন্ত ; অর্থাৎ বলা যায় আমরা সূর্যের মধ্যেই ডুবে আছি। তবে বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, ছটাগুলির বিন্যাস সব সময় এক রকম থাকে না। এই হলো সূর্যদেহের মোটামুটি গঠনশৈলী।

সৌরপৃষ্ঠের বৈচিত্র্যময় ঘটনাবলীর মধ্যে প্রধান হলো সৌরকলঙ্ক। টেলিস্কোপ আবিষ্কারের পূর্বে (অর্থাৎ প্রায় 188 খৃঃ থেকে 1608 খৃঃ পর্যন্ত) চীন, জাপান, কোরিয়া প্রভৃতি দেশের বর্ষানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জীতে সূর্যের সাদা দেহের উপর কালো কালো দাগ সৃষ্টির উল্লেখ আছে। 1371 খৃষ্টাব্দে রাশিয়ার নিকোলোভস্কির ঘটনাপঞ্জীতে স্পষ্টভাবে সৌরকলঙ্কের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। এরপর এলো দূরবীক্ষণ যন্ত্র বা টেলিস্কোপ—সূর্যের কলঙ্ক পর্যবেক্ষণের পালা। টেলিস্কোপ প্রথম গ্যালিলিও আবিষ্কার করেন—এটাই বেশীরভাগ লোকের ধারণা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গ্যালিলিওর আগে হান্স লিপারশে নামে

হল্যাণ্ডের এক চশমা-নির্মাতা 1608 সালে প্রথম দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারের কথা শুনে বছর তিনেক পরে গ্যালিলিও উন্নত ধরণের দূরবীক্ষণ যন্ত্র তৈরি করেন। এই দূরবীক্ষণ যন্ত্র হলো দূরের জিনিষ অনুসন্ধান করবার প্রথম চাবিকাঠি। অবশ্য আজকাল



সৌরকলঙ্ক

এই দূরবীক্ষণ যন্ত্রের অনেক উন্নতি সাধিত হয়েছে, যার ফলে মানমন্দির বা কোন পরীক্ষাগারে বসে বহু দূরের গ্রহ-নক্ষত্র সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান করা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে এই সকল উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতির সাহায্যে সৌরকলঙ্ক সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা গেছে।

সূর্যদেহে সাদা আলোকমণ্ডলের গায়ে ছোট-বড় কালো কালো কলঙ্কগুলি হলো আসলে সৌরপৃষ্ঠের বিরাট বিরাট গহ্বর। সূর্যদেহে মাঝে মাঝে প্রবল ক্রিয়াশীল অঞ্চল সৃষ্টির দরুণ এই কলঙ্কগুলি দেখা দেয়। এদের তাপমাত্রা আলোকমণ্ডলের তাপমাত্রার চেয়ে বেশ কিছুটা কম হলেও চৌম্বক শক্তি কিন্তু প্রচণ্ড। প্রত্যেকটি কলঙ্ক দুটি অঞ্চলে ভাগ করা যায়—ভিতরের গভীর কালো অংশটি হলো প্রচ্ছায়া আর তার চারদিকে ঘেরা অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল অংশটি হলো উপচ্ছায়া। প্রচ্ছায়া সমগ্র কলঙ্কটির মাত্র এক পঞ্চমাংশ স্থান দখল করে—বাকী সবটুকু হলো উপচ্ছায়া। পৃথিবী থেকে দেখলে তাই মনে হয় যেন সূর্যের শরীরের উপর একটি গভীর ক্ষত, যার বাইরের অংশটি অপেক্ষাকৃত বিস্তীর্ণ।

সৌরকলঙ্কের পরিমাপ করা হয় তার সংখ্যা বা আয়তন দিয়ে। গত কয়েক শতাব্দী

ধরে প্রতিদিনের সৌরকলঙ্কের পরিমাপ লিপিবদ্ধ করা হয়ে আসছে। 1840 খৃঃ বিজ্ঞানী শ্বাবে দেখান যে, প্রায় এগারো বছর পর পর সৌরকলঙ্কের পরিমাপ বাড়ে বা কমে, যাকে বলা হয় সৌরচক্র। সূর্যদেহে কলঙ্কের পরিমাণ বাড়লে সূর্য অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ ও অশান্ত হয়ে ওঠে। ফলে সূর্য থেকে সব রকম বিকিরণের মাত্রাও বৃদ্ধি পায়। আর কলঙ্কের সংখ্যা কমলে ফল হয় ঠিক উল্টো অর্থাৎ সূর্যদেহ শান্ত ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে।

সৌরকলঙ্কগুলির পরমায়ু কয়েক দিন থেকে কয়েক মাস হতে পারে। সৌরপৃষ্ঠের পূর্ব প্রান্তে এদের প্রথম আবির্ভাব ঘটে, পরে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে মধ্যরেখা অতিক্রম করে পশ্চিম প্রান্তে অবলুপ্তির কোলে ঢলে পড়ে। আবার কিছুদিন পরে পূর্ব প্রান্তে দেখা দেয় এবং একইভাবে পশ্চিম প্রান্তে মিলিয়ে যায়। এভাবে কয়েক-বার সূর্যকে পরিক্রমা করে। সৌরকলঙ্কের এই আপাত পরিক্রমা থেকে বোঝা যায়, সূর্যও আমাদের পৃথিবীর মত নিজের অক্ষের উপর ঘুরছে। গবেষণার ফলে দেখা গেছে— এই ঘূর্ণনের বেগ প্রায় সাতাশ দিনে একবার।

সৌরকলঙ্কগুলির আকৃতি খুব ছোট থেকে এত বড় হতে দেখা যায় যে, একাধিক পৃথিবী তার মধ্য দিয়ে পাশাপাশি অনায়াসে ঢুকে যেতে পারে। আজ পর্যন্ত যত সৌর-কলঙ্ক দেখা গেছে, তার মধ্যে 1947 সালের এপ্রিল মাসে দেখা কলঙ্কটি হলো সবচেয়ে বড়।

সৌরকলঙ্ক দেখা দিলে তার প্রভাব আমাদের পৃথিবীতেও এসে পড়ে। যার ফলে কলঙ্ক বৃদ্ধির সময় পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রে আলোড়নের সৃষ্টি হয় (Magnetic storm)। চৌম্বকীয় উপাদানগুলির বিচ্যুতি, বিনতি ও অনুভূমিক চৌম্বক প্রাবল্যের আকস্মিক ও প্রবল পরিবর্তনকে বলা হয় চৌম্বক ঝড়। এই পরিবর্তন একসঙ্গে পৃথিবীর মেরু অঞ্চলে নানা জায়গায় পরিলক্ষিত হয়। বর্তমানে রাশিয়ার এক সমীক্ষায় জানা গেছে যে, সৌরকলঙ্ক তথা সৌরবিকিরণ বৃদ্ধির সময় হৃদ্‌রোগে আক্রমণের সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। সৌরকলঙ্ক সৃষ্টির সঙ্গে পৃথিবীর আবহমণ্ডলের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। বিজ্ঞানী ব্রুক্‌সের মতে, সৌরচক্রের চরম অবস্থায় সমগ্র পৃথিবীর তাপমাত্রা কিছুটা হ্রাস পায় এবং এরূপ অবস্থায় ঝড়ঝঞ্ঝা ও বৃষ্টিপাতের আধিক্য ঘটে। কেন সৌরকলঙ্কের সৃষ্টি হয়—কেনই বা এগারো বছর পর্যায়ক্রমে সৌরকলঙ্কের পরিমাণ বাড়ে বা কমে—এই সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের ধারণা এখনও অস্পষ্ট।

সূর্য এবং পৃথিবীর বিচিত্র রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্যে বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা এক সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন—ফলে 1957-58 সালে 'আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ বিজ্ঞান বর্ষের' সৃষ্টি হয়েছিল—যখন সূর্য ছিল বিক্ষুব্ধ অর্থাৎ সৌরচক্রের চরম অবস্থায়। পরে 1963-64 সালে অনুষ্ঠিত হয়েছে, 'আন্তর্জাতিক শান্ত সূর্য বর্ষ'—সূর্য তখন একেবারে শান্ত—অর্থাৎ সৌরচক্রের অবম অবস্থা। এর পরে 1967-68 সালে কলঙ্কগুলি আবার মাথাচাড়া দিয়ে

উঠেছে। বর্তমানে পুনরায় অবমের দিকে যাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা আবহমণ্ডলের বাইরে কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে নতুন নতুন তথ্য সংগ্রহে ব্রতী। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে সৌর-কলঙ্কসহ সৌরদেহের বিচিত্র সব রহস্যের অবগুণ্ঠন উন্মোচিত হবে।

সন্তোষকুমার ঘোড়ই*

---

* পদার্থবিদ্যা বিভাগ, মেদিনীপুর কলেজ ; মেদিনীপুর

পারদর্শিতার পরীক্ষা

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার মে '72 সংখ্যায় তোমাদের দশগুণোত্তর পদ্ধতি ছাড়াও যে অন্যভাবে সংখ্যা গণনা করা যায়, তা বলা হয়েছে এবং দ্বিগুণোত্তর পদ্ধতির যোগ, বিয়োগ ইত্যাদির সঙ্গে তোমরা পরিচিত হয়েছ। এবার পঞ্চগুণোত্তর পদ্ধতি ও দ্বাদশগুণোত্তর পদ্ধতি সম্পর্কে প্রথমে একটু আলোচনা করা যাক।

পঞ্চগুণোত্তর পদ্ধতি—এই পদ্ধতিতে সংখ্যা গণনা কেমন হবে, তা তোমরা অনুমান করতে পারছো নিশ্চয়ই।

পঞ্চগুণোত্তর পদ্ধতিতে ক্রমিক সংখ্যা—0 1 2 3 4 10 11 12···

ঐ সংখ্যাগুলি দশগুণোত্তর পদ্ধতিতে—0 1 2 3 4 5 6 7···

দ্বাদশগুণোত্তর পদ্ধতি—এই পদ্ধতিতে সংখ্যা গণনায় 9-এর পরবর্তী সংখ্যাদ্বয়কে 10, 11 না বলে অন্য কোন চিহ্ন দিয়ে সূচিত করতে হবে, কারণ এই পদ্ধতিতে 10, 11 এই সংখ্যাদ্বয় দশগুণোত্তর পদ্ধতির 12, 13 সংখ্যা বোঝাবে। কাজেই আমরা লিখবো

দ্বাদশগুণোত্তর পদ্ধতি—1 2 3 4 5 6 7 8 9 দ এ 10

ঐ সংখ্যাগুলি দশগুণোত্তর পদ্ধতিতে—1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

এবার প্রশ্নের পালা। তোমাদের মধ্যে যে পাঁচ মিনিটের মধ্যে নীচের পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে, গণিতে তার পারদর্শিতা খুব বেশী বলতে হবে। ঐ সময়ের মধ্যে 4টি, 3টি বা 2টি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলে গণিতে পারদর্শিতা যথাক্রমে বেশী, একটু বেশী বা মাঝারি।

1. নীচে পঞ্চগুণোত্তর পদ্ধতির কয়েকটি যোগ এবং গুণ দেওয়া আছে। উত্তরগুলি আলাদা ভাবে পাশেই দেওয়া আছে। সঠিক ক্রম অনুসারে উত্তরগুলি সাজাও।

(ক) 1+4= 14
(খ) 4+3= 13
(গ) 2×4= 12
(ঘ) 3×3= 10
(ঙ) 4×4= 31

2. দশগুণোত্তর পদ্ধতিতে যে সংখ্যা 333, পঞ্চগুণোত্তর পদ্ধতিতে সেই সংখ্যা হচ্ছে

(ক) 2313
(খ) 2133
(গ) 2331

3. পঞ্চগুণোত্তর পদ্ধতিতে যে সংখ্যা 333, দশ গুণোত্তর পদ্ধতিতে তা হচ্ছে

(ক) 91
(খ) 92
(গ) 93

4. দ্বাদশগুণোত্তর পদ্ধতির কয়েকটি যোগ ও গুণ নীচে দেওয়া আছে। উত্তরগুলি আলাদাভাবে পাশেই লেখা আছে। সঠিক ক্রম অনুসারে সাজিয়ে দাও।

(ক) 5+6= 1দ
(খ) 9+9= 28
(গ) এ×2= 16
(ঘ) 4×8= এ
(ঙ) 5×7= 2এ

5. দশগুণোত্তর পদ্ধতিতে যে সংখ্যা 334, দ্বাদশগুণোত্তর পদ্ধতিতে তা হলো

(ক) 239
(খ) 23এ
(গ) 23দ

(উত্তর 373 নং পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ব্রহ্মানন্দ দাশগুপ্ত ও জয়ন্ত বসু*

* সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-9

কীট-পতঙ্গভুক্ উদ্ভিদ

উদ্ভিদ মাটি থেকে জল আর বাতাস থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড নিয়ে সূর্যের আলোকে পাতার সবুজ কণার সাহায্যে পাতায় খাবার তৈরি করে। কিন্তু কয়েক জাতীয় বিভিন্ন রকমের উদ্ভিদ আছে, যেগুলি কীট-পতঙ্গ শিকার করে দেহপুষ্টির জন্যে নাইট্রোজেনের অভাব পূরণ করে। কীট-পতঙ্গদের ফাঁদে বন্দী করে শিকারী উদ্ভিদেরা তাদের পরিপাক গ্রন্থি-নিঃসৃত জারক রসের সাহায্যে হজম করে তাথেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে।

পৃথিবীতে যে সমস্ত কীট-পতঙ্গভুক উদ্ভিদ আছে, তাদের চারটি গোত্রে (Family) বিভক্ত করা যায়। যথা—

(1) সারাসেনিয়েসী (Sarraceniaceae), (2) নেপেনথেসী (Nepentheceae), (3) ড্রোসেরেসী (Droseraceae) এবং (4) লেনটিবুলারিয়েসী (Lentibulariaceae)।

সারাসেনিয়েসী—এই গোত্রের সারাসেনিয়া নামক উদ্ভিদটি কীট-পতঙ্গভুক্ হিসাবে উল্লেখযোগ্য। উত্তর আমেরিকা, বৃটিশ গায়েনা ইত্যাদি জায়গায় এরা জন্মায়। কিন্তু ভারতবর্ষে এদের পাওয়া যায় না।

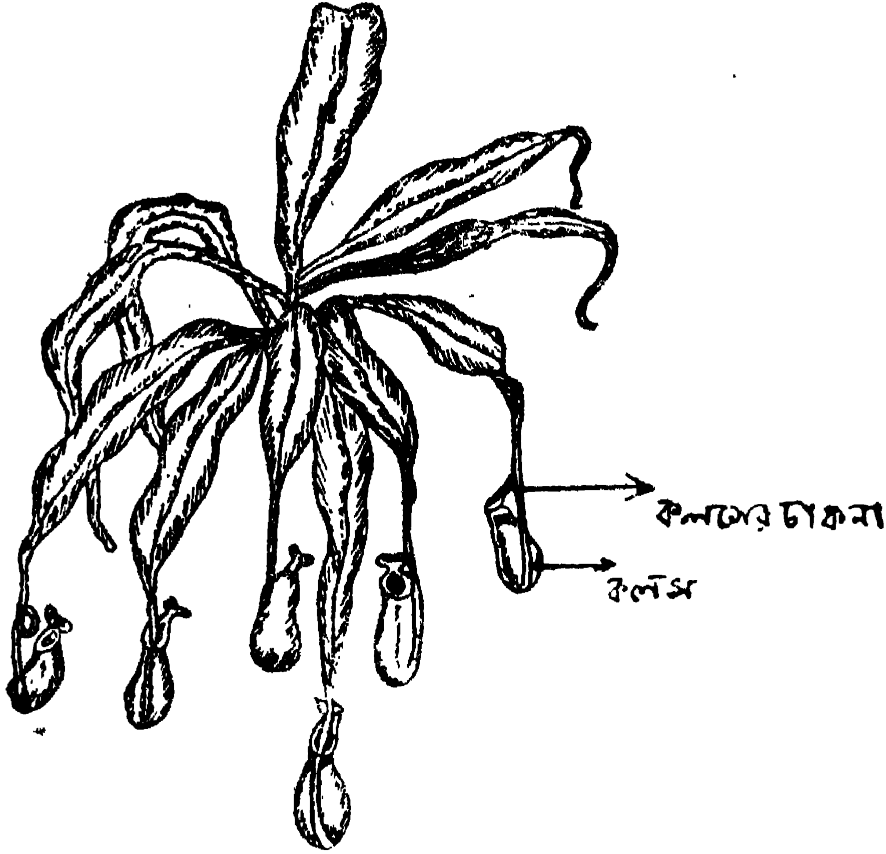
কীট-পতঙ্গ ধরবার জন্যে এদের পাতা বিশেষভাবে তৈরি হয়। পাতাগুলি গুচ্ছা-কারে থাকে এবং কতকটা ঘটির মত হয়। ঘটির উপরিভাগ উজ্জ্বল বর্ণের হয় এবং মুখের কাছে মধু (Nectar) থাকে, যার ফলে পতঙ্গেরা আকৃষ্ট হয়। ঘটির



সারাসেনিয়া

গলার মধ্যে নিম্নাভিমুখী কতকগুলি রোম থাকে। সুতরাং ছোট ছোট পোকামাকড় ভিতরে ঢুকে পড়লে আর বেরুতে পারে না। ঘটির মধ্যে এক ধরণের রস সঞ্চিত হয়। এই রসে প্রোটিন হজম করবার এনজাইম থাকে। উদ্ভিদগুলি এই এনজাইমের সাহায্যে ঘটির ভিতরে বন্দী পোকা-মাকড়ের দেহ হজম করে।

নেপেনথেসী—এই গোত্রের উদ্ভিদগুলি কলস-উদ্ভিদ নামে খ্যাত। এদের একটি মাত্র গণ (Genus) আছে, যেমন—নেপেনথেস (Nepenthes)। ভারতের একমাত্র আসামে খাসিয়া এবং জয়ন্তিয়া পাহাড়ে এদের পাওয়া যায়। এরা গুল্ম, আরোহী অথবা পরাশ্রয়ী হতে পারে। বৃন্তের খানিকটা অংশ চ্যাপ্টা হয়ে পাতার কাজ করে এবং খানিকটা অংশ আকর্ষের কাজ করে। আর ফলকটি কলসে পরিবর্তিত হয়। এই কলসের মুখে একটি ঢাক্‌না থাকে, কিন্তু এই ঢাক্‌না খোলা অথবা বন্ধ করা যায় না।



কলস উদ্ভিদ

কলসের ভিতরের দেয়াল অত্যন্ত পিচ্ছিল এবং এতে প্রোটিন পরিপাক করবার এনজাইম ক্ষরিত হয়। কীট-পতঙ্গ কলসের পিচ্ছিল এবং বক্র দেয়ালের জন্যে ভিতরে পড়ে আঠালো রসে আটকে যায়। পরে একই ভাবে এরা শিকারকে পরিপাক করে। এই কলসগুলির মধ্যে অনেক সময় মৃত পোকা-মাকড় পড়ে থাকতে দেখা যায়।

ড্রোসেরেসী—এই গোত্রে কতকগুলি গণ আছে। এগুলি পতঙ্গ ধরবার ব্যাপারে সুদক্ষ; যেমন—ড্রোসেরা (Drosera), ডায়োনিয়া (Dionoea), অ্যালড্রোভ্যাণ্ডা (Aldrovanda), পিঙ্গুইকিউলা (Pinguicula) ইত্যাদি।

ড্রোসেরা—আমাদের দেশে এগুলিকে সূর্যশিশির বলা হয়। এরা সাধারণতঃ শুষ্ক স্থানে জন্মায়। শীতের সময় ধানক্ষেত এবং তার আশেপাশে এগুলিকে দেখা যায়।

এদের আকার ক্ষুদ্র গুল্মের মত। পাতাগুলি গুচ্ছাকার এবং লালচে রঙের। পাতাগুলি গোলাকার এবং উপরের দিকে প্রচুর গ্রন্থিরোম থাকে। এই গ্রন্থিরোমকে কর্ষিকা বলে। এই কর্ষিকা থেকে এক ধরণের আঠালো রস নিঃসৃত হয়। এই আঠালো রসের উপর সূর্যের আলো পড়ে শিশির বিন্দুর মত ঝক্‌ঝক করে। এই জন্যেই



সূর্যশিশির

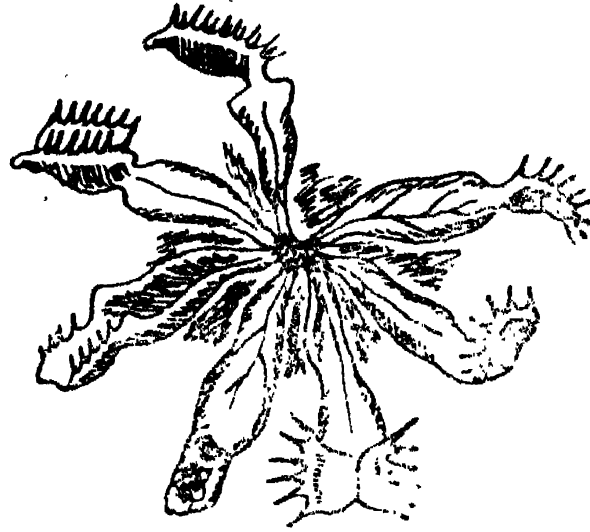
এই উদ্ভিদগুলির নাম সূর্যশিশির। এই উজ্জ্বল জলীয় পদার্থে আকৃষ্ট হয়ে পোকামাকড় কর্ষিকার উপরে এসে বসে এবং সঙ্গে সঙ্গে কর্ষিকাগুলি গুটিয়ে গিয়ে পতঙ্গগুলিকে ধরে ফেলে। আঠালো রসের মধ্যে প্রোটিন পরিপাক করবার এনজাইম থাকে এবং এই ভাবে এরা পতঙ্গের দেহ থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে।

ডায়োনিয়া—ইংরেজীতে এদের বলে ভেনাস ফ্লাই ট্র্যাপ (Venus flytrap)। আমাদের দেশে এদের পাওয়া যায় না। এরা জন্মায় উত্তর আমেরিকায়।

ডায়োনিয়ার পাতাগুলিও গুচ্ছাকারে থাকে। বৃন্তগুলি পক্ষল হয়। পাতার আগার দিকে মাঝখানে একটি খাঁজ থাকে এবং কিনারায় খোঁচা খোঁচা রোম থাকে। যখনই কোন পোকা এসে পাতার আগার দিকে বসে, তখনই পাতার দুইদিক মুড়ে যায় এবং শক্ত রোমগুলি দাঁতে দাঁতে বসে যায় ঠিক ইঁদুর-ধরা কলের মত। এই রোমগুলির মূলে এক ধরণের গ্রন্থি থাকে। যখনই কোন কিছু ধরা পড়ে, তখনই গ্রন্থি থেকে রস নিঃসৃত হয়ে অন্যান্য পতঙ্গভুক্ উদ্ভিদের মতই শিকারকে পরিপাক করে ফেলে।

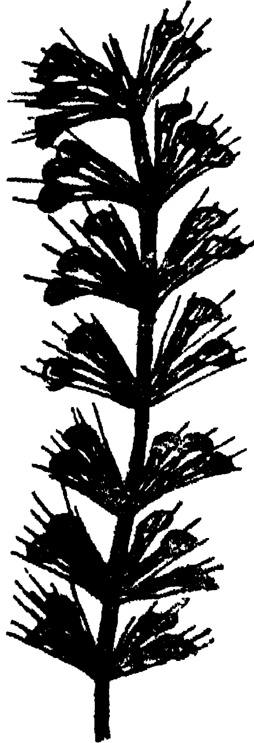
অ্যালড্রোভ্যাণ্ডা—এগুলিকে সাধারণতঃ মালাকা ঝাঁঝি বলা হয়। আমাদের দেশের

পুকুর, খাল ও ডোবায় জলজ উদ্ভিদ হিসাবে এগুলিকে পাওয়া যায়। এরা মূলহীন উদ্ভিদ। এদের পাতাগুলি কতকটা ক্ষুদ্রকায় ডায়োনিয়া পাতার মত। বৃন্তগুলি অল্প পক্ষল হয়

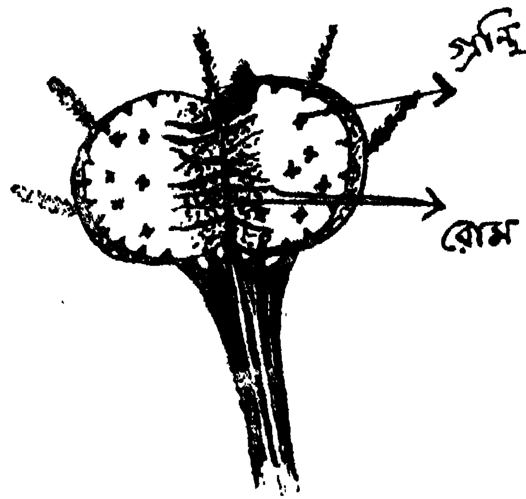


ডায়োনিয়া

এবং কিনারায় ছোট ছোট শক্ত রোম থাকে। পাতার আগার দিকটা গোলাকার, মাঝের অংশ খাঁজকাটা এবং কিনারা দন্তুর (Dentate) হয়। যখনই কোন পতঙ্গ এসে



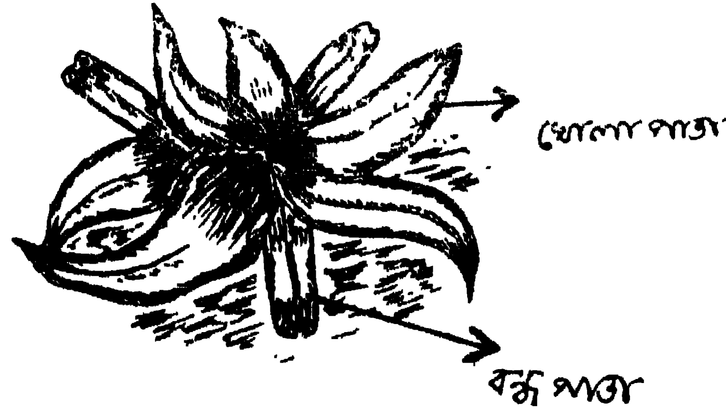
অ্যালড্রোভ্যাণ্ডা



অ্যালড্রোভ্যাণ্ডা পাতার অগ্রভাগ বড় করে দেখানো হয়েছে

পাতার আগার দিকে বসে, তখনই পাতাটি দু-দিক থেকে মুড়ে যায় এবং পতঙ্গটি ধরা পড়ে। যতক্ষণ পর্যন্ত পতঙ্গটি পরিপাক না হয়, ততক্ষণ পাতাটি মুড়ে থাকে।

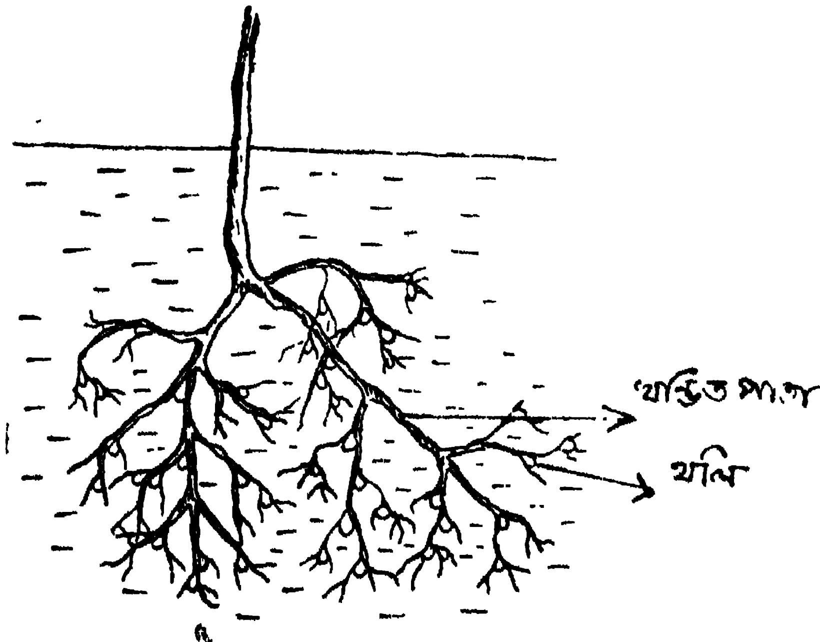
পিঙ্গুইকিউলা—ইংরেজীতে একে বাটার ওয়ার্ট (Butter Wort) বলে। এদের সাধারণতঃ ইউরোপে পাওয়া যায়। এই জাতের একটি মাত্র গাছ হিমালয়ে 11000 থেকে 13000 ফুট উপরে জন্মাতে দেখা যায়। এরা সূর্যশিশিরের মত ক্ষুদ্রকায় হয়। পাতাগুলি সূর্যশিশিরের মত গুচ্ছাকার কিন্তু বৃন্ত এবং কর্ষিকা থাকে না। পাতার



পিঙ্গুইকিউলা

উপরে দুই প্রকারের রোম জন্মায়। একটি সবৃন্তক আর একটি অবৃন্তক। সবৃন্তক রোম থেকে এক রকম আঠালো রস এবং অবৃন্তক রোম এক ধরণের এন্‌জাইম নিঃসৃত হয়। যখনই কোন পতঙ্গ উড়ে এসে পাতার উপরে বসে, তখনই তারা আঠালো রসে জড়িয়ে যায় আর পাতাটির দু-প্রান্ত মুড়ে গিয়ে পোকাটিকে ধরে ফেলে দেহসাৎ করে।

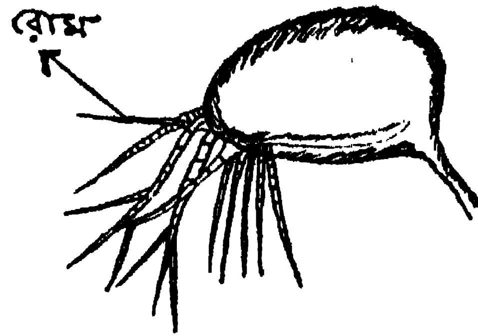
লেনটিবিউলারিয়েসী—এই গোত্রের একটি গাছ কীট-পতঙ্গভুক্‌ উদ্ভিদ হিসাবে



ইউট্রিকিউলারিয়া

উল্লেখযোগ্য, যথা—ইউট্রিকিউলারিয়া (Utricularia)। ইংরেজীতে এদের 'ব্লাডার

ওয়ার্ট' (Bladder Wort) বলা হয়। এগুলি আমাদের দেশে খানা, ডোবা, পুকুর, ইত্যাদি জায়গায় জন্মায়। এরাও এক ধরণের ঝাঁঝি। এরা মালাকা ঝাঁঝির মত জলের উপরে ভাসে। এগুলি মূলহীন উদ্ভিদ। এদের পাতাগুলি জলের নীচে এত বেশী শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত থাকে যে, মূলের মত মনে হয়। প্রচুর পাতা থলিতে রূপান্তরিত হয়। থলিগুলির ভিতরের দেয়ালে কিছু পরিপাক গ্রন্থি থাকে। থলিতে একটি ছিদ্র আছে এবং এই ছিদ্রের মুখে একটি কপাটিকা (Valve) থাকে। একে বাইরে থেকে



ইউট্রিকিউলারিয়ার একটি থলিকে বড় করে দেখানো হয়েছে

খোলা যায়, কিন্তু ভিতর থেকে খোলা যায় না। শাখান্বিত রোম অথবা শক্ত রোম ছিদ্রটির চারপাশে এবং কপাটিকার উপরে ও পরে থাকে। ক্ষুদ্র কোন জলজ পোকা কপাটিকার উপরের রোমগুলি ঠেললে কপাটিকাটি খুলে যায়। পোকাটি তখন থলির ভিতর ঢুকে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে কিছু জলও ওর মধ্যে ঢুকে যায়। ভিতরের ওই জলের চাপে কপাটিকাটি বন্ধ হয়ে যাবার ফলে পোকাটি আর বেরোতে পারে না। তখন উদ্ভিদটি আস্তে আস্তে গ্রন্থি-রসের সাহায্যে শিকারকে পরিপাক করে।

প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের তুলনায় মানুষের জ্ঞান অতি সামান্য। বিচিত্র ধরণের অসংখ্য উদ্ভিদ মানুষ আবিষ্কার করেছে, আবার অনাবিষ্কৃতও রয়েছে উদ্ভিদ ও রয়েছে প্রচুর। ভবিষ্যতে হয়তো আরও বিচিত্র ধরণের পতঙ্গভুক্ উদ্ভিদ আবিষ্কৃত হবে।

গোপালচন্দ্র দাস*

* উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ, রামপুরহাট কলেজ; রামপুরহাট, বীরভূম

উত্তর

(পারদর্শিতার পরীক্ষা)

1. (ক) 10
   (খ) 12
   (গ) 13
   (ঘ) 14
   (ঙ) 31

[

	দশগুণোত্তর পদ্ধতি		পঞ্চগুণোত্তর পদ্ধতি
$1+4=$	5	=	10
$4+3=$	7	=	$12\ (=1\times5^1+2\times5^0)$
$2\times4=$	8	=	$13\ (=1\times5^1+3\times5^0)$
$3\times3=$	9	=	$14\ (=1\times5^1+4\times5^0)$
$4\times4=$	16	=	$31\ (=3\times5^1+1\times5^0)$

2. 2313

[দশগুণোত্তর পদ্ধতিতে 333

$= 2\times5^3+3\times5^2+1\times5^1+3\times5^0$

$\equiv$ 2313 (পঞ্চগুণোত্তর পদ্ধতিতে)

অথবা গত মাসে প্রদত্ত অন্য পদ্ধতি অনুসারে

```
5 | 333
   5 | 66 - 3
      5 | 13 - 1
         5 | 2 - 3
             0 - 2
```

$\therefore$ $333\equiv2313$ (পঞ্চগুণোত্তর পদ্ধতিতে)]

3. 93

[পঞ্চগুণোত্তর পদ্ধতির সংখ্যা

$333\equiv3\times5^2+3\times5^1+3\times5^0$

$=75+15+3$

$=93$]

4. (ক) এ
   (খ) 16
   (গ) 1দ
   (ঘ) 28
   (ঙ) 2এ

[	দশগুণোত্তর পদ্ধতি	দ্বাদশগুণোত্তর পদ্ধতি
5+6=	11	এ
9+9=	18	$16(=1\times12^1+6\times12^0)$
এ×2=	22	1দ$(=1\times12^1+10\times12^0)$
4×8=	32	$28(=2\times12^1+8\times12^0)$
5×7=	35	2এ$(=2\times12^1+11\times12^0)$]

5. 23দ

[দশগুণোত্তর পদ্ধতির 334

$=2\times12^2+3\times12^1+10\times12^0$

$\equiv$23দ]

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন 1. ভাত ও রুটির মধ্যে কোন্‌টি অধিক পুষ্টিকর?

সন্দীপ গুপ্ত, সুদীপ্ত সরকার (বীরভূম)

প্রশ্ন 2. উদ্ভিদের খাদ্য ও পরিপাকক্রিয়া সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই।

দীপ্তি আচার্য, কলিকাতা-34

উত্তর 1. আমাদের অনেকেরই ধারণা, ভাত অপেক্ষা রুটি অধিক পুষ্টিকর। কিন্তু তুলনামূলকভাবে চাল ও গমের উপাদানের বিষয় আলোচনা করলে দেখা যাবে, চাল গম অপেক্ষা অধিক পুষ্টিকর। আমরা যে পদ্ধতিতে ভাত রান্না করি, তাতে চালের পুষ্টিকর উপাদানগুলির অধিকাংশই নষ্ট হয়ে যায়। ঢেঁকিছাটা চাল কলেছাটা চাল অপেক্ষা অধিক পুষ্টিকর। চাল ও গম মূলতঃ শ্বেতসারপ্রধান খাদ্য, যা আমাদের শরীর গঠনে অপরিহার্য। এই শ্বেতসার গমের তুলনায় চালেই বেশী থাকে। শ্বেতসার ছাড়া ক্যালসিয়াম, ফস্‌ফরাস, লৌহ ইত্যাদি ধাতব পদার্থ দুটিতেই প্রায় সমান পরিমাণে পাওয়া যায়। গমে প্রোটিনের পরিমাণ চাল অপেক্ষা বেশী। কিন্তু চালের প্রোটিন গমের প্রোটিনের তুলনায় সহজে হজম হয়। কাজেই প্রোটিনের পরিমাণে পার্থক্য থাকলেও পুষ্টির দিক থেকে উভয়েই সমান।

শ্বেতসার বাদে চাল বা গমে অন্যান্য উপাদানগুলি থাকে ঠিক খোসার নীচে। গমের আটায় এই উপাদানগুলি খোসার সঙ্গে অধিকাংশই বাদ পড়ে যায়। কিন্তু সিদ্ধ-চালে এই উপাদানগুলি খোসা থেকে চালের সঙ্গে মিশে যায়। ফলে চালে পুষ্টিকর

উপাদানগুলির অধিকাংশই বজায় থাকে। ভাতের ফেনের সঙ্গে কিছু পুষ্টিকর অংশ বেরিয়ে আসে। একারণে ফেন না ফেলে ভাত রান্নার অভ্যাস করা দরকার।

উত্তর 2. প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সব প্রাণীই তাদের জীবনধারণের জন্যে উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। উদ্ভিদেরা তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্যোপাদান সংগ্রহ করে মাটি ও বায়ুমণ্ডল থেকে এবং নিজ দেহের অভ্যন্তরেই এই রাসায়নিক উপাদানগুলিকে তাদের খাদ্যোপযোগী করে তোলে। উদ্ভিদের খাদ্যের মধ্যে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় মৌলিক পদার্থগুলি হচ্ছে অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, কার্বন, নাইট্রোজেন, সালফার, ফস্‌ফরাস, ক্যালসিয়াম, ম্যাগ্নেসিয়াম, পটাশিয়াম ও লোহা ইত্যাদি। এদের মধ্যে উদ্ভিদ বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন সংগ্রহ করে এবং অন্যান্য পদার্থগুলি পায় মাটি থেকে।

উদ্ভিদের যে কোন অংশেই কম বা বেশী পরিমাণে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, খনিজ পদার্থ ও ভিটামিন পাওয়া যায়। উদ্ভিদকোষে এগুলি অদ্রবণীয় অবস্থায় থাকে। এই অদ্রবণীয় পদার্থগুলি আর্দ্রবিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় দ্রবণীয় পদার্থে পরিণত হয় এবং উদ্ভিদদেহের এক অংশ থেকে অপর অংশে সঞ্চালিত হয়। দ্রবণীয় অবস্থায় এগুলি সহজেই উদ্ভিদের পুষ্টি ও বৃদ্ধির কাজে লাগে। উদ্ভিদের খাদ্যগুলি বিশ্লিষ্ট হবার কাজে বিভিন্ন প্রকার কোষনিঃসৃত এনজাইম বিভিন্ন পর্যায়ে অনুঘটকের কাজ করে। প্রাণীদেহে খাদ্যবস্তুর পরিপাকক্রিয়া শরীরের একটি নির্দিষ্ট স্থানে সংঘটিত হয়, কিন্তু উদ্ভিদদেহে পরিপাকক্রিয়া যে কোন স্থানে সংঘটিত হতে পারে।

শ্যামসুন্দর দে*

* ইনস্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স; বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-9

শোক-সংবাদ

পরলোকে অনিলকুমার ভট্টাচার্য

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জৈব রসায়ন বিভাগের রীডার ডক্টর অনিলকুমার ভট্টাচার্য গত 6ই মে তাঁর কলকাতার বাসভবনে পরলোকগমন করেছেন।

ডক্টর ভট্টাচার্য 1944 সালে বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে রসায়নশাস্ত্রে অনার্সসহ বি. এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং 1946 সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিশুদ্ধ রসায়নশাস্ত্রে এম. এস-সি ডিগ্রী লাভ করেন। এরপর তিনি বিজ্ঞান কলেজে ডক্টর অসীমা চট্টোপাধ্যায়ের অধীনে উদ্ভিজ্জ রসায়ন বিষয়ে গবেষণা সুরু করেন এবং সেই সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ কলেজে অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন। উদ্ভিজ্জ রসায়নে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক গবেষণার জন্যে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 1954 সালে প্রেমচাঁদ

রায়চাঁদ বৃত্তি এবং 1956 ডি. এস-সি ডিগ্রী লাভ করেন।

1956 সালে ডক্টর ভট্টাচার্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে প্রখ্যাত রসায়ন-বিজ্ঞানী অধ্যাপক এ. আর. গোল্ডফার্বের অধীনে গবেষণা করেন। তিনি



অনিলকুমার ভট্টাচার্য

সেখানে র‍্যাগ-উইডের পরাগবাহিত 'হে-ফিবার'-এর অধিবিষের সূত্র আবিষ্ক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি রাজ্যে এই ব্যাধির বিশেষ প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। ডক্টর ভট্টাচার্য কর্কট রোগ সম্পর্কেও সেখানে গবেষণা করেন।

1959 সালে স্বদেশে ফিরে এসে ডক্টর ভট্টাচার্য সুরেন্দ্রনাথ কলেজে কিছুকাল অধ্যাপনার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে রসায়ন বিভাগে যোগদান করেন এবং 1963 সালে তিনি জৈব রসায়ন বিভাগের রীডার নিযুক্ত হন। তিনি এই বিভাগে একটি দক্ষ গবেষক ছাত্রগোষ্ঠী গড়ে তোলেন, যাঁরা তাঁর অধীনে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। প্রকৃতিজ উপাদান টার্পিন, কুমারিন, উপক্ষার ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁর 25টিরও বেশী মৌলিক গবেষণা-পত্র স্বদেশে ও বিদেশে বিশিষ্ট বিজ্ঞান পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

মানুষ হিসাবে তিনি ছিলেন সদালাপী, সহৃদয় এবং অমায়িক। যে কেউ তাঁর সংস্পর্শে এসে প্রীতি-মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ হতেন। তিনি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রাক্তন সদস্য ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র 49 বছর এবং তিনি তাঁর স্ত্রী বেথুন কলেজের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপিকা ডক্টর অনিমা ভট্টাচার্য ও দুই কন্যা রেখে গেছেন। আমরা তাঁর পরলোকগত আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

র. ব.

চিঠিপত্রের বিভাগ ঃ একটি বিজ্ঞপ্তি

আধুনিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়, মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষা, বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ প্রভৃতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনার উদ্দেশ্যে এই পত্রিকায় একটি 'চিঠিপত্রের বিভাগ' খুলিবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। উক্ত বিভাগে প্রকাশের জন্য পাঠকবর্গের নিকট হইতে চিঠি আহ্বান করা হইতেছে। প্রতিটি চিঠির একটি উপযোগী শিরোনাম দেওয়া প্রয়োজন এবং চিঠির আয়তন মোটামুটিভাবে 400 শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা বাঞ্ছনীয়। চিঠির প্রকাশ এবং আবশ্যকবোধে উহার অল্পবিস্তর পরিবর্তন সম্বন্ধে পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর অভিমতই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

চিঠিপত্র পাঠাইবার ঠিকানা—প্রধান সম্পাদক, 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান', পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-6।